2011 - 1432

IslamHouse.com

অন্তর বিধ্বংসী বিষয়: আসক্তি

[বাংলা – Begali – بنغالي]

মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জেদ

অনুবাদ : জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿مفسدات القلوب: الشهوة﴾

«باللغة البنغالية»

محمد صالح المنجد

ترجمة: ذاكرالله أبوالخير

مراجعة: د. أبوبكر محمد زكريا

2011 - 1432

IslamHouse.com

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য যিনি সমগ্র সৃষ্টিকুলের রব। আর সালাত ও সালাম নবীগণের সেরা ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর এবং তার পরিবার -পরিজন ও সাথী-সঙ্গীদের সকলের উপর।

মনে রাখতে হবে, আসক্তি ও আসক্তির আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে কথা বলা বর্তমান যুগে প্রতিটি নর নারীর জন্য অতি জরুরি। কারণ, বর্তমানে আসক্তি-উত্তেজনা ও এর প্রভাব এতই বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আমাদের দেশ ও সমাজ এক অজানা গন্তব্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারপরও দেশ, জাতি ও সমাজকে পশুত্ব ও পাশবিকতার করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য এ বিষয়ে জাতিকে সতর্ক করা ও খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানিয়ে দেয়া একান্ত জরুরী। পুস্তিকাটিতে আসক্তির বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হবে। যেমন,

আসক্তি কি?

আসক্তিকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?

আসক্তির পূজা করে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহে জড়িত হওয়ার কারণগুলো কি?

আসক্তির চিকিৎসা কি? ইত্যাদি বিষয়গুলো এ কিতাবে আলোচনা করা হবে।

যারা এ কিতাবটি তৈরি করতে এবং কিতাবের বিষয়গুলোকে একত্র করতে আমাদের সহযোগিতা করেছেন আমরা তাদের সবাইর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও যাবতীয় কল্যাণ কামনা করছি এবং তাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করি, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন তাদেরকে আরও বেশি বেশি করে ভাল কাজ করার তাওফিক দেন। আমীন!

হে আল্লাহ! তুমি হালাল দান করে আমাদের হারাম বিমুখ কর, আর তোমার আনুগত্য দ্বারা তোমার অবাধ্যতা থেকে আমাদের হেফাজত কর। আর তোমার অনুগ্রহ দ্বারা আমাদেরকে গাইরুল্লাহ থেকে হেফাজত কর।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

আসক্তি বা شهوة এর সংজ্ঞা

আসক্তি বা شهوة এর আভিধানিক অর্থ:

আল্লামা ইবন ফারেস রহ. বলেন, شهوة শব্দটি সীন, হা ও মুতাল হরফ ওয়াও দ্বারা গঠিত একটি আরবী শব্দ। অর্থাৎ, আসক্তি, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা ইত্যাদি। আরবীতে বলা হয়- رجل شهوان، অর্থাৎ, লোকটি প্রলুব্ধ, লোভী ও আকাঙ্খাকারী।

আল্লামা ফাইরুযাবাদী রহ. বলেন,

شهي الشيء وشهاه يشهاه شهوةً

এ কথাটি তখন বলা হয়ে থাকে, যখন লোকটি কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে, বস্তুটিকে মহব্বত করে, বস্তুটির বিষয়ে তার আগ্রহ থাকে এবং সে বস্তুটি কামনা করে।

আসক্তি বা شهوة এর পারিভাষিক অর্থ:

পরিভাষায় شهوة [আসক্তির চাহিদা] এর একাধিক অর্থ আছে। আমরা গুরুত্বপূর্ণ দু'একটি অর্থ এখানে আলোচনা করব।

এক. এটি মানুষের দৈহিক একটি স্বভাব যার উপর ভিত্তি করেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার স্বীয় বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানব সৃষ্টির রহস্য, মহান উদ্দেশ্য ও মহৎ লক্ষ্য সাধিত হয়।

দুই. আসক্তি হল, নারী ও পুরুষের সংসার করার আগ্রহ।

তিন. কোন বস্তুর প্রতি অন্তরের চাহিদা।

আসক্তি সৃষ্টির কারণ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবকে সৃষ্টি করার সাথে তার মধ্যে এমন একটি মানবিক চাহিদা দান করেন, যা দ্বারা আল্লাহ মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি ধারণা দেন।

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, "আমরা আমাদের দুনিয়ার জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ অর্জনে যাতে সহযোগিতা লাভ করতে পারি, তাই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের মধ্যে আসক্তি

ও কামনা-বাসনাকে সৃষ্টি করেছেন। এ ছাড়াও তিনি আমাদের মধ্যে খাদ্যের চাহিদা ও তা ভোগ করার চাহিদা সৃষ্টি করেছেন। মূলত: এটি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনেক বড় নেয়ামত| দুনিয়াতে বেঁচে থাকা এবং দৈহিক ক্ষমতা সচল রাখার জন্য খাদ্য -পানীয় আমাদের অপরিহার্য, খাদ্য পানীয় ছাড়া আমাদের বেঁচে থাকা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে বিবাহ করা, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে-মিশে ঘর-সংসার করার নাম। আর এটিও একটি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনেক বড় নেয়ামত। বিবাহ দ্বারা বংশ পরিক্রমা ও তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের যে সব কর্ম ও ইবাদত-বন্দেগী করার নির্দেশ দিয়েছেন, যদি আমরা আমাদের শক্তি দ্বারা তা পালন করতে পারি, তাহলে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ লাভে সক্ষম হব এবং আমরা সে সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হব, যাদের মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশেষ নেয়ামত দান করেছেন এবং দুনিয়াতে তাদের সৌভাগবান করেছেন | আর যদি আমরা আমাদের আসক্তির পুজা করি এবং যে সব কর্ম আমাদের ক্ষতির কারণ হয়, তা করতে থাকি, যেমন- হারাম খাওয়া, অন্যায়ভাবে উপার্জন করা, অপচয় করা, আমাদের স্ত্রীদের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করা ইত্যাদি, তাহলে আমরা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে জালেম ও অন্যায়কারী হিসেবে পরিগণিত হব। আমরা কখনোই

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর নেয়ামতের শুকর গুজার বান্দা হিসেবে বিবেচিত হব না”[1]।

উল্লেখিত আলোচনা হতে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়, আর তা হল, কামনা-বাসনা ও আসক্তি মূলত: কোন খারাপ কিছু নয়, তবে তার ব্যবহারের কারণে তা ভালো ও খারাপে পরিণত। কামনা-বাসনা ও আসক্তিকে যদি বৈধ, ভালো ও কল্যাণমুলক কাজে ব্যবহার করা হয়, তখন তা অবশ্যই ভালো এবং এবং প্রসংশনীয়। আর তা না করে যদি তাকে খারাপ ও মন্দ কাজে ব্যবহার করা হয়, তখন তা অবশ্যই খারাপ বলে বিবেচিত হবে । এ জন্য এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে , একজন মানুষ তার কামনা-বাসনা ও আসক্তির পরিচালক, সে তার কামনা-বাসনা ও আসক্তিকে যেভাবে চালাবে তা সেভাবেই চলতে বাধ্য থাকবে।

এতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আরও বড় হিকমত হল, যদি মানুষের মধ্যে কামনা-বাসনা ও আসক্তি না থাকত, তাহলে সে কখনোই বিবাহ করত না, সন্তান লাভের প্রতি তার কোন আকর্ষণ থাকত না এবং সন্তানের চাহিদা থাকত না। ফলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মানব সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য তা হাসিল হত না এবং তার প্রতিফলন ঘটতো না। এ কারণে বলা চলে, আমাদের সৃষ্টির বিশেষ হিকমত ও বুদ্ধিমত্তা হল, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে এমন এক আসক্তি বা কামনা দিয়ে সৃষ্টি

[1] আল-ইস্তেকামাহ ৩৪১-৩৪২/১

করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে আমাদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব। অন্যথায় আমরা টিকে থাকতে পারতাম না , আমাদের বংশ-পরিক্রমা ও তার ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যেত এবং দুনিয়ার স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হত। কিন্তু কামনা-বাসনা ও আসক্তির চাহিদা কখনো কখনো মানব জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে এবং তাদের বিপর্যয় ডেকে আনে।

আর সৃষ্টির বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের চিরন্তন পদ্ধতি হল, তিনি বিভিন্ন হিকমত ও মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তাদের সৃষ্টি করেন। আর দুনিয়াতে তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন। যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম বিনিময় । আর যারা পরীক্ষায় ফেল করবে তাদের জন্য রয়েছে অসহনীয় যন্ত্রণা ও কঠিন শাস্তি। আর পরীক্ষার বিশেষ অংশ হল, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের কামনা-বাসনা ও আসক্তির চাহিদা দিয়ে সৃষ্টি করেন, যাতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পার্থক্য স্পষ্ট করে দিতে পারেন কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনুগত বান্দা, আর কে অবাধ্য । তিনি আরও স্পষ্ট করেন কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র বান্দা, আর কে অপবিত্র ও অপরাধী।

মালেক ইব্ন দীনার রহ. বলেন, "দুনিয়ার জীবনের চাহিদা যার নিকট প্রাধান্য পায়, শয়তান তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আশ্রয় হতে দূরে সরিয়ে দেয়"।

হাসান বছরী রহ. বলেন,

رب مَسُتورٍ سَبَتْهُ شَهْوَةٌ

فَتَعَرَّى سِتْرُهُ فَانْهَتَكا

صَاحِبُ الشَّهْوَةِ عَبْدٌ فإذا

غَلَبَ الشَّهْوَةَ أَضْحَى مَلِكا

"অনেক আত্মগোপনে থাকা মানুষকে তার আসক্তি বন্দি করে ফেলে। অতঃপর যখন সে গোপন পর্দা খুলে যায় তখন তা আবরণ শুন্য হয়ে পড়ে। কামনা-বাসনা ও আসক্তির পুজারী হল একজন দাস কিন্তু যখন সে তার আসক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তখন সে সত্যিকার বাদশায় পরিণত হয়"[2]।

দুনিয়াতে পুরুষের সবচেয়ে বড় চাহিদা হল নারী। এ কারণে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে নারীদের কথা প্রথমে আলোচনা করেন। তিনি মানব জাতিকে জানিয়ে দেন যে, নারীদের ফিতনা সর্বাধিক মারাত্মক, ক্ষতিকর এবং সমাজ ও

---

[2] হুলিয়াতুল আওলিয়া ২/৩৬৫, জাম্মুল হাওয়া ২২

ব্যক্তি জীবনে এর প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী ও ভয়াবহ । আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনের করীমে এরশাদ করেন.

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلۡبَنِينَ وَٱلۡقَنَٰطِيرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡخَيۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ وَٱلۡحَرۡثِۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلۡمَ‍َٔابِ﴾ [آل عمران : 14.]

"মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে কামনা-বাসনা ও আসক্তির ভালবাসা- নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যখেত । এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগ সামগ্রী। আর আল্লাহ, তাঁর নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল "। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪]

উসামা ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»

"আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য অধিক ক্ষতিকর নারীদের চেয়ে খারাপ কোন ফিতনা রেখে যাইনি"[3]।

---

[3] বুখারি ৫০৩৬ মুসলিম ২৭৪০

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« اتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»

"তোমরা দুনিয়া বিষয়ে সতর্ক থাক এবং তোমরা নারীদের বিষয়ে সতর্ক থাক। কারণ, বনী ইসরাইলদের সর্বপ্রথম ফিতনা ছিল নারীদের বিষয়ে"[4]।

নিষিদ্ধ বিষয়সমূহে লিপ্ত হওয়ার কারণ

প্রথম: ঈমানের দুর্বলতা:

ঈমান হল মুমিনের আত্মরক্ষার জন্য সবচেয়ে মজবুত ও বড় হাতিয়ার; ঈমানই মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় দুর্গ ও আশ্রয়স্থল, যা তাকে খারাপ, মন্দ, ঘৃণিত, নিকৃষ্ট ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। যখন কোন মানুষ আল্লাহর আনুগত্য হতে দূরে সরে যায়, তখন তার ঈমান দুর্বল হয় এবং সে অন্যায় ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নাফরমানী করা ও অবাধ্য হওয়ার সাহস পায়। এ কারণেই কোন কোন মনীষী বলেন, তিনটি জিনিস হল,

[4] মুসলিম ২৭৪২

তাকওয়ার নিদর্শন। এক. শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও খারাপ কামনা-বাসনা ও আসক্তির চাহিদাকে ছেড়ে দেয়া। দুই. নফসের বিরোধিতা করে নেক আমলসমূহ পালন করা। তিন. নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আমানতকে তার হকদারের নিকট পৌঁছে দেয়া। এ তিনটি কাজ যে ব্যক্তি করবে তা প্রমাণ করে যে, লোকটির মধ্যে ঈমান ও দ্বীনদারি আছে। কারণ, তার সামনে হারাম কাজ অপেক্ষমাণ কিন্তু সে কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয়ে তা হতে বিরত থাকছে। সে তার নফসের চাহিদার বিরুদ্ধে স্বীয় আত্মাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতে বাধ্য করছে। তার শত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আমানতের খেয়ানত করে নি। অন্যের আমানতকে প্রকৃত হকদারের নিকট পৌঁছে দিয়েছে।

দ্বিতীয়. অসৎ সঙ্গ:

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

"মানুষ তার বন্ধুর স্বভাবের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, সুতরাং তোমরা দেখে শোনে বন্ধু নির্বাচন করবে"[5]।

সাধারণত মানুষ যে সব অন্যায়, পাপাচার, অপরাধ ও অপকর্ম করে থাকে, তার অধিকাংশের কারণ হল, তার অসৎ সঙ্গী। যাদের সঙ্গী খারাপ হয়, তারা ইচ্ছা করলেও ভালো থাকতে পারে না। সঙ্গীরা তাদের খারাপ ও অন্যায় কাজের দিকে নিয়ে যায়।

একজন সতের বছরের যুবক তার জীবনে প্রথম অপকর্মের বর্ণনা দিয়ে বলল, "আমি প্রথমে আমার এক বন্ধুর বাসায় তার সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে সেখানে নিষিদ্ধ সিনেমা দেখি। আমি তার কামরায় অবস্থান করলে সে একটি ভিডিও ফিল্ম চালালে আমি তার সাথে বসে তা দেখতে থাকি। এ ছিল আমার জীবনের সর্ব প্রথম অপরাধ"।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নোংরামি, অশ্লীলতা ও ব্যভিচারকে নিষেধ করেন এবং বেহায়াপনা হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۝١٤٨﴾ [سورة النساء : 148.]

---

[5] আবু দাউদ ৪৭৩৩ , তিরমিযি ২৩৭৮, আল্লামা আলবানি হাদিসটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেন।

মন্দ কথার প্রচার আল্লাহ পছন্দ করেন না , তবে কারো উপর যুলম করা হলে ভিন্ন কথা। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা , সর্বজ্ঞানী। [সূরা নিসা, আয়াত: ১৪৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« لَيْسَ المؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّان وَلَا الفَاحِشِ وَلَا البَذِيءِ »

"ঈমানদার ব্যক্তি খোটাদানকারী নয়, অভিশাপকারীও নয়; অনুরূপভাবে অশ্লীল ও খারাপ বচন বিশিষ্ট ও নোংরা ব্যক্তিও হতে পারে না"[6]।

তৃতীয়: দৃষ্টির হেফাজত করা:

মানুষ যখন রাস্তায় বের হয় তখন তাকে অবশ্যই দৃষ্টির হেফাজত করতে হবে। কারণ, মানুষের দৃষ্টি হল, ইবলিসের বিষাক্ত হাতিয়ার বা তীর। দৃষ্টি হেফাজত করতে না পারলে বিভিন্ন ধরনের অপকর্মের শিকার হতে হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার বান্দাদের দৃষ্টির ব্যাপারে অধিক সতর্ক করেন এবং ভয় দেখান। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

[6] তিরমিযি ১৯৭৭ আল্লামা আলবানি হাদিসটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেন।

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝٣٠﴾ [سورة النور: 30]

"মুমিন পুরুষদেরকে বল , তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত"। [সূরা নূর, আয়াত: ৩০]

চতুর্থ: বেকারত্ব:

বেকারত্ব যুবকদের জন্য মারাত্মক ক্ষতি। শুধু ক্ষতিই নয়, এটি মানব জীবনের জন্য বড় একটি অভিশাপ। যখন তাদের কোন কাজ না থাকে তখন তাদের মস্তিষ্কে খারাপ চিন্তা ঢুকে পড়ে এবং বেকারত্ব তাদের খারাপ ও অশ্লীল কাজের দিকে নিয়ে যায়। তারা খারাপ, অন্যায় ও অশ্লীল কাজের চক আঁকতে থাকে। ধীরে ধীরে তাদের অবস্থা এমন হয় তারা শুধু খারাপ চিন্তাই করতে থাকে। ভালো কোন চিন্তা তাদের মাথায় কাজ করে না। ফলে সে এমন খারাপ অভ্যাসের অনুশীলন করতে থাকে, যা তার জীবনকে ধ্বংসের দ্বার-প্রান্তে পৌঁছে দেয়।

মানবাত্মা যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য ও ইবাদত বন্দেগীতে সময় ব্যয় করবে না তখন সে অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর নাফরমানিতে সময় নষ্ট করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বাণীতে এ কথাটিই বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ :الصِّحَّةُ، وَالفَرَاغُ »

"দুটি নেয়ামত এমন আছে যার মধ্যে অধিকাংশ মানুষ প্রতারিত। এক- সুস্থতা দুই-অবসরতা" [7]। বেকার থাকা একটি বড় মুসিবত এবং আত্মার জন্য মারাত্মক ক্ষতি। যদি মানুষ কোন ভালো কাজে ব্যস্ত না থাকে, তাহলে শয়তান অবশ্যই তাকে খারাপ কাজের দিকে নিয়ে যায়।

পঞ্চম: নিষিদ্ধ কাজে শৈথিল্য:

মানুষ যখন কোন কাজে শিথিলতা দেখায়, তখন তা ধীরে ধীরে বড় আকার ধারণ করে। অধিকাংশ সময় মেয়েদের প্রতি তাকানো ও তাদের সাথে সংমিশ্রণ মানুষকে অশ্লীল কাজ করতে বাধ্য করে। অথচ প্রথম যখন একজন মানুষ কোন মেয়ের সাথে কথা-বার্তা বলে ও তার দিকে তাকায় তখন তার খারাপ কোন উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু ধীরে ধীরে তার অবনতি হতে থাকে এবং তা বড় আকার ধারণ করে। ছোট হারাম বা ছোট গুণাহের প্রতি শৈথিল্য তাকে বড় হারাম বা কবীরা গুণাহের দিক নিয়ে যায়।

---

[77] বুখারি ৬৪১২

বর্তমান সময়ে অনেক পরিবার এমন আছে, যারা চাকরানিকে তাদের যুবক ছেলের সাথে মিশতে কোন বাধা দেয় না, তারা মনে করে, এতে কোন সমস্যা নাই। কারণ, আমাদের ছেলেরা কি ঘরের চাকরানির সাথে কোন অপকর্ম করতে পারে? কিন্তু পরবর্তীতে যখন দুর্ঘটনা ঘটে যায়, তখন তারা লজ্জায় নিজের আঙ্গুল নিজেই কাটতে থাকে।

আবার অনেক পরিবার আছে যারা তাদের মেয়েদের ড্রাইভারের সাথে ছেড়ে দেয়। মনে করে সে একজন ড্রাইভার তার সাথে কি আমাদের মেয়েরা কোন খারাপ চিন্তা করতে পারে? কিন্তু না, দেখা যায় এর পরিণতি খুবই খারাপ হয়। মেয়েরা ড্রাইভারের প্রেমে পড়ে যায় এবং অনেক সময় তা-ই ঘটে যা তুমি কোন দিন চিন্তাই করতে পার নি।

এ ধরনের অনেক ঘটনাই আমাদের শৈথিল্যের কারণে সমাজে সংঘটিত হচ্ছে, যা একজন মানুষকে মহা বিপদ ও ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করে।

ষষ্ট: যৌন উত্তেজক বস্তুর সাথে উঠবস করা:

হারাম বা নিষিদ্ধ কাজে একজন মানুষ তখন লিপ্ত হয়, যখন বিভিন্ন ধরনের যৌন উত্তেজক কাজ যেমন, গান, বাজনা, সিনেমা,

মেয়েদের সাথে কথা বলা ও হাসি ঠাট্টা ইত্যাদির সাথে তার সংশ্রব থাকে। এ কারণেই শরীয়ত অপকর্মের সকল উপাদানকে নিষেধ করে। যেমন, শরিয়ত রাস্তার মাঝে বসা হতে নিষেধ করে। কারণ রাস্তায় বসলে বিভিন্ন ধরনের নোংরা ছবি, পোষ্টার ও মেয়েদের দেখারা আশঙ্কা থাকে যেগুলো একজন মানুষের যৌন উত্তেজনাকে বৃদ্ধি করে এবং অপকর্মের দিক উৎসাহ যোগায়।

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِيَّاكُم وَالجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ فقالوا يا رسول الله ما لنا بُدٌّ، من مجالسنا نتحدث فيها .قال فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجْلِسَ فَأَعْطُواالطَّرِيقَ حَقَّهَ قالوا :وما حقه؟ قال غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، والأمرُ بِالمَعْرُوفِ، والنهيُ عَنِ المُنْكَرِ»

“তোমরা রাস্তার মাঝে বসা হতে বিরত থাক। রাসূল সা. এ কথা শোনে সাহাবীরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল রাস্তায় বসা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নাই। আমরা রাস্তায় বসে কথাবার্তা বলি। তাদের কথার উত্তরে রাসূল সা. বললেন, যদি রাস্তায় বসা ছাড়া তোমাদের কোন উপায় না থাকে তাহলে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। এ কথা শোনে সাহাবীরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল রাস্তার হক কি? তিনি বলেন, রাস্তার হক হল, চক্ষুকে অবনত করা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তুকে হটানো, সালামের উত্তর দেয়া,

ভালো কাজের আদেশ দেয়া এবং খারাপ কাজ হতে নিষেধ করা”[8]। ইসলামী শরীয়ত এবাদতের স্থানেও নারী ও পুরুষের একত্রিকরণ ও তাদের সাথে সংমিশ্রণ যা যৌন উত্তেজনাকে বৃদ্ধি করে তা নিষেধ করেছেন। কারণ, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সালাতে নারীদের কাতারকে পুরুষের কাতার থেকে আলাদা করেছেন, নারীদের জন্য মসজিদে প্রবেশের দরজা আলাদা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং নারীদের মসজিদ থেকে পুরুষদের পরে বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ গুলো সবই হল, যাতে একজন মানুষ যৌন উত্তেজনা হতে দূরে ও সতর্ক থাকে।

গান-বাজনা, সিনেমা, হোটেল, রেস্তোরা, খেলাধুলার অনুষ্ঠান, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ইত্যাদি যেগুলোতে নারীদের উলঙ্গ ছবি চাপানো হয়, এগুলো সবই যৌন উত্তেজক ও চরিত্র হননকারী। বর্তমানে ইন্টারনেট ও ফেসবুক মানুষের চরিত্র ধ্বংস করার জন্য একটি বড় ধরনের উপকরণ বা মাধ্যম। এতে শুধু চরিত্রই নষ্ট হয় না বরং এতে রয়েছে সময়ের অপচয়, অনর্থক কাজে লিপ্ত থাকা ইত্যাদি। আর সময়ের অপচয় ও সময় নষ্ট করা একজন মানুষের জীবনের জন্য খুবই মারাত্মক ও ক্ষতিকর।

কামনা-বাসনা ও আসক্তির সাথে কি ধরনের আচরণ করবে?

---

[8] বুখারি ২৪৬৫, মুসলিম ২১২১; তবে শব্দটি মুসলিমের।

যখন একজন মুসলিমের আসক্তি বা খারাপ কোন কামনা -বাসনা জাগ্রত হয়, আর তার সামনে হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকেই সুশোভিত করা হয় , তার জন্য অশ্লীল ও অপকর্ম করার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং খারাপ কাজটি করার জন্য যা দরকার তার সবকিছু তার হাতের নাগালে থাকে, তখন সে কি করবে? এ অবস্থায় তার জন্য দুটি পথ খোলা থাকে, এক- সে ঐ খারাপ কাজটিতে জড়িয়ে পড়া, অপরটি হল, খারাপ কাজে জড়িত না হওয়া। এ অবস্থায় সে তার কামনা-বাসনা ও আসক্তির সাথে কি ধরনের আচরণ করবে?! বা তার করণীয় কী হবে?

এ সময় তার জন্য তিনটি পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা যেতে পারে, যা তাকে এ ধরনের গুনাহ হতে বাচার জন্য সহযোগিতা করবে এবং তাকে মারাত্মক বিপদ নিশ্চিত ধ্বংস থেকে মুক্তি দেবে।

প্রথমত: তুমি বলবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে হেফাজত কর! কারণ; আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনা ও আল্লাহকে ভয় করা, সব নিরাপত্তার একমাত্র গ্যারান্টি। তিনিই বান্দাকে হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে রক্ষাকারী এবং যৌনাচারের পিছনে দৌড়-ঝাপ দেয়া, পাপাচারে নিয়োজিত হওয়া থেকে মুক্তি দাতা।

ইউসুফ আ. যখন এ ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হলেন, তখন তিনি সাথে সাথে বললেন, (معاذ الله) হে আল্লাহ! আমি তোমার

আশ্রয় কামনা করছি। তার এ কথা বলার কারণেই, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে হেফাজত করেন এবং তার থেকে নারীদের সব ধরনের ষড়যন্ত্রকে রুখে দেন। আর ঐ ব্যক্তিকেও আল্লাহ তা 'আলা হেফাজত করবে যে কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া লাভের প্রত্যাশায় এ কথা বলবে, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে ভয় করি। কারণ, হাদিসে বর্ণিত আছে, যে দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তা 'আলা সাত ব্যক্তিকে তার আরশের ছায়ার তলে ছায়া দেবেন। তার মধ্যে এক ব্যক্তি সে, যাকে কোন সুন্দর ও সম্ভ্রান্ত রমণী তার সাথে অপকর্মের দাওয়াত দিল, কিন্তু সে বলল, আমি অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করি[9]।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন

« سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، ومنهم ...وَرَجُلٌ طَلَبَتْه امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ :إِنِّي أَخَافُ اللهَ »

আল্লামা ইবন হাজার রহ. বলেন, এ কথাটি কেবল মুখে বলবে যাতে সে অন্যায় ও অশ্লীল থেকে বিরত থাকতে পারে। অথবা অন্তর থেকে বলবে, আর এটি তার জন্য আরো অধিক নিরাপদ।

---

[9] বুখারি ৬৬০, মুসলিম ১০৩১

আল্লামা ইবন হাজার রহ. আরো বলেন, “বাক্যটি সে মুখে উচ্চারণ করবে, যাতে তার মন ও আসক্তি চাহিদা পুরণ ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক থাকে এবং অন্তর থেকে বলারও অবকাশ আছে। এ অবস্থার মধ্যে অন্তর ও মুখ উভয়ের একযোগে এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ করা একটি বড় বিষয় এবং এর প্রভাব খুবই বৃহৎ। এ ধরনের প্রেক্ষাপট এমন কথা একমাত্র তার থেকে প্রকাশ পেতে পারে, যাকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই হেফাজত করেন এবং যার ভিতর ও বাহিরে কোন পার্থক্য নাই। যার ফলে সে গোপনে আল্লাহকে তেমন ভয় করে, যেমনটি ভয় করে প্রকাশ্যে।

একজন মুমিন যখন বাস্তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হেফাজতে লালিত হয় এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নামসমূহের অনুশীলন করতে থাকে, তখন সে অবশ্যই তার কামনা-বাসনা ও আসক্তির চাহিদার ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ নিষেধের উপর অটল ও অবিচল থাকে এবং আসক্তির কু-মন্ত্রণা ও পূজা করা হতে নাজাত পাবে।

তারপর যারা গোপনে আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য জান্নাতকে সহজ করা হয়েছে, আখেরাতে সে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿وَأُزۡلِفَتِ ٱلۡجَنَّةُ لِلۡمُتَّقِينَ غَيۡرَ بَعِيدٍ ٣١ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ٣٢ مَّنۡ خَشِيَ ٱلرَّحۡمَٰنَ بِٱلۡغَيۡبِ وَجَآءَ بِقَلۡبٍ مُّنِيبٍ ٣٣﴾ [سورة ق : 31-33.]

আর জান্নাতকে মুত্তাকীদের অদূরে , কাছেই আনা হবে। এটাই , যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখী অধিক সংরক্ষণশীলদের জন্য। যে না দেখেই রহমানকে ভয় করত এবং বিনীত হৃদয়ে উপস্থিত হত। [সূরা ক্বাফ, আয়াত: ৩১-৩৩]

অর্থাৎ যখন লোক চক্ষুর আড়াল হয়, তখনও সে আল্লাহকে ভয় করে। কোন এক কবি বলেছিলেন,

وإذا خَلَوْتَ بريبةٍ في ظُلْمَةٍ وَالنفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ

فَاسْتَحِ مِنْ نَظَرِ الإِلَهِ وَقُلْ لَهَا إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِي

“যখন তুমি গভীর অন্ধকারে একা থাক বা তোমাকে কেউ দেখে না আর তোমার অন্তর তোমাকে খারাপ কাজের প্রতি আহ্বান করে, তখন তুমি তোমার প্রভুর দৃষ্টির প্রতি মনোযোগ দাও আর তুমি তোমার আত্মাকে বল, যে সত্ত্বা অন্ধকারকে সৃষ্টি করেছন, তিনি অবশ্যই আমাকে দেখছেন”।

ইমাম শাফে‘য়ী রহ. বলেন,

إِذَا ما خَلْوتَ الدَّهْرَ يَوْماً فَلَا تَقُلْ

خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبُ

وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ يَغْفَلُ سَاعَةً

وَلَا أَنَّ مَا تُخْفِي عَلَيْهِ يَغِيبُ

"তুমি যখন একা থাক তখন তুমি এ কথা বল না, আমি একা, আমাকে কেউ দেখছে না। বরং তুমি বল, অবশ্যই আমার উপর পাহারাদার নিযুক্ত আছে। আর তুমি এ কথা মনে করো না যে, আল্লাহ ক্ষণিকের জন্যও বেখবর, কিংবা তুমি যা তার কাছে গোপন রাখ তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে গায়েব থাকবে"।

একজন মুমিন যখন উল্লেখিত মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী জীবন যাপন করবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে, তখন সে অবশ্যই একজন চরিত্রবান ও উন্নত মানুষ বলে বিবেচিত হবে। সে একজন মুত্তাকী হিসেবে পরিগণিত হবে; তাকে দুনিয়ার কোন বস্তু বা চাহিদা পরাভূত করতে পারবে না এবং আসক্তি তাকে গোলাম বানাতে পারবে না। শয়তান শত চেষ্টা করেও তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না। তার কু-আসক্তি তাকে কোন খারাপ কাজের দিকে নিয়ে যেতে পারবে না। বরং যখন তাকে তার আসক্তি কোন খারাপ, অন্যায় ও অশ্লীল কাজের দিকে আহ্বান করবে তখন সে এ বলে চিৎকার দেবে নিশ্চয় আমি

আল্লাহকে ভয় করি। আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট শয়তানের কু-মন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাই | আর শয়তান যখন তাকে প্রতারণা দিতে চায় , তখন সে শয়তানকে বলবে, আমার উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব চলবে না।

আর যখন তোমার খারাপ ও অসৎ সঙ্গীরা তার জন্য অশ্লীল ও খারাপ কাজগুলোকে সুশোভিত করবে, তখন তুমি তাদের এ বলে চুপ করে দেবে, আমি জাহিলদের বন্ধু বানাতে চাই না। মনে রাখবে যখন কোন বান্দা এ ধরনের ধ্যান-ধারণা ও মানসিকতা নিয়ে জীবন যাপন করবে, তখন অবশ্যই তার মধ্যে এ কথার একটি প্রভাব দেখা যাবে। অর্থাৎ তুমি একজন আল্লাহওয়ালা লোক ও তোমার মধ্যে আল্লাহর ভয় আছে|

এ ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে তুমি একটু চিন্তা করে দেখ, সে তাদের তিন জনের একজন হবে, যাদের মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের নেক আমলের কারণে গুহা হতে নাজাত দিয়েছিলেন। যখন তারা গুহাভ্যন্তরে আটকে গিয়েছিলে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাদের নিজেদের নেক আমলের মাধ্যমে দো‘আ করেছিলেন।

«اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بنِتْ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّالنَّاسِ إلَيَّ، فَأَرَدتهُا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتنَعَتْ مِنيِّ، حَتيَّ أَلَمَّتْ بهَا سَنة مِنَ السِّنينَ، فَجَاءَتْنِي، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نفْسِهَا، فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدرْتُ

عَلَيْهَاقَالَتْ :لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ- وفي رواية: اتَّقِ الله وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إلا بحقِّهِ -فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنهْا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنتُ فَعَلْتُ ذَلكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَناَّ مَا نَحْنُ فيهِ .فَانْفَرَجَتِ الصَّخْ»

"তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার একজন চাচাতো বোন ছিল সে আমার নিকট দুনিয়ার সব কিছু থেকে প্রিয় ছিল এবং আমি তাকে সবার চেয়ে অধিক ভালোবাসতাম। আমি তার সাথে অপকর্ম করতে চাইলে সে আমাকে বাধা দেয়। অথচ আমি সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত তার প্রতীক্ষায় ছিলাম। তার সাথে মেলামেশা করার জন্য সে আমাকে একশত বিশ দিনার যোগান দেয়ার শর্ত দিলে, দীর্ঘ সাধনার পর আমি আমি একশত বিশ দিনার তার হাতে তুলে দিই। তারপর সে আমার সাথে মেলামেশা করতে বাধ্য হয়ে সম্মতি দেয়। তারপর যখন আমি তার উপর সামর্থ্য লাভ করি, সে আমাকে বলে, আমি তোমার জন্য আংটি খোলাকে তার হক আদায় করা ছাড়া হালাল মনে করি না। অপর বর্ণনায় আছে সে বলে, আল্লাহকে ভয় কর, তুমি এ সীলটি অন্যায্যভাবে খুলবে না। তার কথা শোনে তার সাথে মেলামেশা করতে সংকোচ বোধ করি এবং সাথে সাথে তার থেকে দূরে সরে যাই। অথচ, সে দুনিয়ার সব মানুষের চেয়ে প্রিয় ছিল। আর তাকে আমি যে স্বর্ণ-মুদ্রা দিয়েছিলাম তা তার নিকট রেখে আসি। লোকটি তার জীবনের এ মহৎ কাজটির কথা স্মরণ করে বলে, হে আল্লাহ এ কাজটি যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকি, তাহলে তুমি

আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর। তারপর পাথরটি সরে গেল”[10]।

এ বান্দার অবস্থার দিকে একটু চিন্তা করে দেখ, সে কীভাবে একটি নিষিদ্ধ কাজের দিকে ধাবিত হল এবং জীবনের সব চেষ্টা তার দিকে ব্যয় করল। কিন্তু যখন সে তার প্রেমিকার উপর উঠে বসল, যেভাবে একজন পুরুষ তার স্ত্রীর উপর উঠে বসে। তারপর যখন তাকে বলা হল, তুমি আল্লাহকে ভয় কর! তখন সে তা হতে বিরত থাকল এবং সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল, অথচ সে হল, তার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি।

একেই বলা হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি সত্যিকার ঈমান, যে ঈমান বান্দার অন্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয় সৃষ্টি করে, প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে সামনে রাখে।

দ্বিতীয় মূলনীতি:

চক্ষুর খেয়ানত হতে বেচে থাকা:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

---

[10] বুখারি ২২৭২

﴿يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ ٱلۡأَعۡيُنِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّدُورُ ١٩﴾ [سورة غافر: 19.]

“চক্ষুসমূহের খেয়ানত এবং অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে তিনি তা জানেন”। [সূরা গাফের, আয়াত: ১৯]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা خائنة الأعين এর অর্থ সম্পর্কে বলেন,

“কোন ব্যক্তি অপর পরিবারের কোন ঘরে প্রবেশ করে, ঐ পরিবারের বয়স্ক মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকে, এটিকে বলা হয় চোখের খেয়ানত। অথবা রাস্তায় হাটার সময় একজন সুন্দর নারী দেখতে পেয়ে, তার দিক সে বার বার তাকায় । যখন তারা অন্যমনষ্ক হয়, তখন তার দিকে তাকায় আবার যখন তারা সতর্ক হয়, তখন সে তার থেকে চোখকে সরিয়ে নেয়। আবার যখন তারা অন্য মনষ্ক হয় তখন তার দিকে তাকায় আবার যখন তারা বুঝতে পারে তখন চোখকে সরিয়ে নেয়। একে বলা হয় চোখের খেয়ানত।

সুফিয়ান রহ. বলেন, একজন লোক যখন কোন মজলিশে বসে আর রাস্তা দিয়ে কোন নারী অতিক্রম করতে দেখলে সে গোপনে তার দিক তাকায়। যখন লোকেরা দেখে যে লোকটি মহিলাটির দিকে তাকাচ্ছে, তখন সে চোখ সরিয়ে ফেলে তার দিকে তাকায়

না। আর যখন তারা গাফেল হয়, তখন সে আবার তাকায়। একে বলা হয়, চোখের খেয়ানত। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ ٱلۡأَعۡيُنِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّدُورُ ١٩﴾ [سورة غافر : 19.]

"চক্ষুসমূহের খেয়ানত এবং অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে তিনি তা জানেন"। [সূরা গাফের, আয়াত: ১৯]

অর্থাৎ লোকটি তার অন্তরে যে খারাপ চাহিদাকে গোপন করে তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অবশ্যই জানেন।

একজন বান্দাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সে অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে দণ্ডায়মান। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার আমল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত এবং তাকে তার আমল বিষয়ে একদিন অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗا ٣٦﴾ [سورة الإسراء : 36.]

আর যে বিষয় তোমার জানা নাই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তকরণ- এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩৬]

তাকে অবশ্যই তার এ ধরনের দৃষ্টি; যা ইবলিসের তীরসমূহের একটি তীর, সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। আর তা হল, যৌন উত্তেজনার প্রথম ধাপ । এ কারণেই বলা যায় , নিষিদ্ধ কাজের প্রথম ধাপের সাথে তার শেষ ধাপের সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠﴾ [سورة النور: 30.]

“মুমিন পুরুষদেরকে বল , তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত”। [সূরা নূর, আয়াত: ৩০]

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুমিনদের নির্দেশ দেন যে, তারা যেন তাদের চক্ষুকে তাদের জন্য যা নিষেধ করা হয়েছে, তা থেকে হেফাজত করে এবং তারা যেন তাদের জন্য যা হালাল করা হয়েছে তা ছাড়া অন্য কোন বস্তুর দিকে না তাকায়। যদি হঠাৎ

করে তার ইচ্ছার বাইরে কোন নিষিদ্ধ বস্তুর উপর দৃষ্টি পড়ে যায়, তখন সে তাড়াতাড়ি তা থেকে তার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিবে।

চোখের হেফাজতকে লজ্জা স্থানের হেফাজতের পূর্বে উল্লেখ করার কারণ

চোখের হেফাজতকে লজ্জা স্থানের হেফাজতের পূর্বে উল্লেখ করার কারণ হল, মানুষের দৃষ্টি যিনা, ব্যভিচার ও অপকর্মের বার্তা বাহক ও প্রারম্ভিকতা। এ কারণেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন করীমে তাকে প্রথমে উল্লেখ করেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, মানুষ যত ধরনের অন্যায়, যিনা, ব্যভিচার ও অপরাধ করে থাকে, সব কিছুর মূল কারণ হল মানুষের দৃষ্টি। দৃষ্টি মানুষের অন্তরে প্রথমে উদ্রেককে জাগ্রত করে, আর যখন কোন কিছুর উদ্রেক হয় তা রূপান্তরিত হয় চিন্তায়, চিন্তা থেকে জাগ্রত হয় চাহিদা বা আসক্তি। আর আসক্তি হতে জাগ্রত হয় ইচ্ছা তারপর ইচ্ছাটি ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে তা রূপ নেয় প্রত্যয়ে তারপর তা সংঘটিত হয় ব্যভিচারে; যদি কোন বাধাদানকারী বাধা না দেয়। এ বিষয়ে আরও বলা হয়ে থাকে

চোখের হেফাজতের উপর ধৈর্য ধরা তার পরবর্তী কর্মের শাস্তির উপর ধৈর্য ধারণ হতে সহজ।

এ কারণেই কোন এক কবি বলেন,

كُلُّ الحَوَادِثِ مَبْدَاهَا مِنَ النظرِ

وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ

كمْ نظرةٍبَلغَتْ في قلبِ صَاحِبِهَا

كَمَبْلَغِ السَّهْمِ بَيْنَ القَوْسِ وَالوَتَرِ

والعَبْدُ مَا دَامَ ذَا طَرْفٍ يُقَلِّبُهُ

فِي أَعْيُنِ الغِيدِ مَوْقُوفٌ عَلَى الخطرِ

يسُر مْقلَتُه ما ضَرَّ مُهْجَتَهُ

لَا مَرْحَباً بِسُرُورٍ عَادَ بالضررِ

"সব ধরনের অপকর্মের মুলে কারণ হল, দৃষ্টি। বড় বড় আগুনের মূল হচ্ছে কোন অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে ছোট জ্ঞান করা। এমন বহু দৃষ্টি

রয়েছে, যা সে দৃষ্টিপ্রদানকারীর অন্তরে এমনভাবে নাড়া দেয়; যেমন কোন তীর তার বাঁকা ধনুক ও সুতার মাঝে নাড়া দেয়। আর কোন মানুষ যতক্ষণ চক্ষুপালক বিশিষ্ট হবে, এবং তা সুন্দরীদের চোখের সামনে নাড়াচাড়া করবে ততক্ষণ সে সর্বদা বিপদে থাকবে। তার চোখের পালক এমন কিছু গোপন করবে যা তার সম্মান হানি করবে, সুতরাং এমন আনন্দের জন্য কোন শুভেচ্ছা নেই, যে আনন্দ ক্ষতি নিয়েই ফিরে আসে।

আর এ দৃষ্টির একটি বড় বিপদ হচ্ছে, এটি আফসোস এবং বড় বড় দীর্ঘশ্বাসের উদ্রেক করে, তখন বান্দা এমন কিছু দেখে যা করতে সে সক্ষম নয় আর তা থেকে ধৈর্য ধারণ করতেও সে অপারগ।” [11]

ঐসব লোকেরা বাজারে গিয়ে সুন্দর সুন্দর নারীদের বেপর্দা অবস্থায় দেখে, তাদের অন্তর আফসোস করতে থাকে এবং তারা তাদের অন্তরে না পাওয়ার ব্যথা ও কষ্ট অনুভব করে।

কউ কেউ বলতে পারে যে, অধিকাংশ দৃষ্টিই ব্যভিচার পর্যন্ত গড়ায় না এবং তার সাথে নিষিদ্ধ কাজ পর্যন্ত যায় না।

আমরা বলব, বরং দৃষ্টির শেষ পরিণতি হল, আফসোস, ব্যথা ও কষ্ট। কারণ, সে তার সামনে এমন একটি ফেতনা দেখতে পায়,

---

[11] আল-জাওয়াবুল কাফী (১০৬)।

যা সে লাভ করতে সক্ষম হয় না। ফলে সে আফসোস এবং ব্যথা অনুভব করতে থাকে। অনেক সময় সে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়, তখন তার আফসোস, গ্লানি ও দুশ্চিন্তা আরও বৃদ্ধি পায়"।

তারপর আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "এটি একটি বড় আযাব, তুমি একটি বিষয় হাসিল করতে চাইলে তা না পাওয়ার কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করতে পারলে না, আবার তা লাভ করার ক্ষমতাও তুমি রাখ না। এর চেয়ে বড় আযাব আর কী হতে পারে? কোন এক কবি বলেন,

وكنت مَتَى أرسلت طْرفَك رَائِداً

لقلبك يوْماً أَتْعَبَتْكَ المَنَاظِرُ

رَأَيت الَّذِي لَا كُلّهُ أَنْتَ قَادِرٌ

عَلَيْهِ وَلَا عَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ صَابِرُ

যখন তুমি কোন দিন তোমার চক্ষুদ্বয়কে তোমার মনের পরিচালক হিসেবে অনুসন্ধানকারী হিসেবে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দিলে, তখন সে দৃষ্টিসমূহের দৃশ্য তোমাকে ব্যথিত করবে। তুমি যা দেখলে তার পুরোটা লাভ করতে তুমি সক্ষম নও, আর না তুমি আংশিকের উপরও ধৈর্যশীল।

যারা তাদের চক্ষুকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়, তারা তা হতে বিরত থাকতে পারে না। সে অপকর্মের মধ্যেই হাবুডুবু খেতে থাকে। যেমন, কোন এক কবি বলেন,

يَا نَاظِراً مَا أَقْلَعَتْ لحَظَاتُهُ

حَتّىَ تَشَحَّطَ بَيْنَهُنَّ قَتِيلَا

“হে দর্শক তুমি তোমার দৃষ্টিকে বিরত রাখলে না। তুমি তোমার চোখের অপকর্মেই জীবনকে ব্যয় করলে”।

এর চেয়েও বড় আশ্চর্য হল, দৃষ্টি মানুষের অন্তরকে আহত করে তখন ব্যথার উপর ব্যথা তাকে আরও অধিক কষ্ট দিতে থাকে। তারপর তার ক্ষতের ব্যথা বার বার আহত করা হতে তাকে কেউ বারণ করে না। কবি বলেন,

مَا زِلْت تُتْبِعُ نَظْرَةً فِي نَظْرَةٍ

فِي إِثْرِ كُلِّ مَلِيحَةٍ وَمَلِيحِ

وَتُظُّن ذَاكَ دَوَاءَ جُرْحِكَ وَهْوَ فِي الت

تَحْقِيقِ تَجْرِيحٌ عَلَى تَجْرِيحِ

فَذَبَحَت طرْفَكَ بِاللِّحَاظِ وَبِالبُكا

فَالقَلْبُ مِنكَ ذَبِيحٌ ايُّ ذَبِيحِ

'তুমি প্রতি সুন্দর পুরুষ ও নারীর প্রতি একের পর এক দৃষ্টি দিয়েই যাচ্ছ, আর তুমি মনে করছ যে এটা বোধ হয় তোমার ক্ষতের ঔষধ, প্রকৃতপক্ষে তা ক্ষতের উপর ক্ষতই বাড়িয়ে দেয়; এভাবে তুমি তোমার দৃষ্টিশক্তিকে দেখা ও কান্নার মধ্যে যবাই করে দিলে, সুতরাং তোমার অন্তর ও মন তোমার দ্বারা শুধু যবাই হতে থাকল, সেটা যে কোন ধরনের যবাই তা বলার অপেক্ষা রাখে না।'

আর এ জন্যই বলা হয়ে থাকে, "দৃষ্টিকে ক্ষণিকের জন্য বিরত রাখতে সচেষ্ট হওয়া আজীবন আফসোস করা থেকে উত্তম।[12]"

যে ব্যক্তি হারামের দিকে তাকিয়ে থাকে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মত যে, সাগরের পানি পান করে তৃপ্তি পেতে চায়, তুমি কি তার পিপাসা নিবারিত হতে দেখেছ? কখনও তার পিপাসা নিবারণ হয় না বরং সে পানি পান করার কারণে তার পানির পিপাসা আরও বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি হারামের দিকে

[12] আল-জাওয়াবুল কাফী (১০৬-১০৭)

তাকায় সেও আসক্তির চাহিদা মিটাতে না পারার কারণ তার চাহিদা আরও চাঙ্গা হতে থাকে"।

ঐ হাদীসটির বিষয়ে চিন্তা করে দেখুন, যেখানে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া ও চোখের খিয়ানত বা চোখের হেফাজত না করার মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إِنَّ الله كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حظه مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذلكِ لَا محالةفزنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانُ المَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ »

"আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আদম সন্তানের উপর যিনার কিছু অংশ নির্ধারণ করে রেখেছেন। জীবদ্দশায় তাতে সে আক্রান্ত হবেই। যেমন- চোখের যিনা হল দৃষ্টি, মুখের যিনা হল কথা, আর আত্মা কামনা করে ও আসক্তি তৈরী করে ।আর লজ্জাস্থান তার আশার সত্যায়ন করে বা মিথ্যায় পরিণত করে"[13]।

চিন্তা করে দেখ! দৃষ্টি কত মারাত্মক! এ হাদিসে দৃষ্টিকে ব্যভিচার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। একজন মুমিন অবশ্যই ব্যভিচারকে ঘৃণা করে এবং তা হতে দূরে থাকে।

---

[13] বুখারি ৬২৫৭ মুসলিম ২৬৫৭

আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. বলেন, “হে বন্ধু! – আল্লাহ তোমাকে তাওফিক দান করুন- তুমি দৃষ্টির অনিষ্টতা থেকে নিজেকে বাঁচাও! এ দৃষ্টি বহু ইবাদতকারীকেই ধ্বংস করেছে! কত পরহেজগার মুত্তাকীকে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে! তুমি দৃষ্টির হেফাজত কর! কারণ, দৃষ্টিই হল সব বিপদের মূল কারণ। তবে শুরুতে তার চিকিৎসা করা সহজ। কিন্তু যদি তা বার বার হয়ে থাকে, তখন তা শক্তিশালী ব্যাধিতে পরিণত হয়; তার চিকিৎসা আর সহজ হয় না, তখন তার চিকিৎসা খুবই কষ্টকর।”[14]

দৃষ্টি নেশার পাত্র, আর তার নেশা হল, প্রেম। আর প্রেমের নেশা মদের নেশা হতেও মারাত্মক। কারণ, মদ পানে নেশাগ্রস্থ মাতাল, তাদের আবার জ্ঞান ফিরে আসে, আর প্রেমের নেশায় যারা মাতাল, তাদের কখনোই জ্ঞান ফিরে আসে না।

আর দৃষ্টি ও আসক্তি উভয় মানুষকে প্রেমের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আর অন্তরসমূহ ধ্বংসের জন্য এ হল, সর্বাধিক ক্ষতিকর ও মারাত্মক ব্যাধি। তুমি এ ভয়ানক ও ক্ষতিকর তীরের আঘাত থেকে সতর্ক থাক। কারণ, তার আঘাতে যদি তুমি হত্যা না হও, তোমাকে তা অবশ্যই যখমী করে দিবে। আর যখন যখমী বা আঘাত অধিক হবে, তখন তোমার ধ্বংস অনিবার্য।

---

[14] যাম্মুল হাওয়া (৯৪)

হঠাৎ দৃষ্টি:

জারীর ইব্ন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন আমার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রাখি।

হঠাৎ দৃষ্টি বা [نظر الفجاءة] এর অর্থ হল, অনিচ্ছায় বা হঠাৎ কোন অপরিচিত নারীর উপর দৃষ্টি পড়া। এ ধরনের দৃষ্টির বিধান হল, প্রথমবার এতে কোন গুনাহ নাই। তবে শর্ত হল, সাথে সাথে চক্ষুকে ফিরিয়ে নিতে হবে। আর যদি সে তার দৃষ্টিকে দীর্ঘায়িত করে, তখন তার উপর গুনাহ অবশ্যই বর্তাবে।"[15]

ইবন বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন,

«يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ»

[15] তুহফাতুল আহওয়াযী (৮/৪৯)।

“হে আলী! তুমি প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয় বার দেখবে না। কারণ, তোমার জন্য প্রথম দৃষ্টি, আর পরবর্তী দৃষ্টি তোমার জন্য নয়”[16]।

অর্থাৎ প্রথম দৃষ্টির পর আবার দেখো না এবং একবার তাকানোর পর দ্বিতীয়বার তাকাবে না। অনিচ্ছাকৃত প্রথম দৃষ্টির কারণে তোমার কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু তোমার জন্য দ্বিতীয়বার তাকানোর কোন অনুমতি নাই। কারণ, এতে তোমার ইচ্ছা যুক্ত হওয়ার কারণে তোমার গুনাহ হবে।

[এখানে এ কথা স্পষ্ট হয়, ইচ্ছা করে যদি প্রথমবার তাকায় তাহলেও গুনাহ হবে। আর যদি অনিচ্ছায় তাকায় এবং সাথে সাথে চোখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে গুনাহ হবে না।]

যে সব লোক মশকরা করে বলে, প্রথমবার দেখে যদি কোন ব্যক্তি চোখ বন্ধ করা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকে তার কোন গুনাহ হবে না, তাদের কথা যে ভ্রান্ত তা এ ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হল। কারণ, এখানে বলা হয়েছে ইচ্ছা করে তাকানো অপরাধ। চাই প্রথমবার হোক অথবা দ্বিতীয় বার।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

---

[16] আবু দাউদি ২১৪৯ ও তিরমিযি ২৭৭৭।

﴿قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ إِنۡ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمۡعَكُمۡ وَأَبۡصَٰرَكُمۡ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنۡ إِلَٰهٌ غَيۡرُ ٱللَّهِ يَأۡتِيكُم بِهِۗ ٱنظُرۡ كَيۡفَ نُصَرِّفُ ٱلۡأٓيَٰتِ ثُمَّ هُمۡ يَصۡدِفُونَ ٤٦﴾ [سورة الأنعام: 46]

বলুন, ‘তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ্ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয়ে মোহর করে দেন তবে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন প্রকৃত ইলাহ্ আছে যে তোমাদের এগুলো ফিরিয়ে দেবে?’ দেখুন, আমরা কিরূপে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ননা করি; এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৩০]

চক্ষু হল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে বড় নেয়ামত। গুনাহের কারণে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাতে চক্ষু না নিয়ে যায় সে জন্য আল্লাহকে ভয় করতে হবে।

হারাম থেকে চক্ষুকে বিরত রাখার মধ্যে অনেকফায়দা:

১. আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশের আনুগত্য করা যাতে রয়েছে অনেক সৌভাগ্য ও কল্যাণ।

২. (চক্ষুর চাহনি নামীয়) বিষাক্ত তীরের আঘাত থেকে অন্তর নিরাপদ থাকে।

৩. অন্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সখ্যতা ও তার উপর ঐক্য গড়ে উঠে। যারা তাদের অন্তরকে হারামের মধ্যে ছেড়ে দেয়, তাদের অন্তর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ সখ্যতা থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ, অন্তর বিক্ষিপ্ত থাকার কারণে তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যই বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়না এবং তাঁর জন্যই মহব্বতপূর্ণ হতে পারে না।

৪. চোখের হেফাজত না করলে আত্মা যেমন দুর্বল ও হতাশাগ্রস্ত হয় অনুরূপভাবে চোখের হেফাজতের কারণে মানবাত্মা শক্তিশালী ও প্রশান্তি লাভে ধন্য হয়।

৫. অন্তর নুরের আলো দ্বারা আলোকিত হয়, পক্ষান্তরে চোখের হেফাজত না করলে অন্তর অন্ধকারে ছেয়ে যায়।

৬. চক্ষুর হেফাজত দ্বারা একজন বান্দার মধ্যে হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার মত সত্যিকার যোগ্যতা ও দূরদর্শিতা সৃষ্টি হয়। আর তা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ও উন্নত অবস্থানে পৌছতে সাহায্য করে। আর মানুষের সাথে সব ধরনের লেন-দেনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সহায়ক হয়।

৭. অন্তরে সাহসিকতা ও অবিচলতা সৃষ্টি করে। ফলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার জন্য আধ্যাত্মিক শক্তি যথা,

দূরদর্শিতা, প্রমাণ এবং বাহ্যিক শক্তি যথা, ক্ষমতা ও শক্তি উভয়কে একত্র করে দেন।

৮.শয়তানের প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দেয়। কারণ, দৃষ্টি হল শয়তানের জন্য সবচেয়ে বড় দরজা।

৯. অন্তর ভালো চিন্তার জন্য খালি হয় এবং ভালো কাজেই ব্যস্ত থাকে।

কারণ, যখন কোন অন্তর নারী ও সুন্দর ছেলেদের ছবি তাদের চিন্তা ও প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তখন সে কীভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করবে? হাদিস থেকে একটি মাসআলা শিখবে? ফিকাহ-বিদদের কথা কীভাবে সে বুঝবে? এবং আসমান ও জমিনের বিষয়ে কীভাবে চিন্তা করবে?

১০. চোখের হেফাজতের দ্বারা অন্তর নিরাপদ থাকে। কারণ, অন্তর ও চক্ষু উভয়ের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক ও সংযোগ রয়েছে, উভয়ের একটি অপরটি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং একটি কর্ম অপরটিকে প্রাণচাঞ্চল্যটা দান করে। ফলে একটি সংশোধন হলে অপরটির সংশোধন হয়, আর একটি নষ্ট হলে অপরটি নষ্ট হয় । যখন বান্দার দৃষ্টি নিরাপদ থাকে তখন তার আত্মাও নিরাপদ ও ঠিক থাকে, আর যখন মানুষের দৃষ্টি সঠিক না থাকে এবং খারাপ বস্তুর দিক দেখার কারণে নষ্ট হয়ে যায়, তখন তার অন্তর বা

আত্মাও খারাপ ও নষ্ট হয়ে যায় । এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« اضمَنُوا لِي سِتّاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضمَنُ لَكُمُ الجَنَّةَ :اصْدُقُوا إِذا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذا وَعَدتُمْ، وَأَدُّوا إِذا اؤتمِنتم، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ »

“তোমরা আমার জন্য ছয়টি জিনিসের দায়িত্ব নাও আমি তোমাদের জান্নাতের দায়িত্ব নেব। যখন কথা বল, সত্য বল। আর যখন ওয়াদা কর, তখন তা পুরা কর, আর যখন তোমার নিকট আমানত রাখা হয় তা তুমি হকদারদের নিকট পৌছে দাও। তোমরা তোমাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত কর । তোমাদের চক্ষুকে অবনত রাখ আর তোমাদের হাতদ্বয় হারাম থেকে গুটিয়ে রাখ”[17]।

তৃতীয় মূলনীতি: খারাপ ভাবনা প্রতিহত করা:

খারাপ ভাবনাসমূহ মানবাত্মাকে ব্যাধিগ্রস্ত ও রোগী বানিয়ে দেয়। মানুষ যখন তার খারাপ ভাবনাসমূহকে প্রতিহত না করে এবং তা নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তখন তা চিন্তা হিসেবে দেখা দেয়। তারপর তা চিন্তা থেকে উন্নতি লাভ করে সাধারণ ইচ্ছার রূপ নেয়। তারপর

[17] ইমাম আহমদ ২২২৫১ আলবানী রহ হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।

সাধারণ ইচ্ছা থেকে তা উন্নতি লাভ করে তা প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির রূপ নেয় তারপর তা দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞায় রূপ নেয়। তারপর সে অপকর্মের প্রতি অগ্রসর হয় এবং হারামে লিপ্ত হয়। সুতরাং, প্রথমেই একজন মানুষ তার আত্মাকে খারাপ ভাবনার উদ্রেক থেকে রক্ষা করবে এবং খারাপ ভাবনার সাথে নিজেকে ছেড়ে দিবে না।

অন্তরের বাসনা এটি একটি কঠিন বিষয়। মানুষের ভালো ও মন্দের সূত্রই হল অন্তরের বাসনা। অন্তরে কোন বাসনা জাগ্রত হলে, তা যদি প্রাথমিক অবস্থায় প্রতিহত করা হয়, তাহলে তুমি তোমার আসক্তির নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে এবং তোমার নফসকে পরাজিত করলে। আর যদি তোমার আসক্তি তোমার উপর বিজয়ী হয়, তাহলে তুমি অবশ্যই গহ্বরে নিপতিত হবে।

মানবাত্মায় বাসনা বারবার উদ্‌তৃ হতেই থাকে শেষ পর্যন্ত তা সেটি তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে, আর যখন তা তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে তখন তা বাতিল ও ভ্রান্ত আশায় পরিণত হবে। তখন অবস্থা এমন দাঁড়ায় যেমন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে এরশাদ করেন,

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَسَرَابِۭ بِقِيعَةٖ يَحۡسَبُهُ ٱلظَّمۡـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمۡ يَجِدۡهُ شَيۡـٔٗا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٣٩﴾ [سورة النور : 39.]

“আর যারা কুফরী করে তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকার মত, পিপাসা কাতর ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু যখন সে সেটার কাছে আসে তখন দেখে সেটা কিছুই নয় এবং সে পাবে সেখানে আল্লাহ্‌কে, অতঃপর তিনি তাকে তার হিসাব পূর্ণমাত্রায় দেবেন।” [সূরা আন-নূর: ৩৯]

সবচেয়ে নিকৃষ্ট মনোবৃত্তির অধিকারী হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ও আশার ঘর বাধে। কারণ, মিথ্যা আশা হল অভাবীদের পুঁজি এবং বেকার লোকদের অবলম্বন, আর মানুষের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর বস্তু। কারণ এটি মানুষের মধ্যে অক্ষমতা, অলসতা ও হতাশার জন্ম দেয় । বান্দাকে যখন তার অন্তরের বাসনার উপর চলতে ছাড় দেয়া হয়, তখন সে হারামে পতিত হয়। তারপর খালেস তাওবার মাধ্যমে আত্মাকে নাপাকী হতে মুক্ত করা ছাড়া তার কোন চিকিৎসা নাই।

আর যদি বান্দা গুনাহের স্বাদ ও পবিত্র থাকার স্বাদ এবং গুনাহের স্বাদ ও শত্রুকে পরাভূত ও শত্রুর উপর শক্তিমত্তার স্বাদ, অনুরূপভাবে গুনাহের স্বাদ ও শয়তানকে পরাস্ত ও তাকে বিফল-মনোরথ করার স্বাদের মধ্যে তুলনা করে তবে সে অবশ্যই তা গ্রহণ করবে যা তার বাহির ও ভিতরকে সংশোধন করার কারণ হবে।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে মানবাত্মার মধ্যে কিছু ভালো ভাবনার উৎপত্তি হয়; আবার কিছু ভাবনা আসে শয়তানের পক্ষ হতে, অনুরূপ কিছু ভাবনা তৈরী হয় নিজের আসক্তি থেকেও।

নফস মানুষকে খারাপ কাজের আদেশ দিয়ে থাকে। প্রতিটি কাজের আগেই সেখানে কিছু চিন্তা-দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। মানুষের অন্তর, জ্ঞান ও নফসের মধ্যে চিন্তা গবেষণা ছাড়া কোন কিছুই হঠাৎ করে বাস্তবায়িত হয়েছে এ কথা কখনোই বলা যাবে না। প্রতিটি বস্তু বাস্তবে অস্তিত্বে আসার জন্য প্রথমে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা এ ফিকির অতিবাহিত হতে হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে যখন কোন কিছুর চিকিৎসা বা সংশোধন হয়, তখন তা পরবর্তীতে খুবই সহজ ও সরল হবে। আর এ কাজটি মানুষ যত তাড়াতাড়ি করবে তার সংশোধনও তত তাড়াতাড়ি হবে।

মানুষ তার ভাবনা-চিন্তাকে কখনোই শেষ করে দিতে পারবে না। কারণ ভাবনা-চিন্তা মানুষের অন্তরে এসে আঘাত করবেই, সে তাতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে না।

শয়তান কোন কোন সাহাবীর অন্তরেও আল্লাহ্ সম্পর্কে মারাত্মক কু-মন্ত্রণা ঢেলে দিত। যেমন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

কতক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের অন্তরে এমন কিছু কামনা বাসনা জাগ্রত হয়, যা আমরা আমাদের মুখে বলতে লজ্জাবোধ করি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বাস্তবেই কি তোমরা এ ধরনের অনুভব কর? তারা বলল হা, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাই হল সত্যিকার ঈমান”[18]।

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ রাসূল! আমাদের অন্তরে এমন এমন খারাপ বিষয় জাগ্রত হয়, তা মুখে উচ্চারণ করার চেয়ে আমাদের কয়লা হয়ে যাওয়া অধিক প্রিয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর। সব প্রশংসা সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর যিনি শয়তানের ষড়যন্ত্র ও ধোঁকাকে কু-মন্ত্রণায় রূপান্তর করে দিয়েছেন।[19]”

অর্থাৎ, সব প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের । কারণ, শয়তান তোমাদের থেকে একমাত্র কু-মন্ত্রণার উদ্রেক -যা তোমরা অপছন্দ কর- তা ছাড়া কোন কিছুই হাসিল করতে পারেনি। আর

---

[18] মুসলিম : ১৩২

[19] আবু দাউদ: ৫১১২; শু‘আইব আরনাউত সহীহ বলেছেন।

শয়তানের কু-মন্ত্রণাকে তোমরা যে অপছন্দ করছ তাই প্রমাণ করে যে তোমরা সত্যিকার ঈমানদার।

যখন কোন মানুষের অন্তরে শয়তান কু-মন্ত্রণা দেয়, তখন তার উচিত হল, তার চিকিৎসা করা।   এ ধরনের কু -মন্ত্রণা যখন মুসলিমের অন্তরে আসবে, তখন একজন মুসলিমের করণীয় কি?

১. বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

২. শয়তানের কু-মন্ত্রণাকে ঈমানী চিন্তা-ভাবনা দ্বারা পরিবর্তন করবে। কারণ, নফস হল জাঁতাকলের মত, তা কোন কিছুকে পিষতেই চায়। যদি কোন ব্যক্তি তার জাঁতাকলে গম রাখে, তাহলে তা পিষলে সেখান থেকে আটা বের হবে। আর যদি কোন ব্যক্তি তার জাঁতাকলে বালি ও বটের দানা রাখে, তা হলে তা পিষলে তার থেকে বালি ও বটের দানাই বের হবে, অন্য কিছু নয়।

শয়তানের কু-মন্ত্রণা থেকে বাচার জন্য সহায়ক ভালো ভাবনা-চিন্তাসমূহ:

১. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর আজমত ও বড়ত্ব, আসমান ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করা।

২. ইসলামী শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করা। একজন মানুষের জন্য ইলম অর্জন ও জ্ঞানের চর্চা নিয়ে লিপ্ত থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অনেক আলেমগণের অবস্থা এমন যে তারা হারাম বা অন্যায় কাজ করার মত কোন সময়ই তাদের থাকে না। কারণ, তারা সবসময় শরীয়তের ইলম ও মুসলিম মিল্লাতের সমস্যা সমাধানের কাজে ব্যস্ত থাকে।

৩. আখিরাত ও তার ভয়াবহতা নিয়ে চিন্তা করা। যেমন, মৃত্যু, কবরের আযাব, হাউজে কাউসার, শাফা'আত, মীযান, পুলসিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করা।

৪. হালাল রুজি উপার্জনের জন্য চিন্তা করা। যেমন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা ফিকির করতে হবে। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে অবসর সময়গুলোকে ব্যয় করা ও কাজে লাগানোর জন্য ফিকির করা।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, উল্লেখিত সবকিছুকে যদি তুমি লাভ করতে চাও, তবে যে সব জিনিষ তোমার জানা জরুরি সে সব বিষয়গুলো জানতে এবং তা হাসিল করতে তোমার চিন্তাকে ব্যয় করতে হবে। যেমন, তাওহীদ সম্পর্কে তোমার জানতে হবে এবং তার দায়িত্ব কি তা তোমাকে জানতে হবে। মৃত্যুর পর জান্নাতে প্রবেশ নাকি জাহান্নামে প্রবেশ এ বিষয়ে চিন্তা করার মাধ্যমে তোমাকে অবশ্যই সময় ব্যয় করতে হবে। আর

খারাপ ও বদ আমলের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে এবং তার থেকে বাচার উপায় কি তা নিয়ে তোমাকে ভেবে বের করতে হবে। ইচ্ছা ও দৃঢ়তার বিষয়ে তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যে সব কর্মের ইরাদা করলে তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করবে তারই ইরাদা করতে হবে। আর যে সব কর্মের ইরাদা তোমার ক্ষতির কারণ হয় তা পরিহার করতে হবে।

আল্লাহ্‌র নেককার বান্দাদের মতে, মানবাত্মার জন্য খেয়ানতের আকাঙ্ক্ষা করা, চিন্তা-ফিকিরকে খিয়ানত বিষয়ে ব্যয় করা, স্বয়ং খিয়ানত হতে অধিক ক্ষতিকর।'[20]

সুতরাং যেহেতু মানুষের অন্তরে সব সময় বিভিন্ন কর্মের উদ্রেক ও চিন্তা জাগ্রত হতেই থাকে, আর তা ধীরে ধীরে ইরাদায় রূপ নেয়। তারপর তা প্রত্যয় ও দৃঢ়তায় রূপ নেয়, তাই প্রতিটি স্তরে তাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে, শুধু ভাবনা-চিন্তার পর্যায়ের চিকিৎসাই যথেষ্ট নয়। আমাদেরকে অবশ্যই ভাবনা-চিন্তার পর্যায় ও পরবর্তী প্রতিটি পর্যায়ের চিকিৎসায় মনোনিবেশ করতে হবে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, 'তুমি ভাবনাকে প্রতিহত কর। যদি তা করতে সক্ষম না হও তবে তা চিন্তায় রূপ নেবে। তখন তোমাকে অবশ্যই চিন্তা দূর করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আর তাও যদি করতে সক্ষম না হও তাহলে তা আসক্তিতে

---

[20] ইবনুল কাইয়্যেম, আল-ফাওয়ায়েদ: ১৭৬।

পরিণত হবে। তখন তোমাকে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আর যদি যুদ্ধ করে তা প্রতিহত করতে না পার তখন তা প্রতিজ্ঞায় রূপ নেবে, তখন তোমাকে তা দূর করার জন্য মরণপণ চেষ্টা করতে হবে। তাতে যদি তুমি ফেল কর, তবে তা বাস্তবে রূপ নেবে এবং কর্মে পরিণত হবে। তারপর যদি তাকে তা বিপরীত কোন ভালো কাজ দ্বারা প্রতিহত না কর, তখন তা তোমার অভ্যাসে পরিণত হবে। তখন তার থেকে ফিরে আসা তোমার জন্য পাহাড়কে জায়গা থেকে সরানোর চেয়েও কঠিন কাজ হবে।'[21]

একটি কথা মনে রাখতে হবে, অন্তরের কু-বাসনাকে সংশোধন করা চিন্তার সংশোধনের চেয়ে অধিক সহজ। আর চিন্তাকে সংশোধন করা ইচ্ছার সংশোধনের চেয়ে অধিক সহজ। আর ইচ্ছার সংশোধন করা খারাপ কর্ম সংশোধন করা হতে সহজ। আর খারাপ কর্ম ঠিক করা অভ্যাস পরিত্যাগ করা হতে সহজ।

যদি তুমি বল কোন জিনিস তোমাকে এ ধরনের কু-মন্ত্রণা ও খারাপ ভাবনা চিন্তাতে গা ভাসিয়ে দেয়া প্রতিহত করতে সাহায্য করবে?

আমরা বলব, এ বিষয়ে কয়েকটি বিষয় সহযোগিতা করবে। যেগুলো একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল।

---

[21] আল-ফাওয়ায়েদ: ৩১।

১. এটা ঈমান রাখা ও দৃঢ়ভাবে জানা যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে যে সমস্ত ভাবনা উদিত হয় তা সবই জানেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ ٱلۡأَعۡيُنِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّدُورُ ١٩﴾ [سورة غافر: 19.]

চক্ষুসমূহের খেয়ানত এবং অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে তিনি তা জানেন। [সূরা গাফের, আয়াত: ১৯]

﴿وَإِن تَجۡهَرۡ بِٱلۡقَوۡلِ فَإِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخۡفَى ٧﴾ [سورة طه: 7.]

“আর যদি তুমি উচ্চস্বরে কথা বল তবে তিনি গোপন ও অতি গোপন বিষয় জানেন।” [সূরা তাহা, আয়াত: ৭]

বান্দা যখন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার অন্তরের বিষয়সমূহ জানার কারণে লজ্জা অনুভব করবে, তখন সে তার অন্তরে যে সব কু ভাবনা-চিন্তা জাগ্রত হয়, তা থেকে সে দূরে থাকবে। এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

২. চিন্তা ফিকির করা:

তোমার অন্তরে যখন কু-মন্ত্রণা ও খারাপ চিন্তার উদ্রেক হয়, তখন তুমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বড়ত্ব সম্পর্কে চিন্তা করবে, আর

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নাম ও গুণসমূহকে তোমার অন্তরে হাজির করবে। অন্তরে এ কথা চিন্তা করবে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কঠিন আযাব দাতা, শাস্তি দানকারী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান, শক্তিশালী ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

৩. লজ্জাবোধ করা:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কুদরত ও তিনি যে আমাদের অন্তরের গোপন বিষয়গুলো জানেন তা বিশ্বাস করার পর তোমাকে অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের থেকে লজ্জা করতে হবে। তুমি খারাপ চিন্তা ও শয়তানী চিন্তা হতে নিজেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করবে। যখন তুমি কোন অপকর্ম করছ, ঠিক তখন যদি তোমার পরিচিত কেউ অথবা তোমার কোন বন্ধু তোমার নিকট প্রবেশ করে তখন তোমার কি অবস্থা হবে তা চিন্তা করে দেখ এবং তুমি কি করবে? মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যিনি তোমাকে দেখছেন তার থেকে লজ্জা করা আরও অধিকতর শ্রেয়।

৪. আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বড়ত্ব ও কুদরত সম্পর্কে চিন্তা করা।

৫. আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রহমত হতে বঞ্চিত হওয়া এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তুমি একেবারে মূল্যহীন ব্যক্তি হিসেবে পরিণত হওয়ার ভয় করা।

৬. আপন অন্তরের আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করা। ফলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহব্বত ছাড়া আর কোন কিছুর মহব্বতকে অন্তরে স্থান না দেয়া বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।

৭. অন্তরে শয়তানের কু-মন্ত্রণা বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে তা অবশিষ্ট ঈমানকে খেয়ে না ফেলে।

৮. মানুষের অন্তরের কু-মন্ত্রণা পাখিকে শিকার করার জন্য নিক্ষিপ্ত দানা-পানির মত। শয়তান তা মানুষের সামনে দানার মত ছিটিয়ে দেয়, যাতে মানুষ তা গ্রহণ করে। শয়তানের প্রতিটি কু-মন্ত্রণাই হল মানুষের জন্য তার ঈমানকে শিকার করার জন্য পেতে রাখা ফাঁদ ও জাল।

৯. মনে রাখতে হবে, শয়তানের কু-মন্ত্রণা কখনোই ঈমানের সাথে একত্র হতে পারে না।

১০. একটি কথা জানতে হবে মানুষের অন্তরে শয়তানের কু-মন্ত্রণা কুল কিনারা হীন সমুদ্রের মত যার কোন শেষ নেই। যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে তার ডুবে মরাটা অনিবার্য।

আসক্তির চিকিৎসা

বান্দার প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহ হল, তিনি তার বান্দাদের অনর্থক ছেড়ে দেননি এবং অনর্থক সৃষ্টি করেন

নি। বরং তিনি তাদের জন্য তাদের জীবনে যত ব্যাধি, সংক্রামক ও বক্রতা আছে তার চিকিৎসার জন্য মজবুত দ্বীন নাযিল করেছেন। জীবনের সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাধি হল, নিষিদ্ধ কামনা-বাসনা, কুআসক্তি বা নিষিদ্ধ চাহিদা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ মারাত্মক ব্যাধির জন্য একাধিক চিকিৎসা নির্ধারণ করেছেন; যার দ্বারা খারাপ বাসনা ও কুআসক্তির উত্তেজনা স্তিমিত হয় এবং তার দৌরাত্ম্য দূর হয় । নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হল।

এক. বিবাহ:

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেন,

« يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ »

“হে যুবক সম্প্রদায় তোমাদের মধ্যে যাদের ক্ষমতা আছে তারা যেন বিবাহ করে। কারণ, তোমাদের চোখের জন্য অধিক হেফাজতকারী এবং তোমাদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষক”[22]।

[22] মুসলিম ১৪০০

উল্লেখিত হাদিসে الباءة শব্দের অর্থ স্ত্রী মিলনে সক্ষম ও বিবাহের খরচ। যখন কোন ব্যক্তি বিবাহের ক্ষমতা রাখে এবং তার নফস বিবাহের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তাকে অবশ্যই বিবাহ করতে হবে।

বিবাহ হল, হালাল উপায়ে মানুষ তার মানবিক ও জৈবিক চাহিদা মেটানোর একটি পথ; যা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের জন্য বৈধ বিধান হিসেবে চালু করেছেন। বিবাহ হল নবী ও রাসুলগণের সুন্নাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা তাদের নিজেদের উপর বিবাহকে হারাম করেছিল তাদের বিষয়ে বলেন,

« لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي »

“কিন্তু আমি সালাত আদায় করি, ঘুমাই, রোজা রাখি ইফতার করি এবং নারীদের বিবাহ করি। সুতরাং এ গুলো সবই হল আমার আদর্শ। আর যে ব্যক্তি আমার আদর্শ থেকে দূরে সরে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়”[23]।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[23] মুসলিম ১৪০১

«النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ»

“বিবাহ আমার সুন্নাত। যে আমার সুন্নাত অনুযায়ী আমল করে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তোমরা বিবাহ কর, কারণ আমি আমার উম্মতের আধিক্য নিয়ে আল্লাহর দরবারে গর্ব করব। যার সামর্থ্য আছে সে অবশ্যই বিবাহ করবে আর যার সামর্থ্য নাই তার উপর কর্তব্য হল রোজা রাখা। কারণ, রোজা তার জন্য প্রতিষেধক”[24]।

বিবাহের মাধ্যমে মানুষের দ্বীন ও ঈমানের সংরক্ষণ হয়। আর যিনা ব্যভিচার দ্বারা মানুষ যে নুরের দ্বারা আলোকিত, তা ছিনিয়ে নেয়া হয়।

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কতক গোলাম ছিল, তিনি তাদের জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য নির্বাচন করেছিলেন। তিনি তাদের বলতেন, “যদি তোমরা বিবাহ করতে চাও তবে আমি তোমাদের বিবাহ দিয়ে দেব। কারণ, বান্দা যখন ব্যভিচার করে তার অন্তর থেকে ঈমানকে ছিনিয়ে নেয়া হয়”।[25]

---

[24] ইবনে মাজা ১৮৪৬। আল্লামা আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[25] ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন ২/২৩

তিনি তাদের আরও বলেন, “তোমরা বিবাহ কর! কারণ, বান্দা যখন কোন ব্যভিচার করে তখন তার ঈমানের নুর ছিনিয়ে নেয়া হয়”।[26]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেন, “বিবাহ ছাড়া কোন ইবাদাতকারীর ইবাদত প্রকৃতভাবে কবুল হয় না।” [27] অর্থাৎ কোন ইবাদত-কারী বান্দার ইবাদত বা দ্বীন বিবাহ করা ছাড়া পরিপূর্ণ হয় না। অবিবাহিত ব্যক্তির দ্বীন ও ইবাদত সর্বদা অপূর্ণ থেকে যায়। কারণ, তার জন্য এ সম্ভাবনা রয়েছে, সে বিবাহ না করাতে কোন হারাম বা যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে”।

যে ব্যক্তি তার নিজের ব্যাপারে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করে, তার জন্য বিবাহ করা হজের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরয। অথচ হজ হল ইসলামের রোকনসমূহের একটি রোকন। তা স্বত্বেও যে ব্যক্তি হজ ও বিবাহ দুটিকে এক সাথে আদায় করতে সক্ষম নয় তাকে অবশ্যই হজের উপর বিবাহকে প্রাধান্য দিতে হবে।

নেককার মহিলা বা স্ত্রী অর্ধ দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্যকারী:

---

[26] তারিখু দিমাশক ৫০/১২৩; যাম্মুল হাওয়া ১৯৩।

[27] ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন ২/২৩

আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي »

"আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকে নেককার স্ত্রী লাভের তাওফীক দেন, তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অর্ধেক দ্বীনের বিষয়ে সাহায্য করল, বাকী অর্ধেকের বিষয়ে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে"[28]।

আল্লামা মুনাবি রহ. বলেন, দ্বীনের জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর ও মহা মুসিবত হল, দুটি জিনিষ। এক- পেটের চাহিদা, দুই-যৌন চাহিদা।

দ্বিতীয় চাহিদা মেটানোর জন্য তাকে বিবাহ করতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি দ্বীনদার ও সৎ নারীকে বিবাহ করে, তাহলে সে ব্যভিচার থেকে মুক্ত থাকবে এবং সে অর্ধেক চাহিদা মেটাতে পারবে। তারপর তার অবশিষ্ট অর্ধেক চাহিদা বাকী থাকল। আর তা হল তার পেটের চাহিদা। এ চাহিদা মেটানোর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাকওয়া অর্জন করার উপদেশ দেন। তাকওয়ার মাধ্যমে তার দ্বীনদারি পূর্ণতা লাভ করে

---

28 মুস্তাদরাকে হাকেম ২৬৮১ এবং হাকেম তা সহীহ বলেছেন , আর যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের যে দ্বীন দিয়েছেন সে দ্বীনের উপর অটল অবিচল থাকার তাওফিক হাসিল হয়।

এখানে [হাদীসে] নেককার নারীর কথা বলার কারণ হল, নারী যদি দ্বীনদার ও নেককার না হয়, তার দ্বারা ব্যভিচার থেকে মুক্তি পেলেও লোকটি তার স্ত্রীর কারণে কোন অপকর্ম ও খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে এবং তার স্ত্রী তাকে হারাম উপার্জন ইত্যাদির প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারে; যা তার পরিণতির জন্য খুবই খারাপ।[29]

আল্লামা কুরতবী রহ. বলেন, বর্তমানকালে কেউ অন্যায়-পাপ থেকে সবর করার ক্ষমতা না রাখে, তার জন্য ওয়াজিব হবে দ্বীনদার স্ত্রী তালাশ করা; যার মাধ্যমে সে তার দ্বীনদারি ঠিক রাখতে পারে।[30]

বিবাহের মধ্যে রয়েছে ছাওয়াব আর ব্যভিচারে রয়েছেগুনাহ:

বিবাহের সবচেয়ে কল্যাণকর ও বিশেষ দিক হল, যৌন চাহিদা মিটানোতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর পক্ষ হতে সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায় । যেমন, হাদিসে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[29] ফায়যুল কাদীর ৬/১৭৭।

[30] কুরতুবী ৪/২৯।

«وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قالوا :يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟!، قال أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فكذلك إذا وَضَعَهَا فِي الحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ»

"তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করাতে তার জন্য রয়েছে, সদকার সাওয়াব। এ কথা শোনে সাহাবীরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যদি আমাদের স্ত্রীদের সাথে যৌন চাহিদা মেটাই তাতেও কি আমাদের ছাওয়াব রয়েছে? তখন তিনি বললেন, যদি লোকটি কোন হারাম কাজে লিপ্ত হত তাহলে তার গুনাহ হত কিনা? অনুরূপভাবে যখন সে হারাম থেকে বিরত থেকে হালাল কাজে লিপ্ত হও তখন অবশ্যই তোমাদের জন্য ছাওয়াব ও বিনিময় থাকবে"[31]।

ইমাম নববী রহ. বলেন, যে সব কাজগুলো মুবাহ বা হালাল ইবাদতের নিয়ত দ্বারা তা ইবাদতে পরিণত হয়। যেমন, স্ত্রী সহবাসের দ্বারা যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীর অধিকার আদায়, তার সাথে সুন্দর ব্যবহার, নেক সন্তান লাভ, নিজের নফসকে ও স্ত্রীকে ব্যভিচার থেকে হেফাজত করা, খারাপ বা হারামের দিকে তাকানো থেকে বিরত রাখা, খারাপ চিন্তা ও ফিকির হতে বিরত রাখা

---

[31] মুসলিম ১০০৬

ইত্যাদি ভালো ও নেক উদ্দেশ্য লাভের নিয়ত করে, তাহলে স্ত্রী সহবাস অবশ্যই ইবাদত বলে পরিগণিত হবে।'[32]

মনে রাখতে হবে বিবাহ হল, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা যুবকদের অনৈতিক চিন্তাধারা থেকে হেফাজত করে এবং যিনা-ব্যভিচার থেকে রক্ষা করে। বিবাহের মাধ্যমে একজন যুবক হারাম বিষয়ে চিন্তা করা এবং হারাম কাজের ইচ্ছা করা হতে বিরত থাকে।

বিবাহিত ব্যক্তিকে পবিত্র ও সৎ থাকতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সাহায্য করে:

কোনো ব্যক্তি যদি বিবাহের মাধ্যমে পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবানে তাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কারণ, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বান্দা থেকে সব ধরনের অশ্লীলতা দূর করতে চান এবং তাকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার জন্য যে সব কর্মকে হালাল করেছেন, তার দিকে ধাবিত করতে এবং হারাম থেকে বিরত রাখতে চান। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى الله عونهم:الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، والمكاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأداء،وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ »

---

[32] শারহুন নববী আলা মুসলিম ৭/৯২।

“তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর ওয়াজিব। এক- আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ। দুই- চুক্তিবদ্ধ গোলাম[33] যে মুক্তিপণ আদায় করতে চায়। তিন- বিবাহিত ব্যক্তি যে পবিত্র থাকতে চায়”[34]।

যদি কোন ব্যক্তি এমন হয়, একটি স্ত্রী দ্বারা তার আসক্তির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং সে তার নিজের বিষয়ে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করছে, তাহলে তার উপর একাধিক বিবাহ করা ওয়াজিব, যাতে সে হারাম থেকে বাচতে পারে। আর যদি এক স্ত্রী দ্বারা তার আসক্তির ক্ষুধা নিবারণ হচ্ছে, তবে একটি স্ত্রী নিয়ে থাকাতে তার কষ্ট হচ্ছে, তাহলে তার জন্য পরবর্তী বিবাহ করা মোস্তাহাব।

দুই- রোজা রাখা:

রোজা যুবকদের অপকর্ম, যিনা, ব্যভিচার ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে হেফাজত করে। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকদের রোজার চিকিৎসা গ্রহণ করার প্রতি উপদেশ দেন।

---

[33] মুকাতাব সে দাসকে বলা হয় ; যে তার মনিবকে কিছু সম্পদ দেয়ার বিনিময়ে স্বাধীন হবে বলে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। [মু‘জামু লুগাতিল ফুকাহা ১/৪৫৫]

[34] তিরমিযি ১৬৫৫।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি আমাদের হাদিস বর্ণনা করে বলেন,

«مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

"তোমাদের মধ্যে যাদের ক্ষমতা আছে তারা যেন বিবাহ করে। কারণ, বিবাহ তোমাদের চোখের জন্য অধিক হেফাজতকারী এবং তোমাদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষক। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না তাকে অবশ্যই রোজা রাখতে হবে | কারণ, রোজা তার জন্য প্রতিষেধক"[35]|

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকদের প্রথমে শেফাদানকারি চিকিৎসা অর্থাৎ বিবাহের দিকে পথ দেখান। কিন্তু তাতে যদি কেউ অক্ষম হয় তাকে তার পরিবর্তে কি করতে হবে তার প্রতি দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। আর তা হল, রোজা রাখা। কারণ, রোজা মানুষের আসক্তির চাহিদাকে দুর্বল করে এবং আসক্তির উৎপাতকে দমিয়ে ও সংকোচিত করে দেয়। মানুষের আসক্তি সাধারণত খাদ্যের আধিক্য ও বিভিন্নতার কারণে শক্তিশালী হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ ও অধিক খাদ্য একজন মানুষের আসক্তির

---

[35] বুখারি ১৯০৫, মুসলিম ১৪০০

চাহিদাকে বাড়িয়ে দেয়। আর রোজা রাখা দ্বারা তা অনেকটা কমে যায়। যখন একজন মানুষ রোজা রাখতে থাকে, তখন সে খাসিকৃত জন্তুর মত হয়ে যায়। যে ব্যক্তি সব সময় রোজা রাখে তার যৌন চাহিদা ও আসক্তি দুর্বল হবে না এমন মানুষ খুব কমই পাওয়া যায়।'[36]

তাছাড়া আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -হাদিসে কুদসীতে- মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

«والصَّوْمُ جُنَّةٌ... »

"রোজা মুমিনের জন্য ডাল স্বরূপ"।[37]

ডাল স্বরূপ এ কথার অর্থ হল, রোজা রক্ষাকারী ও গোপনকারী। রোজা মানবাত্মাকে আসক্তির চাহিদা ও তার উত্তেজনা থেকে হেফাজত করে এবং মানুষকে হারামে লিপ্ত হওয়া হতে বাঁচায়। কারণ, খাদ্য মানুষের যৌন চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। আর রোজার মানেই হল খাদ্য-পানীয় থেকে বিরত থাকা।

---

[36] ইবনুল কাইয়্যেম, রাওদাতুল মুহিব্বীন ২১৯।

[37] বুখারী: ৭৪৯২।

আল্লামা কুরতবি রহ. বলেন, 'খাদ্য যত কম হবে, আসক্তি ততই দুর্বল হবে। আর আসক্তি যত দুর্বল হবে তার গুনাহ কম হবে'।[38]

তিন. দৈহিক শক্তিকে কল্যাণকর ও নেক আমলে ব্যয় করা:

যুবকদের কর্তব্য হল, তারা তাদের দৈহিক শক্তি ও যৌবনকে গুরুত্ব দেবে এবং বিভিন্ন ধরনের নেক ও জন কল্যাণমূলক কাজে তাদের নিজেদের সময় ও যৌবনকে ব্যয় করবে। সামাজিক ও ধর্মীয় কাজে যুবকরা সময়কে অধিক হারে ব্যয় করতে পারে। যেমন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দ্বীনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া, সমাজের হত-দরিদ্র ও অভাবী মানুষদের সাহায্য এগিয়ে আসা এবং মানুষের বিপদ ও দুর্যোগের সময় যুবকরা তাদের সাহায্যার্থে ঝাঁপিয়ে পড়া ইত্যাদি। এছাড়াও সমাজে যে কোন ধরনের জন কল্যাণমুলক কাজে তারা নেতৃত্বই দিতে পারে।

চার. অন্যদের মধ্যে যৌন উত্তেজনা ছড়ানো হতে বিরত থাকা:

বর্তমানে আমরা যে যুগের মধ্যে বসবাস করি, তা হল, নোংরামি, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার যুগ। এ যুগে মারা-মারি, কাটা-কাটি, হত্যা, গুম, চিন্তাই ইত্যাদি প্রায় নিত্য দিনের ঘটনা। রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, দোকান-পাট যেখানেই তাকাই সেখানেই আমরা দেখতে পাই অশ্লীল গান-বাজনা, নগ্ন সিনেমা, উলঙ্গ ছবি,

---

[38] তাফসীরুল কুরতুবী: ২/২৭৫।

নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা ইত্যাদি। এ সবের কারণে বর্তমানে যুব সমাজের চরিত্র প্রা য় ধ্বংসের কাছাকাছি, তাদের নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃ:পতন অপ্রতিরোধ্য। বর্তমানে আমরা আমাদের যুগে যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছি , অতীতে আমাদের বাপ-দাদারা তা কোনদিন চিন্তাও করেন নি।

বর্তমান যুগে মানুষের পোশাকগুলো তৈরি করা হচ্ছে এমনভাবে যাতে পোশাক পরিধান করার পরও একজন মানুষ অর্ধ-উলঙ্গ থাকে। তাদের দেখলেই মানুষের নফসের কামনা আরও বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে নারীদের পোশাক বানানো ও ডিজাইন করার জন্য কিছু লোক নিযুক্ত আছে, তারা সবসময় এ চিন্তা করে, কোন ধরনের পোশাক বানালে মানুষ তাদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হবে এবং বিভিন্ন ধরনের ফিতনায় লিপ্ত হবে।

অনেককে আমরা বলতে শুনি তারা বলে, নারীদের পোশাকের অবস্থা এমন যে, তারা যদি তাদের পোশাক পরিধান না করে উলঙ্গ থাকত, তাহলে এতটা ফিতনার আশঙ্কা হত না। কারণ, তাদের এ পোশাকের আকর্ষণ তাদের নেংটা থাকার চেয়েও অধিক মারাত্মক। এ পোশাক তাদেরকে তাদের প্রকৃত সুন্দরের চেয়েও বেশী আকর্ষণীয় করে তোলে।

অনুরূপভাবে বোরকা নারীদের সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে দেয়। বাস্তবে মহিলাটি এতটা সুন্দর না হলেও যখন বোরকা পরে তখন

মানুষ তার প্রতি মাথা উঁচু করে দেখতে থাকে। মনে করে মেয়েটি কতই না সুন্দর। কিন্তু বাস্তবে যখন সে তার চেহারা খুলবে তখন তার এ সৌন্দর্য আর অবশিষ্ট থাকে না।

ইয়াহুদীরা তৈরি করেছে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য কিছু প্রতিষ্ঠান বানিয়েছে । তারা তাদের নারীদের থেকে কতক গায়িকা ও মডেল তৈরি করে তাদেরকে নোংরা পোশাক পরিধান করিয়ে বাজারে ছেড়ে দেয়, টিভি চ্যানেলে তাদের প্র দর্শিত হয়। তাদের দেখে আমাদের দেশের নারীরা তাদের নারীদের অনুকরণ করতে থাকে এবং তারাও তাদের সাজে সাজতে পছন্দ করে। তাদের দেখে দেখে আমাদের দেশের নারীরাও একই ধরণের পোশাক পরিধান করে, যা আমাদের দেশের নারীদের কপালে কলংকের দাগ টেনে দেয় । কল, কারখানা ও গার্মেন্টসগুলোতেও নারীদের জন্য ঐ ধরনের পোশাক তৈরি করা হয়। যার কারণে বাজারে অশালীন পোশাক ছাড়া শালীন ও ভদ্র কোন পোশাক পাওয়াই বর্তমানে দুষ্কর। বরং বর্তমান বাজারে অধিকাংশ পোশাকই হল, তাদের ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সহায়ক।

পাঁচ. কোন নারী দেখে আকৃষ্ট হলে, স্বীয় স্ত্রীর নিকট চলে আসা:

মনে রাখতে হবে, আসক্তি পূজা করা শুধু অবিবাহিত লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং বিবাহিত লোকও অনেক সময় তার

নিজের স্ত্রীকে বাদ দিয়ে অন্য নারীর প্রতি ঝুঁকে পড়ে। অনেক সময় দেখা যায় বিবাহিত লোক অবিবাহিত লোকের চেয়ে আরও বেশি ফিতনার কারণ হয়। কারণ, সে নারীদের সাথে মিশছে তাদের সাথে সহবাস করছে। ফলে সে নারীদের সাথে মেলামেশা করা কি মজা তা জানে। আর যে কোন কিছুর মজা বা স্বাদ কি তা জানে আর যে জানে না উভয় সমান হতে পারে না।

সুতরাং বিবাহিত লোকদের এ বিষয়ে অধিক সতর্ক থাকতে হবে। তারা তাদের নিজেদের হেফাজত করার জন্য অধিক চেষ্টা করবে। যদি কোন অপরিচিত নারীর দিক দৃষ্টির কারণে অথবা নিষিদ্ধ বা উলঙ্গ ছবি ইত্যাদি দেখার কারণে তার অন্তরে কোন অপকর্ম বা খারাপ কাজের উদ্রেক হয়, তখন সে যেন দ্রুত তার স্ত্রীর নিকট গিয়ে তার স্বীয় প্রয়োজন পূর্ণ করে এবং তার নফসের চাহিদা মেটায়।

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন নারীকে দেখে তিনি তার স্ত্রী যয়নাবের নিকট আসল। তখন যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার শরীরকে পরিষ্কার করার জন্য মালিশ করতে ছিল। তারপর সে তার হাজত পূরণ করল এবং সাহাবীদের নিকট বের হয়ে বলল,

« إن المرأة تقبل في صُورَة شَيطَانٍ، وتدبر في صُورَة شَيطَانٍ، فإذا أَبْصَرَ أَحَدَكُمُ امْرَأَةً فليأت أَهْلَهُ؛ فإن ذلك يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ »

“নারীরা শয়তানের আকৃতিতে সামনের দিক অগ্রসর হয় আবার শয়তানের আকৃতিতে চলে যায়। তোমাদের যখন কোন নারী দেখে যৌন চাহিদা জেগে উঠে, তাহলে সাথে সাথে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নিকট এসে চাহিদা মেটাবে। কারণ, এতে তোমাদের অন্তরে যে খারাপ ভাবের উদ্রেক করেছে তা দূর করে দেবে”[39]। অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন,

« فإنَّ مَعَهَا مِثَل الَّذِي مَعَهَا »

“তার সাথে তাই আছে যা তোমার স্ত্রীর মধ্যে রয়েছে”।[40]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন নারীকে দেখল, এর অর্থ হল, একজন নারীর উপর হঠাৎ করে তার দৃষ্টি পড়ল। এতে কোন গুনাহ নাই। অথবা এ ঘটনা পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বের; তখন নারীদের দিকে তাকানো বৈধ ছিল।

আবী কাবশা আল-আনমারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তার সাথীদের সাথে বসা ছিলেন, তারপর তিনি মজলিশ থেকে উঠে

[39] মুসলিম: ১৪০৩।

[40] তিরমিযি ১১৫৮; আল্লামা আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং গোসল করে বের হলেন। তাকে দেখে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয় কোন ঘটনা ঘটছে! তখন তিনি বললেন,

« أَجَلْ، مَرَّتْ بِي فُلَانَةٌ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي شَهْوَةُ النِّسَاءِ، فَأَتَيْتُ بَعْضَ أَزْوَاجِي فَأَصَبْتُهَا، فـكذلكفَافْعَلُوا؛ فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الحَلَالِ »

“আমার নিকট দিয়ে একজন নারী অতিক্রম করতে দেখে আমার অন্তরে নারীর আকর্ষণ জাগ্রত হয়। তারপর আমি আমার একজন স্ত্রীর নিকট হাজির হয়ে তার সাথে সহবাস করি। তোমরাও তাই কর। কারণ, হালালের কাছে গমন করা তোমাদের সর্বোত্তম আমলেরই নামান্তর”[41]।

ইমাম নববী রহ. বলেন, কোন ব্যক্তি যখন কোন নারীকে দেখে তার যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, তার জন্য মুস্তাহাব হল, সে তার স্ত্রীর নিকট আসবে এবং তার সাথে সহবাস করে, সে তার যৌন ক্ষুধা নিবারণ করবে, তার অন্তরকে তার চাহিদা অনুযায়ী একত্র করবে এবং আত্মাকে শান্তি দেবে। শয়তান মানুষকে নারীদের ফিতনায় লিপ্ত হওয়ার দাওয়াত দিতে থাকে। কারণ, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পুরুষদের নারীদের প্রতি আকর্ষণ দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তারা নারীদের দিকে দেখে এবং তাদের সাথে সম্পৃক্ত যে কোন কিছু দেখে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং মজা পায়।

---

[41] আহমদ ১৮৫৬৭; আল্লামা আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

সুতরাং, বলা বাহুল্য যে, নারীরা শয়তানের মতই। শয়তান যেমন মানুষকে খারাপ ও অপকর্মের দিকে আহ্বান করে অনুরূপভাবে নারীরাও তাদের সাজ-সজ্জা ও পর্দা-হীনতা দিয়ে পুরুষদের অপকর্ম ও ব্যভিচারের দিকে ডাকতে থাকে। এতে এ কথা স্পষ্ট হয়, নারীরা যেন বেপর্দা হয়ে বিনা প্রয়োজনে পুরুষদের সাথে হাটে বাজারে রাস্তা ঘাটে বের না হয়। আর পুরুষদের কর্তব্য হল, তারা নারীদের প্রতি তাকাবে না এবং তাদের দেখলে চক্ষুকে অবনত করে রাখবে।[42]

উপরের দুটি হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিজের গোপন বিষয়ে যে স্পষ্ট কথা বলেন, তাতে অনেকেই বিষয়টিকে আশ্চর্য মনে করেন। রাসূল সা. এর অন্তরে কিভাবে খারাপ চিন্তা আসল? আবার তিনি তা সাহাবীদের নিকট কীভাবে বললেন? কিন্তু তারা যখন তার কারণ সম্পর্কে জানবে তখন আর আশ্চর্যবোধ করবে না। কারণ, বিষয়টি খুবই মারাত্মক ও ক্ষতিকর। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিজের বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন, যাতে মুসলিমরা তার থেকে শিক্ষালাভ করে এবং তার অনুকরণ করে।

ছয়. প্রয়োজন ছাড়া নারীদের ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করা

[42] শারহুন নববী আলা মুসলিম: ৯/১৭৮।

নারীরা যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন শয়তান মাথা উঁচা করে দেখতে থাকে এবং শয়তান তাদের মানুষের দৃষ্টিতে খুব সুন্দর করে দেখায়। বাস্তবে তার যতটুকু সৌন্দর্য আছে শয়তান একটু বেশি করে দেখায়, যাতে মানুষকে সে অশ্লীল কাজ ও অপকর্মের মধ্যে লিপ্ত করতে পারে।

সুতরাং অভিভাবকদের উচিত হল, তারা যেন তাদের মেয়েদের রাস্তায় বের হওয়া হতে নিষেধ করে এবং প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাহিরে যেতে না দেয়; যাতে তারা তাদের ইজ্জত, সম্মান ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করতে পারে।

সাত. ঘরের মধ্যে ব্যক্তিগত ইবাদতগুলো অধিকহারে করা:

তোমরা তোমাদের ঘরকে কবর বানাবে না; যেখানে কোন জিকির নাই, দো 'আ নাই এবং ইবাদত বন্দেগী নাই। বরং, তোমরা তোমাদের ঘরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত বন্দেগী দ্বারা আবাদ কর, ঘরে সালাত আদায় কর ও কুরআন তিলাওয়াত কর। আর ঘরের মধ্যে সালাত আদায়ের জন্য একটি জায়গা নির্ধারণ করবে যেখানে তোমরা নফল সালাত আদায় করবে, কুরআন তিলাওয়াত করবে। কুরআনের তিলাওয়াত শোনার জন্য একটি টেপরেকর্ড বা কম্পিউটার রাখবে। ঘরের মধ্যে কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক দীনি বই পুস্তক রাখবে এবং এগুলো তালীমের পরিবেশ কায়েম করবে; যাতে তোমাদের পরিবারের দুনিয়া ও আখিরাতের

কল্যাণ নিশ্চিত হয়। এগুলো মানুষকে তাদের প্রভুর দিকে ধাবিত করবে এবং আসক্তির চাহিদা দুর্বল হবে।

আট. দো'আ করা:

দো'আ হল মুমিনের সত্যিকার ও মজবুত হাতিয়ার। দো 'আ কখনোই বেকার যায় না। মুমিনের দায়িত্ব হল, সে সবসময় দো'আর হাতিয়ারকে ব্যবহার করবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [سورة البقرة : 186.]

আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে। [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ১৮৬]

ওবাদাহ ইবন সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا عَلَى الأرض مُسْلِمٍ يَدْعُو الله بدعوة إِلَّا آتَاهُ الله إِيَاهَا، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا؛ مَا لَمَ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ فقال رجل من القوم :إذاً نكثر .قال الله أَكْثَرُ»

“জমিনের বুকে কোন মুসলিম ব্যক্তি যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট কোন কিছু চায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে তা দান করবেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার থেকে সমপরিমাণ অকল্যাণ দূর করবে। তবে শর্ত তার দো ‘আ যেন কোন অন্যায় অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক কর্তন করার জন্য না হয়। এ কথা শোনে একজন লোক বলল, তাহলে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অধিক হারে দো ‘আ করব। তখন বলল, আল্লাহ তোমাদের চেয়ে অধিক দো‘আ কবুলকারী”[43]।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নবী ইউসুফ আ. সম্পর্কে চিন্তা করে দেখ, যখন আসক্তি চাহিদার মুহূর্তে তাকে নিষিদ্ধ ও হারাম কাজের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন সে কি বলেছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার কাহিনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন,

﴿قَالَ رَبِّ ٱلسِّجۡنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدۡعُونَنِيٓ إِلَيۡهِۖ وَإِلَّا تَصۡرِفۡ عَنِّي كَيۡدَهُنَّ أَصۡبُ إِلَيۡهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلۡجَٰهِلِينَ ٣٣ فَٱسۡتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنۡهُ كَيۡدَهُنَّۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ٣٤﴾ [سورة يوسف : 33-34.]

[43] তিরমিযি ৩৫৭৩ আল্লামা আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

সে (ইউসুফ) বলল , ‘হে আমার রব , তারা আমাকে যে কাজের প্রতি আহ্বান করছে তা থেকে কারাগারই আমার নিকট অধিক প্রিয়। আর যদি আপনি আমার থেকে তাদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হব ’। অতঃপর তার রব তার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তার থেকে তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [সূরা ইউসূফ, আয়াত: ৩৩-৩৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ হল তিনি আসক্তির ফিতনা হতে বাঁচা ও তা প্রতিহত করার জন্য তার সাহাবীদের দো‘আ শেখাতেন।

শাকাল ইবন হামিদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের একটি দো‘আ শিখিয়ে দিন। উত্তরে তিনি বলেন, তুমি বল,

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي»

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার কর্ণের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমার চোখের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমার মুখের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমার

অন্তরের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং আমার বীর্যের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি”[44]।

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বীর্যের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চেয়েছেন। আর বীর্যের অকল্যাণ বলে আসক্তি ও অসৎ প্রেরণা থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট আশ্রয় চাওয়াই উদ্দেশ্য।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলতেন,

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى، وَالتقَّى، وَالعَفَافَ، وَالغِنَى »

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হিদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও অমুখাপেক্ষিতা চাই”[45] এখানে তিনি পবিত্রতা চেয়েছেন, যা কু-আসক্তিকে দমিয়ে রাখা ও তার চিকিৎসার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

সুতরাং তুমি অবশ্যই সতর্ক থাকবে, যাতে তোমার নিজের নফস তোমাকে ধোঁকায় না ফেলতে পারে এবং তোমাকে দো ‘আ করা হতে বিরত রাখতে না পারে। কারণ, ইবরাহীম আ. ও মূর্তিপূজা বর্জনের জন্য তার নিজের [তাকওয়া ও ঈমানি দৃঢ়তার] ওপর

---

[44] আবু দাউদ ১৫৫১ তিরমিযি ৩৪৯২ নাসায়ী ৫৪৫৬ হাকেম হাদীসটি সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।

[45] মুসলিম ২৭২১

নির্ভর করেন নি বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দো ‘আ ও প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন,

﴿وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ ٣٥﴾ [سورة إبراهيم : 35.]

আর স্মরণ কর ‘যখন ইবরাহীম বলল, ‘আর আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন ’। [সূরা ইবরাহীম , আয়াত: ৩৫]

তিনি শুধু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দরবারে ছোট গুনাহ থেকে বাচার প্রার্থনা করেন নি বরং তিনি বড় শির্ক হতে বাঁচার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করেন। সুতরাং, তুমি কখনোই এ কথা বলবে না আমি একজন দ্বীনদার যুবক, আমি ইমাম, খতিব, বক্তা, তালেবে ইলম এবং আমি একজন দা‘য়ী। সবারই উচিত সে তার নিজের বিষয়ে ফিতনায় লিপ্ত হওয়া হতে ভয় করবে। আর আমরা যখন আমাদের নিজের বিষয়ে ভয় করব, তখন আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা করব এবং তার নিকট ফিরে যাব , যাতে তিনি আমাদের গুনাহ থেকে হেফাজত করেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿وَلَوۡلَآ أَن ثَبَّتۡنَٰكَ لَقَدۡ كِدتَّ تَرۡكَنُ إِلَيۡهِمۡ شَيۡـٔٗا قَلِيلًا ٧٤﴾ [سورة الإسراء .74]

“আর আমি যদি তোমাকে অবিচল না রাখতাম, তবে অবশ্যই তুমি তাদের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়তে ” [সূরা আল-ইসরা , আয়াত: ৭৪]

إِذا لَم يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ اللهِ لِلْفَتَى

فَأَوَّلُ مَا يَجْنِي عَلَيْهِ اجْتِهَادُهُ

একজন যুবককে যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সহযোগিতা না করে তখন প্রথম যে বস্তুটি তার বিপদ ডেকে আনে তা হচ্ছে, তার ইজতিহাদ[46]।

নয়. কু-আসক্তির পিছনে দৌড়ার ক্ষতি সম্পর্কে চিন্তা ফিকির করা:

ইয়াহিয়া ইবন মুয়ায রহ. বলেন, যে ব্যক্তি তার দেহকে ভোগ-বিলাসের মধ্যে কাজে লাগাতে পছন্দ করে, সে তার নিজের জন্য অপমান-অপদস্থের গাছ বপন করা ছাড়া আর কিছুই করল না।

আব্দুস সামাদ আয-যাহেদ রহ. বলেন, যে ব্যক্তি এ কথা জানল না যে, কু-আসক্তি হল ষড়যন্ত্রের একটি জাল, সে একজন নির্বোধ।

[46] নফহুত তীব মিন গুসনিল উন্দুলুসির রাতীব ৬/১৭৭।

দুনিয়া ও আখিরাতে ব্যভিচার ও অশ্লীল কাজের ক্ষতি সম্পর্কে যখন কোন মানুষ চিন্তা করবে তখন সে অবশ্যই জানতে পারবে কু-আসক্তি ও নিষিদ্ধ কাজের পিছনে দৌড়ার ক্ষতি কি?

পবিত্র লোকদের ঘটনা

ইতিহাসের পাতায় আমরা এমন অনেক লোককে দেখতে পাই যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেও তাদের পবিত্রতা ও চারিত্রিক গুণাবলির কারণে তাদের আলোচনা আমরণ চলতে থাকবে। তারা মরেও আমাদের মধ্যে জীবিত। তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদের নিজেদের কু-আসক্তি হতে নিজেদের বিরত রাখেন। ফলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের আলোচনা চিরন্তন করেন এবং তাদের জীবনীকে আমাদের মধ্যে সমুন্নত রাখেন।

নিম্নে তাদের কয়েক জনের কাহিনী আলোচনা করা হল:

এক. ইউসুফ আ. এর ঘটনা:

পৃথিবীর ইতিহাসে নারী ও পুরুষের মাঝে সবচেয়ে বড় ফিতনা সংঘটিত হয় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্মানিত নবী ইউসুফ আ. কে কেন্দ্র করে। ইউসুফ আ. কে বাদশাহ তার রাজ প্রাসাদে

আশ্রয় দেয়। সেখানে ইউসুফ আ. অগ্নি পরিক্ষার সম্মূখীন হন। বাদশাহর স্ত্রী ইউসুফ আ. এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে পড়ে যায়। তার সাথে অপকর্ম করতে ইউসুফ আ. কে বাধ্য করে এবং তার জন্য যাবতীয় উপকরণগুলো একত্র করে। যেমন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার মহান কিতাব কুরআনে কারীমে তা উল্লেখ করে বলেন,

﴿وَرَٰوَدَتۡهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيۡتِهَا عَن نَّفۡسِهِۦ وَغَلَّقَتِ ٱلۡأَبۡوَٰبَ وَقَالَتۡ هَيۡتَ لَكَۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ رَبِّيٓ أَحۡسَنَ مَثۡوَايَۖ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٣﴾ [سورة يوسف : 23.]

আর যে মহিলার ঘরে সে ছিল , সে তাকে কুপ্ররোচনা দিল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল আর বলল, 'এসো'| সে বলল, আল্লাহর আশ্রয় (চাই)। নিশ্চয় তিনি আমার মনিব , তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয় যালিমগণ সফল হয় না। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২৩]

বিষয়টি এখানেই শেষ হয়নি |বরং এ কথা বলার পরও তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। তার সাথে কামভাব পূরণ করার লক্ষে মহিলাটি তাকে তার দিকে আহ্বান করে। ইউসুফ আ. নিরুপায় হয়ে তার থেকে পালিয়ে দৌড়ে দরজার সামনে চলে আসে। তখন মহিলাটি পিছন থেকে তার জামা টেনে ধরে পিছন দিক থেকে তার জামাটি ছিঁড়ে ফেলে। মহিলার স্বামী

আজিজে মিসর তাদের দেখে ফেললে মহিলাটি ইউসূফ আ. এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয় | মহিলাটি তার সাথে অপকর্ম করতে জোর জবরদস্তি করতে থাকে। কিন্তু ইউসূফ আ . এতে রাজি না হলে তাকে বিনিময়ে জেলখানায় যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ইউসূফ আ. তার সাথে অশ্লীল কাজ করতে অস্বীকার করেন এবং জেলখানায় যেতে সম্মত হন। সে হারাম কাজ করার চেয়ে জেলখানায় জুলুম, নির্যাতন ও বিভিন্ন ধরনের কষ্ট সহ্য করতে সম্মত হন|

এ ঘটনা বিষয়ে চিন্তা করলে অবশ্যই স্পষ্ট হবে যে, আল্লাহর নবী ইউসুফ আ. এর জন্য অপকর্মের যাবতীয় সব ধরনের উপকরণ সহজ হাজির ছিল। ইচ্ছা করলে সে তা করতে পারত। কারণ, তিনি ছিলেন একজন অবিবাহিত যুবক, স্বীয় আসক্তিকে ব্যয় করার মত কোন ক্ষেত্র ছিল না। আর সে ছিল একজন গোলাম তার আত্ম-মর্যাদা বা সম্মানহানির তেমন কোন ভয় ছিল না, যেমনটি একজন স্বাধীন বা মুনিবের ভয় থাকে।

আর অপরদিকে যে নারী তাকে অপকর্মের প্রতি আহ্বান করছে, সে ছিল একজন সুন্দরী রমণী ও ক্ষমতাধর নারী। সে ইউসুফ আ. এর মনিব আর ইউসুফ আ. হল তার হুকুমের গোলাম বা চাকর। তিনি যা আদেশ দেবেন বা নিষেধ করবেন তা পালন করতে সে বাধ্য। খাদেম হওয়ার কারণে তার ঘরে প্রবেশ করা ইউসুফ আ. এর জন্য কোন বাধা ছিল না | যখন ইচ্ছা সে ঘরে প্রবেশ করতে

পারত। তার স্বামী বাড়ি থাকত না। মহিলার স্বামীর আত্ম -মর্যাদাবোধ ছিল খুবই কম। যখন সে ঘটনা জানতে পারল সে আশানুরূপ কোন ব্যবস্থা ইউসুফ আ. ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে নেয়নি। বরং সে ইউসুফ আ. কে বলল, হে ইউসুফ তুমি বিরত থাক, আর তার স্ত্রীকে বলল, তুমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাকে যেভাবে ব্যভিচারের দাওয়াত দেয়া হয়েছে, তাতে তাদের মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। এমনকি ক্ষমতাধর নারীটি তার সাথে অপকর্ম না করলে তাকে জেল খানায় পাঠানোর হুমকি দেয়। এত কিছুর পরও তিনি ধৈর্য ধারণ করেন| আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মজবুত রশিকে আঁকড়ে ধরেন এবং স্বীয় প্রভু ও মাওলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

চিন্তা করে দেখ, তিনি তার নফসকে কিভাবে দমিয়ে রাখলেন? মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর বিনিময় তাকে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী করেন | মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে তার খালেস বান্দা হিসেবে নির্বাচন করেন এবং মুহসীন ও মুখলিসদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

ইউসূফ আ. এর ধৈর্য ধারণ করার কারণ :

প্রথমত: আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয়। ইউসূফ আ. এর অন্তরে ছিল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয়। তাই তিনি নফসের পূজা থেকে বেঁচে যান।

দ্বিতীয়ত: তার প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাহায্য ও তাওফীক। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَٰنَ رَبِّهِۦ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾﴾ [سورة يوسف :24.]

আর সে মহিলা তার প্রতি আসক্ত হল , আর সেও তার প্রতি আসক্ত হত, যদি না তার রবের স্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ করত। এভাবেই, যাতে আমি তার থেকে অনিষ্ট ও অশ্লীলতা দূর করে দেই। নিশ্চয় সে আমার খালেস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২৪]

তৃতীয়ত: আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নাফরমানির কারণ হতে পলায়ন করা।

ইউছফ আ. বলেন, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি' এ কথা বলে ঘরে বসে থাকেন নি। বরং তিনি এ কথা বলে সাথে সাথে দৌড় দিয়ে পালাতে এবং ঘর থেকে বের হতে চেষ্টা করেন।

গুনাহের স্থান ত্যাগ করা মানুষকে গুনাহ হতে নাজাত দেয় এবং কু-আসক্তি থেকে হেফাজত করে। আর গুনাহের স্থানে অবস্থান করা মানুষকে গুনাহের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং গুনাহের উৎসাহ প্রধান করে। সুতরাং তোমরা যদি নাজাত পেতে চাও তবে তোমরা গুনাহের স্থান ত্যাগ কর।

চতুর্থত: আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা: মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿قَالَ رَبِّ ٱلسِّجۡنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدۡعُونَنِيٓ إِلَيۡهِۖ وَإِلَّا تَصۡرِفۡ عَنِّي كَيۡدَهُنَّ أَصۡبُ إِلَيۡهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلۡجَٰهِلِينَ ۝٣٣﴾ [سورة يوسف : 33.]

সে (ইউসুফ) বলল , 'হে আমার রব , তারা আমাকে যে কাজের প্রতি আহ্বান করছে তা থেকে কারাগারই আমার নিকট অধিক প্রিয়। আর যদি আপনি আমার থেকে তাদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হব'। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩৩]

পঞ্চমত: ইউসুফ আ. দ্বীনদার ও মুত্তাকী হওয়া:

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُخۡلَصِينَ﴾ [سورة يوسف :24.]

"নিশ্চয় সে আমার খালেস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। " [সূরা ইউসুফ , আয়াত: ২৪]

ষষ্ঠ: কু-প্রবৃত্তি ও খারাপ কামনার উপর দুনিয়ার শাস্তিকে প্রাধান্য দেয়া:

﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجۡنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدۡعُونَنِيٓ إِلَيۡهِۖ ﴾ [يوسف: ٣٣]

“তিনি বলেছিলেন, হে আমার রব! তারা যে দিকে আমাকে আহ্বান করছে তা থেকে জেল আমার কাছে অধিক প্রিয়”। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩৩]

এ ঘটনার মধ্যে বিভিন্ন উপদেশ ও নসিহত রয়েছে যেগুলো একজন মুসলিমের জন্য পালন করা খুবই জরুরি। বিশেষ করে যুবকদের জন্য এ ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করা ও এ ঘটনার শিক্ষণীয় বিষয়গুলো হতে উপকৃত হওয়া অত্যন্ত জরুরী। একজন যুবক যখন এ ঘটনাটি পড়বে তখন যেন শুধু তা জানা ও আবিষ্কার করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে শিক্ষালাভ ও উপকৃত হওয়ার মানসিকতা নিয়ে পাঠ করে।

বিশিষ্ট আবেদ জুরাইজের ঘটনা:

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« كَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ :لَأَفْتِنَنَّ جُرَيْجاً .فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَّمَتْهُ، فَأَبَى، فَأَتَتْ رَاعِيا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَقَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ .فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ فَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى الغُلَامَ فَقَالَ :مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟ قَالَ الرَّاعِي »

“যুরাইয তার স্বীয় গির্জায় সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন ছিল। তখন একজন মহিলা বলল, আমি যুরাইযকে ফিতনায় ফেলব। তারপর সে তার সাথে গিয়ে কথা বলতে চাইলে সে তার সাথে কথা বলতে অস্বীকার করে। তারপর সে একজন রাখালের নিকট গেলে মহিলাটি তাকে তার সাথে অপকর্ম করার সুযোগ দেয়। তারপর মহিলাটি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে বলল, এ জুরাইজের সন্তান। এ কথা শোনে লোকেরা তার উপর চড়াও হল এবং তার গির্জাকে ভেঙে চুরমার করে ফেলল। তারা তাকে তার ইবাদত-গাহ হতে বের করে দিল এবং গালি-গালাজ করল।
নিরুপায় হয়ে জুরাইজ ওযু করল এবং সালাত আদায় করল। তারপর সে বাচ্চাটিকে জিজ্ঞাসা করল তোমার পিতা কে? উত্তরে সে বলল, রাখাল”।

এখানে লক্ষ্য করে দেখ, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জুরাইজের সম্মান ও মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে কিভাবে গোলামটিকে কথা বলার শক্তি দান করেন! কারণ সব ধরনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয়ে সে ঐ মহিলাকে ছেড়ে দেয়।

রবী‘ ইবন খুসাইমের ঘটনা:

রবী ইবন খুসাইমের গোত্রের লোকেরা এক অতি সুন্দরী নারীকে রবীর নিকট গিয়ে নিজেকে পেশ করতে বাধ্য করে; যাতে সে তাকে ফিতনার মধ্যে ফেলে। আর তারা বলল, যদি তুমি এ কাজে সফল হও, আমরা তোমাকে এক হাজার দেরহাম দেব।

এ ঘটনা থেকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখতে পারি, তা হল, মানুষের মধ্য থেকে কতক শয়তান মানুষ আছে, যারা সৎ লোকের সততাকে নষ্ট করার জন্য টাকা পয়সা ব্যয় করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। তাদের উদ্দেশ্য হল, দ্বীনের বিরোধিতা করা এবং ইসলামের দাওয়াতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা।

তাদের প্রস্তাব অনুযায়ী মহিলাটি তার সাধ্যানুযায়ী নতুন ও সুন্দর কাপড় পরিধান করল এবং খুব সাজ -সজ্জা ও সুগন্ধি মাখল । তারপর যখন লোকটি মসজিদ থেকে সালাত আদায় করে বের হল, তখন মহিলাটি তার সামনে এসে দাঁড়াল । রবী‘ তার দিকে তাকাল এবং মহিলার অবস্থাটি তাকে আতঙ্কে ফেলল । তারপর মহিলাটি তার সামনে দিয়ে হাঁটছিল।

রবী‘ তাকে ডেকে বলল, যদি তোমার শরীরে জ্বরা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং তোমার এ সৌন্দর্য ও রূপ বিকৃত করে দেয়া হয়, তখন কেমন হবে?

অথবা এ মুহূর্তে মালাকুল মাওত এসে তোমার প্রাণটি নিয়ে যায়, তাহলে কেমন হবে?

অথবা যদি মুনকার নকীর ফেরেশতা এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তখন তোমার উত্তর কি হবে?

এ সব কথা শোনে সে মহিলাটি একটি বিকট আওয়াজ করল, তারপর বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

তারপর সে তার পুরো জীবনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দেয় | আর যে দিন সে মারা যায় সে একটি অগ্নিদগ্ধ ছাগলের মত হয়ে যায়[47]|

সুরাই ইবন দীনার রহ. এর ঘটনা:

একবার সুরাই ইবন দীনার মিসর শহরে গিয়ে পৌঁছল| তখন এ শহরে একজন নামকরা সুন্দরী মহিলা ছিল। শহরের লোকেরা তার সৌন্দর্য ও রূপের কারণে ফিতনার মুখোমুখি হত এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়ত | বিষয়টি মহিলা জানতে পেরে বলল, আমি সুরাই ইবন দিনারকে ফিতনায় ফেলব। তারপর সে তার সন্ধান করে তার বাড়িতে গেল। তার ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সময় সে তার সৌন্দর্য প্রকাশ করল এবং শরীরের কাপড়-চোপড় খুলে ফেলল। মহিলাটির অবস্থা দেখে তাকে

---

[47] সিফাতুস সাফওয়া ৩/১৯১।

জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি চাও? তখন সে বলল, তোমার মধ্যে আমার প্রতি কোন আগ্রহ আছে কি? তখন সে উত্তরে বলল,

وكم   ذي مَعاصٍ نَالَ مِنْهُنَّ لَذَّةً

وَمَاتَ فَخَلَّاهَا وَذَاقَ الدَّوَاهِيَا

تَصرم لَذاتُ المَعَاصِي وَتَنقَضِي

وَتَبْقَى تِبَاعَاتُ المَعَاصِي كَمَا هِيَا

فَيا سَوْأَتَا والله رَاءٍ وَسَامِعٌ

لِعَبْدٍ بِعَيْنِ الله يَغْشَى المَعَاصِيَا

অনেক অপকর্মকারী নারীদের থেকে কতই না মজা উপভোগ করেছেন। কিন্তু যখন মারা যায় তখন সে তাকে রেখেই যায়। আর কঠিন আযাবে আক্রান্ত হয়। গুণাহের মজা বা স্বাদ অচিরেই শেষ হয়ে যায়। তবে গুণাহের পরিণতি পূর্বের মতই বাকী থাকে। হায় দুঃখ সে বান্দার জন্য! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে দেখে এবং শোনে, কিন্তু সে আল্লাহর সামনেই গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়।[48]

---

[48] যাম্মুল হাওয়া ২৫৩; রাওদাতুল মুহিব্বীন, ৩৩৯।

আবু বকর আল-মিসকি রহ. এর ঘটনা:

আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. বলেন, আবু বকর আল মিসকি রহ. কে জিজ্ঞাসা করা হল, আমরা সব সময় তোমার শরীর থেকে মিশকের সুঘ্রাণ অনুভব করি এর কারণ কি? তখন সে বলল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শপথ করে বলছি, সুদীর্ঘ অনেক বছর পর্যন্ত আমি কোন মিশক ব্যবহার করিনি। কিন্তু এর কারণ হল, একজন নারী আমার সাথে ধোঁকাবাজি করে, আমাকে তার ঘরে নিয়ে যায়। আমাকে তার ঘরে প্রবেশ করিয়ে সে তার ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ করে দেয়। তারপর সে আমাকে তার সাথে অপকর্ম করার জন্য প্রলোভন দেয় । আমি তার অবস্থা দেখে কি করব, তা নিয়ে   ভীষণ চিন্তায় পড়ি। তারপর আল্লাহর অপার অনুগ্রহে আমি মহিলার সব ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেই। আমি তাকে বললাম, আমি একটু বাথরুমে যাব। তারপর সে তার এক বাঁদিকে নির্দেশ দিলে সে আমাকে বাথরুমে নিয়ে গেল। আমি বাথ রুমে প্রবেশ করে, সেখান থেকে কিছু পায়খানা ও ময়লা আবর্জনা নিয়ে আমার পুরো শরীরে মাখাই। তারপর আমি এ অবস্থায় মহিলাটির নিকট ফিরে আসি। আমার অবস্থা দেখে মহিলাটি অবাক হয়ে গেল। তারপর সে আমাকে ঘর থেকে বাহির করে দেয়ার নির্দেশ দিল। আমি সেখান থেকে চলে আসলাম এবং গোসল করে নিলাম।

তারপর ঐ দিন রাতে আমি যখন ঘুমালাম তখন স্বপ্নে দেখতে পেলাম এক লোক আমাকে বলছে, তুমি এমন একটি কাজ করছ, যা তুমি ছাড়া আর কেউ কোন দিন করে নি। আমি তোমার দেহকে মিশকের ঘ্রাণ দ্বারা সুগন্ধযুক্ত করে দেব । দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে তোমার সুঘ্রাণ মানুষ পেতে থাকবে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমার শরীর থেকে মিশকের ঘ্রাণ বের হতে থাকে[49]।

নারীদের কাহিনী:

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার খিলাফতের আমলে মুসলিমদের ঘরে ঘরে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য ঘুরে বেড়াত। তখন সে একজন মহিলাকে বলতে শুনল, সে বলতেছে-

تطاول هذا الليل وَاسْوَدَّ جانبه

وأرقني إذ لا حبيب ألاعبه

فلولا الذي فوق السموات عرشه

لزعزع من هذا السرِيرِ جوانبه

[49] আল-মাওয়ায়েয ওয়াল মাজালিস ২২৪।

“আজকের রাতটি অনেক দীর্ঘ ও গভীর অন্ধকার। আর আমার ঘুম দূর হয়েছে এ কারণে যে, এখানে আমার কোন বন্ধু নাই যার সাথে খেলাধুলা করে রাত যাপন করব। যদি সে সত্তা না থাকত, যার আরশ আসমানের উপর। তাহলে এ খাটের আশপাশ ওলট পালট হয়ে যেত”।

পরদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সকাল বেলা মহিলাটি তার দরবারে ডেকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠালেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করল এ ধরনের কথাগুলো তুমি বলছিলে? তখন সে বলল, হা, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তুমি এ কথাগুলো কেন বললে, তখন সে বলল, আমি আমার স্বামীকে এক যুদ্ধে পাঠাই। তারপর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মহিলারা স্বামী ছাড়া কতদিন ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারে। তখন সে বলল, ছয় মাস। তারপর থেকে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছয় মাস পর সৈন্যদলকে বাড়ীতে ফেরত পাঠাতেন[50]।

[50] মুসান্নাফে আবদির রাযযাক ৭/১৫২; সুনানুল বাইহাকী ৯/২৯।

আসক্তির গহ্বরে পড়ে যারা নিজেদের পতনকে নিশ্চিত করেছে তাদের কিছু ঘটনা

উপরে আমরা কতক ধৈর্যশীলদের কথা উল্লেখ করি, যারা তাদের আসক্তির চাহিদার উপর ধৈর্যধারণ করে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নেয় এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আদর্শ ও অনুকরণীয় হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের বিপরীতে এমন কতক লোক আছে যারা তাদের আসক্তির চাহিদার কাছে হার মানে এবং আল্লাহ আযাব ও গজবের অংশীদার হয়।

আবদুহ ইবন আব্দুর রহীম (আল্লাহ লোকটির দুর্নাম জিইয়ে রাখুন) ২৭৮ হিজরিতে মারা যায়। এ কমবখত লোকটি একজন মুসলিম মুজাহিদ ছিল, মুসলিমদের পক্ষ নিয়ে রোমানদের সাথে একাধিক যুদ্ধে সে অংশ গ্রহণ করে। কোন এক যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যরা রুমের একটি শহরকে ঘেরাও করে ফেললে তখন লোকটি ঐ দুর্গে রোমানদের একজন সুন্দরী মহিলা দেখতে পেল। তাকে দেখে সে তার প্রেমে পড়ল। তার নিকট সে বার্তা পাঠাল যে, তোমার নিকট পৌছার উপায় কি? তখন সে তাকে বলল, তুমি নাসারা বা খৃষ্টান হয়ে যাও আমার নিকট চলে আস।

লোকটি তার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করল এবং মুসলিমদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করল। সে ঐ মহিলার নিকট অবস্থান

করল। এ ঘটনার ফলে মুসলিমরা খুব চিন্তিত হল এবং তারা খুব কষ্ট পেল। অনেক দিন পর মুসলিমরা ঐ দুর্গ দিয়ে অতিক্রম করলে তারা দেখতে পেল লোকটি ঐ মহিলার সাথেই আছে। তখন তারা জিজ্ঞাসা করল, তোমার কুরআনের কি অবস্থা? তোমার ইলমের কি অবস্থা? তোমার সালাতের অবস্থা কি? তোমার জিহাদের কি অবস্থা? এবং তোমার সিয়ামের কি অবস্থা?

তখন সে বলল, আমি সমগ্র কুরআন ভুলে গেছি কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ বাণী ছাড়া: মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۝٢ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝٣﴾ [سورة الحجر: 2-3.]

“যারা কুফরী করেছে , তারা একসময় কামনা করবে যদি তারা মুসলমান হত! তাদেরকে ছেড়ে দাও, আহারে ও ভোগে তারা মত্ত থাকুক এবং আশা তাদেরকে গাফেল করে রাখুক , আর অচিরেই তারা জানতে পারবে।” [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ২-৩][51]

[51] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১১/৭৪।

- বর্ণিত আছে মিসরের একজন লোক সে মসজিদে পাঁচওয়াক্ত সালাতের আযান দিত এবং সব সময় মসজিদে অবস্থান করত। সে সর্বদা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশের আনুগত্য করত এবং তার চেহারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদতের কারণে নুরের আলোতে ছিল পরিপূর্ণ। একদিন সে তার রুটিন মোতাবেক আযান দেয়ার জন্য মিনারে উঠল। মিনারের নিচে খৃস্টানদের একটি বাড়ি ছিল। লোকটি বাড়িটির দিকে তাকিয়ে বাড়ি ওয়ালার একজন মেয়েকে দেখতে পেল। তাকে দেখে লোকটির মনে তার প্রতি ভালোবাসা জন্মিল। তারপর সে আযান না দিয়ে মিনার থেকে নেমে তার ঘরে প্রবেশ করল। তাকে দেখে মেয়েটি বলল, তোমার কি হয়েছে? তুমি কি চাও? সে বলল, আমি তোমাকে চাই! সে বলল, কেন? বলল, তুমি আমার ভালোবাসা কেড়ে নিলে এবং আমার অন্তর ভালোবাসার আগুন জালিয়ে দিলে। মেয়েটি বলল, আমি কখনোই তোমার আহ্বানে সাড়া দিব না। সে বলল, আমি তোমাকে বিবাহ করব। মেয়েটি বলল, তুমি একজন মুসলিম আর আমি খৃষ্টান। আমার পিতা আমাকে তোমার নিকট বিবাহ দেবে না। তখন সে বলল, আমি তাহলে খৃষ্টান হয়ে যাব। সে বলল, যদি তুমি তা কর তবে আমি তোমার সাথে বিবাহ করতে রাজি আছি। তারপর লোকটি ঐ মেয়েকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে খৃস্টান হয়ে গেল এবং তাদের সাথে তাদের ঘরেই অবস্থান করল। পরদিন লোকটি ঐ বাড়ির ছাদের উপর উঠলে ছা দ থেকে পড়ে

মারা গেল। তারপর সে ঐ মেয়েকেও পেল না, আর নিজের দ্বীনকেও বরবাদ করল[52]।

আমরা আল্লাহ রাব্বুল নিকট তাঁর দ্বীনের উপর অবিচল থাকা কামনা করি।

[52] আল-জাওয়াবুল কাফী: ১১৮।

পরিশিষ্ট

কু-আসক্তি বিষয়ে যে আলোচনা তুলে ধরা হল, তাতে শুধু যুবক-যুবতী কিংবা খারাপ প্রকৃতির লোকেরা আক্রান্ত হয় তা ঠিক নয়। বরং অনেক সময় দেখা যায়, যারা ভালো ও সৎলোক বলে পরিচিত এবং যারা উন্নত ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করে তারাও আসক্তির বেড়াজালে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এছাড়াও যারা মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দিকে আহ্বান করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দ্বীনের সত্যিকার ইলম অর্জনে সর্বদা নিয়োজিত থাকে, মানুষকে দীনি ইলম ও শরীয়তের মাসলা-মাসায়েল শিক্ষা দেয়, জন কল্যাণমুলক কাজের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে এবং তারা মানুষকে কু-আসক্তি হতে দূরে থাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের ওয়াজ নছিহত করে থাকে, তারাও দেখা যায় তাদের নফস বা কু-আসক্তির ধোঁকায় পড়ে যায়। বরং অনেক সময় দেখা যায় তাদের কু-আসক্তি ও নফসের চাহিদা অন্য খারাপ লোকদের তুলনায় আরও বেশি মারাত্মক আকার ধারণ করে। কিন্তু তারা তাদের কু-আসক্তি ও নফসের চাহিদাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয়ে এবং আখিরাতের বিনিময় ও ছাওয়াব লাভের আশায় নিয়ন্ত্রণ করে এবং দমিয়ে রাখে।

সুতরাং এ দুনিয়ার অবস্থার প্রতি সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে চিন্তা করলে, একজন ব্যক্তি এর কল্যাণ গ্রহণ করতে পারবে এবং দুনিয়ার অকল্যাণ হতে মুক্ত থাকতে পারবে। পক্ষান্তরে যে এর খারাপ পরিণতি দেখতে পাবে না ও এ সম্পর্কে সাবধান হবে না, তার উপর তার ইন্দ্রিয় প্রাধান্য পাবে, ফলে তা তার জন্য কষ্টের কারণ হবে এবং তাকে অজস্র জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমাদের পরম চাওয়া হল, তিনি যেন আমাদেরকে হারাম হতে বিরত রাখেন এবং আমাদের মাঝে ও হারামের মাঝে নির্মাণ করেন বরযখ বা পর্দা, সুদৃঢ় প্রাচীর ও মজবুত প্রতিবন্ধক। আর আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা যখন কোন ভুল বা অপরাধ করে, সাথে সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর যখন তারা কোন ভালো কাজ করেন, তখন তারা খুশী হন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট আমাদের আরও প্রার্থনা হল, তিনি যেন আমাদের আসক্তিকে তিনি যা পছন্দ করেন এবং যে সব কাজে সন্তুষ্ট হন সে কাজে ব্যবহার করতে পারি, সে তাওফীক দেন। আমীন

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জেদ

অনুশীলনী

তোমার সামনে দুই স্তরের প্রশ্ন পেশ করা হল | এক ধরনের প্রশ্ন যেগুলোর উত্তর তুমি সাথে সাথে দিতে পারবে। আর এক ধরনের উত্তর তুমি সাথে সাথে দিতে পারবে না, বরং তোমাকে একটু চিন্তাভাবনা করে উত্তর দিতে হবে।

প্রথম স্তরের প্রশ্ন:

১. আসক্তি দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে?

২ নিষিদ্ধ আসক্তির প্রতি মানুষকে ধাবিত করার তিনটি কারণ উল্লেখ কর।

৩. চক্ষুকে অবনত করার অনেক উপকার আছে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আলোচনা কর।

৪. নিষিদ্ধ আসক্তির চিকিৎসা কি?

দ্বিতীয় ধরনের প্রশ্ন:

আসক্তিকে কেন সৃষ্টি করেছেন?

যখন তোমরা কু-আসক্তি ও নিষিদ্ধ বিষয়ের মুখোমুখি হও তখন তোমাদের করণীয় কি?

কেন চোখের হেফাজতকে লজ্জা-স্থানের হেফাজতের পূর্বে উল্লেখ করা হল?

আজিজে মিসরের স্ত্রীর সাথে সংঘটিত ইউসূফ আ. এর ঘটনা থেকে আমরা কি শিখতে পারি?

সূচীপত্র

অন্তর বিধ্বংসী বিষয়: প্রবৃত্তির অনুসরণ

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

মুহাম্মাদ সালেহ্ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ : জাকের উল্লাহ্ আবুল খায়ের

সম্পাদনা : মো: আবদুল কাদের

2011 - 1433

IslamHouse.com

﴿ مفسدات القلوب: اتباع الهوى ﴾

« باللغة البنغالية »

محمد صالح المنجد

ترجمة: ذاكر الله أبو الخير

مراجعة: محمد عبد القادر

2011 - 1433

IslamHouse.com

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক। আর সালাত ও সালাম নাযিল হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর, যিনি সমস্ত নবীগণের সেরা ও সর্বশ্রেষ্ঠ। আরও সালাত ও সালাম নাযিল হোক তার পরিবার, পরিজন ও সাথী-সঙ্গীদের উপর।

অবশ্যই মনে রাখতে হবে, প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে যাবতীয় কল্যাণ হতে বিরত রাখে এবং মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে খর্ব করে। প্রবৃত্তির অনুসরণ দ্বারা মানুষ থেকে দুশ্চরিত্র গুলোই বের হয়ে আসে এবং অশ্লীল ও নোংরা কর্ম প্রকাশ পায়। প্রবৃত্তি মানবতাকে দুর্বল করে এবং অন্যায় অপকর্মের পথকে উন্মুক্ত করে।

প্রবৃত্তি হল ফিতনার বাহক, আর দুনিয়া হল মানুষের পরীক্ষাগার। প্রবৃত্তি থেকে দূরে থাক, তবেই তুমি নিরাপদ থাকবে এবং দুনিয়া হতে বিরত থাক, তাহলে তুমি লাভবান হবে। দুনিয়ার খেল-তামাশার ঘ্রাণ তোমাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে এবং ফিতনায় না জড়ায়। মনে রাখবে দুনিয়ার খেল তামাশা অচিরেই শেষ হয়ে যাবে এবং যুগের ভোগ-বিলাস শীঘ্রই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তুমি

যেসব অপকর্ম, অন্যায় ও নিষিদ্ধ কাজ কর, তা তোমার বিপক্ষে একাট্টা থাকবে এবং তোমার উপার্জিত গুনাহগুলো তোমার বিরোধিতা করার জন্য অবশিষ্ট থাকবে।

প্রবৃত্তির অনুসরণ করা, মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা একজন মানুষের উপর ফরজ এবং তাকে প্রতিহত করা একজন মানুষের সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আবু হাযেম রহ. বলেন, তুমি তোমার দুশমনের সাথে যেভাবে যুদ্ধ কর, তার চেয়ে আরও বেশি যুদ্ধ কর তোমার প্রবৃত্তির সাথে।[1]

প্রবৃত্তি হল, সমস্ত ফিতনার মুল এবং যাবতীয় সব ধরনের মুসিবতের কারণ। সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, হে মানবাত্মা তুমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাওবা কর! কারণ, মৃত্যু তোমার নিকট এসে গেছে। আর প্রবৃত্তির বিরোধিতা কর, কারণ, প্রবৃত্তি সব সময় তোমাকে ফিতনা-ফাসাদের দিকে নিয়ে যাবে। যেহেতু প্রবৃত্তির অবস্থা এত মারাত্মক ও ক্ষতিকর, তাই এ নিয়ে আলোচনা করা এবং মানুষকে এ ধরনের কঠিন ও মারাত্মক রোগ হতে বাঁচানোর চেষ্টা করা আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব।

এ কিতাবে আমরা প্রবৃত্তির সংজ্ঞা, প্রবৃত্তি অনুসরনের ক্ষতি, বিরোধিতা করার গুরুত্ব, উপকার, অনুসরণ করার কারণ, প্রবৃত্তির

---

[1] হুলিয়্যাতুল আওলিয়াহ ২৩১/৩

চিকিৎসা ও খারাব প্রবৃত্তি এবং প্রশংসনীয় প্রবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনা করব।

যারা এ কিতাবটি তৈরি করতে এবং কিতাবের বিষয়গুলোকে একত্র করতে আমাদের সহযোগিতা করেছেন, আমরা তাদের সবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও যাবতীয় কল্যাণ কামনা করছি এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করি, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন তাদেরকে আরও বেশি বেশি করে ভাল কাজ করার তাওফিক দেন। আমীন!

হে আল্লাহ! তুমি হালাল দান করে আমাদের হারাম থেকে বিমুখ কর, আর তোমার আনুগত্য দ্বারা তোমার অবাধ্যতা থেকে আমাদের হেফাজত কর। আর তোমার অনুগ্রহ দ্বারা আমাদেরকে গাইরুল্লাহ থেকে হেফাজত কর।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

—মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জেদ

প্রবৃত্তির সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থ: هَوِيَه শব্দটি মাছদার। যখন কোন বস্তুকে মহব্বত বা পছন্দ করে তখন এ কথা বলে[2]।

পারিভাষিক অর্থ: শরিয়তের অনুমোদন নেই এমন কোন বস্তুকে প্রবৃত্তি পছন্দ করে, তার প্রতি নফসের ঝুকে পড়াকে প্রবৃত্তি বলা হয়[3]।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যুম রহ. বলেন, প্রবৃত্তি হল, মানব স্বভাব তার জন্য যা প্রয়োজন ও উপযোগী তার প্রতি ঝুঁকে পড়া। মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে এ ধরনের-নফসের চাহিদা ও প্রবৃত্তি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। অন্যথায় যদি মানুষের মধ্যে খাওয়া, পান করা ও বিবাহের চাহিদা না থাকত, তাহলে তারা খাদ্য পানীয় গ্রহণ করত না এবং বিবাহ-সাদি করত না। তখন দুনিয়ার জীবনের প্রতি তাদের কোন আগ্রহ থাকত না। প্রবৃত্তিই মানুষের জন্য চাহিদাকে জাগিয়ে তুলে। রাগ বা ক্ষোভ যেভাবে একজন মানুষ থেকে কষ্টদায়ক বস্তুগুলো

---

[2] আল-মাগরিব

[3] আল্লামা জুরযানীর তারিফাত:৩২০।

প্রতিহত করে, অনুরূপভাবে নফস বা মানবাত্মা যা চায় তা পূরণ করার জন্য মানুষের প্রবৃত্তি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে[4]।

[4] রাওজাতুল মুহিব্বি-ন: ৪৬৯।

প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে নিষেধ করা বিষয়ে আলোচনা

নফস বা প্রবৃত্তি দিয়ে মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তি রয়েছে, যা একজন মানুষকে দুনিয়াতে বেঁচে থাকার আগ্রহকে জাগিয়ে তুলে এবং বেঁচে থাকার সার্থকতা ও অবলম্বনকে সার্থক করে তুলে। এমনকি প্রবৃত্তি বা নফস ছাড়া একজন মানুষ দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে পারে না। সুতরাং, বলা বাহুল্য যে, মানুষের মধ্যে এ ধরনের চাহিদা ও প্রবৃত্তি থাকা কোন অপরাধ বা দোষের কিছু নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মানুষের দায়িত্ব হল, প্রবৃত্তি বা নফসের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করা, তার প্রবৃত্তি যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ বা নিষেধের অবাধ্য না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে বিরত থাকা। কুরআন ও হাদিসের অসংখ্য প্রমাণাদি রয়েছে, যাতে ইসলাম প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে মানবজাতিকে নিষেধ করেছে।

কখনো সময় প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে নিষেধ করার সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায়:

যেমন, আল্লাহ রাব্বূল আলামীন বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥ ﴾

[سورة النساء:١٣٥ .]

হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে। যদিও তা তোমাদের নিজদের কিংবা পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়। যদি সে বিত্তশালী হয় কিংবা দরিদ্র, তবে আল্লাহ উভয়ের ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে- পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা এড়িয়ে যাও তবে আল্লাহ তোমরা যা কর সে বিষয়ে সম্যক অবগত। [সূরা নিসা, আয়াত: ১৩৫] আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও বলেন,

﴿ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ٢٦ ﴾ [سورة ص : ٢٦.]

(হে দাঊদ), নিশ্চয় আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি, অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য কঠিন

আযাব রয়েছে। কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল। [সূরা সাদ, আয়াত: ২৬]

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তোমরা মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা কর। প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ করা হতে বিরত থেকো না। যারা ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা হতে বিরত থাকে তারা আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং গোমরাহ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যারা গোমরাহ হবে তাদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কঠিন শাস্তি দেবেন। তাদের শাস্তি দেয়ার কারণ হিসেবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, তারা আখেরাত সম্পর্কে ভূলে গিয়েছিল, তাই তাদের শাস্তি অবধারিত হয়েছে।

আবার কখনো সময় কুরআন ও হাদিসে কাফের মুশরিক ও পথভ্রষ্টদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হতে নিষেধ করার প্রমাণ পাওয়া যায়:

যেমান-আল্লাহ রাব্বূল আলামীন বলেন,

﴿ قُلۡ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشۡهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَاۖ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشۡهَدۡ مَعَهُمۡۚ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ ١٥٠ ﴾ [الأنعام : ١٥٠.]

বল, তোমাদের সাক্ষীদেরকে নিয়ে আস, যারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ এটি হারাম করেছেন। অতএব যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিয়ো না। আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না এবং যারা তাদের রবের সমকক্ষ নির্ধারণ করে। [সূরা আনআম, আয়াত: ১৫০]

আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় নবীকে ঐ সব লোকদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছেন এবং আখেরাতের দিবস ও হিসাবের দিনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আল্লাহ রাব্বূল আলামীন তার স্বীয় নবীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, আপনি কাফেরদের বলুন-

﴿ قُلۡ إِنِّي نُهِيتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِۚ قُل لَّآ أَتَّبِعُ أَهۡوَآءَكُمۡ قَدۡ ضَلَلۡتُ إِذٗا وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُهۡتَدِينَ ٥٦ ﴾ [الأنعام: ١٥٠.]

বল, ‘নিশ্চয় আমাকে নিষেধ করা হয়েছে তাদের উপাসনা করতে, যাদেরকে তোমরা ডাক আল্লাহ ছাড়া। বল, ‘আমি তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করি না, (যদি করি) নিশ্চয় তখন পথভ্রষ্ট হব এবং আমি হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হব না। [সূরা আনআম, আয়াত: ৫৬]

আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার নবীকে নির্দেশ দেন যে, হে রাসূল! আপনি তাদের জানিয়ে দেন যে, যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা করে আপনাকে তাদের উপাসনা করতে নিষেধ করেছেন। আর আপনি তাদের আরো বলে দিন, আমি তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবো না, আর আমি যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধানকে বাদ দিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করি তবে আমি ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবো। তারপর আল্লাহ রাব্বূল আলামীন তার নবীকে নির্দেশ দিয়ে আরও বলেন,

﴿فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ﴾
[سورة المائدة : ٤٨.]

সুতরাং, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তুমি তার মাধ্যমে ফয়সালা কর এবং তোমার নিকট যে সত্য এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। [সূরা মায়দো, আয়াত: ৪৮]

অর্থাৎ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে তোমাকে যে সত্য ও হক বিধান দেয়া হয়েছে, তুমি তাই পালন করবে। আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী তুমি তাদের মাঝে বিচার ফায়সালা করবে। তোমার মনগড়া বা তাদের প্রবৃত্তি ও চাহিদা অনুযায়ী তাদের মাঝে বিচার ফায়সালা করবে না। হক ও সত্য বিধানকে বাদ দিয়ে বিচার ফায়সালা করতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার নবীকে নিষেধ করেন। অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার নবীকে

নির্দেশ দিয়ে বলেন, এর জন্য তুমি মানুষকে দাওয়াত দিতে থাক, আর আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তুমি সত্যের উপর অটল ও অবিচল থাক। যেমন-আল্লাহ রাব্বূল আলামীন আরও বলেন,

﴿ فَلِذَٰلِكَ فَٱدۡعُۖ وَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡۖ ﴾ [سورة شورى : ١٥ .]

এ কারণে তুমি আহবান কর এবং দৃঢ় থাক যেমন তুমি আদিষ্ট হয়েছ। আর তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না [সূরা শুরা, আয়াত: ১৫] আল্লাহ রাব্বূল আলামীন আরও বলেন,

﴿وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥۖ وَلَا تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَا تُطِعۡ مَنۡ أَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذِكۡرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمۡرُهُۥ فُرُطٗا ٢٨﴾ [سورة كهف : ١٥٠.]

আর তুমি নিজকে ধৈর্যশীল রাখ তাদের সাথে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশে এবং দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে। তোমার দু'চোখ যেন তাদের থেকে ঘুরে না যায়। আর ওই ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার যিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে। [সূরা কাহাফ, আয়াত: ২৮]

আয়াতগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার নবীকে ধৈর্য্যের নির্দেশ দেন এবং তাদের সাথে থাকার নির্দেশ দেন যারা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর যিকির করেন। আর যারা আল্লাহর যিকির হতে গাফেল এবং তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাদের অনুসরণ করা হতে নিষেধ করেন। উল্লেখিত আয়াতগুলোতে বিশেষ একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, আল্লাহ রাব্বূল আলামীন প্রবৃত্তিকে কাফের মুশরিক ও গোমরাহ লোকদের দিকে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হল মানুষ মানেই তাদের মধ্যে প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে, এমন নয় যে যারা ঈমানদার তাদের কোন প্রবৃত্তি বা নফস নাই। কারণ, তাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে সত্যের অনুকরণ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা থেকে বিরত রাখে। অপরদিকে মুমিনরা সম্পূর্ণ তাদের বিপরীত; তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনা হতে বিরত থাকে না। কারণ, কাফেরদের প্রবৃত্তি ও চাহিদা সবই হল বাতিল এবং গোমরাহ। আর মুমিন যাদের ঈমান মজবুত তাদের প্রবৃত্তি সবসময় আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের আদেশের এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিধান নিয়ে দুনিয়াতে আগমন করেছেন, তার আদর্শ বা সুন্নতের মোতাবেক। তাদের প্রবৃত্তি যখন কোন বস্তুর দিকে ঝুঁকে তখন তা অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত বা তার নির্দেশের অনুগত হবে। আর যদি তা না হয়, কম পক্ষে তা হবে মুবাহ বা বৈধ। মুমিনদের প্রবৃত্তির চাহিদা শরিয়তের পরিপন্থী হবে না। মুমিনদের উদ্দেশ্যই

হল, আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন। দুনিয়াতে এটাই হল, তাদের বড় চাওয়া পাওয়া। তারা এর বাহিরে কোন কিছু চিন্তা করে না। তাই তারা সর্বদা সত্যের অনুসন্ধান করতে থাকে এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় স্বচেষ্ট থাকে।

তারপর অপর আয়াতে আল্লাহ রাব্বূল আলামীন বলেন, যারা তাদের রবের পক্ষ থেকে সু-স্পষ্ট দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত তারা কখনোই তাদের মত হতে পারে না যাদের আমল মন্দ ও খারাপ। আর যারা তাদের খেয়াল খুশি মতে চলে এবং যখন যা ইচ্ছা তা করে তারা কখনোই তাদের মত হতে পারবে না যারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং আল্লাহর পক্ষ হতে যে সত্য ও সঠিক বিধান দেয়া হয়েছে তার অনুসরণ করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهۡوَآءَهُم ١٤﴾ [سورة محمد : ١٤.]

"যে ব্যক্তি তার রবের পক্ষ থেকে আগত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কি তার মত, যার মন্দ আমল তার জন্য চাকচিক্যময় করে দেয়া হয়েছে এবং যারা তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে?" [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ১৪]

আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল।

প্রবৃত্তির অনুসরণ করার কুফল:

আবার কখনো নফস যা মানুষকে খারাপ কাজের নির্দেশ দেয়, তার দুর্নাম সম্বোলিত বিভিন্ন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন-

আবী ইয়ালা সাদ্দাদ ইব্ন আউস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«العَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا »

"অক্ষম সে ব্যক্তি যে তার নফসকে তার প্রবৃত্তির অনুসারী বানায়"[5]।

এ হাদিসে যে ব্যক্তি নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তাকে অক্ষম বলা হয়েছে। বাস্তবে সে যতই শক্তিশালী হোক না কেন, সে যখন তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না তার চেয়ে দূর্বল ব্যক্তি দুনিয়াতে আর কেউ হতেই পারে না। হাদিসে নফসকে দোষারোপ করা হয়েছে।

আবার কখনো সময় অন্তরের দিকে নিসবত করে প্রবৃত্তির নিন্দা করে বিভিন্ন প্রমাণাদি আবর্তিত:

---

[5] ইবনে মাযাহ: ৪২৬০ হাকেম হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

যেমন- হুযাইফা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

« تُعْرَضُ الفِتَنَ عَلَى القُلُوبِ كَالحَصِيرِ عُوداً عُوداً، فَأَيِّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكتِ فيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتىَّ تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ :عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلَا تَضرُّهُ فِتنْةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ، وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادّاً كَالكُوزِ مُجَخِّياً، لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفاً وَلَا يُنْكرُ مُنكْراً إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَا هَ »

মানবাত্মার উপর বিভিন্ন ধরনের ফিতনা-ফাসাদ এমনভাবে গেঁথে দেয়া হবে, যেমনভাবে চাটাইতে একটির পর একটি করে পাতা গেঁথে দেয়া হয়। কোন অন্তরে যখন ফিতনা অনুপ্রবেশ করে, তখন তার অন্তরের মধ্যে কালো একটি দাগ পড়ে যায়। আর যখন কোন অন্তর ফিতনাকে গ্রহণ না করে, তখন তার অন্তরে একটি সাদা দাগ দেয়া হয়। সর্বশেষ মানবাত্মা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক- ধবধবে সাদা অন্তর, যা ধবধবে সাদা পাথরের মত। যতদিন পর্যন্ত আসমান যমীন স্বীয় স্থানে বহাল থাকবে কোন প্রকার ফিতনা-ফাসাদ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এখানে প্রবৃত্তিকে অন্তরের দিক নিসবত করা হয়েছে[6]।

[6] মুসলিম: ১৪৪

অর্থাৎ এ হাদিসে মানুষের খারাপ আমল ও ভালো আমলের চালক হিসেবে অন্তরকে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মানুষের ভালো বা খারাপ আমলের উদ্রেক প্রথমে অন্তরেই হয়ে থাকে। যখন একজন মানুষ তার অন্তরে ভালো কাজকে স্থান দেবে তখন সে হবে সফল। আর যখন মানুষ তার অন্তরে খারাপ বা মন্দ আমলকে স্থান দেবে তখন সে হবে অক্ষম বা দূর্বল।

কখন প্রবৃত্তির কারণে মানবজাতিকে শাস্তি দেয়া হয়?

প্রবৃত্তি ও নফস মানবজাতির জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়। মানবজাতি কখনোই এর বাহিরে থাকতে পারে না এবং সে তার প্রবৃত্তি মুক্ত হতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে নফস দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। মানুষ মানেই তার মধ্যে প্রবৃত্তি থাকবে, নফস থাকবে এবং চাহিদা থাকবে। এটি মানবজাতির জন্য কোন দোষণীয় বিষয় নয়। মানবজাতিকে শুধু তার নফস বা প্রবৃত্তির উপর কখনোই শাস্তি দেয়া হবে না। মানুষ যখন কোন কিছু চায় বা পছন্দ করে তা তার জন্য কোন অপরাধ নয় যে, তাকে এ কারণে তার উপর শাস্তি দিতে হবে। তবে কখন মানুষকে তার প্রবৃত্তির কারণে শাস্তি দেয়া হবে ?! এটি একটি যুগান্তকারী প্রশ্ন।

এছাড়াও আরেকটি প্রশ্ন হল, একজন মানুষ তার অন্তর বা আত্মা থেকে প্রবৃত্তি বা নফসের চাহিদাকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে বের করে দিতে বা তা ফেলে দিতে নির্দেশিত কিনা? নাকি তার জন্য কিছু নিয়ম বা কায়দা-কানুন আছে?

এগুলো সবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং সমাধানের বিষয়। যুগে যুগে মানুষের মাঝে এ ধরনের প্রশ্ন বিভিন্নভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং বার বার তা মানুষের সামনে উঠে আসছে। ইসলামের বড় বড় মনীষীরাও যুগ যুগ ধরে এ সব প্রশ্নের যথার্থ সমাধান দিয়েছেন।

আল্লামা ইব্ন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, মানবজাতিকে শুধু তার নফস বা প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করে কখনোই শাস্তি দেয়া হবে না, তাকে শাস্তি দেয়া হবে, প্রবৃত্তি ও নফসের অনুকরণ ও অনুসরণ করার উপর। যখন মানবাত্মা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু সে তা না করে মানবাত্মাকে তা থেকে বিরত রাখে, তাহলে তাকে কোন প্রকার শাস্তি পেতে হবে না, বরং তার জন্য এ বিরত থাকা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত ও ইসলামী শরীয়তের নেক আমল বলে পরিগণিত হবে[7]।

এ হল একজন সত্যিকার মুসলিমের অবস্থা। সর্বদা তার নফস তাকে বিভিন্ন খারাপ ও মন্দ কাজের নির্দেশ দিতে থাকে। আর সে তার নফসের সাথে যুদ্ধ করতে থাকে এবং নফসের নির্দেশ অমান্য ও বিরোধিতা করে আল্লাহকে ভয় করতে থাকে, যার মধ্যে এ ধরনের গুণ পাওয়া যাবে সে ব্যক্তিই হল সত্যিকার ঈমানদার ও প্রকৃত মুমিন। আর এ ধরনের ঈমানদারের জন্য রয়েছে জান্নাত ও উত্তম প্রতিদান।

আল্লাহ রাব্বূল আলামীন বলেন,

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۝٤٠ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ۝٤١ ﴾ [سورة النازعات : ٤٠-٤١.]

---

[7] মাজমুয়ায়ে ফাতওয়া ৬৩৫/১০

“আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল”। [সূরা নাজেয়াত, আয়াত: ৪০-৪১]

আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুটি জিনিষকে স্পষ্ট করেন, এক-যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করে তার প্রবৃত্তির অবস্থান অনুযায়ী। শুধু ভয় করা যথেষ্ট নয়, বরং আল্লাহকে ভয় করতে হবে তার শান ও অবস্থান হিসেবে। দ্বিতীয়ত- এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে আর তা হল প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানো হতে তাকে বিরত থাকতে হবে; মনে যা চায় তা করা হতে বিরত থাকতে হবে। নিজের নফস বা নফসের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হতে হবে। তখন তার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঘোষণা হল জান্নাতই হবে তার আবাসস্থল।

মোট কথা, প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী আমল করা ব্যতীত কাউকে কোন প্রকার শাস্তি দেয়া হবে না। কোন মানুষ যখন কোন গুনাহ করার ইচ্ছা করে বা তার গুনাহ করতে মনে চায়, শুধুমাত্র এর উপর তাকে কোন শাস্তি দেয়া হবে না। তবে যদি লোকটি তার ইচ্ছা ও আকাঙ্খা অনুযায়ী আমল করে, তখন তাকে তার আমল ও প্রবৃত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى، مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ؛ فَالعَيْنَانِ زِنَاهمَا النَّظَرُ،وَالأُذُنَانِ زِنَاهمَا الاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الكَلَامُ، وَاليَدُ زِنَاهَا البَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الخُطَا، وَالقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ »

"আদম সন্তানদের জন্য ব্যভিচারের একটি অংশ অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সে তার জীবদ্দশায় তা অবশ্যই অর্জন করবে। তার চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার হল, খারাপ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি, কর্ণদ্বয়ে ব্যভিচার হল, কোন খারাপ বা অশ্লীল কথার শ্রবণ, মুখের ব্যভিচার হল, শরীয়তের পরিপন্থী কথা, হাতের ব্যভিচার হল, নিষিদ্ধ কোন বস্তুকে স্পর্শ করা আর পায়ের ব্যভিচার হল কোন নিষিদ্ধ কাজের প্রতি অগ্রসর হওয়া। অন্তর আশা করে এবং ধাবিত হয়, লজ্জাস্থান তা সত্যে পরিণত করে অথবা মিথ্যায় পরিণত করে[8]।

হাদিস দ্বারা একটি কথা প্রমাণ হয়, মানুষের অন্তরে যখন কোন খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজের উদ্রেক হয়, তার জন্য তাকে কোন প্রকার শাস্তি পেতে হবে না এবং তাকে তার জন্য ভালো বা খারাপ বলে মন্তব্য করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার অন্তরের কাজটিকে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা বাস্তবায়ন না করে। তার হাত পা মুখ যখন তার অন্তরের কোন কাজকে বাস্তবায়ন করবে তখন তার উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান চালু হবে।

---

[8] মুসলিম [২৬৫৭]

প্রবৃত্তির অনুসরণ করার কারণসমূহ

প্রবৃত্তির অনুসরণ করার কারণসমূহ জানা থাকা অতীব জরুরি। যে কোন কিছুর কারণ জানা থাকলে তা করা না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের সহজ হয়। কারণ, যখন কোন কিছুর কারণ অস্বচ্ছ বা অসৎ হয় তার পরিণতিও হবে খারাপ ও অস্বচ্ছ। আর যখন কারণ ভালো ও স্বচ্ছ হবে তখন তার ফলাফল হবে মধুর ও আনন্দদায়ক।

যে সব কারণসমূহ মানুষকে প্রবৃত্তির অনুসরণের দিকে ডাকে সেগুলো অনেক। কেন মানুষ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তারা কেন সত্য ও সঠিক পথের অনুসরণ থেকে বিরত থাকে? তা নিম্নে আলোচনা করা হল। মনে রাখতে হবে, প্রবৃত্তির অনুসরনের অনেকগুলো কারণ আছে।

প্রথমত: বাল্যকাল থেকে প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণের উপর অভ্যস্ত না হওয়া:

অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চারা মাতা-পিতার অধিক আদর-স্নেহে মানুষ হয় এবং বড় হতে থাকে। তারা যখন যা চায় মাতা-পিতা তাদের তাই দিয়ে থাকে এবং তাদের যে কোন চাহিদা পূরণ করে তাদের খুশি রাখতে চেষ্টা করে। কোনটি হারাম আর কোন হালাল তার মধ্যে কোন প্রকার তারতম্য করে না। ছেলে মেয়ে যখন

ফজরের সালাতের সময় ঘুমায়, তখন মাতা-পিতা তাকে ঘুম থেকে জাগায় না, তারা বলে তাদের উপর এখনো সালাত ফরজ হয়নি। আর যখন সে কোন খেলা-ধুলা করতে চায়, মাতা-পিতা তাকে সুযোগ দেয়। তাকে বিরত রাখতে কোন প্রকার চেষ্টা তারা করে না। এমনকি তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঘরের মধ্যে তাদের জন্য গান-বাজনা, সিনেমা, নাটক ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেয়। অনেক সময় দেখা যায় ছেলের জন্য আলাদা ড্রাইভার এবং মেয়ের জন্য আলাদা রুম ইত্যাদি উচ্চ বিলাস ও বিলাসবহুল জীবন ব্যবস্থা তাদের জন্য করে দেয়া হয়। তাদের মতের বিরুদ্ধে কোন কিছুই করা হয় না, তারা যখন যা চায় তাই করে এবং তাদের খুশি রাখতে মাতা-পিতা উভয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। টাকা-পয়সা যখন যা লাগে তাদের তা দিয়ে দেয় তারা যা চায় তাই তাদের মাতা-পিতা থেকে তা পায়। ফলে তারা তাদের ইচ্ছা মত যেখানে মনে চায় সেখানে যেতে পারে যা ইচ্ছা তা করতে পারে। এভাবে চলতে চলতে একটা সময় এমন আসে, ছেলে মেয়েরা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণে অভ্যস্ত হয়ে গড়ে উঠে। কোন কিছু চাওয়া মাত্রই সে তা পায় এবং যখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তখন সে কারো কথা শোনে না। মাতা-পিতার কথাও তার কাছে আর ভালো লাগে না। কোন উপদেশকারীর উপদেশ তার কাছে তিক্ত মনে হয়। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলতে পারে না। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা বললে, সে তাকে তার শত্রু মনে করে। সে যা করতে চায় তা থেকে কেউ তাকে বিরত রাখতে পারে না এবং বাধা দিতে পারে না।

এরপর যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন তার চাহিদাও আকাশচুম্বী হয়। তার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো তার প্রবৃত্তির পিছনে দৌঁড়তে থাকে। বিশেষ করে যখন ছেলে মেয়েরা তাদের বাল্যকাল অতিক্রম করে কৈশোরে পৌঁছে। তখন তাদের প্রবৃত্তি পাগলা হাতির মত লাফালাফি করতে থাকে। তখন তারা বড় বড় অন্যায়, অপকর্ম ও অপরাধ করতে কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ করে না। তাদের এ ধরনের অপকর্ম ও অপরাধ করা থেকে বিরত রাখার কোন উপায় থাকে না। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছাহাবীরা ছোট বেলা থেকেই তাদের বাচ্চাদের সু-শিক্ষা দিতেন এবং তাদের চাহিদাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। তারা তাদের বাচ্চাদের রোজা, নামায, হজ ইত্যাদি শরিয়তের বিধান পালনে ছোট বেলা থেকেই অভ্যাস করাতেন। যার ফলে তাদের সন্তানেরাও তাদের মতই বিখ্যাত ও বড় বড় জ্ঞানী।

রবি বিনতে মুয়াওয়াজ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أرسل النبي غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: « **مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِراً فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِماً فَلْيَصُمْ** » قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার দিন দুপুর বেলায় একটি জামাতকে আনসারীদের এলাকায় প্রেরণ করেন। তারা সেখানে গিয়ে তাদের এ কথার দাওয়াত দেয় যে, যে ব্যক্তি রোজা না রেখে সকাল উদযাপন করল, সে যেন বাকি সময়টুকু কোন কিছু না খেয়ে দিন অতিবাহিত করে, আর যে ব্যক্তি রোজা রাখা অবস্থায় সকাল করল, সে যেন রোজা রাখে। তার কথা শোনে একজন মহিলা বলল, তারপর থেকে আমরা আশুরার দিন রোজা রাখতাম এবং আমাদের বাচ্চাদের রোজার নির্দেশ দিতাম। আমরা আমাদের বাচ্চাদের জন্য গাছের ডাল দিয়ে খেলা-ধুলার সামগ্রী বানাতাম। তারা যদি ক্ষুধার কারণে কান্না-কাটি করত, তাদের এসব খেলা-ধুলার সামগ্রী দিয়ে ইফতারের সময় পর্যন্ত ভুলিয়ে রাখতাম”[9]।

বাচ্চাদেরকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী লালন-পালন করা দ্বারা শুধু দ্বীনি ক্ষতি তাই নয়, বরং এর দ্বারা তাদের দুনিয়াও নষ্ট হয় এবং তাদের জীবন ধ্বংস হয়। দুনিয়ার জীবনে তারা বিভিন্ন ধরনের মুসিবত ও বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়, অর্থের অপচয় হয়, সাংসারিক জীবন সংকীর্ণ হয় এবং তাদের পরিবারের শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়। সুতরাং বর্তমান সময়ে আমাদের উচিত হল, বাচ্চাদের নিয়ে খুব সতর্ক থাকা, যাতে তারা নিশ্চিত ধ্বংস হতে মুক্তি পাই। মনে রাখতে হবে, তারা যা চায় তা করা যাবে না, তাদেরকে খেয়াল খুশি মত চলতে দেয়া যাবে না। তাদের চাহিদাকে ছোট থেকেই

---

[9] বুখারি: ১৯৬০, মুসলিম: ১১৩৬।

নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং ইচ্ছা আকাঙ্খাকে ছোট বেলা থেকেই যাচাই বাচাই করতে হবে। বর্তমান সময়ে কেনইবা নিয়ন্ত্রণ করবে না? তাদের সব চাহিদা বা আশা-আকাঙ্ক্ষা কিভাবে পূরণ করবে?!

তারপর এক সময় আসবে যখন তুমি জীবন যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, তখন দেখতে পাবে, তার পরিবার তার চাহিদাগুলো ইচ্ছা থাকলেও পূরণ করতে সক্ষম নয়। বিশেষ করে যখন সে নিজেই স্বয়ং সম্পন্ন হবে, বৈবাহিক জীবনে পদার্পণ করবে এবং কর্ম জীবনে পা বাড়াবে, তখন তোমাকে বলবে আমাকে এ কাজ করতে দাও, আমাকে এ কাজ করার জন্য টাকা দাও ইত্যাদি। তখন তুমি তার চাহিদা মোতাবেক যদি তাকে সাপোর্ট দিতে না পার, তাহলে শুরু হবে অশান্তি, ঝগড়া-বিবাদ, দু:সম্পর্ক।

অনুরূপভাবে মেয়েরা যখন বিলাস-বহুল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়, তখন তারাও তাদের ব্যক্তি ও সাংসারিক জীবনে অশান্তিতে পড়তে হবে। অনেক সময় দেখা যাবে, সে এমন এক স্বামীর সংসারে আবদ্ধ হয়েছে, যে আর্থিকভাবে তার থেকে দুর্বল বা সমকক্ষ নয়, তখন সে তার স্বামীকে বাড়তি চাপ দিতে থাকবে, তাকে সার্বক্ষণিক বিরক্ত করবে এবং এটা-সেটা এনে দেয়ার জন্য বলতে থাকবে। যখন সে এনে দিতে পারবে না তখন সে তার স্বামীর উপর চড়াও হবে, স্বামীর থেকে নাক ছিটকাইবে। আবার অনেক সময় দেখা যাবে সে তার স্বামীকে ফকির বলে গালি দেবে। এভাবে দেখা যাবে তাদের সংসারে সব সময় ঝগড়া-বিবাদ, মান-অভিমান ও অশান্তি লেগে থাকবে। ফলে তাদের

আত্মার শান্তি ও পারিবারিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হবে এবং স্বামীর সাথে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না। এ ধরনের ঘটনা বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজে অহরহ ঘটছে। সুতরাং, আমরা যদি শুরু থেকে সতর্ক না হই তবে আমাদের আরো দুভোর্গ পোহাতে হবে।

দ্বিতীয়ত: প্রবৃত্তির অনুসারীদের সাথে উঠবস ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা:

মনে রাখতে হবে, বন্ধু নির্বাচন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যারা বন্ধু নির্বাচন করতে ভূল করে, তারা তাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ হারায় ফেলে। যার বন্ধু খারাপ বা চরিত্রহীন হয়, তাকে ভালো রাখার জন্য কোন কৌশলই উপকারে আসে না। কারণ, প্রবাদে আছে, মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। তার বন্ধুর দ্বীন যা হবে তার দ্বীনও একই দ্বীন হবে। সুতরাং, আমরা সবসময় সৎ সঙ্গী নির্বাচন করবো, কখনোই অসৎ বন্ধুদের সাথে চলাফেরা করবো না, তাদের এড়িয়ে চলবো। কারণ, কিয়ামতের ভয়াবহ বিপদের দিন আমার বন্ধু আমার কোন উপকারে আসবে না। সেদিন আমার বন্ধু আমার দুশমণে পরিণত হবে। তারা আমাকে চিনতে পারবে না, একমাত্র মুত্তাকী ছাড়া। যারা মুত্তাকী এবং একমাত্র দ্বীনের স্বার্থে একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব করে তাদের বন্ধুত্ব কিয়ামতের দিনও কাজে লাগবে। আল্লাহ রাব্বুল

আলামীন যারা দ্বীনের কারণে একে অপরকে ভালোবাসতো তাদের ক্ষমা করে দেবেন। এ ছাড়াও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সত্যবাদীদের সাথে উঠবস করার নির্দেশ দেন। কারণ, কথায় আছে, সৎ সঙ্গ স্বর্গবাস আর অসৎ সঙ্গ সর্বনাশ।

মানুষের সাথে বন্ধুত্ব ও তাদের সাথে উঠবস করার ফলে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যারা প্রবৃত্তির অনুসারীদের সাথে উঠবস এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারা অবশ্যই তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিশেষ করে যখন সে তাদের চেয়ে দুর্বল হয় এবং তার মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করার মত যোগ্যতা থাকে, তখন সে কোন প্রকার হিসাব-নিকাশ ছাড়াই তার বন্ধুদের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে থাকে।

এ কারণেই আমাদের মনীষীরা আমাদেরকে প্রবৃত্তির অনুসারী ও বিদআতিদের সাথে উঠবস করতে নিষেধ করেন এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকতে বলেন। আল্লামা আবু কালাবাহ রহ. বলেন,

لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم؛ فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة، أو يلبّسوا عليكم في الدين بعض ما لُبِّسَ عليهم

"তোমরা প্রবৃত্তির অনুসারিদের সাথে উঠবস করো না[10] এবং তাদের সাথে কোন প্রকার বিতর্কে জড়াবে না। কারণ, আমরা

---

[10] আব্দুলা আহমদের আস-সুন্নাহ: ৯১

তোমাদের নিশ্চয়তা দিতে পারছি না যে, তারা তোমাদেরকে গোমরাহীতে ডুবাবে না অথবা দ্বীনের বিষয়ে তাদের নিকট যে অস্পষ্টতা রয়েছে তাতে তোমাদের বিভ্রান্তিতে ফেলবে না"।

আল্লামা মুজাহিদ রহ. বলেন,

لا تجالسوا أهل الأهواء

"তোমরা প্রবৃত্তির অনুসারীদের সাথে উঠবস করো না। একই উক্তি কাইস ইবন ইবরাহিম থেকেও বর্ণিত"।

তৃতীয়: আখিরাত ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞানের অভাব:

যে ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সত্যিকার মান-মর্যাদা সম্পর্কে অবগত নয় বা তাকে যথাযথ সম্মান দেখাতে পারে না, সে আল্লাহকে তার বিপক্ষে ক্ষেপিয়ে তুলতে, আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের নাফরমানি করতে এবং তার আদেশ নিষেধকে অমান্য করতে সে তেমন কোন পরওয়া করে না; তার অন্তরে আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের বড়ত্ব ও তা'জীম অবশিষ্ট থাকে না। একজন মানুষের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ক্বদর ও মান-মর্যাদা সম্পর্কে জানা থাকা অতীব জরুরি। তার উপর আল্লাহর পক্ষ হতে কি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং তাকে কখন কি পালন করতে হবে তা অবশ্যই জানা থাকতে হবে। এ গুলো জানা না

থাকলে সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ নিষেধ কিভাবে পালন করবে এবং তার হুকুমের আনগত্য কিভাবে করবে?

যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মান-মর্যাদা সম্পর্কে অবগত আছে আর যারা অবগত নয়, তারা কখনোই সমান হতে পারে না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهۡوَآءَهُم ۝١٤ ﴾ [سورة الزمر: ٦٧.]

যে ব্যক্তি তার রবের পক্ষ থেকে আগত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কি তার মত, যার মন্দ আমল তার জন্য চাকচিক্যময় করে দেয়া হয়েছে এবং যারা তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে? [সূরা যুমার, আয়াত: ৬৭]

চতুর্থ: প্রবৃত্তির পূজারীদের সাথে যে ধরনের আচরণ করা দরকার তা পালন করা হতে বিরত থাকা:

যারা প্রবৃত্তির পূজা করে ঘুরে বেড়ায়, তাদের প্রতি সমাজের মানুষের একটি বড় দায়িত্ব হল, তারা তাদেরকে ভালো পথে আনার চেষ্টা করবে এবং বিপথগামী হতে রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে। কারণ, ভালো কাজের আদেশ ও খারাপ কাজ হতে নিষেধ করার দায়িত্ব পালনে অবহেলা মানুষকে প্রবৃত্তির পূজারি

বানিয়ে দেয়। আর মানুষ যখন ভালো কাজের আদেশ ও খারাপ কাজ হতে নিষেধ করার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তখন প্রবৃত্তির পূজারী যারা তাদের শয়তানি, হঠকারিতা ও অপরাধ প্রবণতা আরও বহুগুণে বেড়ে যায়। তারা কোন অপরাধকে আর অপরাধ মনে করে না। যে কোন ধরনের অপরাধ করতে তারা কাউকে পরওয়া বা ভয় করে না। তারা অন্যায় অপরাধ করতে করতে তাদের স্বভাব নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি ধীরে ধীরে তাদের প্রবৃত্তি তাদের অন্তরে স্থান করে নেয় এবং তাদের চলা ফেরা ও যাবতীয় কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ তাদের প্রবৃত্তিই করতে থাকে। মানবিক কোন গুণ তাদের মধ্যে আর অবশিষ্ট থাকে না। তাদের মধ্যে পাশবিক চরিত্র ও জীব-জন্তুর চরিত্রই প্রভাব বিস্তার করে। এ কারণেই ইসলাম মানুষকে ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা নির্দেশ দেন। আল্লাহ রাব্বূল আলামীন বলেন,

وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤ [سورة العمران : ١٠٤.]

“আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম”। [আল-ইমরান, আয়াত: ১০৪]

আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, সমাজে একটি জামাত থাকতে হবে যারা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ ও খারাপ কাজ

হতে বারণ করার দায়িত্ব পালন করে। আর যারা এ দায়িত্ব পালন করবে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারাই হল, সফল। সমাজে যখন এ ধরনের দায়িত্বশীল লোক থাকবে তখন সমাজিক অপরাধ কমে যাবে এবং প্রবৃত্তির অনুসারীরা ধীরে ধীরে দূর্বল হয়ে যাবে। তবে যারা মানুষকে ভালো কাজের দিকে আহ্বান করবে তাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। কিভাবে তারা মানুষকে অন্যায় অনাচার থেকে ফিরাবে। শুধুমাত্র ক্ষমতার ডাণ্ডা দিয়ে মানুষকে থামিয়ে রাখা যায় না। মানুষের অন্তরে খারাপ বা বন্দ কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে। মানুষকে ওয়াজ নসিহত ও সুন্দর কথা বলে এবং উত্তম বিতর্ক দ্বারা বুঝাতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করার মূলনীতি আলোচনা করে আল্লাহ রাব্বূল আলামীন আরও বলেন,

﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥﴾ [سورة النحل : ١٢٥.]

“তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন”। [সূরা নাহাল, আয়াত: ১২৫]

আল্লাহ রাব্বূল আলামীন আরও বলেন,

﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ وَعِظۡهُمۡ وَقُل لَّهُمۡ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ قَوۡلَۢا بَلِيغٗا ٦٣﴾ [سورة النساء : ٦٣.]

ওরা হল সে সব লোক, যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তাদেরকে সদুপদেশ দাও। আর তাদেরকে তাদের নিজদের ব্যাপারে মর্মস্পর্শী কথা বল। [সূরা নিসা, আয়াত: ৬৩]

আর যখন মানুষ অন্যায় ও অপরাধকে প্রতিহত করতে অভ্যস্ত হয়, তখন তাদের দ্বারা কোন প্রকার অন্যায় সংঘটিত হয় না এবং যারা প্রবৃত্তির পূজারী তাদের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায় না। আর তাদের চলার পথে কোন প্রকার হোঁচট খেতে হয় না।

পাঁচ. দুনিয়ার মহব্বত এবং দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়া:

যে ব্যক্তি দুনিয়াকে অধিক মহব্বত করে এবং দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে, তার অন্তর সর্বদা দুনিয়ার মহব্বতের দাবি পূরণ ও তার জন্য যা করনীয় তা বাস্তবায়নেই লিপ্ত থাকে। অন্য কোন চিন্তা তার মাথায় প্রবেশ করে না। যদিও তার কার্যক্রম আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের বিধানের পরিপন্থী হয়। আর একেই বলে প্রবৃত্তির পূজা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে এ ধরনের অভ্যাস ও কারণের প্রতি সতর্ক করে বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرۡجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَٱطۡمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنۡ ءَايَٰتِنَا غَٰفِلُونَ ۝٧ أُوْلَٰٓئِكَ مَأۡوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ۝٨﴾ [سورة يونس : ٧-٨.]

"নিশ্চয় যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না এবং দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট আছে ও তা নিয়ে পরিতৃপ্ত রয়েছে। আর যারা আমার নিদর্শনাবলী হতে গাফেল তারা যা উপার্জন করত, তার কারণে আগুনই হবে তাদের ঠিকানা"। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৭-৮]

আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, যারা আখেরাত দিবসের আশা করে না এবং দুনিয়ার জীবনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তাদের ঠিকানা হল, জাহান্নাম। আর এটি তাদের কর্মেরই ফলাফল। তারা দুনিয়াতে আখেরাতকে ভূলে গিয়েছিল এবং তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে যখন যা ইচ্ছা তাই করছিল।

ছয়. মানবাত্মা যখন কোন বৈধ বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে তখন তা অর্জন করার জন্য তাড়াহুড়া করা:

মানুষর স্বভাব হল, সে তাড়াহুড়া করতে পছন্দ করে। কোন কিছুতে মানুষ ধৈর্য্য ধারণ করার ক্ষমতা খুব কমই রাখে। মানবজাতিকে যখন তার নফস কোন বৈধ কর্মের প্রতি আহ্বান করে, তখন সে দ্রুত তার বাস্তবায়নে ঝাঁপিয়ে পড়ে; তা তার জন্য

ভাল নাকি মন্দ তা সে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখে না। জ্ঞানীরা তাদের বাচ্চাদের এবং নিজেদের ছাত্রদের প্রবৃত্তির বা নফসের চাহিদার বিরোধিতা করার উপর অভ্যস্ত করে গড়ে তুলেন। কোন বৈধ জিনিষও যখন তাদের ছাত্র বা সন্তানেরা হাসিল করতে চাইত, তারা তাদের চাহিদাকে প্রত্যাখ্যান করত। তারা যা চাইতো তা বৈধ হলেও তা থেকে তারা তাদের বাচ্চাদের বিরত রাখত। অনেক সময় ছাত্ররা তাদের ওস্তাদদের বারণ করাকে সহ্য করতে পারে না। ফলে তারা প্রতিবাদ করে এবং বিরোধিতা করে। কিন্তু তখন তারা বুঝতে না পারলেও পরবর্তীতে যখন তারা বড় হয় বা ওস্তাদ হয়, তখন ঠিকই বুঝতে পারে। কেন তাদের এ কাজ করতে নিষেধ করা হল এবং কাজটি কেন করতে দেয়া হল না। আমাদের সময় আমাদের শিক্ষকরা অনেক মুবাহ কাজ করতে আমাদের বারণ করত, তখন আমাদের তা বুঝতে কষ্ট হত। কিন্তু এখন তারা কেন নিষেধ করত তা বুঝতে আর কষ্ট হয় না। বর্তমানে দেখা যায় অনেক প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের জন্য মোবাইল ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়। এর যথার্থতা ও যৌক্তিকতা স্পষ্ট। ছাত্ররা মোবাইল ব্যবহার করে তাদের জীবনের মহামূল্যবান সময় নষ্ট করে, মাতা-পিতার কষ্টার্জিত অর্থের অপচয় করে এবং মোবাইল দ্বারা বিভিন্ন লোকজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সম্পর্ক করার কারণে তাদের পড়া লেখায় বিঘ্ন ঘটে।

খলফ ইব্ন খলিফা সুলাইমান ইব্ন হাবিব ইব্ন মিহলাব এর নিকট প্রবেশ করে দেখতে পেল, সুলাইমানের একটি বাঁদি, তার নাম

বদর। তার চেহারা খুবই সুন্দর এবং সে অত্যন্ত ভাল ও গুণি। সুলাইমান খলফকে জিজ্ঞাসা করে বলল, তুমি এ বাঁদিকে কেমন দেখছ? সে বলল, আল্লাহ রাব্বূল আলামীন আমীরকে সংশোধন করুক! আমি ইতিপূর্বে এর চেয়ে সুন্দর কোন নারীকে দেখিনি। সে বলল, তুমি হাত ধর! উত্তরে খলফ বলল, না আমি এ কাজ করব না। আমি জানি আপনি তাকে পছন্দ করেন। তারপর সে আবারো বলল, আমি তাকে পছন্দ করলেও তুমি তাকে ধর কোন সমস্যা নাই। সে এ কথা এ জন্য বলল, যাতে আমার প্রবৃত্তি আমার উপর প্রাধান্য পায় কিনা তা জানতে পারে।

ধৈর্যের চর্চা করার কারণে মানুষ অনেক সময় প্রবৃত্তির পূজা করা হতে বিরত থাকতে সক্ষম হয়। আর এ ধরনের বঞ্চিত হওয়ার দরুন মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হয় না বরং মানুষের যাবতীয় কল্যাণ নিশ্চিত হয়। বিশেষ করে যখন সে তার প্রবৃত্তি ও নিষিদ্ধ আকাঙ্ক্ষার মুখোমুখি হয়। কিন্তু যখন সে সাধারণত বৈধ ও মুবাহ বস্তু লাভে অভ্যস্ত হয়, তখন মানবাত্মা নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তুর সামনে দুর্বল হয়ে পড়ে।

সাত. প্রবৃত্তির অনুসরণ করার যে পরিণতি সে সম্পর্কে জানা না থাকা:

জ্ঞানই হল মানুষের একমাত্র শক্তি। জ্ঞান মানুষকে যাবতীয় অধ:পতন থেকে রক্ষা করে। যে কোন কাজের পরিণতি সম্পর্কে জানা থাকলে, মানুষ সে কাজ করা না করা বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে

উপণীত হতে পারে। কোন কিছুর পরিণতি সম্পর্কে অজানা থাকা মানুষকে তার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রবৃত্তির অনুসরণ করার অনেক ক্ষতি ও ধ্বংস রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এসব সম্পর্কে বেখবর। যখন প্রবৃত্তির অনুসারীরা এ সব ক্ষতিসমূহ জানতে পারবে, তখন সে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকবে।

আহমদ ইব্ন কাসেম তিবরানি রহ. কিছু কাব্য পড়েন এবং তাতে তিনি বলেন,

سَأَحْذَرُ مَا يُخَافُ عَلَيَّ مِنْهُ

وَأَتْرُكُ مَا هَوَيْتُ لِمَا خَشِيْتُ

“যে কাজ করাকে আমি আমার বিপক্ষে বিপদ সংকুল মনে করি তা করা হতে আমি অবশ্যই বিরত থাকব। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয়ে আমার মন যা চায় তা করার অভ্যাসকে ছেড়ে দেব”।

প্রবৃত্তির অনুসরণ করার ক্ষতিসমূহ

দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের জীবনের জন্য প্রবৃত্তির অনুসরণ করার ক্ষতি অসংখ্য। কিছু ক্ষতি আছে যা নগদ; দুনিয়াতেই তার মুখোমুখি হতে হয় আর কিছু ক্ষতি আছে যেগুলো সময় সাপেক্ষ।

এ সব ক্ষতির কারণে মানুষ প্রবৃত্তির স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না এবং তা মানুষকে আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের নেয়ামত থেকে ভুলিয়ে রাখে। আলী ইবন আবী তালেব রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,

إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكم؛ فإنّ عاجلها ذميم، وآجلها وخيم، فإن لم ترها تنقاد بالتحذير والإرهاب، فسوّفها بالتأميل والإرغاب، فإن الرغبة والرهبة إذا اجتمعا على النفس ذلت لهما وانقادت

"তোমরা তোমাদের প্রবৃত্তিকে তোমাদের আত্মার জন্য বিচারক বানানো থেকে বেঁচে থাক। কারণ, তার নগদ ক্ষতি হল, খুবই তিক্ত আর পরিণতি খুবই ভয়াবহ। যদি তুমি তা বুঝতে সক্ষম না হও তবে সে তোমাকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে বাধ্য করবে। তারপর সে তোমাকে আশা দিতে থাকবে এবং উৎসাহ প্রদান করবে। কারণ, আকাঙ্খা ও ভয় উভয় যখন মানবাত্মার উপর একত্র হয়, তখন মানবাত্মা উভয়ের জন্য আনুগত্য প্রদর্শণ করে এবং সহনশীল হয়"।

প্রবৃত্তির অনুসরণ করার ক্ষতি কি?

প্রবৃত্তির অনুসরণ করার ক্ষতি দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। প্রবৃত্তির অনুসরণ করার কারণে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হয়। সামাজিক শান্তি শৃংখলা ও ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়। সামাজের মধ্যে নানাবিধ অন্যায়, অনাচার ও অশ্লীলতা সংঘটিত হতে থাকে। প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে সমাজে ন্যায় বিচার

প্রতিষ্ঠিত হয় না। একে অপরের উপর জুলুম নির্যাতন করে এবং অন্যের হক নষ্ট করে। প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। নিম্নে আমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করার ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথমত: আখিরাতের ক্ষতি:

আখেরাতের ক্ষতি সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে এরশাদ করেন,

﴿فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ۝٣٧ وَءَاثَرَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا ۝٣٨ فَإِنَّ ٱلۡجَحِيمَ هِيَ ٱلۡمَأۡوَىٰ ۝٣٩ وَأَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفۡسَ عَنِ ٱلۡهَوَىٰ ۝٤٠ فَإِنَّ ٱلۡجَنَّةَ هِيَ ٱلۡمَأۡوَىٰ ۝٤١﴾ [سورة النازعات : ٣٧-٤١.]

"সুতরাং যে সীমালঙ্ঘন করে আর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়, নিশ্চয় জাহান্নাম হবে তার আবাসস্থল। আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল"। [সূরা আন-নাযেয়াত, আয়াত: ৩৭-৪১]

আল্লামা শা'বী রহ. বলেন, প্রবৃত্তিকে নাম করণের কারণই হল, সে মানুষকে তার কু-কর্মের দ্বারা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

« من كان الأجوفان همّه خسر ميزانه يوم القيامة »

“যার উদ্দেশ্য হবে দুটি পেটের চাহিদা পূরণ করা কিয়ামতের দিন তার আমলের পাল্লা দুর্বল হবে”।

এখানে দুটি পেটের চাহিদা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, পেটের চাহিদা আর যৌবনের চাহিদা।

কিয়ামতের দিন প্রবৃত্তির পূজারীদের তুমি দেখবে, তারা দুনিয়াতে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করার কারণে পাগলের মত চট-পট করতে থাকবে এবং কিয়ামতের দিন যারা আল্লাহর আযাব হতে নাজাত পাবে তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে। দুনিয়াতে তারা প্রবৃত্তির পূজারীদের সাথে যেভাবে চলাফেরা করত অনুরূপভাবে তারা কিয়ামতের দিন যারা নাজাত পাবে তাদের সাথে নাজাত পাওয়ার জন্য উঠবস করবে এবং তাদের সাথে থাকতে প্রাণপণ চেষ্টা চালাবে। কিন্তু সেদিন তাদের চেষ্টা কোন কাজে আসবে না।

আল্লামা মুহাম্মদ ইবন আবুল ওয়ারদ রহ. বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য এমন একটি দিবস আছে, যেদিন প্রবৃত্তির পূজারীরা তাদের অপকর্মের পরিণতি হতে কোন ক্রমেই বাঁচতে পারবে না। আর কিয়ামতের দিন সবচেয়ে অধিক চটপট কারী

হল, সেই লোক, যে দুনিয়াতে তার যৌবনের চাহিদা মেটাতে অধিক ব্যস্ত থাকত। আখেরাতের প্রতি তার কোন আগ্রহ ছিল না।

আল্লামা আতা রহ. বলেন, যার প্রবৃত্তি তার জ্ঞানের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং যার ধৈর্যের উপর তার অধৈর্য প্রাধান্য পায়, সে কিয়ামতের দিন বঞ্চনার মুখোমুখি হবে। অর্থাৎ, জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে কিয়ামতের দিন সে বড় ধরনের অপমান ও অপদস্ত হবে।

আল্লামা ইবরাহিম ইব্ন আদহম রহ. বলেন, প্রবৃত্তি মানুষকে অসুস্থ বানিয়ে দেয় আর আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের ভয় ও তাকওয়া মানুষকে সুস্থতা দেয়। একটি কথা মনে রাখবে, তোমার প্রবৃত্তি তোমার অন্তর থেকে সব কিছুই দূর করতে পারবে যখন তুমি ভয় করবে সে সত্বাকে যার সম্পর্কে তুমি বিশ্বাস কর যে সে তোমাকে সবসময় দেখছে।

প্রবৃত্তি মানুষকে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়:

একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সব গোমরাহীর মুল হল, খারাপ ধারনা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করা। ধারণা মানুষকে ধ্বংস করে, মানুষের মনোবলকে দূর্বল করে এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও সংঘবদ্ধতাকে বিনষ্ট করে। আর প্রবৃত্তি মানুষকে সঠিক পথ হতে দূরে সরিয়ে দেয়। যারা প্রবৃত্তির

অনুসরণ করে তারা সঠিক পথের উপর থাকতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গোমরাহ লোকদের সম্পর্কে বলেন,

﴿ إِنۡ هِيَ إِلَّآ أَسۡمَآءٞ سَمَّيۡتُمُوهَآ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلۡطَٰنٍۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهۡوَى ٱلۡأَنفُسُۖ وَلَقَدۡ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلۡهُدَىٰٓ ٢٣ ﴾ [سورة النجم : ٢٣.]

"এগুলো কেবল কতিপয় নাম, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা রেখেছ। এ ব্যাপারে আল্লাহ কোন দলীল প্রমাণ নাযিল করেননি। তারা তো কেবল অনুমান এবং নিজেরা যা চায়, তার অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াত এসেছে"। [সূরা নজম, আয়াত: ২৩]

মানুষ তাদের নফসের অনুকরণ ও খারাপ ধারণার পূজা করার কারণেই গোমরাহীতে পড়ে। প্রবৃত্তির পূজা করা শুধু তাকে গোমরাহ করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং তা অন্য লোকদের গোমরাহ করা এবং তাদের সঠিক পথের অনুকরণ করা হতে বিরত রাখে। আল্লাহ রাব্বূল আলামীন বলেন,

﴿ وَإِنَّ كَثِيرٗا لَّيُضِلُّونَ بِأَهۡوَآئِهِم بِغَيۡرِ عِلۡمٍۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُعۡتَدِينَ ١١٩ ﴾ [سورة الأنعام : ١١٩.]

“এবং নিশ্চয় অনেকে না জেনে তাদের খেয়াল-খুশি দ্বারা পথভ্রষ্ট করে। নিশ্চয় তোমার রব সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত”। [সূরা আনয়াম, আয়াত: ১১৯]

অর্থাৎ, তারা তাদের প্রবৃত্তির দ্বারা অন্য লোকদের গোমরাহ করে। কুরআন, হাদিস ও উপদেশ দ্বারা তারা কোন উপকার লাভ করে না।

প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে কুরআন বুঝা, কুরআন দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করা ও তার বিধান দ্বারা উপকৃত হওয়া থেকে বিরত রাখে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে প্রবৃত্তির অনুসারীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখ থেকে সরাসরি কুরআনের তিলাওয়াত শুনত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কুরআন দ্বারা কোন উপকার লাভ করতে পারেনি। তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান আনেনি। প্রবৃত্তির অনুসরণই তাদের আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান আনা হতে বিরত রাখে। অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ সত্যকে উপলব্ধি করতে পারা সত্ত্বেও তারা তা গ্রহণ করে না। কারণ, তারা তাদের প্রবৃত্তির বিরোধিতা করতে পারে না। আল্লাহ রাব্বূল আলামীন তাদের বিষয়ে বলেন,

﴿وَمِنۡهُم مَّن يَسۡتَمِعُ إِلَيۡكَ حَتَّىٰٓ إِذَا خَرَجُواْ مِنۡ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهۡوَآءَهُمۡ ١٦﴾

[سورة محمد: ١٦.]

“আর তাদের মধ্যে এমন কতক রয়েছে, যারা তোমার প্রতি মনোযোগ দিয়ে শুনে। অবশেষে যখন তারা তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায় তখন তারা যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে বলে, ‘এই মাত্র সে কী বলল?’ এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে”। [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ১৬]

কোরআন ও সুন্নাহের প্রমাণসমূহের অনুকরণ না করা প্রমাণ করে যে, তারা ছিল প্রবৃত্তির অনুসারী। কারণ, কুরআন ও সুন্নাহ হল, মানুষের স্বভাবের অভিন্ন বস্তু। তাই কুরআন ও সুন্নাহের অনুসরণ বাদ দিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করার অর্থই হল, মানবতার বিরোধিতা করা ও চতুস্পদজন্তু জানোয়ারের স্বভাবের অনুকরণ করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও বলেন,

﴿فَإِن لَّمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهۡوَآءَهُمۡۚ وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيۡرِ هُدٗى مِّنَ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥٠﴾ [سورة القصص: ٥٠]

“অতঃপর তারা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রাখ, তারা তো নিজদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে। আর আল্লাহর দিকনির্দেশনা ছাড়া যে নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত করেন না”। [সূরা কাসাস, আয়াত: ৫০]

আলী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিষ ভয় করি। এক-তোমাদের দীর্ঘ আশা, দুই-প্রবৃত্তির অনুসরণ। কারণ, লম্বা আশা মানুষকে আখিরাত বিমুখ করে আর প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে হকের অনুকরণ হতে বিরত রাখে। মনে রাখবে, দুনিয়া মানুষকে পিট দেখিয়ে পলায়ন করে আর আখিরাত মানুষের সামনে অগ্রসর হতে থাকে। আর উভয় জগতের জন্য রয়েছে, সন্তান। তোমরা আখিরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হইও না। কারণ, আজকের দিন, অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন হল কর্মস্থল এখানে কোন হিসাব নাই আর আখিরাত হল হিসাবের জায়গা সেখানে কোন কর্ম বা আমল করার সুযোগ নাই।

অন্তর নষ্ট করে এবং তার মাঝে ও তার শান্তির লাভের মাঝে প্রাচীর তৈরি করে।

প্রবৃত্তির অনুসরণ করা মানব জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করে। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভে প্রবৃত্তি মানুষের মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানবাত্মা পাঁচটি জিনিষ থেকে নিরাপদ না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানবাত্মা পরিপূর্ণ নিরাপদ থাকতে পারবে না।

এক- তাওহীদের পরিপন্থী শিরক হতে মুক্ত থাকতে হবে।

দুই- বিদআত যা সুন্নতের পরিপন্থী তার থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

তিন- আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের আদেশের পরিপন্থী প্রবৃত্তি থেকে নিরাপদ থাকতে হবে।

চার- অলসতা থেকে দূরে থাকতে হবে যা আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের স্মরণ বা জিকিরের পরিপন্থী।

পাঁচ- প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত থাকতে হবে যা মানুষকে ইখলাস থেকে বিরত রাখে এবং এক আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের জন্য ইবাদত-বন্দেগী করার পরিপন্থী হয়ে থাকে।

এখানে যে পাঁচটি বিষয় আলোচনা করা হল, এগুলো সবই আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পরিপন্থী। আর এ পাঁচটি বিষয়ের অধীনে আরও অসংখ্য বিষয় রয়েছে, যে গুলো গণনা করে শেষ করা যাবে না। এ কারণেই বলা বাহুল্য যে, একজন বান্দার জীবনে সবচেয়ে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হল, সে সব সময় আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের দরবারে সঠিক পথের হেদায়েত লাভের জন্য কান্নাকাটি করবে। আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের নিকট দো'আ করবে আল্লাহ রাব্বূল আলামীন যেন তাকে সঠিক পথের পথ দেখায়। এটি এমন একটি দো'আ এ দো'আর প্রতি সে যতটুকু মুখাপেক্ষী, তার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর কোন কিছুই দুনিয়াতে হতে পারে না। একজন বান্দা আর

কোন কিছুর প্রতি এত বেশি মুখাপেক্ষী নয়। দুনিয়াতে এর চেয়ে উপকারী আর কোন বস্তু তার জন্য হতেই পারে না।

প্রবৃত্তির অনুকরণ জ্ঞান-বুদ্ধি হারা হওয়ার কারণ:

মানুষ যখন তার প্রবৃত্তির পুজা করে, তখন সে জ্ঞান-বুদ্ধি হারা হয়। তার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেতে থাকে।

মুতাছিম বিল্লাহ একসময় আবি ইসহাক আল মুসিলিকে বলেছিলেন, হে আবু ইসহাক যখন কোন ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে সহযোগিতা করে, তখন তার চিন্তা, ফিকির ও বুদ্ধি লোপ পায়।

[প্রবৃত্তিকে সহযোগীতা করার অর্থ হল প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী চলা। মন যা চায় তা করা এবং মনে বিরোধিাত না করা। আর মানুষ যখন তার মনে যা চায় তা করে তখন তার জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পাবে এবং ধীরে ধীরে সে জ্ঞান শূন্য হবে।]

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম রহ. বলেন, আমার শাইখ ইব্ন তাইমিয়্যাহ রহ. কে বলতে শুনেছি- যখন কোন ব্যক্তি টাকা পয়সা নগদ পরিশোধ করতে খেয়ানত করে, আল্লাহ রাব্বূল আলামীন তার থেকে আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের মারেফাতকে চিনিয়ে নেয়, অথবা আল্লাহ রাব্বূল আলামীন তাকে ভুলে যায়। এ কথা শোনে

আমার শেখ তাকে বলল, অনুরূপ পরিণতি তাদের হবে যারা শরীয়তের মাসলা-মাসায়েল বিষয়ে আল্লাহ রাব্বূল আলামীন ও তার রাসূলের খিয়ানত করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তার রাসূলের খেয়ানত হল, আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশ নিষেধের খেয়ানত করা এবং আল্লাহ ও তার রাসূল যে সব কথা বলে নাই বা কোন কাজকে তারা আমাদের করা বা বর্জন করার নির্দেশ দেন নাই, আমরা যদি এমন কোন কথা বা কাজ আমাদের নিজের থেকে বলে তাদের কথা বলে চালিয়ে দেই বা আমাদের নিজেদের কোন কর্ম ও প্রণীত বিধানকে আল্লাহ ও রাসূলের কর্ম ও বিধান বলে চালিয়ে দেই, তবে তাকেই খিয়ানত বলা হয়। [এ ধরনের খিয়ানত খুবই মারাত্মক। যারা এ ধরনের খিয়ানত করে তাদের মত বড় জালিম দুনিয়াতে আর কেউ হতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের বড় জালিম বলে আখ্যায়িত করেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বাণীতে এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করল সে যেন আখেরাতের জীবনে তার ঠিকানা হিসেবে জাহান্নামকে বেছে নেয়। সুতরাং, এ ধরনের খিয়ানত থেকে আমাদের সবাইকে বেঁচে থাকতে হবে।]

ইসলামী শরীয়ত বিষয়ে যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, আল্লাহ রাব্বূল আলামীন তার ইলম ও জ্ঞানকে ছিনিয়ে নেবে। লোকটি ঈমান থেকে এমন ভাবে বের হয়ে আসবে সে টেরও

পাবেনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ ধরনের লোকের দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর রাসূলকে বলেন,

﴿ وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱلَّذِيٓ ءَاتَيۡنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنۡهَا فَأَتۡبَعَهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلۡغَاوِينَ ١٧٥ وَلَوۡ شِئۡنَا لَرَفَعۡنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخۡلَدَ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُۚ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلۡكَلۡبِ إِن تَحۡمِلۡ عَلَيۡهِ يَلۡهَثۡ أَوۡ تَتۡرُكۡهُ يَلۡهَثۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ ٱلۡقَوۡمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَاۚ فَٱقۡصُصِ ٱلۡقَصَصَ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ١٧٦ ﴾ [سورة الأعراف: ١٧٥-١٧٦.]

“আর তুমি তাদের উপর সে ব্যক্তির সংবাদ পাঠ কর, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং শয়তান তার পেছনে লেগেছিল। ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আর আমি ইচ্ছা করলে উক্ত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাকে অবশ্যই উচ্চ মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মত। যদি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দাও তাহলে সে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে অথবা যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে। এটি হচ্ছে সে কওমের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। অতএব তুমি কাহিনী বর্ণনা কর, যাতে তারা চিন্তা করে”। [আল-আরাফ, আয়াত: ১৭৫-১৭৬]

[আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বনী ইসলাঈলের একজন লোকের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন। আল্লাহ তাকে তার আয়াতসমূহের জ্ঞান দান করেছিল। কিন্তু সে আল্লাহর দেয়া জ্ঞান কাজে লাগাতে পারেনি। সে প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। শয়তানের ধোকায় পড়ে সে আল্লাহর স্মরণ হতে গাফেল হয়ে যায় এবং পার্থিব জগতের প্রতি সে ঝুঁকে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে বলেন, তার দৃষ্টান্ত হল, কুকুরের মত। যে কুকুর ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে জিহবা বের করে হাপাতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, আপনি আপনার কওমদের নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করেন। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে। আর সামান্য পার্থিব সুবিধা হাসিলের জন্য তারা যাতে আল্লাহর আয়াতসমূহের বিরোধিতা না করে।]

কতক আলেমগণ বলেন, চারটি জিনিষের মধ্যে কুফরি নিহিত থাকে। এক- অতিরিক্ত রাগ, দুই-প্রবৃত্তি, তিন- অধিক আগ্রহ, চার-ভীতি। আর আমি নিজেই এ চারটির পরিণতি স্বচক্ষে দেখেছি। আমি দেখলাম এক ব্যক্তি খুব রাগান্বিত হল, অতঃপর সে তার মাকে হত্যা করল। আর এক ব্যক্তি একজন মেয়ের প্রেমে পড়ে খৃষ্টান হয়ে গেল। কারণ, তার প্রতি তার আগ্রহ এত প্রবল ছিল, সে তার ঈমান আমল সবকিছু ভূলে গেল।

এক লোক বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা অবস্থায় একজন সুন্দর নারীকে দেখে তার পাশে গিয়ে তাওয়াফ করতে আরম্ভ করে। তারপর সে বলল,

أَهوى هَوى الدِّينِ وَاللَّذَّاتُ تُعْجِبُنِي

فَكَيْفَ لِي بِهَوَى اللَّذَّاتِ وَالدِّينِ

"আমি দ্বীনকে মহব্বত করি। কিন্তু প্রবৃত্তির সাধ আমাকে অভিভুত করল। আমি বুঝতে পারছিনা প্রবৃত্তির সাধ আর দ্বীনের সাধ হতে কোনটিকে প্রাধান্য দেব"।

তার কথা শোনে রমণীটি বলল, তুমি যে কোন একটি ছাড়, তাহলে অপরটি অবশ্যই পাবে। প্রবৃত্তি ও দ্বীন একসাথে একত্র করতে পারবে না।

[যার প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে, তার কাছে আল্লাহর ঘরও তুচ্ছ হয়ে যায়। সে আল্লাহর ঘরের সামনে গিয়েও অপকর্ম করতে দ্বিধাবোধ করে না।] আল্লাহ আমাদের এ ধরনের পরিণতি হতে হেফাজত করুন! আমীন!

প্রবৃত্তি ধ্বংসাত্মক বিষয় সমূহের একটি:

প্রবৃত্তি মানুষকে ধ্বংস করে তার জীবনকে কুলসিত করে। যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাদের ধ্বংস নিশ্চিত। এ জন্য রাসূল সা. প্রবৃত্তিকে ধ্বংসাত্মক বিষয় বলে আখ্যায়িত করেন। আনাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوىً مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ »

“তিনটি জিনিষ মানুষকে নিশ্চিত ধ্বংস করে- এক-কৃপণতা যার অনুকরণ করা হয়। দুই- নফসের চাহিদা যার অনুকরণ করা হয়। তিন-মানুষ যখন তার নিজের বিষয়ে অধিক খুশি বা উদাসীন হয়”।

ওহাব ইবন মুনাব্বেহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, দ্বীনের উপর চলার জন্য সবচেয়ে অধিক উপকারী বস্তু হল, দুনিয়া হতে বিমুখ থাকা। আর দ্বীনের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকারক দিক হল, প্রবৃত্তির অনুসরণ করা। আর প্রবৃত্তির অনুসরণ বলতে যা বুঝায়, তা হল, ধন-সম্পদ ও পার্থিব ইজ্জত লাভের আকাঙ্ক্ষা করা। আর মালের মহব্বতের বহি:প্রকাশ হল, হারামকে হালাল করা। আর যে বান্দা হারামকে হালাল করে তার উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ক্ষুব্ধ হয়। আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের ক্ষোভ এমন একটি রোগ এর কোন ঔষধ নাই একমাত্র আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের সন্তুষ্টি ছাড়া। আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের সন্তুষ্টি এমন একটি প্রতিষেধক কোন রোগ তার কাছে আসতেই পারে না। আর যে ব্যক্তি তার প্রভুর সন্তুষ্টি

কামনা করে, সে অবশ্যই তার নফসকে নাখোশ করে। যখন কোন ব্যক্তি দ্বীনের কোন কাজকে কঠিন মনে করে ছেড়ে দেয়, হতে পারে এমন একটি দিন আসবে সেদিন তার মধ্যে দ্বীনের কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। [দ্বীনের কোন কাজকে কঠিন মনে করা একজন বান্দার ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। যখন কোন বান্দা দ্বীনের কোন কাজকে কঠিন মনে করে, তখন সে তা করতে চায়না। এভাবে যখন সে দ্বীনের একটি কাজকে ছেড়ে দেয়, তখন সে আরো অনেক আমল ছেড়ে দেয়। তারপর ধীরে ধীরে সে দ্বীন হতে দূরে সরে যায়। আর যখন কোন বান্দা দ্বীন হতে দূরে সরে যায়, তখন তার মধ্যে কুফরী ও বদ্বীন স্থান করে নেয়।

প্রবৃত্তির অনুসরণ বান্দার উপর তাওফিকের দরজাসমূহ বন্দ করে দেয়া হবে।

[যখন কোন বান্দা প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে থাকে, তখন তাকে ভালো কাজের তাওফীক দেয়া হয় না। সে সব সময় খারাপ, অন্যায়, অশ্লীল ও অপকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ভালো কাজ করা তার জন্য কঠিন হয়ে যায়। ভালো কোন কাজের কথা বললে বা ভালো কাজের উপদেশ দিলে তা তার নিকট অসহ্য লাগে। সে সব সময় পাগলা হাতির মত ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে।]

ফুজাইল ইবন আয়ায রহ. বলেন, যার উপর প্রবৃত্তির অনুসরণ ও মানবিক চাহিদা প্রাধান্য বিস্তার করে, তার থেকে তাওফিক লাভের সব পথ ও উপকরণ দূর হয়ে যায়।

প্রবৃত্তির অনুসারীরা চলার পথে তাদের রাস্তা ভুলে যায় এবং বিভ্রান্ত হয়; তাকে সঠিক ও সরল পথ লাভের তাওফিক দেওয়া হয় না। কারণ, সে হেদায়েত ও তাওফিক লাভের উৎস হতে বিমুখ। সে কুরআন ও সুন্নাহকে বাদ দিয়ে তার প্রবৃত্তিকে গ্রহণ করছে। কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ বাদ দিয়ে সে প্রবৃত্তির অনুসারী হল। সুতরাং, তাকে কীভাবে সঠিক পথের প্রতি তাওফিক দেয়া হবে!

আল্লাহ রাব্বূল আলামীন বলেন,

﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢٣﴾
[سورة الجاثية ٢٣.]

"তবে তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে আপন ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তিনি তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তার চোখের উপর স্থাপন করেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে হিদায়াত করবে? তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?"। [সূরা জাসিয়া , আয়াত: ২৩]

[আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার পার্থিব জীবনে প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করল এবং তার অনুসরণ করল, আল্লাহ তা'আলা তার চোখ, কান ও অন্তরে

মোহর মেরে দেবে। সে আর সত্য কথা শুনতে পারবে না, সত্যকে প্রত্যক্ষ করত পারবে না আর অন্তরে সত্যকে অনুধাবন করতে পারবে না।]

প্রবৃত্তির অনুসরণ আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের আনুগত্য ও ইবাদত বন্দেগী হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ:

যারা প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে থাকে, তারা তাদের প্রবৃত্তির উপর গর্ব-অহংকার করে এবং সে নিজেকে অনেক বড় মনে করে; যার কারণে তারা কারো অনুকরণ করতে চায় না, এমনকি তারা তাদের স্রষ্টার অনুকরণ করা হতেও বিরত থাকে। অনেক মানুষকে তাদের অহংকারই তাদেরকে কুফরিতে লিপ্ত করছে এবং হক্ব ও সত্যের অনুসরণ হতে বিরত রাখছে। যে প্রবৃত্তি তার অন্তরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে সক্ষম, এবং তার উপর সে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান সেই দুনিয়াতে সফল ব্যক্তি। আর যে ব্যক্তি প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, সে তার নফসের ধোঁকায় পড়ে আছে এবং প্রবৃত্তিতে বন্দি হয়ে আছে; এখান থেকে বের হওয়ার আর কোন উপায় তার নাই। আর একজন মানুষের পেটে দুটি অন্তর নাই যে, সে এক সাথে অনেক কাজ করতে পারবে। ফলে সে হয়তো আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের আনুগত্য করবে অথবা সে তার নফস, প্রবৃত্তি ও শয়তানের অনুকরণ করবে। [এক সাথে দুটি কাজ করা মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। কোন মানুষ যদি তার প্রবৃত্তি ও শয়তানকে খুশি রাখে, তাহলে তাকে মনে রাখতে হবে, তার উপর তার প্রভূ মহান রাব্বুল আলামীন অখুশি ও অসন্তুষ্ট। কোন

মানুষের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুটি অন্তর দেয় নাই যে, একদিকে সে আল্লাহর মহব্বতকে লালন করবে আবার অপরদিকে সে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে।]

প্রবৃত্তির অনুসরণ গুনাহ, অন্যায় ও অপরাধের কারণ:

প্রবৃত্তির অনুসরণ করা অপমান অপদস্থ হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাদের পদে পদে লাঞ্চিত হতে হয়। এ ছাড়াও প্রবৃত্তির অনুসারীরা বিভিন্ন ধরনের ব্যধিতে আক্রান্ত হয়। যেমন- যারা প্রবৃত্তির অনুকরণ করে তাদের অন্তর কঠিন হয়ে যায়। আর যখন গুনাহ ও অপরাধের কারণে অন্তর কঠিন হয়, তখন সে কোন অপরাধকে অপরাধ মনে করে না। যে কোন ধরনের গুনাহ, অন্যায় ও অপরাধ সে করতে পারে। কোন অন্যায়কে সে অন্যায় মনে করে না। কোন অপরাধকে সে বড় মনে করে না। তার নিকট সব ধরনের গুণাহ হালকা মনে হয়। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إِنَّ المُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا »

"একজন মুমিন তার গুণাহকে অনেক বড় করে দেখে। মনে হয় সে একটি বিশাল পাহাড়ের নিচে বসা, আশঙ্কা করছে যে পাহাড়টি তার মাথার উপর ভেঙ্গে পড়বে। আর গুণাহগার ব্যক্তি সে তার

গুণাহকে একটি মাছির মত মনে করে। অর্থাৎ, মাছিটি তার নাকের উপর বসল, আর ঝাড়া দেয়ার সাথে সাথে চলে গেল"

প্রবৃত্তির অনুসরণ দ্বীনের মধ্যে বিকৃতির কারণ:

যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা দ্বীনের মধ্যে বিকৃতি করতে কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা দ্বীনকে তাদের প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী সাজায়। তাদের কাছে যদি সঠিক দ্বীন কোনটি তা তুলে ধরা হয়, তখন তারা প্রবৃত্তিকেই প্রাধান্য দেয়, দ্বীনকে তারা প্রাধান্য দেয় না।

হাম্মাদ ইব্ন আবি সালমা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, রাফেজীদের একজন শাইখ তাব, আমাকে হাদিস বর্ণনা করে বলেন, আমরা যখন কোন বিষয়ে একমত হতাম এবং বিষয়টিকে সুন্দর মনে করতাম, তখন তাকে হাদিস বলে চালিয়ে দিতাম। হাদিস আমাদের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী হতে হবে এমন কোন শর্ত ছিল না।

প্রবৃত্তির অনুসারিরাই যুগে যুগে দ্বীনের মধ্যে বিকৃতি সাধন করে। বিদআত সৃষ্টি তারাই করেছে, যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে।

প্রবৃত্তির অনুসরণ স্বাভাবিক জীবন-যাপন ব্যাহত করা ও মানুষের রোষানলে পড়ার কারণ:

একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণেই মানুষের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, অন্যায়, অনাচার ও দুশমনি সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকে এবং তার বিরোধিতা করে, সে তার দেহ, মন ও যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শান্তি দেয়। তাকে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে হয় না। আর যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করল, সে যেন একটি দুর্বিষহ জীবন যাপন করল। সে কোথাও কোন প্রকার শান্তি পায় না। সব সময় দুশ্চিন্তা ও হতাশায় লিপ্ত থাকে। তার পেরেশানির কোন অন্ত থাকে না। সে মানুষকে খারাপ জানবে আর মানুষ তাকে খারাপ জানবে। তার জীবনে বিপর্যয় ছাড়া কিছুই জুটবে না। তার চাহিদার শেষ নাই। যাদের চাহিদা যত বেশি হবে, সে ততবেশি অশান্তি ভোগ করবে।

ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা তোমাদের নফসকে তার চাহিদা থেকে ফিরিয়ে রাখ। কারণ, নফস হল এমন একটি চালক, যে তোমাকে অতীব এমন খারাপ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে, যার থেকে মুক্তি পাওয়ার মত কোন উপায় তোমার থাকবে না। মনে রাখবে সত্য খুব ভারি ও কঠিন, সত্যের দায়িত্ব মহান। যারা সত্যের দিশারী হয়, তাদের অবশ্যই গুরু দায়িত্ব পালন করতে হয়। আর বাতিল খুব সহনীয় ও সহজলভ্য। এর জন্য খুব কষ্ট করতে হয় না। দুনিয়ার শ্রোতের সাথে গা বাসিয়ে দিলেই চলে। বর্তমান যুগটাই হল, খারাপের যুগ। এ যুগে গুনাহ, অন্যায়, অনাচারকে সহজ করে দেয়া হয়েছে। শয়তান মানুষের

জন্য অপরাধকে সুশোভিত করে দিয়েছে এবং গুনাহের যাবতীয় উপকরণ মানুষের দোরগড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। আর গুনাহের কাজ ছেড়ে দেয়া, তাওবার মাধ্যমে প্রতিকার করা হতে উত্তম। অনেকে মনে করে আমরা এখন গুনাহ করব, তারপর তাওবা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে নিব। তাদের এ ধরনের ধারণা ভ্রান্ত ও বাতিল। আর অনেক দৃষ্টি আছে মানুষের অন্তরে প্রেমের বীজ বপন করে। সুতরাং, খারাপ বস্তু থেকে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রাখতে হবে। কারণ, দৃষ্টিকে শয়তানের তীর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তীর দিয়ে যেমন শিকার করা হয়, অনুরুপভাবে দৃষ্টির মাধ্যমে মানুষ অন্যায় অপকর্ম শিকার করে। আর সামান্য সময়ের জন্য প্রবৃত্তিতে লিপ্ত হওয়া তোমার মধ্যে দীর্ঘকালের জন্য পেরেশানি ও দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ, তুমি হয়ত অল্প সময় উপভোগ করবে, কিন্তু তা তোমার জন্য খুব তিক্ত পরিণতি ডেকে আনবে। তোমাকে আমরণ তার যন্ত্রনা সইতে হবে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুক।

আবু বকর আল-ওররাক রহ. বলেন, যখন মানুষের উপর প্রবৃত্তি প্রাধান্য বিস্তার করে, তখন তার অন্তর আচ্ছন্ন হয়। আর যখন অন্তর আচ্ছন্ন হয়, তখন তার আত্মা সংকীর্ণ ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়। আর যখন আত্মা ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তার চরিত্র খারাপ হয়। আর যখন চরিত্র খারাপ হয়, তখন সমগ্র মাখলুক তাকে খারাপ জানবে। আর যখন মানুষ তাকে খারাপ জানবে তখন সেও মানুষকে খারাপ জানবে। তারপর যখন মানুষ বুড়ো হয় এবং শাইখের বয়সে

উপনীত হয়, তখন সে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করার পরিণতি জানতে পারবে। সে তখন বুঝতে পারবে তার অতীত কত মূল্যবান ছিল। কোন এক কবি বলেন,

مَآرِبُ كَانَتْ فِي الشَّبَابِ لَأَهْلِهَا

عِذَابُ فَصَارَتْ فِي المَشِيبِ عَذَاباً

অর্থাৎ, যখন একজন মানুষ জোয়ান ছিল, তখন তার নিকট যৌন চাহিদা ও মানবিক চাহিদাগুলো খুব মিষ্টি ও মধুর ছিল এবং অতীব সুন্দর ছিল। কিন্তু যখন সে যৌবনকে পাড়ি দিয়ে, বার্ধক্যে পৌঁছল, তখন তা তিক্ততা ও অশান্তিতে রূপ নিলো।

প্রবৃত্তির অনুসরণ করা দ্বারা মানুষ নিজেকে তার দুশমনের হাতে তুলে দেয়ার নামান্তর:

মানুষের সবচেয়ে বড় দুশমন হল, তার শয়তান, যে মানুষকে খারাপ পথের দিকে ডাকে। আর মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু হল, তার জ্ঞান যা তাকে ভালো উপদেশ দেয়। আর মানুষের অপর বন্ধু হল, ফেরেশতা যে তাকে ভালো কাজের দিকে উদ্বুদ্ধ করে। যখন কোন ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তখন সে তার আত্মাকে নিজ হাতে দুশমনের কাছে সোপর্দ করে এবং নিজেকে

শয়তানের বেড়াজালে আবদ্ধ করে। যখন কোন ব্যক্তি শয়তানের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়, তখন তার পরিণতি হয় খুবই করুণ। আর একেই বলা হয়, মহা বিপদ ও করুণ পরিণতি, যার থেকে রাসূল সা. আল্লাহর দরবারে মুক্তি কামনা করেন। এছাড়া একে খারাপ ফায়সালা ও দুশমনদের খুশি করাও বলা হয়ে থাকে। এ দুটি থেকেও রাসূল সা. আল্লাহর দরবারে মুক্তি চান।

আগেকার যুগে বলা হত, যখন তোমার উপর তোমার জ্ঞান প্রাধান্য বিস্তার করে, তখন তা তোমার উপকারে লাগে। আর যখন তোমার উপর তোমার প্রবৃত্তি প্রাধান্য বিস্তার করবে, তখন তা তোমার দুশমনের কাজে লাগবে।

প্রবৃত্তির অনুসরণ করা মানুষের তিরস্কার ও ভৎসনা লাভের কারণ:

হিসাম ইবন আব্দুল মালেক রহ. এ কাব্য ছাড়া আর কোন কাব্য কখনোই বলতেন না।

إِذا أَنْتَ لَم تَعصِ الهَوَى قَادَكَ الهَوَى

إِلَى بَعْضِ مَا فِيهِ عَلَيْكَ مَقَالُ

“তুমি যদি তোমার প্রবৃত্তির বিরোধিতা না কর এবং তাকে ধমিয়ে রাখতে না পার, তবে তোমার প্রবৃত্তি তোমাকে এমন বস্তুর দিকে টেনে নেবে, যার মধ্যে তোমার ক্ষতি ছাড়া কোন উপকার থাকবে না”।

আল্লামা ইবন আব্দুল বার রহ. বলেন, যদি বলত: তার মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুতে তোমার বিরুদ্ধে কথা আছে, তাহলে তা হত অতি উত্তম ও খুব সুন্দর।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন,

إِذِا حارَ وَهْمُكَ فِي مَعْنَيَيْنِ

وَأَعْيَاكَ حَيْثُ الهَوَى وَالصَّوَابْ

فَدع ما هَوْيتَ فَإِنَّ الهَوَى

يَقُودُ النفُّوسَ إِلَى مَا يُعَابْ

“যখন তোমার চিন্তা দুটি বিষয়ে অর্থাৎ কোনটি প্রবৃত্তি আর কোনটি সঠিক, এ নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে এবং তোমাকে অক্ষম করে ফেলে, তখন তোমার নফস তোমাকে এমন বস্তুর দিকে নিয়ে যাবে, যাকে কোন ক্রমেই ভালো বলা যাবে না”।

প্রবৃত্তির অনুসরণ অপমান অপধস্তের কারণ:

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বলেন,

وَمِنَ البَلَاءِ وَلِلْبَلَاءِ عَلَامَةٌ

أَنْ لَا تَرَى لَكَ عَنْ هَوَاكَ نُزُوعُ

العَبْدُ عَبْدُ النفَّسِ فِي شَهَوَاتهَ

وَالحُرُّ يَشْبَعُ مَرَّةً وَيَجُوعُ

“বিপদ শুধু বিপদ নয়, বরং সুস্পষ্ট বিপদ, যার আলামত হল, তুমি কখনোই তোমার প্রবৃত্তি থেকে বের হতে পারবে না। আর পরাধীন সে ব্যক্তি যে তার নফসের গোলামী করে এবং নফসের চাহিদা হতে বের হতে পারে না। আর স্বাধীন সে ব্যক্তি যে এক সময় পেট ভরে খায়, আবার ক্ষুধায় কষ্ট পায়”।

কোন এক হাকীমকে প্রবৃত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, সে বলে প্রবৃত্তি হল ‘হাওয়ানুন’ অর্থাৎ অপমান, তা হতে শুধু নুন শব্দকে বাদ দেয়া হয়েছে। একই অর্থ একজন কবি তার আবৃত্তিতে উল্লেখ করেন এবং তিনি বলেন,

نُونُ الهَوَانِ مِنَ الهَوَى مَسْرُوقَةٌ

فَإِذَا هَوَيْتَ فَقَدْ لَقِيتَ هَوَانَا

“হাওয়ানুন শব্দটি হাওয়া শব্দ থেকে নির্গত, তার নুনকে চুরি করা হয়েছে। যখত তুমি নফসের চাহিদা মেটাতে যাও, তখন তুমি অবশ্যই হাওয়ানুন অর্থাৎ, অপমান ও লাঞ্ছনার মুখোমুখি হবে”।

অপর একজন কবি বলেন,

وَلَقَدْ رَأَيْتُ مَعَاشراً جَمَحَتْ بِهِمْ

تِلْكَ الطَّبِيعَةُ نَحْوَ كُلِّ تَبَارِ

تْهوَى نُفُوسُهُمُ هَوَى أَجْسَامِهِمْ

شُغْلاً بِكلِّ دَنَاءَةٍ وَصَغَارِ

تبعِوا الهَوَى فَهَوَى بِهِمْ وَكَذَا الهَوَى

مِنْهُ الهَوَانُ بِأَهْلِهِ فَحَذَارِ

فَانْظُرْ بِعَيْنِ الحَقِّ لَا عَيْنَ الهَوَى

فَالحَقُّ لِلْعَينِ الجَلِيَّةِ عَارِي

قَادَ الهَوَى الفُجَّارَ فَانْقَادُوا لَهُ

وأبتْ عَلَيْهِ مَقَادَةُ الأَبْرَارِ

অর্থ, আমি একটি জামাতকে দেখলাম তাদের স্বভাব বা নফস তাদের যাবতীয় সব ধ্বংস এ সর্বনাশী কর্মের প্রতি বাধ্য করে, তাদের নফস শত অপমান, অপদস্ত ও বঞ্চনা সত্বেও তাদের দেহের চাহিদা মেটাতে সচেষ্ট থাকে। তারা তাদের নফসের অনুকরণ করল, ফলে তারা নফসের চাহিদা নিয়েই তারা ব্যস্ত থাকতে থাকল। আর তাদের প্রবৃত্তি তাদের জন্য কেবল অপমান ও লাঞ্চনাই বয়ে আনল, কোন সুফল দেখাতে পারল না। তুমি তোমার সঠিক দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করে দেখ, প্রবৃত্তির দৃষ্টি দিয়ে নয়। আম মনে রাখবে, সত্য, সত্যের অনুসন্ধানকারীদের সামনে একেবারেই স্পষ্ট ও উম্মুক্ত। ফাজের লোককে তার নফস সব সময় অন্যায়ের দিকে টানতে থাকে। ফলে তারা তারই অনুসরণ করে। আর যারা সত্যিকার জ্ঞানী তারা তাদের নফসের চাহিদা মেটাতে অস্বীকার করে এবং নফসের চাহিদাকে প্রত্যাখ্যান করে।

ওমর ইবন আব্দুল আজীজ রহ. বলেন, সর্বোত্তম জিহাদ হল, নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। আর সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, সবচেয়ে বড় বাহাদুর ব্যক্তি হল, যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক বেশি কঠোর হয়। মনে রাখবে, কোন কিছুকে ছোট মনে করা ধ্বংস ডেকে আনে। অন্তরের ব্যাধিসমূহের সত্যিকার চিকিৎসা ও প্রতিষেধক হল, প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা।

সাহাল ইব্ন আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, তোমার প্রবৃত্তি হল তোমার অন্তরের রোগ। আর যখন তুমি তোমার প্রবৃত্তির বিরোধিতা করবে তখন তা হবে চিকিৎসা।

সুতরাং বান্দা হিসেবে আমাদের উচিত হল, নফসের বিরোধিতা করা। আর নফসের বিরোধিতার অন্তরের চিকিৎসা করতে হবে।

নফস বা প্রবৃত্তির বিরোধিতা করার উপকারিতা

নফসের বিরোধিতা করা দ্বারা একজন মানুষ কি কি উপকার লাভ করে তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

প্রবৃত্তির বিরোধিতা দ্বারা জান্নাত লাভ হয়:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ۝٣٧ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۝٣٨ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ۝٣٩ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۝٤٠ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ۝٤١ ﴾ [سورة النازعات : ٣٧-٤١.]

সুতরাং যে সীমালঙ্ঘন করে আর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়, নিশ্চয় জাহান্নাম হবে তার আবাসস্থল। আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল। [সূরা আন-নাযেয়াত, আয়াত: ৩৭-৪১]

যে ব্যক্তি নফসের বিরোধিতা করে এবং প্রবৃত্তির চাহিদাকে প্রতিহত করতে গিয়ে ধৈর্য ধারণ করে, কিয়ামতের দিন তাকে উত্তম বিনিময় দেয়া হবে। তাদের জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এবং জান্নাতে তাদের দেয়া হবে সুন্দর ও আনন্দদায়ক জীবন।

আর তা হল, তারা যে দুনিয়াতে ধৈর্য ধারণ করেছিল তার বিনিময়। আল্লাহ রাব্বূল আলামীন বলেন,

﴿ وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝١٢ ﴾ [سورة الإنسان : ١٢.]

“আর তারা যে ধৈর্যধারণ করেছিল তার পরিণামে তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী বস্ত্রের পুরস্কার প্রদান করবেন”। [সূরা আল-ইনসান, আয়াত: ১২]

আবু সুলাইমান আদ-দারানী রহ. বলেন, অর্থাৎ, তারা তাদের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ না করে, ধৈর্য ধারণ করে।

وَآفَةُ العَقْلِ الهَوَى فَمَنْ عَلَا

عَلَى هَوَاهُ عَقْلُه فَقَدْ نَجَا

একজন মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির জন্য বড় বিপদ হল, তার প্রবৃত্তি। যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির উপর বিজয়ী হবে, কিয়ামত **দিবসের ভয়াবহ পরিণতি হতে নাজাত লাভ:**

কিয়ামতের দিন মানুষের যে ভয়াবহ অবস্থা হবে তার থেকে মুক্তি পাবে। আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِهِ يَوْمَ لَا ظِلّ إلّا ظِلّهُ :إمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصْبٍ وَجمَالٍ فَقَالَ:إنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضتْ عَيْنَاهُ»

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সাত ব্যক্তিকে তার আরশের ছায়ার তলে আশ্রয় দেবেন। সেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তারা হলেন, ন্যায় পরায়ন বাদশা, যুবক যে তার যৌবনকে আল্লাহর রাহে ব্যয় করে, যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত, দুই ব্যক্তি যারা একে অপরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে। আল্লাহর ভালোবাসার ভিত্তি করে তারা একত্র হয় এবং তার উপর ভিত্তি করে তারা পৃথক হয়, এক ব্যক্তি যাকে কোন সন্দর ও সম্ভ্রান্ত রমণী তার সাথে অপকর্মের জন্য ডাকলে সে বলে আমিতো আল্লাহকে ভয় করি। গোপনে সাদকাকারি ব্যক্তি যার বাম হাত জানে না ডান হাতে কি দান করল। যে নির্জনে বসে আল্লাহর জিকির করল এবং তার উভয় চোখ অশ্রু বিসর্জন দিল"।

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম রহ. বলেন, যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন যাদের আরশের ছায়ার তলে স্থান দেয়া হবে, তাদের বিষয়ে চিন্তা করল দেখতে পাবে, তাদের এত বড় মর্যাদা লাভের কারণ হল, তারা তাদের

নফসের বিরোধিতা করত এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে বিরত থাকত। কারণ, এখানে যে সাতজনের কথা বলা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই নফসের বিরোধিতা করত। যেমন- ক্ষমতাশীল ও শক্তিশালী বাদশা, ইনসাফ করতে সক্ষম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার নফসের বিরোধিতা না করবে। তার নফস তাকে ন্যায় বিচার না করতে আদেশ দেয়। কিন্তু সে তার নফসের যা চায় তার বিরোধিতা করে এবং আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী ন্যায় বিচার করে। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, তাকে ইনসাফ করতে হলে অবশ্যই তার নফসের বিরোধিতা করতে হবে। আর যে যুবক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয়ে অপকর্ম হতে বিরত থাকল, তাকেও তার নফসের বিরোধিতা করতে হয়েছে। কারণ, তার নফসের বিরোধিতা ছাড়া সে তার যৌবনকে আল্লাহর রাহে কাজে লাগাতে সক্ষম হবে না। অনুরূপভাবে যে লোকটির অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত তাকে আজীবন তার নফসের বিরোধিতা করেই এ অভ্যাস গড়ে তুলতে হয়েছে। অন্যথায় সে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের সাথে সম্পৃক্ত থেকে প্রবৃত্তির স্রোতে ঘুরে বেড়াত।

আর যে ব্যক্তি গোপনে সদকা করে এবং তার ডান হাত কি দান করল তা বাম হাত জানে না ইত্যাদি তখন সম্ভব হয় যখন সে তার প্রবৃত্তির সাথে অনবরত যুদ্ধ করে। কারণ, মানবাত্মার স্বভাব হল সে সব সময় তার নিজের গুনাগুণ ও প্রশংসা শোনতে চায়। আর গোপনে সাদকাকারীকে অবশ্যই তার আত্মার চাহিদার সাথে সংগ্রাম করতে হয়। আর যাকে সুন্দর রমণী অপকর্মের দিকে

ডাকার পর সে তা হতে একমাত্র আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের ভয়ে বিরত থাকল এবং যে লোকটি একান্তে আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের স্মরণে দু-চোখ হতে অশ্রু বিসর্জন দিল এবং নির্জনে বসে বসে কেবল আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের ভয়ে কাঁদল, একমাত্র নফসের বিরোধিতা ও প্রবৃত্তির প্রতি অবিচার করাই তাদের এ অবস্থায় পৌঁছিয়েছে। তারা তাদের জীবনে দুনিয়াতে নফসের বিরোধিতা করেন বলেই কিয়ামতের দিন কিয়ামতের ভয়াবহতা হতে নাজাত পাবে। কিয়ামতের দিনের প্রচণ্ড উত্তাপ, গরম ও ঘাম তাদের কোন প্রকার স্পর্শ করতে পারবে না। অন্যদিকে প্রবৃত্তির পূজারীরা সেদিন অত্যন্ত অসহনীয় বিপদের মুখোমুখি হবে। প্রচণ্ড গরম ও সূর্যের তাপের কারণে তাদের ঘাম তাদের গলদেশ পর্যন্ত পৌছবে। তারা তাদের ঘামের মধ্যে সাঁতরাতে থাকবে। তারপর তারা এ ভয়াবহ শাস্তির বোঝা মাথায় নিয়ে জাহান্নামের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। তারপর তাদের প্রবৃত্তির শাস্তি জেলখানায়-জাহান্নামে-তাদের প্রবেশ করানো হবে।

প্রবৃত্তির বিরোধিতা করার কারণে ইজ্জত, সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা লাভ হবে:

মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, মানবিকতা হল, প্রবৃত্তির অনুকরণ হতে বিরত থাকা এবং নফসের বিরোধিতা করা। প্রবৃত্তির অনুসরণ মানবিকতাকে কুলসিত করে আর প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা মানবতাকে পুনরুজ্জীবিত করে।

মাহলাব ইব্ন আবী সুফিয়ানকে বলা হল, তুমি যে ইজ্জত সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলে, তা কীভাবে অর্জন করলে? উত্তরে সে বলল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য ও নফসের বিরোধিতার মাধ্যমে।

আরও কতক আলেম বলেন, সম্মানের অধিকারী আলেম তারা যারা তাদের দ্বীনকে নিয়ে দুনিয়াদারি হতে পলায়ন করেন। আর তারা বিপদে পড়েছে যারা তাদের প্রবৃত্তির নেতৃত্বে চলেছেন।

আবু আলী আদ-দাকাক বলেন, যৌবনে যে তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বুড়ো বয়সে তাকে সম্মান দেবেন।

আল্লামা ইব্ন আব্দুল কাবী রহ. বলেন,

فَمَنْ هجَر اللَّذَّاتِ نَالَ المُنىَ وَمَنْ

أَكَبَّ عَلَى اللَّذَّاتِ عَضَّ عَلَى اليَدِ

وَفِي قَمِع أَهَواءِ النفُّوسِ اعْتِزَازُهَا

وَفِي نَيْلِهَا مَا تَشْتَهِي ذُلُّ سَرْمَدِ

وَلا تَشَتِغْل إلّا بمِا يُكسِبُ العُلَا

وَلَا تُرْضِ النفَّسَ النفَّيسَةَ بِالرَّدِي

وَفِي خَلْوِة الإِنْسَانِ بِالعِلْمِ أُنْسُهُ

وَيَسْلَمُ دِينُ المَرْءِ عِنْدَ التَّوَحُّدِ

وَيْسَلُم مِنْ قِيلٍ وَقَالٍ وَمِنْ أَذى

جَلِيسٍ وَمِنْ وَاشٍ بَغِيضٍ وَحُسَّدِ

فَكنْ حِلْسَ بَيْتٍ فَهْوَ سِتْرٌ لعِوْرَةٍ

وَحِرْزُ الفَتَى عَنْ كُلِّ غَاوٍ وَمُفْسِدِ

وَخَيْرُ جِلِيسِ المَرْءِ كُتْبٌ تُفِيدُهُ

عُلُوماً وَآدَاباً وَعَقْلاً مُؤَيَّدِ

"যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসরণ করা ছেড়ে দেবে সে অবশ্যই তার উদ্দেশ্যে হাসিলে সফল হবে। আর যে ব্যক্তি তার শয়তানীর উপর অটল থাকবে, সে অবশ্যই একদিন তার ভুল বুঝতে পারবে এবং আফসোস করতে করতে আঙ্গুল কাটতে থাকবে। নফসের চাহিদাকে প্রতিহত করার মধ্যে রয়েছে তোমার ইজ্জত ও সম্মান। আর নফস যা চায় তার অনুকরণ করার মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য আমরণ অশান্তি। এমন কোন কাজে ব্যস্ত হইওনা যা তোমার সম্মানহানি ঘটায়, তবে তুমি কিছু নিয়ে ব্যস্ত হও যা তোমার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে। আর ভালো আত্মা কখনোই খারাপ ও নিকৃষ্ট বস্তুর উপর সন্তুষ্ট থাকে না। যখন একজন মানুষ একা হয়, তখন তার জ্ঞানই হবে তার সঙ্গী। একজন মানুষের দ্বীন তখন নিরাপদ হবে যখন তার মধ্যে তাওহীদ থাকবে। মানুষের সমালোচনা ও সহপাঠীদের কষ্ট হতে নিরাপদ থাকবে এবং হিংসুক, নিন্দুক ও দুশমণ থেকে নিরাপদ থাকবে। তুমি তোমার ঘরের ভিতর সু-রক্ষিত থাকো, তাতে তুমি সব কিছু হতে আড়াল থাকতে পারবে। আর তুমি তোমাকে সব ধরনের অনিষ্ঠতা ও ফাসাদ থেকে নিরাপদ থাকবে। একজন মানুষের জন্য সবচেয়ে উত্তম সাথী হল তার বই পুস্তক, যা তার উপকারে আসে। কিতাবসমূহ তাকে স্থায়ী ইলম আদব ও জ্ঞানের সন্ধান দেয়"।

আজীমতকে শক্তিশালী করা:

প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষের আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা ও প্রত্যয়কে দুর্বল ও নড়-বড় করে। আর প্রবৃত্তির বিরোধিতা মানুষের আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা ও প্রত্যয়কে শক্তিশালী ও সবল করে। আর বান্দার আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা হল, আখিরাত ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র মাধ্যম ও বাহন। আর যখন একজন বান্দার বাহন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন আরোহীর অবস্থাও খারাপ হয়ে যায়।

ইয়াহয়া ইব্ন মুয়াজকে বলা হল, দৃঢ়তার দিক দিয়ে সর্বাধিক সঠিক লোক কে? তিনি উত্তরে বললেন, প্রবৃত্তির উপর বিজয়ী লোক।

প্রবৃত্তির বিরোধিতা দ্বারা দেহের হেফাজত করা হয়:

যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা তাদের দেহ ও মন উভয়েরই ক্ষতি করে। প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে বিভিন্ন ধরনের অপকর্মের দিকে নিয়ে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের খারাপ কাজ করতে বাধ্য করে। এ সব অপকর্ম দ্বারা যেমনিভাবে তার আত্মা দূর্বল হয়, অনুরূপভাবে তার শরীর বা দেহও ধীরে ধীরে দূর্বল হয়ে পড়ে।

আল্লামা ইবন রজব রহ. বলেন, অনেক আলেমদের দেখা যায় সে একশত বছর অতিবাহিত করার পরও সে তার শক্তি, সামর্থ্য ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ।

একদিন এক লোক রাগে ক্ষোভে ভীষণ কুদে উঠলে, তাকে বিভিন্ন ধরনের গাল মন্দ করা হল। তখন সে বলল, আমরা যৌবনে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহের কাজ থেকে হেফাজত করি আর আল্লাহ রাব্বূল আলামীন আমাদেরকে বৃদ্ধ বয়সে যাবতীয় দুর্বলতা থেকে হেফাজত করেন। আর বিপরীত হল, কোন এক মনীষী বলেন, আমরা একজন বৃদ্ধকে দেখি, সে মানুষের নিকট ভিক্ষা করছে। তারপর সে বলল, লোকটি খুবই দুর্বল, আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের বিধানকে সে ছোট বেলায় নষ্ট করছে, আর বুড়ো কালে আল্লাহ রাব্বূল আলামীন তার শক্তি ও সামর্থ্যকে নষ্ট করেছে।

প্রবৃত্তির বিরোধিতা দ্বারা দুনিয়াতে যাবতীয় বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে:

যারা প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে তারা দুনিয়াতে বিভিন্ন ধরনের জামেলা হতে মুক্ত থাকে। কোন প্রকার বিপদ তাদের স্পর্শ করে না। ইবরাহীম ইবন আদহম রহ. বলেন, সবচেয়ে কঠিন জেহাদ হল প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা। যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে খারাপ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখতে সক্ষম হল, সে অবশ্যই দুনিয়া ও দুনিয়ার মুসিবত হতে নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হবে। আর

দুনিয়ার জীবনে সে আরাম পাবে এবং দুনিয়ার কষ্ট হতে সে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকবে।

প্রবৃত্তির চিকিৎসা

মানুষ যখন তার প্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়ে যাবে তাকে অবশ্যই পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। সে যখন তার প্রবৃত্তির চিকিৎসার প্রতি মনোযোগ দেবে, তখন হতে পারে আল্লাহ রাব্বূল আলামীন তার প্রতি অনুগ্রহ করবে এবং তাকে নেককার লোকদের সাথে সম্পৃক্ত করবে। আমরা নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী কিছু চিকিৎসার কথা আলোচনা করব।

এক. **তাওবা ও দো'আ করা:**

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট তাওবা ও প্রার্থনা করা যাতে আল্লাহ রাব্বূল আলামীন তাকে প্রবৃত্তির অনিষ্ঠতা থেকে হেফাজত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পূর্ব মনীষীদের আদর্শ ছিল, তারা আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের নিকট তাওবা করত এবং আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের দরবারে দো'আ করতেন। গুণাহ হতে তাওবা করা প্রবৃত্তির অনিষ্ঠতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল সা. নিজে দৈনিক অসংখ্য বার আল্লাহর দরবারে তাওবা করতেন এবং উম্মতদের তাওবা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। রাসূল সা. বলেন, যারা গুণাহ হতে তাওবা করেন, তারা যেন কোন গুণাহ করেন নাই।

কুতবা ইব্ন মালেক রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন-

« اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلَا قِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ »

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট খারাপ চরিত্র হতে আশ্রয় প্রার্থণা করছি এবং খারাপ আমল ও প্রবৃত্তি হতে আশ্রয় প্রার্থণা করছি”।

ওমর ইব্ন আব্দুল আজীজ রহ. খালেদ ইব্ন সাফওয়াকে বলেন, তুমি আমাকে সংক্ষিপ্ত ওয়াজ ও নছিহত কর। তখন সে বলল, হে আমীরুল মুমিন! অনেক মানুষকে আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের পর্দা ধোঁকায় ফেলছে, আর তাদের প্রশংসা তাদেরকে বিপদে ফেলছে। তোমার সম্পর্কে তোমার জানাকে অন্যের অজানা যেন পরাভূত করতে না পারে। আল্লাহ রাব্বূল আলামীন আমাকে এবং তোমাকে আমাদের গুনাহসমূহ গোপন রাখার মাধ্যমে ধোঁকায় পড়া থেকে হেফাজত করুন! মানুষের প্রশংসায় খুশি হওয়া থেকে হেফাজত করুন। আর আল্লাহ রাব্বূল আলামীন আমাদের উপর যা ফরজ করেছেন, তাতে যাতে আমরা পিছপা না হই এবং কোন প্রকার দুর্বলতা প্রদর্শন না করি। আর আমরা যাতে আমাদের প্রবৃত্তির প্রতি না ঝুঁকি। এ কথা শোনে তিনি ক্রন্দন করেন এবং বলেন,

আল্লাহ রাব্বূল আলামীন আমাকে এবং তোমাকে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে হেফাজত করুন।

ইব্রাহীম তাইমী রহ. স্বীয় দো'আয় বলতেন, হে আল্লাহ! তোমার কিতাব এবং তোমার নবীর সুন্নত দ্বারা আমাদেরকে হক সম্পর্কে মতবিরোধ করা থেকে হেফাজত কর। হে আল্লাহ! তোমার পথ নির্দেশকে আমাদের জীবনে পাথেয় বানিয়ে দাও। আর তোমার অনুকরণ ছাড়া প্রবৃত্তির অনুকরণ হতে আমাদের রক্ষা কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের আরও রক্ষা কর গোমরাহি ও পথভ্রষ্টটা হতে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের যাবতীয় কর্মে সন্দেহ পোষণ করা, হঠকারীতা, ঝগড়া-বিবাদ ও উল্টা-পাল্টা করা হতে রক্ষা কর।

দুই. প্রবৃত্তির পরিপন্থী বস্তু দ্বারা অন্তর পূর্ণ থাকা:

মনে রাখতে হবে মানবাত্মা কখনোই খালি থাকে না; তাকে যদি আমরা ঈমান ও আমলের নুর দিয়ে পরিপূর্ণ না করি, তাহলে তা অবশ্যই শিরক ও কুফরের অন্ধকারে পরিপূর্ণ হবে। তাতে কুফর শিরক ও বিদআত স্থান করে নেবে। আমাদের অবশ্যই অন্তরকে পরিপূর্ণ রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। আর তা হল আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের উপর ঈমান আনার মাধ্যমে অন্তরকে ঈমানের নুরের দ্বারা পরিপূর্ণ রাখা এবং অন্তর থেকে গাইরুল্লাহ মহব্বতকে দূর করা। আর গাইরুল্লাহর মহব্বতকে অন্তরে কোন প্রকার স্থান না দেয়া। নি:সন্দেহে একটি কথা যায় যে, আল্লাহর

মহব্বতকে অন্তরে স্থান দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের নৈকট্য লাভে ধন্য হওয়া যায়। আর যখন মানবাত্মা আল্লাহর মহব্বতে পরিপূর্ণ হবে, তখন মানুষের অন্তর থেকে যাবতীয় খারাপ চাহিদা দূর হয়ে যাবে।

তিন. আলেম ওলামা ও সালে-হীনদের সাথে উঠা-বসা করা:

আল্লামা ইবন আব্দুল কাবী রহ. বলেন,

وَخالطِه إِذِا خَالَطتَّ كُلَّ مُوَفَّقٍ مِنَ العُلَمَاءِ أَهْلِ التُّقَى وَالتَّسَدُّدِ

يُفِيدُكَ مِنْ عِلْمٍ وَيَنْهَاكَ عَنْ هَوىً فَصَاحِبْهُ تْهدَى مِنْ هُدَاهُ وَتَرْشُدِ

وَإِيَاكَ وَالهَمَّازَ إِنْ قُمْتَ عَنْهُ وَالبَذِيِّ فَإِنِّ المَرْءَ بِالمَرْءِ يَقْتَدِي

وَلا تَصَحبِ الحَمْقَى فَذُو الجَهْلِ إِنْ يَرُمْ صَلَاحاً لشْيءٍ يَا أَخَا الحَزْمِ يُفْسِدِ

অর্থ, যখন তুমি কারো সাথে উঠবস করতে চাও, তবে তুমি আলেম ওলামা, মুত্তাকী, পরহেজগার এবং আল্লাহ যাদের কবুল করেছেন তাদের সাথে উঠবস কর। তারা তাদের ইলম দ্বারা তোমার উপকার করবে এবং তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা

হতে নিষেধ করবে। আর তুমি খারাপ ও গোমরাহ লোকদের অনুসরণ করা হতে বিরত থাক। কারণ, মানুষ মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তুমি যখন খারাপ ও গোমরাহ লোকদের সাথে উঠবস করবে তখন তোমাদের মধ্যে তাদের গোমরাহী ও খারাপ প্রভাব বিস্তার করবে। আর তুমি কোন জাহেল, অজ্ঞ ও আহমক লোকের সাথে মিশবে না। তাদের সাথে মিশলে তুমি তাদের মতই হবে। কারণ, একজন জাহেলের কাজ হল, তুমি যখন কোন বিষয়ে সংশোধন চাইবে তখন সে তা ধ্বংস করে দেবে, তোমাকে সংশোধন হতে দেবে না।

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম রহ. কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাহায্যের পর এসব বিষয়গুলোর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির কু-মন্ত্রণা হতে মুক্তি পেতে পারে। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিতে ডুবে আছে, তার দ্বারা কি তা থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব? তাকে বলা হবে, অবশ্যই সম্ভব! আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তাওফিক ও তার সাহায্য থাকলে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। নিম্নে আমরা বিষয়গুলো আলোচনা করব:

এক. একজন স্বাধীন ও সাহসী লোকের সাহস ও প্রত্যয় যা তার আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নফসের বিরুদ্ধে কাজ করে। এ ধরনের সাহসী লোক দ্বারা প্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকা সম্ভব।

দুই. ধৈর্য ধারণে সাহসিকতার পরিচয় দেয়া। যখন তার নফস কোন খারাপ কিছু চায়, তখন তা থেকে বিরত থাকার তিক্ততার উপর ধৈর্যধারণ করা।

তিন. আত্মার শক্তি একজন মানুষকে সাহসিকতার যোগান দেয় এবং তাকে সঠিক পথে চলার জন্য উৎসাহ প্রদান করে। আর সাহসিকতা পুরোই হল, প্রতিকুল মুহূর্তের সাময়িক ধৈর্য। আর সবচেয়ে উত্তম জীবন যা একজন বান্দা লাভ করে তা হল, ধৈর্যের দ্বারা জীবন লাভ করা। ধৈর্যের মাধ্যমে যে জীবন লাভ করা যায় তাকে সমৃদ্ধ জীবন লাভ করা বলা চলে।

চার. উত্তম পরিণতির জায়গা কোনটি তা পর্যবেক্ষণ করা এবং সৎ সাহসের মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করা।

পাঁচ. প্রবৃত্তির অনুসরণ করা শাস্তি নিয়ে চিন্তা করা:

প্রবৃত্তির পূজা করার কারণে ভীষণ যন্ত্রণা ও শাস্তি কি তা পর্যবেক্ষণ করা। যখন সে তার শাস্তি সম্পর্কে জানতে পারবে তখন সে প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে অবশ্যই বিরত থাকবে।

ছয়. প্রবৃত্তির বিরোধিতা করার ফলাফল নিয়ে চিন্তা করা:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট বিশেষ মর্যাদার স্থানে তাকে নিয়ে যাওয়া এবং মানুষের অন্তরে তার সম্মান ও মর্যাদা

প্রতিস্থাপন করা। আর এটি তার জন্য অধিক উত্তম ও প্রশান্তি প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করার মজা হতে।

সাত. পাপাচার বা গুনাহের মজার উপর পাক-পবিত্র থাকা, সম্মান বজায় রাখার যে মজা তাকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে।

আট. দুশমনের উপর বিজয় লাভ, দুশমনকে প্রতিহত করা ও তাকে অপমান অপদস্থ করে ক্ষোভ, রাগ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে দেয়ার আনন্দ উপভোগ করা। কারণ, শয়তান যখন তার আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে না পারে, তখন সে বিক্ষুব্ধ ও হতাশাগ্রস্ত হয়। আর আল্লাহ রাব্বূল আলামীন তার বান্দা থেকে পছন্দ করে যেন সে তার দুশমন শয়তানকে অপমান অপদস্থ করে। যেমন- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার মহা কিতাব আল-কুরআনে এরশাদ করেন-

﴿ مَا كَانَ لِأَهۡلِ ٱلۡمَدِينَةِ وَمَنۡ حَوۡلَهُم مِّنَ ٱلۡأَعۡرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرۡغَبُواْ بِأَنفُسِهِمۡ عَن نَّفۡسِهِۦۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ لَا يُصِيبُهُمۡ ظَمَأٞ وَلَا نَصَبٞ وَلَا مَخۡمَصَةٞ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوۡطِئٗا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنۡ عَدُوّٖ نَّيۡلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٞ صَٰلِحٌۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٢٠ ﴾ [سورة التوبة : ١٢٠.]

মদীনার অধিবাসী ও তার আশপাশের মরুবাসীদের জন্য সংগত নয় যে, রাসূলুল্লাহ থেকে পেছনে থেকে যাবে এবং রাসূলের জীবন অপেক্ষা নিজদের জীবনকে অধিক প্রিয় মনে করবে। এটা এ

কারণে যে, তাদেরকে আল্লাহর পথে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় আক্রান্ত করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের ক্রোধ জন্মায় এবং শত্রুদেরকে তারা ক্ষতিসাধন করে, তার বিনিময়ে তাদের জন্য সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। [সূরা তাওবা, আয়াত: ১২০]

সত্যিকার মহব্বতের আলামত হল, মাহবুবের দুশমনকে ক্ষেপিয়ে তোলা এবং তাদের অপমান করা।

নয়. এ কথা বিশ্বাস করা যে, প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মানকে বৃদ্ধি করে। একজন বান্দাকে বাহ্যিক ও বাতেনী উভয় প্রকার সম্মানে ভূষিত করে। অপরদিকে যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সম্মানহানি ঘটে এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে তারা অপমান, অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হয়।

কোনটি প্রশংসনীয় প্রবৃত্তি এবং কোনটি নিন্দনীয় প্রবৃত্তি?

প্রবৃত্তিকে ঢালাওভাবে খারাপ বা ভালো কোনটিই বলা চলে না। তবে যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে বিভিন্ন ধরেনর খারাপ কাজে লিপ্ত হয়, এবং এ নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করে তাদেরই খারাপ বলা যাবে। প্রক্ষান্তরে যে প্রবৃত্তি মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি মোতাবেক চলতে সাহায্য করে, তা কোনদিন খারাপ হতে পারে না। তাকে অবশ্যই ভালো প্রবৃত্তি বলতে হবে। আর যে প্রবৃত্তি দ্বারা উপকার লাভ ও ক্ষতি দূর করা সম্ভব নয় তা অবশ্যই খারাপ। এ ছাড়া যে প্রবৃত্তি মানুষকে খারাপের দিকে নিয়ে যায় এবং মানবাত্মার উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে, তা অবশ্যই খারাপ ও নিন্দনীয়।

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, কোন কোন প্রবৃত্তি বা নফসের চাহিদা আছে, যেগুলোকে আল্লাহ ও তার রাসূল পছন্দ করে। এ ধরনের প্রবৃত্তি বা চাহিদাকে প্রশংসনীয় প্রবৃত্তি বা প্রশংসনীয় চাহিদা বলা হয়ে থাকে। সুতরাং, বলা বাহুল্য যে, প্রশংসনীয় প্রবৃত্তি হল, যে প্রবৃত্তিকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল পছন্দ করে। এ ধরনের প্রবৃত্তি শরীয়তের বিধানের পরিপন্থী হয় না। বরং, তা মানুষকে আল্লাহর মর্জি মোতাবেক চলতে সাহায্য করে। এ ধরনের প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত হাদিস কুরআন দ্বারাও প্রমাণিত।

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله وأقول :أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: ﴿ تُرۡجِي مَن تَشَآءُ مِنۡهُنَّ وَتُـٔۡوِيٓ إِلَيۡكَ مَن تَشَآءُ ﴾ [الأحزاب :٥١] قلت :ما أرى ربك إلا يسارع في هواك

অর্থ, আমি ঈর্ষা করতাম সে রমণীদের উপর যারা তাদের নিজেদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য সোপর্দ করত। আমি বলতাম, নারীরা কি স্বেচ্ছায় তাদের নিজেদের নফসকে সোপর্দ করতে পারে? তারপর যখন আল্লাহ রাব্বূল আলামীন এ আয়াত নাযিল করল,

﴿ تُرۡجِي مَن تَشَآءُ مِنۡهُنَّ وَتُـٔۡوِيٓ إِلَيۡكَ مَن تَشَآءُۖ وَمَنِ ٱبۡتَغَيۡتَ مِمَّنۡ عَزَلۡتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكَۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعۡيُنُهُنَّ وَلَا يَحۡزَنَّ وَيَرۡضَيۡنَ بِمَآ ءَاتَيۡتَهُنَّ كُلُّهُنَّۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمٗا ٥١ ﴾ [الأحزاب : ٥١].

"স্ত্রীদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার পালা তুমি পিছিয়ে দিতে পার, যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পার; যাকে তুমি সরিয়ে রেখেছ তাকে যদি কামনা কর তাতে তোমার কোন অপরাধ নেই; এটা নিকটতর যে, তাদের চক্ষু শীতল হবে, তারা কষ্ট পাবে না এবং তুমি তাদের যা দিয়েছ তাতে তারা সবাই সন্তুষ্ট হবে। আর তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, পরম সহনশীল"। [সূরা আহযাব, আয়াত: ৫১]

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললাম, আমি তোমার রবকে দেখতে পেলাম, সে সবসময় তোমার চাহিদার পিছনে দৌঁড়ে।

কোন কোন বিষয় ছিল, যেগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিজের জন্য পছন্দ করত বা তার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগ্রহ ছিল, তখন আল্লাহ রাব্বূল আলামীন তার চাহিদা মোতাবেক কোরআন নাযিল করত; ফলে এর দ্বারা প্রমাণিত হত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কামনা করেছেন বা তার মন যা চেয়েছে তা ছিল প্রশংসনীয় ও ভালো চাহিদা বা ভালো প্রবৃত্তি। এখানে যে কথাটি প্রমাণিত হয়, তা হল প্রবৃত্তি বা চাহিদা মানেই কোন খারাপ বা মন্দ কিছু নয়; তা ভালোও হতে পারে আবার মন্দও হতে পারে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব বিষয়গুলো কামনা করতেন, তার মধ্যে একটি বিষয় ছিল, তিনি কিবলাকে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে ফিরিয়ে কাবার দিক করাকে পছন্দ করেন। এর কারণ সম্পর্কে ওলামারা বলেন, তিনি ইবরাহীম আ. এর কিবলার অনুসরণ করাকে পছন্দ করেতেন বলেই, কিবলার পরিবর্তন চাইতেন। এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মনের চাহিদা ছিল, কিন্তু মনের চাহিদা হওয়ার কারণে একে খারাপ বলা যাবে না। কেননা, এর পিছনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ত সৎ ও ভালো ছিল। তিনি ইব্রাহিম আ. এর নির্মিত কাবার অনুকরণ করাকে পছন্দ করছেন। আর ইব্রাহীম

আ. এর নির্মিত কাবাকে পছন্দ করার কামনা করা হল, প্রসংশনীয় কামনা ও প্রসংশনীয় উদ্যোগ।

আবি বারযা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُم شَهَوَاتِ الغَيِّ فِي بُطُونكُمْ وَفُرُوجِكُمْ، وَمُضِلَّاتِ الْهَوَى »

“আমি তোমাদের উপর যে জিনিষটি অধিক ভয় করি তা হল, তোমাদের পেট, লজ্জাস্থান ও গোমরাহ প্রবৃত্তির চাহিদা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতের বিষয়ে সব ধরনের প্রবৃত্তিকে ভয় করেননি। বরং তিনি তার প্রবৃত্তির কু-মন্ত্রণা ও প্রবৃত্তির খারাপ চাহিদাসমূহকে ভয় করেন। প্রবৃত্তির চাহিদা কখনো কখনো গোমরাহ হয়ে থাকে। এ ধরনের প্রবৃত্তি মানুষের দ্বীন ও জ্ঞানকে নষ্ট করে। মানুষকে আল্লাহর স্মরণ আখেরাত হতে ফিরিয়ে রাখে। আর যে সব প্রবৃত্তি গোমরাহ হয় না, তা কখনোই মানুষের দ্বীন ও জ্ঞানকে নষ্ট করে না। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে সব ধরনের প্রবৃত্তি হতে সতর্ক করেননি। তিনি শুধু যে সব প্রবৃত্তি মানুষকে খারাপ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, তাকে খারাপ বলেছেন তার থেকে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন।

তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে, প্রবৃত্তি মানুষের জন্য খুবই মারাত্মক; একারণেই আমরা দেখতে পাই কুরআনের আয়াত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস, সাহাবায়ে কেরাম, সালফে সালেহীন এবং তাদের পরবর্তী মনিষীরা প্রবৃত্তির অধিক নিন্দা করেন এবং প্রবৃত্তি হতে মানুষকে অধিক সতর্ক করেন। এ সব কুরআন, হাদিস ও সাহাবীদের উক্তি দ্বারা যে প্রবৃত্তির নিন্দা বা সতর্ক করা হয়েছে, তা হল খারাপ প্রবৃত্তি ও কু-প্রবৃত্তি। তবে সব ধরনের প্রবৃত্তিকে নিন্দা করা হয়নি।

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম রহ. বলেন, সাধারণত দেখা যায়, মানুষ তাদের চাহিদার পিছনে দৌড়ে এবং প্রবৃত্তির পূজারিই হয়ে থাকে এবং তাদের জন্য যতটুকু উপকারী সে সীমানা পর্যন্ত অবস্থান করে না এবং সীমা অতিক্রম করা হতে বিরত থাকে না। তাই কুরআন ও হাদিসে ঢালাওভাবে প্রবৃত্তির দুর্নাম ও প্রবৃত্তি বিষয়ে অধিক সতর্ক করা হয়েছে। কারণ, প্রবৃত্তি সাধারণত মানুষের উপকারের চেয়ে ক্ষতির কারণ অধিক হয়ে থাকে। এ ছাড়া যে ব্যক্তি প্রবৃত্তি বিষয়ে ইনসাফ করে এবং সীমা অতিক্রম করে না এ ধরনের লোক খুব কমই পাওয়া যায়। এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার স্বীয় কিতাবে প্রবৃত্তির নিন্দা করেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতে দু-একটি জায়গা ছাড়া সব জায়গায় প্রবৃত্তির শুধু নিন্দাই বর্ণিত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতে প্রবৃত্তির দুর্নাম বা নিন্দা করা হয়নি এমন একটি হাদিস হল, উপরে উল্লেখিত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহু এর হাদিস।

অপর একটি হাদিস আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« لَا يُؤْمِن أَحدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبعاً لمَا جِئْتُ بِهِ »

"তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যে বিধান নিয়ে এসেছি তার অনুকরণ না করে"।

এ হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, প্রবৃত্তির একটি প্রকার আছে, যেটি প্রশংসনীয় প্রবৃত্তি আর তা হল, যে প্রবৃত্তি ইসলামী শরিয়ত যে বিধান নিয়ে আসছে তার অনুগত ও মোতাবেক হয়। আর যে প্রবৃত্তি ইসলামী শরিয়তের সাথে সংঘর্ষিক হয়, তা হল কু-প্রবৃত্তি বা শয়তানি-প্রবৃত্তি।

ওমর ইবন খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« لما كان يوم بدر، فلما أسروا الأسارى قال رسول الله لأبي بكر وعمر **مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الأَسَارَى** فقال أبو بكر :يا نبي الله، هم بنو العم

والعشيرة؛ أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام .فقال رسول الله **مَا تَرَى يَا ابْنَ الخَطَّابِ** قلت : لا والله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان – نسيبا لعمر -فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها .فهوي رسول الله ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت »

"বদরের যুদ্ধে যুদ্ধ-বন্দীদের বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ চেয়ে আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিআল্লাহু আনহু উভয়কে জিজ্ঞাসা করে বললেন, তোমরা তাদের ব্যাপারে কি মতামত দাও? উত্তরে আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর নবী! তারা আমাদের বাপ-চাচাদের বংশধর এবং আমারা একই বংশের লোক। আপনি তাদের থেকে কিছু ফিদিয়া গ্রহণ করে তাদের ছেড়ে দিন। এতে তারা খুশি হয়ে আমাদের বিরোধিতা করবে না, আমাদের পক্ষের লোক হয়ে যাবে, যা পরবর্তী আমাদের জন্য কাফেরদের বিপক্ষ শক্তি হিসেবে উপকারে আসবে। আশা করি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের ইসলামের প্রতি পথ দেখাবেন। আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু কথা শোনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমর ইবনুল খাত্তাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, হে ওমর! তোমার মতামত কি? ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলল, না আমি আবু বকর যে মতামত দিয়েছে তার সাথে মোটেও একমত নই। তবে আমার কথা হল, আপনি আমাদের সুযোগ দেবেন আমরা তাদের

সকলকে হত্যা করে ফেলবো। আলী রাদিআল্লাহু আনহু কে সুযোগ দেয়া হবে, সে চাচাতো ভাই আকীলকে হত্যা করবে। আমাকে আমার বংশের লোক অমুকের বিষয়ে সুযোগ দেবেন আমি তাকে হত্যা করব। কারণ, এরা সবাই হল কুফরের লিডার ও ইমাম। এদের হত্যার কোন বিকল্প হতে পারে না। তাদের উভয়ের মতামত শোনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু এর মতামতকে প্রাধান্য দেন। ওমর রাদিআল্লাহু আনহু এর কথার প্রতি তেমন কোন গুরুত্ব দেননি"।

এ হল, আমাদের নবী যিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ। তিনি প্রথমে আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু এর কথার প্রতি আকৃষ্ট হন। কারণ, তিনি বাহ্যিকভাবে দেখতে পেলেন যে এ মতের মধ্যে রয়েছে ইসলামের কল্যাণ এবং এটি হল প্রশংসনীয় প্রবৃত্তি। কারণ, সে যে চিন্তা করেছিল তা ছিল ইলমের উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। অথচ কুরআন নাযিল হয়েছে, ওমর রাদিআল্লাহু আনহু এর মতের উপর ভিত্তি করে।

পরিশিষ্ট

মনে রাখতে হবে নফসের বিরোধিতা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, আত্মার জন্য তা অতি কষ্টদায়ক এবং শরীরের উপর অনেক চাপ। কিন্তু এর পরিণতি অত্যন্ত ভালো এবং ফলাফল খুবই মধুর। নফসের বিরোধিতা করার ফলাফল লাভ হতে একমাত্র তারাই বঞ্চিত হয়, যাদের সাহস দুর্বল ও মানসিকতা কুলসিত। আবুল আতাহিয়া রহ. বলেন,

أَشَدُّ الجِهَادِ جِهَادُ الهَوَى

وَمَا كَّرمَ المَرْءَ إِلَّا التُّقَى

"সবচেয়ে বড় যুদ্ধ হল নফসের সাথে যুদ্ধ করা। আর তাকওয়া ছাড়া একজন মানুষকে আর কিছুই সম্মান দিতে পারে না"।

অপর একজন কবি বলেন,

صَبَرْتُ علَى الأيَامِ حَتَّى تَوَلَّتِ

وَأَلْزَمْتُ نَفْسِي صَبْرَهَا فَاسْتَمَرَّتِ

وَما النفْسُ إلَا حَيْثُ يجْعَلُهَا الفَتَى

فَإِنْ أُطْمِعَتْ تَاقَتْ وَإِلَّا تَسَلَّتِ

“আমি যুগের মুসিবতের উপর ধৈর্যধারণ করি, ফলে তা আমাকে পৃষ্ট পদর্শন করে। আর আমি আমার আত্মার উপর ধৈর্য ধারণ করাকে চাপিয়ে দেই, ফলে তার কখনো বিচ্যুতি ঘটেনি। আর হে যুবক তুমি মনে রাখবে, নফসের বৈশিষ্ট্য হল, তুমি তাকে যেখানে লাগাবে সে সেখানেই ব্যবহৃত হবে। যখন তুমি তাকে প্রলোভন বা যোগান দিবে তখন সে শক্তিশালী হবে, অন্যথায় সে নিস্তেজ হয়ে থাকবে”।

প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার বড় আলামত হল, দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্য ও সৌন্দর্য হতে বিরত থাকা। মালেক ইব্ন দীনার রহ. বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য ও ধোঁকা হতে দূরে থাকতে পারবে প্রকৃত পক্ষে সেই তার নফসের উপর বড় বিজয়ী বলে বিবেচিত হবে।

প্রবৃত্তির অনুসরণ করা শুধু মূর্খ-জাহেল বা বাচ্চাদের বৈশিষ্ট্য নয় যা তাদের পথহারা করে বরং প্রবৃত্তির অনুসরণ সব ধরনের মানুষের বৈশিষ্ট্য। এমনকি আলেম-ওলামা, জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী ও পরামর্শক সব ধরনের লোকের অন্তরে প্রবৃত্তি বা খারাপ আত্মা বিদ্যমান থাকে। নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, আবাল-বৃদ্ধা কেউ নফস বা প্রবৃত্তির চাহিদা হতে নিরাপদ নয়।

কোন এক জ্ঞানী বলেছিল, একজন অভিজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী ও জ্ঞানী সেও অপরের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য যাতে সে তার মতামতকে তার নফসের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারে।

সুতরাং, কেউ এ কথা বলতে পারবে না যে, প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে যে নিষেধ করা হয়েছে, আমি তার আওতার বাহিরে। কারণ, আমিতো প্রবৃত্তির অনুসরণ করি না। মনসুর আল-ফকীহ রহ. বলেন,

إِنَّ الْمَرَائِيَ لَا تُرِيكَ خُدُوشَ وَجْهِكَ فِي صَدَاهَا

وَكَذَاكَ نَفْسُكَ لَا تُرِيكَ عُيُوبَ نَفْسِكَ فِي هَوَاهَا

তোমার চেহারায় যে সব দাগ রয়েছে তা তুমি প্রত্যক্ষ করতে পারবে না। [বরং তোমার চেহারার দাগগুলো অপরের চোখে প্রদর্শিত হবে।] অনুরূপভাবে তুমি তোমার নফসের দোষ-ত্রুটিগুলো কখনোই দেখতে পারবে না। [অপরের নিকট তা অবশ্যই ধরা পড়বে।]

অনেক সময় দেখা যায় আমরা যাদের সবচেয়ে জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও দ্বীনদার বলে বিবেচনা করি সেও তার নফসের ধোঁকায় পড়ে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে বিরত থাকতে পারে না।

আমরা আল্লাহ রাব্বূল আলামীনের দরবারে কামনা করি আল্লাহ রাব্বূল আলামীন যেন আমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণের উপকরণ থেকে রক্ষা করে, আর আমাদের থেকে গোমরাহিকে দূর করে এবং আমাদের যেন তিনি ভালো ও সৎ কাজ করার তাওফিক দান করে।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

— মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জেদ

অনুশীলনী

তোমার সামনে দুই ধরনের প্রশ্ন পেশ করা হল, এক ধরনের প্রশ্ন যে গুলোর উত্তর তুমি সাথে সাথে দিতে পারবে। আর এক ধরনের প্রশ্নের উত্তর তুমি সাথে সাথে দিতে পারবে না, বরং তোমাকে একটু চিন্তাভাবনা করে উত্তর দিতে হবে।

প্রথম প্রকার প্রশ্ন:

১. প্রবৃত্তির আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা কর।

২ প্রবৃত্তির অনুসরণের কতগুলো কারণ আছে সেগুলো কি তা বর্ণনা কর।

৩. প্রবৃত্তির অনুসরণে অনেক ক্ষতি ও নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে সেগুলো কি তা আলোচনা কর।

৪. প্রবৃত্তির অনুসরণ এর চিকিৎসা কি?

দ্বিতীয় প্রকার প্রশ্ন:

১- প্রবৃত্তির অনুসরণ করার কারণে কখন মানুষকে শাস্তি দেয়া হয়?

২- নফসের বিরোধিতা করার অনেকগুলো ফায়দা আছে সেগুলো কি তা তোমার সাধ্য অনুযায়ী আলোচনা কর!

৩- কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সাতজন ব্যক্তি তার আরশের তলে ছায়া দেবেন তাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটি কারণ পাওয়া যায় তার ব্যাখ্যা কি তা আলোচনা কর।

৪- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به »

[অর্থ, তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসারী না হয়]

এ হাদিস দ্বারা তুমি কি বুঝলে তা আলোচনা কর।

৫- নফসের বিরোধিতা করা সবচেয়ে বড় আলামত কোনটি? তা আলোচনা কর।

সূচীপত্র

অন্তর বিধ্বংসী বিষয়: দুনিয়ার মহব্বত
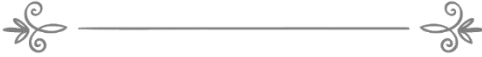
মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদক : জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: ٠٠٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

OFFICERABWAH

مفسدات القلوب [حب الدنيا]

(باللغة البنغالية)

محمد صالح المنجد

ترجمة: ذاكرالله أبوالخير

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

OFFICERABWAH

সূচিপত্র

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা............

দুনিয়ার মহব্বত একটি মারাত্মক ব্যাধি, যা মানবাত্মাকে ধ্বংস করে দেয় এবং মানবজাতিকে আখিরাত বিমুখ করে। এ রেসালাটিতে দুনিয়ার হাকীকত কী, দুনিয়াতে মুমিনদের অবস্থান ও দুনিয়ার সাথে তাদের সম্পর্কের মানদণ্ড কেমন হওয়া উচিৎ, দুনিয়ার মহব্বত ও আসক্তির কারণে মানব জীবনে কী কী প্রভাব পড়তে পারে, কী ক্ষতি হতে পারে, তার চিকিৎসা কী এবং দুনিয়ার প্রতি আসক্তির কারণসমূহ এ রিসালাটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার যিনি সমগ্র জাহানের রব। আর সালাত ও সালাম নাযিল হোক সমস্ত নবীগণের সেরা ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। আরও সালাত ও সালাম নাযিল হোক তার পরিবার, পরিজন ও সাথী-সঙ্গীদের ওপর।

মনে রাখতে হবে, মানুষের অন্তর হলো, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রাজা আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হলো, তার অধীনস্থ প্রজা। যখন রাজা ঠিক হয়, তখন তার অধীনস্থ প্রজারাও ঠিক থাকে। আর যখন রাজা খারাপ হয়, তার অধীনস্থ প্রজারাও খারাপ হয়। নোমান ইবন বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسِدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ ٱلْقَلْبُ»

“সাবধান! তোমাদের দেহে একটি গোস্তের টুকরা আছে, যখন টুকরাটি ঠিক থাকে তখন সমগ্র দেহ ঠিক থাকে, আর যখন গোস্তের টুকরাটি খারাপ হয় তখন তোমাদের পুরো দেহ খারাপ হয়ে যায়, আর তা হলো, মানবাত্মা বা অন্তর।

মানবাত্মা হলো, শক্তিশালী দুর্গের মতো, যার আছে অনেকগুলো দরজা, জানালা ও প্রবেশদ্বার। আর শয়তান হলো, অপেক্ষমাণ সুযোগ সন্ধানী শত্রুর মতো, যেসব সময় দুর্গে প্রবেশের জন্য সুযোগ খুঁজতে এবং চেষ্টা করতে থাকে; যাতে দুর্গের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব নিজেই করতে পারে।

এ দুর্গকে রক্ষা করতে হলে, তার দরজা ও প্রবেশদ্বারসমূহে অবশ্যই পাহারা দিতে হবে। দুর্গের প্রবেশ দ্বারাসমূহ রক্ষা না করতে পারলে দুর্গকে রক্ষা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সুতরাং একজন জ্ঞানীর

জন্য কর্তব্য হলো, তাকে অবশ্যই দুর্গের দরজা ও প্রবেশদ্বারসমূহ চিহ্নিত করে তাতে প্রহরী নির্ধারণ করে দেওয়া, যাতে সে তার স্বীয় দুর্গ- মানবাত্মাকে অপেক্ষমাণ, সুযোগ সন্ধানী শত্রু-শয়তান থেকে রক্ষা ও মানবাত্মা থেকে তাকে প্রতিহত করতে পারে। আর শয়তানটি যাতে তার কোনো ক্ষতি করতে তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারে। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে মানবাত্মার জন্য শয়তানের প্রবেশদ্বার অসংখ্য অগণিত; সবগুলোকে বন্ধ করে দিতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি বলা যেতে পারে, যেমন হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, কৃপণতা, রাগ, ক্ষোভ, শত্রুতা, খারাপ ধারণা, দুনিয়ার মহব্বত, তাড়াহুড়া করা, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও চাকচিক্যের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, ঘর-বাড়ী এবং নারী-গাড়ীর মোহে পড়া ইত্যাদি।

আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে এ কিতাবে মানবাত্মার জন্য বিধ্বংসী বিষয়সমূহের আলোচনার ধারাবাহিকতায় শয়তানের প্রবেশদ্বারসমূহ থেকে সর্বশেষটি অর্থাৎ দুনিয়ার মহব্বত বিষয়ে

আলোচনা করব। দুনিয়ার হাকীকত কী, দুনিয়াতে মুমিনদের অবস্থান ও দুনিয়ার সাথে তাদের সম্পর্কের মান-দণ্ড কেমন হওয়া উচিৎ, তা এ কিতাবে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরতে প্রয়াস চালাবো। তারপর দুনিয়ার মহব্বত ও আসক্তির কারণে মানব জীবনে কী কী প্রভাব পড়তে পারে, কী ক্ষতি হতে পারে, তার প্রতিবিধান কী এবং দুনিয়ার প্রতি আসক্তির কারণসমূহ আলোচনা করব।

এ পুস্তিকাটি তৈরি করা ও এটিকে একটি সন্তোষজনক অবস্থানে দাঁড় করাতে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আমি কখনোই ভুলবো না।

আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন দুনিয়াকে আমাদের লক্ষ্য না বানান, আমাদের জ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায় নির্ধারণ না করেন এবং আমাদের গন্তব্য যেন জাহান্নাম না করেন।

আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট আরও প্রার্থনা করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন আমাদের দুনিয়া ও

আখিরাতের স্থায়ী ও চিরন্তন কল্যাণ দান করেন এবং আমাদের ক্ষমা করেন। আমীন।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

সালেহ আল-মুনাজ্জেদ

দুনিয়ার হাকীকত

দুনিয়ার হাকীকত কী এ বিষয়ে অনেক কথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তবে এ বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের যে ধারণা বা জ্ঞান দিয়েছেন, তাই একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য। কারণ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই এ জগতের সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক; তার চেয়ে অধিক জানার অধিকার আর কারো হতে পারে না। তিনিই সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে কুরআনে কারীমের বিভিন্ন জায়গায় মানবজাতিকে বুঝান। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন,

﴿ٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا لَعِبٞ وَلَهۡوٞ وَزِينَةٞ وَتَفَاخُرُۢ بَيۡنَكُمۡ وَتَكَاثُرٞ فِي ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَوۡلَٰدِۖ كَمَثَلِ غَيۡثٍ أَعۡجَبَ ٱلۡكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصۡفَرّٗا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمٗاۖ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٞ شَدِيدٞ وَمَغۡفِرَةٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٞۚ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ ٢٠﴾

[الحديد: 20]

“তোমরা জেনে রাখ যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহংকার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা হলো বৃষ্টির মতো, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর আখিরাতে আছে কঠিন আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।” [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ২০]

আয়াতের তাফসীর: আল্লামা কুরতবী রহ. বলেন, এ আয়াতে ما শব্দটি সম্পর্ক স্থাপনকারী। আয়াতের অর্থ হলো, তোমরা জেনে রাখ! দুনিয়ার জীবন হলো, নিষ্ফল ও অনর্থক খেলাধুলা এবং আনন্দদায়ক কৌতুক ও বিনোদন। তারপর তা অচিরেই নিঃশেষ ও ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লামা কাতাদাহ রহ. বলেন, ক্রীড়া ও কৌতুক শব্দদ্বয়ের অর্থ হলো, খাওয়া ও পান করা। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন হলো, কেবলই খাওয়া ও পান করার নাম, এ ছাড়া

আর কিছু না। আবার কেউ কেউ বলেন, শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই এখানে উভয় শব্দ তার নিজস্ব অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। আল্লামা মুজাহিদ রহ. বলেন, শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই- দু'টির অর্থ একই। অর্থাৎ সব খেলাধুলাই কৌতুক আবার সব কৌতুকই খেলাধুলা।[1]

আল্লামা ইবন কাসীর রহ. বলেন, "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার জীবনের বিষয়টিকে নিকৃষ্ট ও নগণ্য আখ্যায়িত করে বলেন, ﴿أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ﴾ "দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহংকার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র"। অর্থাৎ দুনিয়াদারদের নিকট দুনিয়ার নির্যাস ও সারসংক্ষেপ এর ব্যতিক্রম কিছু নয়। যেমন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্যত্র বলেন,

[1] তাফসীরে কুরতুবী [১৭/২৫৪]

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلۡبَنِينَ وَٱلۡقَنَٰطِيرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡخَيۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ وَٱلۡحَرۡثِۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلۡمَـَٔابِ﴾ [آل عمران:14]

মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালবাসা- নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যখেত। এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগ সামগ্রী। আর আল্লাহ, তাঁর নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তন স্থল”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪] তারপর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার জীবনের একটি উপমা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, দুনিয়ার জীবন হলো, সাময়িক চাকচিক্য ও সৌন্দর্য এবং ক্ষণস্থায়ী নি‘আমত, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই। তিনি আরও বলেন, দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত হলো, كَمَثَلِ غَيۡثٍ সেই বৃষ্টির মতো, যে বৃষ্টির প্রতীক্ষা করতে করতে মানুষ হতাশ হয়, তারপর হঠাৎ বৃষ্টি এসে যায়। যেমন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ مِنۢ بَعۡدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحۡمَتَهُۥۚ وَهُوَ ٱلۡوَلِيُّ ٱلۡحَمِيدُ ۝٢٨﴾ [الشورى: 28]

“আর তারা নিরাশ হয়ে পড়লে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন। আর তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসিত।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ২৮] আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী: أَعۡجَبَ ٱلۡكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ অর্থ: বৃষ্টির দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদের খুশি করে ও আনন্দ দেয়। যেমনিভাবে বৃষ্টির দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদের খুশি করে এবং আনন্দ দেয়, অনুরূপভাবে কাফিরদেরও দুনিয়ার জীবন সাময়িক খুশি করে এবং আনন্দ দেয়। কারণ, তারা দুনিয়ার জীবনের প্রতি সর্বাধিক আসক্ত ও লোভী এবং দুনিয়ার সব মানুষের তুলনায় তারাই দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে। ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصۡفَرّٗا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمٗاۖ অতঃপর উৎপাদিত ফসল শুকিয়ে যায়, তখন তুমি দেখতে পাবে ফসলগুলো হলুদ বর্ণের। অথচ এসব ফসল একটু আগেও তরতাজা ও সবুজ বর্ণের ছিল। তারপর তুমি দেখতে পাবে এ

ফসলগুলো সব শুকিয়ে খড়-কুটো ও ধুলায় পরিণত। এটিই হলো দুনিয়ার জীবনের উপমা ও দৃষ্টান্ত, প্রথমে দুনিয়ার জীবনকে আমরা দেখতে পাই সবুজ শ্যামল ও তরতাজা। তারপর ধীরে ধীরে তা দুর্বল হতে থাকে। অতঃপর একটি সময় আসে, তখন সে বুড়ো হয়ে যায়; তার নিজস্ব কোনো শক্তি, জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্ম ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে না। একজন মানুষ তার জীবনের শুরুতে তরতাজা ডালের মত যুবক, কর্মক্ষম ও শক্তিশালী থাকে; তা শক্তি সামর্থ্য বাহাদূরী ও কর্মতৎপরতা মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয় এবং মানুষ তাকে দেখে অভিভূত ও মুগ্ধ হয়। তারপর সে ধীরে ধীরে বার্ধক্যের দিকে ধাবিত হতে থাকে, অবস্থার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়; কর্মক্ষমতা, শক্তি ও সামর্থ্য লোপ পায় এবং বার্ধক্য তার ওপর অনাকাঙ্ক্ষিত আক্রমণ ও আগ্রাসন চালায়। ফলে সে ধীরে ধীরে একেবারেই নিঃশক্তি, দুর্বল, কুনকুনে বুড়ো হয়ে যায়, এখন আর নড়চড় করতে পারে না এবং কোনো কিছুই জয় করতে পারে না, সবকিছু তাকেই জয় করে। যার হুংকারে থরথর করত মাটি, আজ সে মাটিতেই

লোকটি গড়াগড়ি করে, নিজের শরীর থেকে কর্দমাক্ত মাটিগুলো পরিষ্কার করার কোনো শক্তি তার নেই। আহ্‌! কী করুণ পরিণতি! কী নিদারুণ এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও বলেন,

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعۡفٖ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ ضَعۡفٖ قُوَّةٗ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٖ ضَعۡفٗا وَشَيۡبَةٗۚ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡقَدِيرُ ٥٤﴾ [الروم: 54]

"আল্লাহ, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন দুর্বল বস্তু থেকে এবং দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দান করেন। আর শক্তির পর তিনি আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান"। [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৫৪]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দৃষ্টান্ত ও উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে, দুনিয়ার জীবনের অবস্থা ও পরিণতি কী হবে এবং তাদের গন্তব্য কোথায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে আরও জানিয়ে দেন, দুনিয়ার জীবন কখনোই চিরস্থায়ী নয়, দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী, দুনিয়ার

জীবন নিঃসন্দেহে শেষ ও ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী যার শুরু আছে শেষ নাই। আখিরাতের জীবনে মানুষ অনন্ত অসীম কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং আখিরাতের অফুরন্ত, অসংখ্য, অগণিত ও চিরস্থায়ী নি'আমতসমূহের প্রতি অগ্রসর হতে তাগিদ ও নির্দেশ দেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে বলেন,

﴿وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٞ شَدِيدٞ وَمَغۡفِرَةٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٞۚ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ ٢٠﴾

"আর আখিরাতে আছে কঠিন আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।" অর্থাৎ আসন্ন আখিরাতের জীবনে তোমাদের জন্য কেবলই আছে, এটি বা ওটি। অর্থাৎ হয় জাহান্নামের কঠিন আযাব অথবা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি সন্তুষ্টি, অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও দণ্ড-হীন ক্ষমা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী: وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ দুনিয়ার জীবন শুধুই ধোঁকার সামগ্রী। এর অর্থ হলো, যারা দুনিয়ার জীবনের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে তাদের এ জীবন দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী সামগ্রী শুধুই ধোঁকা দেয়। কারণ, সে দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহে পড়ে ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এ ধারণা করে যে, এ দুনিয়াই তার শেষ গন্তব্য, এ জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নেই এবং এ দুনিয়ার জীবনের পর কোনো উত্থান নেই। অথচ আখিরাতের চিরস্থায়ী হায়াতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য।[2]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন,

﴿وَٱضۡرِبۡ لَهُم مَّثَلَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا كَمَآءٍ أَنزَلۡنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلۡأَرۡضِ فَأَصۡبَحَ هَشِيمٗا تَذۡرُوهُ ٱلرِّيَٰحُۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ مُّقۡتَدِرًا﴾ ٤٥ [الكهف: 45]

[2] তাফসীরে ইবন কাসীর ৮/২৪।

“আর আপনি তাদের জন্য পেশ করুন দুনিয়ার জীবনের উপমা: তা পানির মতো, যা আমি আসমান থেকে বর্ষণ করেছি। অতঃপর তার সাথে মিশ্রিত হয় জমিনের উদ্ভিদ। ফলে তা পরিণত হয় এমন শুকনো গুঁড়ায়, বাতাস যাকে উড়িয়ে নেয়। আর আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান”। [সূরা কাহাফ, আয়াত: ৪৫]

আল্লামা তাবারী রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সম্পদশালীরা তাদের অধিক সম্পদের কারণে যেন অহংকার না করে এবং ধন-সম্পদের কারণে অন্যদের ওপর অহংকার ও বড়াই করা হতে তারা যেন বিরত থাকে। দুনিয়াদাররা যেন দুনিয়ার দ্বারা ধোঁকায় নিমজ্জিত না হয়। দুনিয়ার দৃষ্টান্ত শস্য, শ্যামল, সুজলা, সুফলা ফসলের মতো, বৃষ্টির পানির কারণে যা সৌন্দর্য-মণ্ডিত ও দৃষ্টি-বান্ধব হয়ে উঠেছিল, মানুষ যার দৃশ্য দেখে মুগ্ধ ও মোহিত হত। কিন্তু যখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে মাটি শুকিয়ে যায়, তখন ফসলের সেই সৌন্দর্য, গৌরব ও উজ্জ্বলতা আর বাকী থাকে না, ফসল হয়ে যায় হলুদ। তারপর আরও কিছুদিন অতিবাহিত হলে তা শুকিয়ে খড়-কুটে

পরিণত হয়ে অবস্থা এতই করুণ হয়, বাতাস সেগুলোকে এদিক সেদিক উড়িয়ে নিয়ে যায়। বাতাসকে প্রতিহত করার কোনো ক্ষমতা ফসলের আর অবশিষ্ট থাকে না এবং মানুষের দৃষ্টি এখন আর এসবের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। দুনিয়ার জীবনও ঠিক এসব ফসলের মতো। সুতরাং যে জীবনের এ পরিণতি তার জন্য ব্যস্ত না হয়ে আমাদের উচিৎ এমন এক জীবনের জন্য কাজ করা যার কোনো ক্ষয় নাই, যে জীবন চিরস্থায়ী যার কোনো পরিবর্তন ও বার্ধক্য নাই।[3]

আল্লামা ইবন কাসীর রহ. বলেন, "আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, হে মুহাম্মাদ তুমি মানবজাতির জন্য দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ তুলে ধর! তাদের বলে দাও! দুনিয়ার জীবন হলো সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী তা একদিন শেষ ও ধ্বংস হয়ে যাবে, দুনিয়ার কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। যেমন, আমি মহান

---

[3] তাফসীরে তাবারী ১৮/৩০।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন পানি জমিনে ছিটানো বীজের সাথে মিশে তা থেকে ফসল উৎপন্ন হয়ে তা যৌবনে উপনীত হয়। তারপর সবুজ শ্যামল হয়ে তা এক অপরূপ সৌন্দর্যে পরিণত হয়। একজন কৃষক এ অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকনে মুগ্ধ হয়। কিন্তু তা চিরস্থায়ী হয় না। তারপর নেমে আসে বিপর্যয় ও দুর্ভোগ। পানি শুকিয়ে যাওয়ার পর ফসল ধীরে ধীরে শুকিয়ে খড়-কুটে পরিণত হয়। বাতাস তখন এদিক সেদিক উড়িয়ে নিয়ে যায়, কখনো ডান দিকে নেয়, আবার কখনো বাম দিকে নেয়। বাতাসের গতিরোধ করার মতো নিজস্ব কোনো ক্ষমতা ফসলের থাকে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনি এ অবস্থার সৃষ্টিকর্তা আবার পরবর্তী অবস্থারও সৃষ্টিকর্তা"। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে এ ধরনের দৃষ্টান্ত একাধিক বার বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿إِنَّمَا مَثَلُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا كَمَآءٍ أَنزَلۡنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلۡأَرۡضِ مِمَّا يَأۡكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلۡأَنۡعَٰمُ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلۡأَرۡضُ

زُخۡرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتۡ وَظَنَّ أَهۡلُهَآ أَنَّهُمۡ قَٰدِرُونَ عَلَيۡهَآ أَتَىٰهَآ أَمۡرُنَا لَيۡلًا أَوۡ نَهَارٗا فَجَعَلۡنَٰهَا حَصِيدٗا كَأَن لَّمۡ تَغۡنَ بِٱلۡأَمۡسِۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ [يونس: 24]

“নিশ্চয় দুনিয়ার জীবনের তুলনা তো পানির ন্যায় যা আমি আকাশ থেকে নাযিল করি, অতঃপর তার সাথে জমিনের উদ্ভিদের মিশ্রণ ঘটে, যা মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু ভোগ করে। অবশেষে যখন জমিন শোভিত ও সজ্জিত হয় এবং তার অধিবাসীরা মনে করে জমিনে উৎপন্ন ফসল করায়ত্ত করতে তারা সক্ষম, তখন তাতে রাতে কিংবা দিনে আমার আদেশ চলে আসে। অতঃপর আমি সেগুলোকে বানিয়ে দেই কর্তিত ফসল, মনে হয় গতকালও এখানে কিছু ছিল না। এভাবে আমি চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করি”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ২৪]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে এ ধরনের আরও একটি উপমা পেশ করেন। দুনিয়ার জীবন দেখতে

একজন পরিদর্শকের দৃষ্টিতে খুবই সুন্দর, সে যখন নীরবে এ জীবনের সৌন্দর্য অবলোকন করতে থাকে, তখন এ জীবন তাকে অনাবিল আনন্দে ভরে দেয়। ফলে সে এ জীবনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং এ জীবনকে তার জীবনের স্থায়ী সমাধান ভাবতে থাকে। আর সে মনে করে, সে নিজেই এ জীবনের মালিক এবং এ জীবনকে ধরে রাখতে সে নিজেই সক্ষম। ঠিক এ মুহূর্তে আকস্মিকভাবে যে জীবনের প্রতি এত নির্ভরশীল ও আসক্ত ছিল, সে জীবনকে তার থেকে চিনিয়ে নেয়া হয়। তৈরি করা হয় তার ও জীবনের মাঝে সুবিশাল নিশ্ছিদ্র প্রাচীর। তখন তার হতভম্ব হয়ে চোখ উল্টিয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার এ জীবনকে জমিনের সাথে তুলনা করেন। জমিনে যখন বৃষ্টি পড়ে তখন এ বৃষ্টির পানি বীজের সাথে মিশে খুব সুন্দর ও দৃষ্টি নন্দন ফসল উৎপন্ন হয়। ফসলের অপরূপ সৌন্দর্য একজন দর্শকের দৃষ্টিকে ভরে দেয় অনাবিল আনন্দে। তখন সে ধোঁকার বশবর্তী হয়ে ধারণা করে যে, সে নিজেই ফসল উৎপাদন করতে

সক্ষম এবং এ ফসলের সে নিজেই প্রকৃত মালিক ও নিয়ন্ত্রক। তখন হঠাৎ করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ এসে যায় এবং আক্রান্ত হয় জমিনের ফসল। আর ফসলের অবস্থা এতই করুণ হয় যে, যেন এখানে কখনোই কোনো ফসলী জমি ছিল না। তখন তার ধারণা ও বিশ্বাস একেবারেই পর্যবসিত হয়, তার হাত একদম খালি হয়ে যায়। অনুরূপভাবে দুনিয়ার জীবনের অবস্থা এবং যারা দুনিয়ার জীবনে আঁকড়ে ধরে তাদের পরিণতি। এ দৃষ্টান্ত হলো, দুনিয়ার জীবনের সর্ব উৎকৃষ্ট ও সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত।[4]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও বলেন,

﴿وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٦٤﴾ [العنكبوت: 64]

[4] এলামুল মুউকীয়ীন ১/১৫৩।

“আর এ দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং নিশ্চয় আখিরাতের নিবাসই হলো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত”। [সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৬৪]

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ الدُّنْيَا حُلَوةٌ خَضَرة وَإِنَّ اللهَ مسْتخْلفِكُمْ فيِهَا، فَينْظُر كَيفَ تَعمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النسَّاءَ، فَإن أَوَّلَ فتْنَة بْنِي إسَرائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ »وفي رواية: «لِينظْر كْيفَ تْعمَلُونَ»

“অবশ্যই দুনিয়ার জীবন খুবই মজাদার ও সুন্দর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদের এ দুনিয়াতে তার প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেন। তিনি দেখেন তোমরা জমিনে কোনো ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা কর। তোমরা দুনিয়াকে ভয় কর এবং নারীদের ভয় কর। কারণ, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে প্রথম ফিতনা ছিল নারীদের নিয়ে। অপর একটি বর্ণনায় আছে: যাতে তিনি অবলোকন করেন তোমরা কি কাজ কর”। আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু

আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الدنَيا متَاعٌ، وَخَيْرُ متَاعِ الدُّنْيَا المَرْأَةُ الصَّالحَةُ»

“দুনিয়া হলো, ভোগের পন্য আর সর্বাধিক উত্তম ভোগের পন্য হলো, নেককার নারী”।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الدُّنَيا سِجْنُ المُؤْمِنِ وجَنة الْكَافر»

“দুনিয়া মুমিনদের জন্য জেলখানা আর কাফিরদের জন্য জান্নাত”।[5]

একজন মুমিন ইচ্ছা করলে দুনিয়াতে যা ইচ্ছা তা করতে পারে না। তাকে একটি নিয়ম-কানূন এবং বিধি-বিধান মেনে চলতে হয়। পক্ষান্তরে একজন কাফিরকে কোনো বিধি-বিধান কিংবা নিয়ম কানুনের পাবন্দি করতে হয় না, সে যখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। এ কারণেই হাদীসে

---

[5] সহীহ মুসলিম।

দুনিয়াকে মুমিনদের জন্য জেলখানা বলা আর কাফিরদের জন্য জান্নাত বলা হয়েছে। এ ছাড়া কাফিররা যখন মারা যাবে তাদের মৃত্যুর পর তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। আর জাহান্নামের শাস্তি যে কত ভয়াবহ তা আমাদের কারো অজানা নয়। জাহান্নামে নিদারুন বেদনাদায়ক শাস্তির তুলনায় দুনিয়া কাফিরদের জন্য জান্নাত স্বরূপ আর মুমিনদের জন্য জাহান্নাম। মুমিনরা তাদের মৃত্যুর পর তাদের গন্তব্য হবে জান্নাত। জান্নাতে তারা পরম সুখ ও অনাবিল আনন্দ ভোগ করতে থাকবে। চিরদিন তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দেওয়া নাজ-নি'আমত ভোগ করতে থাকবে। তা হতে তারা বের হবে না। জান্নাতের এ পরম সুখের তুলনায় দুনিয়ার জীবনটি তাদের জাহান্নাম তথা কারাগারের মত। তাই হাদীসে দুনিয়াকে মুমিনদের জন্য কারাগার বা জেলখানা বলা হয়েছে। মুস্তাওরাদ ইবন সাদ্দাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا الدُّنْيَا فِي الآخرة إِلَّا مِثْلُ مَا يَجعلُ أَحَدُكُمْ أُصبعهُ فِي الْيَمِّ فَلَينظُر بمَا تَرْجِعُ»

“দুনিয়ার জীবন দৃষ্টান্ত আখিরাতের জীবনের তুলনায় এমন, যেমন তোমাদের কেউ অকুল সমুদ্রে একটি আঙ্গুল রাখল, তারপর তা তুলে ফেলল, তখন তার আঙ্গুলের সাথে যতটুকু পানি উঠে আসে দুনিয়ার জীবনও আখিরাতের তুলনায় তার মতো। সে যেন চিন্তা করে দেখে সমুদ্রের পানির তুলনায় তার আঙ্‌গুলের সাথে উঠে আসা পানির পরিমাণ কতটুকু”।

সমুদ্রের পানির তুলনায় আঙ্গুলের সাথে উঠে আসা পানি কোনো পরিমাণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না। তা এতই নগণ্য যে দুনিয়ার কোনো অংক তা ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝাতে পারবে না। আখিরাতের জীবন অনন্ত অসীম যার শুরু আছে শেষ নাই। আখিরাতের জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবন একেবারেই হিসাবের বাহিরে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোঝানের জন্য একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন মাত্র।

দুনিয়া ও ঈমাদার

মুমিনদের দুনিয়ার জীবন মুল লক্ষ্য হতে পারে না। তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হলো আখিরাত। তাই মুমিনরা দুনিয়াতে তাদের যাবতীয় কর্ম দ্বারা আখিরাত লাভের চেষ্টা চালিয়ে যায়। দুনিয়া মুমিনদের জন্য আখিরাতের পথ চলার সাময়িক বিশ্রামাগার। পথিক যেমন পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কোথাও ছায়া তালাশ করে সেখানে বিশ্রাম নেয় অনুরূপ একজন মুমিনের জন্য আখিরাতের কল্যাণ হাসিলের লক্ষ্যে কাজ করতে করতে বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। আর দুনিয়া হলো, তাদের বিশ্রামাগার।

দুনিয়ার জীবন বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়াতে প্রেরণ করছে মানবজাতিকে দুনিয়ার অন্ধকার থেকে বের করে আলোর সন্ধান দিতে এবং সরল পথ দেখাতে। দুনিয়ার রাজত্ব বা বাদশাহী করতে তাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয় নি। দুনিয়ার কোনো কিছুর

প্রতি তার কোনো আগ্রহ ছিল না। তাকে দুনিয়ার নারী, বাড়ী, গাড়ী ও রাজত্ব সবকিছুই দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তিনি কোনো কিছুই গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেছিলেন আমি এক বেলা খাব অপর বেলা উপবাস থাকবো এটাই আমার নিকট বেশি পছন্দনীয়। তিনি সাদাসিধে জীবন-যাপন করতে পছন্দ করতেন। কোনো প্রকার উচ্চাভিলাষ ও রং তামাশা করতে পছন্দ করতেন না। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেন,

«.. وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من آدم حشوها ليف ، وإن عند رجليه قَرَظاً مصبوباً، وعند رأسه أَهَبٌ معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت، فقال: ما يُبكْيِكَ؟ يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال: «أمَا تَرْضى أَنْ تَكُونَ لهُمْ الدُّنْيَا وَلَنَا الِآخرَةُ»

“একদিন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে খেজুর পাতার বিছানা শুয়ে থাকতে দেখি। খেজুর পাতার বিছানার উপর আর কিছুই বিছানো ছিল না, তার

মাথার নিচে একটি চামড়ার বালিশ ছিল। পায়ের দিক দিয়ে একটি উন্মুক্ত তলোয়ার আর মাথার পার্শ্বে খাবারের একটি পোটলা। আমি তার মুবারক দেহে বিছানার দাগ দেখে কাঁদতে আরম্ভ করলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করে বললেন, তুমি কি কারণে কাঁদছ? আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! রোম ও পারস্যের রাজা-বাদশাহরা দুনিয়ার কত শান শওকত নিয়ে থাকে, আর আপনি আল্লাহর রাসূল; উভয় জাহানের বাদশাহ হয়ে একটি খেজুরের পাতার বিছানায় শুয়ে আছেন। আমার কথা শোনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের জন্য দুনিয়া, আমাদের জন্য আখিরাত হওয়াতে তুমি কি সন্তুষ্ট নও।”[6]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুনিয়ার সবকিছু তুলে ধরা হলো এবং তাকে দুনিয়াদারি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হলো। কিন্তু তিনি দুনিয়াকে গ্রহণ না করে তা

---

[6] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৯১৩।

প্রত্যাখ্যান করেন। দু'হাত দিয়ে দুনিয়াকে না করেন এবং দুনিয়ার প্রস্তাবকে প্রতিহত করে দুনিয়াকে পিছনে ফেলে দেন। তারপর তার সাহাবীদের কাছে দুনিয়াকে তুলে ধরা হলো এবং তাদের নিকটও দুনিয়া পেশ করা হলো। তাদের কেউ কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ অবলম্বন করল এবং দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান করল; তবে তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। আবার তাদের মধ্যে কতক আছে যাদের নিকট দুনিয়াকে পেশ করা হলে তারা বলে, হে দুনিয়া! তুমি বল, তোমার মধ্যে কি কি রয়েছে? তখন বলা হলো, হালাল, হারাম, মাকরূহ ও সংশয়যুক্ত বিষয়ের সমন্বয়েই দুনিয়া। তখন তারা বলল, দুনিয়া থেকে যা হালাল তা আমাদের দাও, এছাড়া অন্যগুলোতে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই। তারা দুনিয়ার হালাল বস্তুকে অবলম্বন করল আর হারাম, মাকরূহ ইত্যাদি প্রত্যাখ্যান করল। তারপর তাদের পরবর্তীদের জন্য দুনিয়াকে পেশ করা হলে, তারা বলল, দুনিয়ার হালাল বস্তুসমূহকে আমাদের জন্য রেখে যাও। তাদের জন্য হালাল বস্তুসমূহ তালাশ করে পাওয়া গেল

না। তখন তারা মাকরূহ ও সংশয়যুক্ত বস্তুসমূহ তালাশ করলে, দুনিয়া তাদের জানিয়ে দিল, তা তো তোমাদের পূর্বের লোকেরা গ্রহণ করে ফেলছে। তখন তারা বলল, তাহলে তুমি আমাদেরকে তোমার হারাম বস্তুসমূহ দাও, তখন তাদের হারাম বস্তুসমূহ দেওয়া হলে তারা তা গ্রহণ করল। তারপর তাদের পরবর্তীরা দুনিয়া তালাশ করলে তাদের দুনিয়া জানিয়ে দেয় যে, দুনিয়া অত্যাচারীদের কবজায় চলে গেছে। তারা দুনিয়া বিষয়ে তোমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করছে। তখন তারা দুনিয়া হাসিলের জন্য অতি উৎসাহী হয়ে বিভিন্ন কলা, কৌশল ও তাল-বাহানা অবলম্বন করে। তখন অবস্থা এত নাজুক হবে যে, কোনো অপরাধী হারাম বস্তুর দিক হাত বাড়ালে দেখতে পাবে, তার চেয়ে আরও অধিক খারাপ ও শক্তিশালী অপরাধী তার প্রতি তার পূর্বেই হাত বাড়িয়ে আছে। অথচ একটি কথা মনে রাখতে হবে, দুনিয়াতে আমরা সবাই মেহমান, আমাদের হাতে যেসব ধন-সম্পদ আছে, তা সবই আমাদের নিকট আমানত। যেমনটি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف، وماله عارية، فالضيف مرتحل، والعارية مؤادة»

“দুনিয়াতে সবাই মেহমান, আর তার ধন-সম্পদ হলো আমানত, মেহমান অবশ্যই বিদায় নেবে, আর আমানতকে প্রকৃত মালিকের নিকট আদায় করা হবে”।

এ ছিল নবী ও রাসূলগণের অবস্থা- তাদের যখন দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভ হত, তখন তাদের মধ্যে এ নিয়ে কোনো কৌতূহল, উল্লাস বা আনন্দ পরিলক্ষিত হত না, তারা এ নিয়ে গর্ব, অহংকার করত না। আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, কোনো নবীই দুনিয়ার কোনো বিষয় নিয়ে আনন্দ ও উল্লাস করেন নি”[7]।

দুনিয়া বিষয়ে সাহাবীদের অবস্থান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ দুনিয়ার প্রতি কখনোই লোভী ছিলেন না। তারা ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও তার শিক্ষা-দীক্ষার অগ্রপথিক। তাই তারাও

---

[7] তাফসীরে কুরতবী ১৩/১৭।

ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো দুনিয়া বিমুখ এবং আখিরাত অভিমুখী। সাহাবীগণ কখনো ভোগ-বিলাসের জীবন যাপন করেন নি। তারাও সাদাসিদে জীবন-যাপন করতেন। তারা ছিলেন কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির আদর্শ। সাহাবীগণ সবসময় আখিরাতকে দুনিয়ার জীবনের ওপর প্রাধান্য দিতেন।

খলিফাতুল মুসলিমীন উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেক ভালো ভালো ও সু-স্বাদু খাওয়ার খাওয়া এবং পানীয় পান করা হতে বিরত থাকতেন এবং অভিজাত ও দামী খাওয়া ও পানীয় থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন। আর তিনি বলতেন, আমি আশংকা করি আমি যেন তাদের মো না হই, যাদের বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন,

﴿وَيَوۡمَ يُعۡرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذۡهَبۡتُمۡ طَيِّبَٰتِكُمۡ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنۡيَا وَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهَا فَٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلۡهُونِ بِمَا كُنتُمۡ تَسۡتَكۡبِرُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَبِمَا كُنتُمۡ تَفۡسُقُونَ ٢٠﴾ [الأحقاف: 20]

“আর যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে (তাদেরকে বলা হবে) ‘তোমরা তোমাদের দুনিয়ার জীবনে তোমাদের সুখ সামগ্রীগুলো নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ। তোমরা যেহেতু অন্যায়ভাবে জমিনে অহংকার করতে এবং তোমরা যেহেতু নাফরমানী করতে, সেহেতু তার প্রতিফলস্বরূপ আজ তোমাদেরকে অপমানজনক আযাব প্রদান করা হবে”। [সূরা আহকাফ, আয়াত: ২০]

আবু মিজলায বলেন, কতক সম্প্রদায় এমন আছে, যারা দুনিয়ার অনেক কল্যাণ যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তা তারা হারাবে, তখন তাদের বলা হবে, أَذۡهَبۡتُمۡ طَيِّبَٰتِكُمۡ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنۡيَا وَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهَا “তোমরা তোমাদের দুনিয়ার জীবনে তোমাদের সুখ সামগ্রীগুলো নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ।” [সূরা আহকাফ, আয়াত: ২০]

আল্লামা ইবন জারির রহ. বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেন ইবন হুমাইদ, আর তিনি বলেন, আমাকে হাদীস

বর্ণনা করেন, ইয়াহিয়া ইবন ওয়াজিহ, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেন, আবু হামযা আর তিনি আতা থেকে এবং আতা আরফাযা ইবন আস-সাকাফী থেকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সূরা আলা- سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى-র তিলাওয়াত শুনতে চাইলে, তিনি আমাদের সূরাটির তিলাওয়াত শোনান। তারপর তিলাওয়াত করতে করতে যখন﴿بَلۡ تُؤۡثِرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا ١٦ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ﴾ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছল, তখন তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করে দেন এবং সাহাবীদের দিকে অগ্রসর হয়ে বলেন, আমরা কি আখিরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিই না? তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সাহাবীগণ চুপ করে বসে থাকেন। তারপর তিনি আবারো বললেন, আমরা কি দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি? কারণ, আমরা দুনিয়ার সৌন্দর্য, নারী, বাড়ী, গাড়ী ও ভালো ভালো খাদ্য-পানীয় অবলোকন করি আর আখিরাত থেকে আমরা অনেক দূরে থাকি। তাই আমরা নগদ অর্থাৎ দুনিয়াকে গ্রহণ করি, বাকী অর্থাৎ আখিরাতের প্রতি আমাদের কোনো আগ্রহ

নেই। কথাগুলো আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বিনয় অবলম্বন ও নিজেকে ছোট করে স্বীয় মর্তবা থেকে নিচে নেমে এসে বলেন, অন্যথায় তার মতো এমন একজন সাহাবী দুনিয়াকে প্রাধান্য দিবেন, তা কখনো চিন্তাই করা যায় না। অথবা তিনি কথাগুলো দ্বারা মানবজাতির অবস্থা সম্পর্কে মানুষকে জানিয়ে দেন। আল্লাহই ভালো জানেন[৪]।

আখনফ ইবন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারপর আমরা মদিনায় ফিরে এলাম এবং কুরাইশের লোকদের একটি মজলিশে উপস্থিত হলাম। তখন মোটা কাপড় পরিহিত, সুঠাম দেহের অধিকারী ও বিবর্ণ চেহারার এক লোক এসে তাদের মধ্যে উপস্থিত হলো। তারপর সে তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলল, তোমরা যারা ধন-সম্পদ একত্র করে- যাকাত আদায় করে না তাদের সু-সংবাদ দাও আগুনের তখতির, যাকে জাহান্নামের আগুনের উপর গরম করা হবে। অতঃপর তা তাদের

---

[৪] তাফসীরে ইবন কাসীর

স্তনের বোটার উপর রাখা হলে তা তাদের দুই কাঁধের পার্শ্ব দিয়ে নির্গত হবে। আর তার দুই কাঁধের ওপর রাখা হলে তা তার দুই স্তনের বোটা দিয়ে বের হয়ে আসবে। তার কথা শোনে সমবেত লোকেরা সবাই মাথা নিচু করে রাখল কেউ তার কথার কোনো প্রকার জবাব দিল না। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর লোকটি চলে গেলে আমি তার পিছু নিলাম এবং দেখতে পেলাম লোকটি একটি দেওয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসল। আমি তাকে বললাম, তুমি তাদের যা বললে তারা তা অপছন্দই করল। তিনি বললেন, ঐ সব লোকেরা কিছুই বুঝে না। আমার বন্ধু আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলে আমি তার ডাকে সাড়া দিলে তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি কাউকে দেখতে পাচ্ছ? আমি তাকিয়ে দেখলাম সূর্য ছাড়া আর কিছুই আমি দেখতে পেলাম না। আমি ধারণা করছিলাম তিনি হয়তো আমাকে কোথাও কোনো কাজে পাঠাবেন। আমার নিকট যদি সূর্যের সমপরিমাণ স্বর্ণ থাকত, আর আমি তা তিনটি দিনার ছাড়া সবই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রাহে

ব্যয় করাতে তেমন কোনো আনন্দ অনুভব করি না। অর্থাৎ তিনটি দিনারও একত্র করা বা জমা রাখা তার নিকট অ-পছন্দনীয় ছিল। তারা আসলে কিছুই বুঝে না এ কারণে তারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ একত্র করতে ব্যস্ত। আমি তাকে বললাম, তোমার ও তোমার কুরাইশ ভাইদের কি হলো, তাদের তুমি একত্র করছ না এবং তাদের থেকে তুমি আক্রান্ত হচ্ছ না। সে বলল, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শপথ করে বলছি, আমি আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকট দুনিয়া রবিষয়ে কোনো প্রকার প্রশ্ন করব না এবং দীনের বিষয়ে কোনো কিছু জানতে চাইব না।

ওয়াবরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমি হজের ইহরাম বেঁধেছি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করব কি? তিনি বললেন, তাতে তোমাকে কে বাধা দেয়? তিনি বললেন, আমি অমুকের ছেলেকে দেখেছি, সে তা অপছন্দ করে আর তুমি আমার নিকট তার চেয়ে অধিক উত্তম, তাকে আমি দুনিয়ার ফিতনায় নিপতিত হতে

দেখছি। তিনি বললেন, আমাদের বা তোমাদের মধ্যে কে আছে? যাকে দুনিয়ার ফেতনায় আক্রমণ করে নি।[9] সাহাবীদের যুগেই মানুষকে দুনিয়ার মহব্বত আক্রান্ত করে ফেলেছে। তাহলে বর্তমান যুগে আমাদের অবস্থাতো আরও অনেক নাজুক। বর্তমানে খুব কম লোকই পাওয়া যাবে যাদের দুনিয়ার মহব্বত আক্রমণ করে নি। মানুষ দুনিয়ার উপার্জনের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। কিন্তু আখিরাত লাভের জন্য সামান্য সময়ও ব্যয় করতে রাজি হয় না।

আমর ইবন কাইস রহ. থেকে বর্ণিত, এক লোক তার নিকট মুয়ায ইবন যাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হলো, তখন সে বলল, হে মৃত্যু তোমাকে ধন্যবাদ! তুমি একজন দূরের মেহমান। তুমি আমার বন্ধু আমার অভাবের সময় তুমি এসেছ। হে মৃত্যু! আমি তোমাকে ভয় করতাম, কিন্তু আজ আমি তোমার হিতাকাংখী। হে মৃত্যু! তুমি জান আমার

---

[9] সহীহ মুসলিম।

দুনিয়াকে মহব্বত ও দুনিয়াতে দীর্ঘদিন থাকাকে মহব্বত করা দুনিয়ার সৌন্দর্য, নদ-নদী ও গাছ-পালা ইত্যাদি অবলোকন করার জন্য নয়। আমি দুনিয়াতে থাকতে চাই তৃষ্ণার্তদের পিপাসা নিবারণ করতে, দুঃসময়ের বন্ধু হতে ও আলিমগণের যিকিরের অনুষ্ঠানে ভিড় জমাতে।[10]

দুনিয়া বিষয়ে তাবে'ঈদের অবস্থান

আমরা মালেক ইবন দীনার রহ. এর মুমূর্ষু অবস্থায় তার ঘরে প্রবেশ করি। তখন মৃত্যুর সঙ্গে তার পাঞ্জা লড়ছে। তিনি মাথা আসমানের দিকে ওঠালেন, তারপর বললেন, হে আল্লাহ! তুমি জান আমি দুনিয়াতে বেঁচে থাকাকে মহব্বত করা আমার পেট বাচানো বা যৌবনের তাড়নায় নয়। একদিন আবু মুসলিম আল-খাওলানী রহ. মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, এক জামাত লোক একটি মজলিসে একত্র হয়ে বসে আছে। তাদের দেখে তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন, লোকেরা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিকির বা অন্য কোনো ভালো কাজে এখানে

---

[10] মৃত্যুর সময় ঈমানের ওপর অবিচল থাকা ১১৮-১১৯।

একত্র হয়েছে। তাই তিনি নিজেও গিয়ে তাদের সাথে বসলেন। মজলিসে গিয়ে দেখলেন, একজন বলছে আমার গোলাম ফিরে এসেছে! তার এ সমস্যা। অপরজন বলছে আমার গোলামের মাল-সামান ও প্রয়োজনীয় সব কিছু যোগাড় করছি ইত্যাদি। তিনি কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! হে লোক সকল! তোমরা কি জান আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত কিরূপ? শোন! এক লোক খুব ভারি মুষলধার বৃষ্টিতে আক্রান্ত হলো, তখন সে আত্মরক্ষার জন্য এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখতে পেল, দু'টি বিশাল প্রাচীর। লোকটি মনে মনে চিন্তা করল, যদি আমি এ প্রাচীরে গিয়ে আশ্রয় নিই, তাহলে হয়ত বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাব এবং বৃষ্টির বিড়ম্বনা থেকে বাঁচতে পারব। লোকটি দৌঁড়ে গিয়ে ঐ ঘরটিতে প্রবেশ করলে দেখতে পেল ঘরটির উপরে কোনো ছাঁদ নেই। আমি তোমাদের নিকট বসলাম, আশা করছিলাম তোমরা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিকির বা কোনো কল্যাণমুলক কাজে লিপ্ত আছ। কিন্তু না, দেখি তোমরা

আসলে দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করছ। এ কথা বলে লোকটি চলে গেল[11]।

এখানে পূর্বের মনীষীগণের সীরাত থেকে কিছু নমুনা পেশ করা হলো, আর আপনি যদি এ বিষয়ে আরও বেশি জানতে চান, তাহলে ওলামাগণ এ বিষয়ের উপর যেসব কিতাবাদি লিপিবদ্ধ করেছেন তা অধ্যয়ন করতে পারেন।

দুনিয়ার মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ

দুনিয়ার প্রতি অধিক মহব্বতের কারণে সমাজে বিভিন্ন ধরনের প্রভাব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। মারামারি কাটাকাটি ইত্যাদির মুল কারণ, হলো দুনিয়ার মহব্বত। বর্তমান সমাজে আমরা দেখতে পাই ভাই ভাইয়ে সাথে, পিতা পুত্রের সাথে এবং পাড়া প্রতিবেশীর সাথে দুনিয়াকে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই আছে। অনেক সময় তা শুধু ঝগড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা হত্যা জেল-যুলুম ইত্যাদিতে রূপ নেয়। মোটকথা দুনিয়ার মহব্বত হলো সব গুনাহ পাপাচার ও অপরাধের মূল। নিম্নে এ

[11] আয-জুহুদ লি-ইবনুল মুবারক (৩৩৮)।

বিষয়ের কিছু প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা হলো। আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন।

১. মানুষকে দুনিয়ার মধ্যে ডুবে থাকতে বাধ্য করা

দুনিয়ার মহব্বত মানুষকে গুনাহে লিপ্ত থাকতে বাধ্য করে। তারা দুনিয়া লাভ করার উদ্দেশ্যে হালাল হারাম ন্যায় অন্যায় কোনো কিছুকে তোয়াক্কা করে না। যেখানেই দুনিয়া লাভ দেখে সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। আব্দুল্লাহ ইবন হারেস ইবন নওফল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন উবাই ইবন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন,

«لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا»

"মানুষ সব সময় দুনিয়ার অনুসন্ধানে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে"[12]।

২. আখিরাতের নাম বিক্রি করে দুনিয়া অর্জন করা

[12] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৯৫।

বর্তমান সমাজে এমন কিছু লোক আছে যারা দীন দ্বারা দুনিয়া কামাই করে। দীনকে দুনিয়ার সামান্য লাভের বিনিময় বিক্রি করে দেয়। দীনের নামে ইসলামের নামে বিভিন্ন ধরনের কু-কর্ম বিদ'আত শির্ক করে দুনিয়া উপার্জন করছে। তারা দুনিয়ার সামান্য লাভের জন্য দীনকে নষ্ট করছে।

মুতাররফ রহ. বলেন: "দুনিয়ার প্রতি সর্বনিকৃষ্ট চাহিদা হলো, আখিরাতের নাম বিক্রি করে দুনিয়া অর্জন করা[13]। ফুজাইল ইবন আয়াজ রহ. বলেন, "দীনের মাধ্যমে দুনিয়া উপার্জনের তুলনায় ডোল তবলা বাজিয়ে দুনিয়া উপার্জন করা আমার নিকট বেশি প্রিয়"[14]। জুনাইদ রহ. বলেন, "আমি ছুররি রহ. কে যারা দীনের দ্বারা যে দুনিয়া কামাই করে তাদের দুর্নাম করতে শুনেছি। তিনি বলতেন, "অপবিত্র কাজ হলো, একজন বান্দা তার দীন দ্বারা তার জীবিকা উপার্জন করা"।

---

[13] বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৬৯৩০।

[14] বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৬৯৩১।

মালেক ইবন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, “মালিকের উস্তাদ রবিয়া আর-রাঈ বলতেন, হে মালেক! হতভাগা কমবখত কে? উত্তরে তিনি বলেন, আমি বললাম, যে দীন দ্বারা জীবিকা উপার্জন করে। তারপর সে আবার জিজ্ঞাসা করল, কে তার চেয়ে আরও নিকৃষ্ট কমবখত? সে উত্তরে বলল, যে অন্যের দুনিয়াকে সুন্দর করে নিজের দীনকে বাদ দিয়ে। সে বললেন, আমার উত্তর শুনে আমার উস্তাদ খুব খুশি হলেন এবং আমাকে সাবাস দিলেন”[15]।

আব্দুল্লাহ ইবন মুবারককে জিজ্ঞাসা করা হলো, প্রকৃত মানুষ কে? উত্তরে সে বলল, আলিমগণ। তারপর জিজ্ঞাসা করা হলো, বাদশাহ কারা? উত্তরে সে বলল, আবেদগণ। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কমবখত কারা? উত্তরে সে বলল, যারা দীনের দ্বারা দুনিয়া কামাই করে[16]।

---

[15] বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৬৯৩২।

[16] বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৬৯৩৩।

৩. খাওয়া-দাওয়া পোশাক-আশাক ইত্যাদিতে সীমাতিরিক্ত অপচয় করা

মুয়াজ ইবন জাবাল থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে ইয়ামনের দিকে পাঠান, তখন তিনি তাকে উপদেশ দিয়ে বলেন,

«إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوا بِالمتَنَعِّمِينَ»

"তোমরা ভোগ-বিলাস ও অপচয় করা হতে সতর্ক থাক। কারণ, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বান্দারা কখনোই ভোগ-বিলাস ও অপচয় করেন না"[17]।

৪. ধন-সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান ও ক্ষমতার লোভ:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন,

﴿تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًاۚ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٨٣﴾ [القصص: 83]

---

[17] আহমদ, হাদীস নং ৬১৬০০।

“এই হচ্ছে আখিরাতের নিবাস, যা আমরা তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা জমিনে ঔদ্ধত্য দেখাতে চায় না এবং ফাসাদও চায় না। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।” [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৮৩]

কা‘ব ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا ذِئْبَانِ جَائعَانِ أُرْسِلا فِي غَنم بأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ المَرْءِ عَلَى المَالِ وَالَّشَرفِ لِدِينهِ»

“দু’টি ক্ষুধার্ত বাঘকে কোনো ছাগলের পালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া, ছাগলের পালের জন্য ততটা ক্ষতিকর নয়, যতটা ক্ষতিকর হয় একজন মানুষের দীনের জন্য, যখন তার মধ্যে ধন-সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান ও ক্ষমতার লোভ থাকে”[18]।

---

[18] তিরমিযী, হাদীস নং ২৩৭২। ইমাম তিরমিযি হাদীসটিকে সহীহ ও হাসান বলেন আখ্যায়িত করেন।

দুনিয়ার মহব্বতের কারণসমূহ

সব কিছুর পেছনে কোনো না কোনো কারণ থাকে। কারণ, জানা থাকলে তা হাসিল করা কিংবা তা থেকে বিরত থাকা সহজ হয়। দুনিয়ার মহব্বতের অনেকগুলো কারণ আছে। এগুলো যখন আমাদের জানা থাকবে তখন তা নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকা সহজ হবে। দুনিয়ার মহব্বতের অনেক কারণ আছে। আমরা এখানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আলোচনা করব।

১. দুনিয়ার সৌন্দর্য ও বাহ্যিক চাকচিক্য

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন,

﴿ٱلۡمَالُ وَٱلۡبَنُونَ زِينَةُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱلۡبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيۡرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابٗا وَخَيۡرٌ أَمَلٗا ٤٦﴾ [الكهف: 46]

“সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা। আর স্থায়ী সৎকাজ তোমার রবের নিকট প্রতিদানে উত্তম এবং প্রত্যাশাতেও উত্তম।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ৪৬]

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضرة، وَإِن الله مسْتَخْلفُكُمْ فيهَا، فَينظُر كَيفَ تَعمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النسَّاءَ، فَإِنَ أَوَّلَ فتْنَة بني إِسْرائيِلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»

"অবশ্যই মনে রাখতে হবে, দুনিয়া খুব সুন্দর, উপভোগ্য, সজ্জিত ও আনন্দদায়ক। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদের দুনিয়াতে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তিনি দেখেন তোমরা কেমন আমল কর। তোমরা দুনিয়া বিষয়ে সতর্ক থাক, আর নারীদের বিষয়ে সতর্ক থাক। কারণ, বনী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম ফিতনা সংঘটিত হয় নারীদের নিয়ে"[19]।

২. মানবাত্মা ও অন্তর দুনিয়ার দিকে অধিক ঝুঁকে পড়া

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন,

---

[19] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৪২।

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلۡبَنِينَ وَٱلۡقَنَٰطِيرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡخَيۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ وَٱلۡحَرۡثِۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلۡمَـَٔابِ ١٤﴾ [آل عمران : 14]

“মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালবাসা- নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রূপা, চিহ্নত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত। এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী। আর আল্লাহ, তাঁর নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন,

«قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ، حُبِّ الْعَيْشِ وَالمَالِ»

“বৃদ্ধ মানুষের অন্তর দু’টি জিনিসের মহব্বতে যুবক। দুনিয়ার মহব্বত ও ধন-সম্পদের মহব্বত”[20]।

---

[20] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৪৬।

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يَهْرَمُ اْبنُ آدَم وَيشب مِنهُ اثْنتَانِ الْحِرْصُ عَلَى المَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ»

"আদম সন্তান বুড়ো হয়, তবে তার দু'টি জিনিস জোয়ান হতে থাকে। এক. ধন-সম্পদের লোভ, দুই. দুনিয়ার জীবনের লোভ"।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরও বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَان مِنْ مَالٍ لابْتَغَى وَادِيَا ثَالِثًا، وَلا يمْلأُ جَوْفَ ابْن آدَمَ إِلاّ التُّرَاب، وَيَتُوُب اللهُ عَلَى مَن تاَب»

"যদি আদম সন্তানের ধন-সম্পদের দু'টি উপত্যকা থাকে, তখন সে আরও একটি উপত্যকা তালাশ করবে। আর আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া কোনো কিছু দ্বারাই পুরো করা যাবে না। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ক্ষমা করবেন যাকে তিনি ক্ষমা করার ইচ্ছা করেন"।

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَوْ كَانَ لابنِ آدَمَ وَادٍ مْن ذَهبٍ ، أَحَبَّ أَنْ لهُ وَاديًا آخَر، ولَنْ يمَلَأَ فاهُ إلَّا الُّتَرابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ»

"যদি আদম সন্তানের উপত্যকা থাকে, তখন সে আরও একটি স্বর্ণ-মুদ্রার উপত্যকা চাইবে। আর আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া কোনো কিছু দ্বারাই পুরো করা যাবে না। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ক্ষমা করবেন যাকে তিনি ক্ষমা করার ইচ্ছা করেন"।

৩. বর্তমানকে প্রাধান্য দেওয়া প্রতীক্ষিত ভবিষ্যতের ওপর

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿بَلۡ تُؤۡثِرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا ١٦ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ ١٧﴾ [الأعلى: 17]

"বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ। অথচ আখিরাত সর্বোত্তম ও স্থায়ী।" [সূরা আল-আ'লা, আয়াত: ১৭]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের নিকট প্রেরণ করেন তার রাসূলগণ, নাযিল করেন কিতাবসমূহ। তাদের নিকট আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার বার্তা পাঠান এবং সুস্পষ্ট বর্ণনা করেন, কোনো কাজে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি আর কোনো কাজে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসন্তুষ্টি। মানুষ যদি তাদের প্রবৃত্তির পূজা ও মানবিক চাহিদা থেকে বের হয়ে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হুকুমের আনুগত্য করে তবে আল্লাহ তাদের জান্নাতে চিরস্থায়ী নি'আমতের প্রতিশ্রুতি দেন। তারপরও অধিকাংশ জ্ঞানীদের জ্ঞান এ দুনিয়া খতম হওয়ার পর, নগদ, উপস্থিত ও চাক্ষুষের ওপর প্রতীক্ষার পরবর্তী ভবিষ্যৎকে প্রাধান্য দিতে রাজি হয় না। তারা বলে নগদ পন্য যা আমার কব্জায় রয়েছে, তা কীভাবে সুদীর্ঘ কালের জন্য বাকী বিক্রি করবো? যা পৃথিবীর ধ্বংস ও দুনিয়ার নিঃশেষ হওয়ার পর লাভ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ লোকের অবস্থা দেখে মনে হয়, তারা বলে, তুমি এখন যা দেখছ, তা গ্রহণ কর, আর যা শুনছ

তা ছাড়। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকে তাওফিক দেয়, সেই আখিরাতের মূল্য বুঝতে পারে এবং ঈমানের শক্তি ও জ্ঞান দ্বারা আখিরাতের স্থায়িত্ব ও রহস্য সম্পর্কে জানতে পারে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যারা আনুগত্য করে তাদের জন্য যে সব নি'আমত আর যারা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নাফরমানী করে তাদের জন্য যেসব আযাব নির্ধারণ করেছেন তা তারা বুঝেন। তারা দুনিয়ার বাস্তবতা, পরিবর্তন, অল্প সময়ে নিঃশেষ হওয়া, দুনিয়ার গাদ্দারী ও অত্যাচার, অনাচার সবই দেখতে পান। তারা জানেন, দুনিয়া হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেমন বর্ণনা করেছেন, খেলাধুলা, ক্রীড়া, কৌতুক ও ধন-সম্পদ ও ছেলে সন্তান নিয়ে প্রতিযোগিতা। আর ধন-সম্পদ নিয়ে বাড়াবাড়ি ও অহংকার। আর দুনিয়া হলো, বৃষ্টির দ্বারা উৎপন্ন ফসলের মত যা একজন কৃষককে খুশি করে ও আনন্দ দেয়। অতঃপর তুমি দেখতে পাবে, উৎপাদিত ফসলগুলো শুকিয়ে হলুদ বর্ণের হয়ে গেছে। অথচ এসব ফসল একটু আগেও তরতাজা ও সবুজ

বর্ণের ছিল। তারপর এ ফসলগুলো খড়-কুটো ও ধুলায় পরিণত হয়।

আমাদের ও ছেলে সন্তানদের সৃষ্টি এ জগতেই। ফলে আমরা এ ছাড়া কিছুই বুঝি না এবং এর বাইরে কোনো কিছু বুঝতে রাজি না। আমাদের অভ্যাস আমাদের বিচারক আর আমাদের প্রবৃত্তি আমাদের বাদশাহ। আমাদের জ্ঞানের ওপর ইন্দ্রসমূহ ক্ষমতাশীল ও রাজা। নফসের চাহিদা ও দাবি অনুযায়ী চলে আমাদের জীবন।

মোটকথা, দুনিয়ার মহব্বত ও দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দেওয়া দুই কারণে হয়ে থাকে।

প্রথম কারণ: দীন ও ঈমান ধ্বংস হওয়া।

দ্বিতীয় কারণ: জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হওয়া।

দুনিয়ার মহব্বতের পরিণতি

দুনিয়ার প্রতি অধিক মহব্বত থাকার কারণে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। দুনিয়া মানুষের জন্য অনিবার্য ও জরুরি, কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, এ দুনিয়াই হবে একজন মানুষের শেষ প্রান্তর ও জীবনের সবকিছু। দুনিয়া

হলো একজন মানুষের জন্য আখিরাতের ক্ষেত ও সেতুবন্ধন স্বরূপ। একজন মানুষের শেষ প্রান্তর ও গন্তব্য হলো, আখিরাতের জীবন ও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন। দুনিয়াতে তার যাবতীয় কাজ ও আমল হবে তার আসল গন্তব্য ও শেষ ঠিকানার জন্য। দুনিয়া তার আসল গন্তব্য বা শেষ ঠিকানা নয়। এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের দুনিয়ার প্রতি অধিক মনোযোগী হতে বা ঝুঁকে পড়তে নিষেধ করেন এবং দুনিয়ার মোহে পড়ে আমরা যাতে ধোঁকায় না পড়ি এ জন্য তিনি আমাদের সতর্ক করেন। দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়াতে নানাবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তা চাই নগদে হোক অথবা পরবর্তীতে হোক। নিম্নে কয়েকটি ক্ষতি ও পরিণতির কথা আলোচনা করা হলো।

এক. দুনিয়ার মহব্বত সব অনিষ্টের চাবিকাঠি

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "দুনিয়াতে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতির চাবি হলো, আশাকে খাট করা বা অধিক আশা করা হতে বিরত থাকা। আর যাবতীয়

সব কল্যাণের চাবি হলো, আখিরাতের আকাঙ্ক্ষা করা ও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি বেশি বেশি ধাবিত হওয়া। আর সমস্ত অনিষ্টের চাবি হলো, দুনিয়ার প্রতি অধিক মহব্বত ও লম্বা আশা। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে আমরা অনেকেই আছি এমন যারা কোনো জিনিসে কল্যাণ আর কোনো জিনিসে অকল্যাণ তা আমরা ভালোভাবে জানি না। অথচ এ বিষয়সমূহের ইলম হলো অত্যন্ত উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ। কল্যাণ ও অকল্যাণের চাবি কি তা জানা অনেক বড় ইলম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তা জানা ও তার ওপর আমল করার তাওফীক দেন না। আল্লাহ যাদের চান কেবল তাদের কল্যাণ দেন। আর যাদের তিনি চান না তাদের চেয়ে হতভাগা দুনিয়াতে আর কেউ হতে পারে না। কারণ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভালো ও খারাপ সবকিছুর জন্য চাবি ও দরজা নির্ধারণ করে রেখেছেন। একজন মানুষ তা দিয়ে তার নিকট প্রবেশ করেন[21]।

---

[21] হাদীউল আরওয়াহ ৪৭।

দুই. দুনিয়ার মহব্বত মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে কুফুরী করা ও তার নাফরমানীর কারণ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يُصبِحِ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِرا، وَيمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحِ كَافِرا، يَبِيعُ دِينَهَ بِعرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا»

“মানুষ ঈমানদার অবস্থায় সকাল উদযাপন করে, আর বিকালে সে কাফির আবার ঈমানের অবস্থায় বিকাল অতিবাহিত করে কিন্তু সকালে সে ঈমান হারা হয়ে যায়। দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের জন্য সে তার দীনকে বিক্রি করে দেয়”।[22]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, “একজন কাফির সেও কুফুরীর ক্ষতি সম্পর্কে জানে, কিন্তু দুনিয়ার মহব্বত তাকে কুফরের ওপর উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন,

---

[22] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮।

﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا عَلَى ٱلۡأٓخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٠٧ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ وَسَمۡعِهِمۡ وَأَبۡصَٰرِهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡغَٰفِلُونَ ١٠٨ لَا جَرَمَ أَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ١٠٩﴾ [النحل: 106,109]

“যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফুরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফুরী দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের ওপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব। ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফুরী করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত। এটা এজন্য যে, তারা আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ করেছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফির কাওমকে হিদায়াত করেন না। এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহ, শ্রবণ সমূহ ও দৃষ্টিসমূহের ওপর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই হচ্ছে গাফেল। সন্দেহ নেই,

তারাই আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত”। [সূরা নাহাল, আয়াত: ১০৬ -১০৯]

তিন. আখিরাতের শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতেই শাস্তির সম্মুখীন হওয়া

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, “দুনিয়ার মহব্বতকারী তার দুনিয়া দ্বারা সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক শাস্তি ভোগ করবে। সে তার জীবনের তিনটি স্তরে সর্বাধিক বেশি আযাবের সম্মুখীন হবে। দুনিয়াতে তার শাস্তি হলো, ধন-সম্পদ অর্জন করার জন্য চেষ্টা করা ও এর জন্য দুনিয়াদারদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করা ইত্যাদির কষ্ট। আর আলমে বরযখেও সে অধিক কষ্ট পাবে। সেখানে সে দুনিয়া হারানোর কষ্টে ও বেদনা অনুভব করবে এবং আফসোস করতে থাকবে। যখন সে বুঝতে পারবে যে, তার মধ্যে ও তার সম্পদের মাঝে চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ ঘটেছে আর কখনোই তার সাথে এবং তার সম্পদের সাথে দেখা হবে না এবং দুনিয়ার বিনিময়ে এখানে আর কোনো বন্ধু সে পাবে না যা তার

সমপর্যায়ের হবে, তখন তার কষ্টের আর অন্ত থাকবে না। আর লোকটি কবরেও অনেক আযাবের অধিকারী হবে। ধন-সম্পদ হারানো চিন্তা, আফসোস, পেরেশানি তার আত্মায় এমনভাবে আঘাত করতে থাকবে যেমনটি সাপ, বিচ্ছু ও পোকা-মাকড় তার দেহে আঘাত করতে থাকে”।

তিনি আরও বলেন, “দুনিয়াদারকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে এবং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সাক্ষাতের দিন তথা কিয়ামতের দিনও অধিক শাস্তি দেওয়া হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন,

﴿فَلَا تُعۡجِبۡكَ أَمۡوَٰلُهُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُهُمۡۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَتَزۡهَقَ أَنفُسُهُمۡ وَهُمۡ كَٰفِرُونَ ٥٥﴾ [التوبة: 55]

“অতএব, তোমাকে যেন মুগ্ধ না করে তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি, আল্লাহ এর দ্বারা কেবল তাদের আযাব দিতে চান দুনিয়ার জীবনে এবং তাদের জান বের হবে কাফির অবস্থায়।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫৫]

কোন কোনো মনীষী বলেন, “তাদের ধন-সম্পদ একত্র করার কারণে শাস্তি দেওয়া হবে। আর তাদের অবস্থা এমন হবে ধন-সম্পদের মহব্বতে তাদের জান যাওয়ার উপক্রম হবে। শুধুমাত্র সম্পদের মহব্বতে দুনিয়াতে তারা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হক আদায়ে অস্বীকার করেছিল”[23]।

চার. অন্তর আখিরাতের প্রতি অমনোযোগী হওয়া ও নেক আমলে ত্রুটি করা

দুনিয়াদারদের অন্তর আখিরাত বিমুখ হয়ে থাকে। ফলে তারা কোনো নেক আমল করতে চায় না, তারা সব সময় তাদের লক্ষ্য দুনিয়া কামাই করাতে ব্যস্ত থাকে। তাদের সব ধরনের চেষ্টা, কষ্ট-ক্লেশ ও পরিশ্রম দুনিয়া কামাইর জন্যই ব্যয় হয়ে থাকে। ফলে তারা আখিরাত থেকে বঞ্চিত হয়।

---

[23] উদ্দাতুস সাবেরীন ১৮৯।

আবু মুসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مْن أَحبَّ دنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَن أَحبَّ آخِرَتَهُ أَضَر بدِنْيَاهُ، فَآثِرِوا مَا يَبْقَى عَلى مَا يَفْنَىَ»

“যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভ করতে বেশি পছন্দ করে, সে তার আখিরাত লাভ করতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হবে, আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে অর্জন করতে মহব্বত করে, তাকে অবশ্যই দুনিয়া অর্জন করতে লোকসান দিতে হবে। সুতরাং তোমরা যা চিরস্থায়ী তার অর্জনকে ক্ষণস্থায়ী বস্তুর অর্জনের ওপর প্রাধান্য দাও”। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী-:

﴿قُتِلَ ٱلۡخَرَّٰصُونَ ۝١٠ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي غَمۡرَةٖ سَاهُونَ ۝١١﴾ [الذاريات: 10,11]

“মিথ্যাচারীরা ধ্বংস হোক! যারা সন্দেহ-সংশয়ে নিপতিত, উদাসীন”। [সুরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ১০, ১১] সম্পর্কে বলেন, অর্থাৎ তারা আখিরাতের বিষয়ে অমনোযোগী, দুনিয়ার মহব্বতে তারা ডুবে আছে। অর্থাৎ

তাদের অন্তর দুনিয়া ও দুনিয়ার ধন-সম্পদের মহব্বতে আখিরাত থেকে ও তাদের যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা থেকে সম্পূর্ণ বেখবর। তাদের অবস্থা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ আয়াতেরই নামান্তর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন,

﴿وَلَا تُطِعۡ مَنۡ أَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذِكۡرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمۡرُهُۥ فُرُطٗا ۝٢٨﴾ [الكهف: 28]

“আর ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমরা আমাদের যিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ২৮]

আয়াতে الغمرة উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটি সাধারণত প্রবৃত্তির পূঁজা করার কারণেই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর আয়াতে السهو শব্দের অর্থও একই ধরনের। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে-

السهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه

السهو হলো, কোনো বস্তু থেকে গাফেল হওয়া ও তার থেকে মনোযোগ ছুটে যাওয়া। আর সমস্ত অনিষ্টের কেন্দ্র বিন্দু হলো, গাফলত ও কু-প্রবৃত্তি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও আখিরাত থেকে গাফেল হওয়ার ফলে কল্যাণের সমস্ত দরজা (মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিকির ও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য জাগ্রত থেকে ইবাদত বন্দেগী করা) বন্ধ হয়ে যায়। আর কু-প্রবৃত্তি সমস্ত অনিষ্ট, গাফলত ও আতঙ্কের দরজা খুলে দেয়। ফলে মানবাত্মা কুপ্রবৃত্তির মধ্যে ডুবে থাকে এবং আল্লাহ থেকে সম্পূর্ণ অমনোযোগী থাকে। অন্তরে গাইরুল্লাহ স্থান করে নেওয়ার ফলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিকির ভুলে থাকে। গাইরুল্লাহকে নিয়ে ব্যস্ত হয়, অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত বিশাল আকার ধারণ করে। যেমন, সহীহ বুখারী ও হাদীসের আরও অন্যান্য কিতাবে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«تَعس عْبدُ الدِّينَارِ، تَعِس عَبْدُ الدِّرهَمِ، تعس عَبْدُ اَلخِميصة، تَعَس عبْدُ الْقَطيفة، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذا شِيكَ فَلَا انْتَفَش، إنْ أُعْطِيِ رَضِيَ، وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ»

"অর্থের গোলাম ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সম্পদের গোলাম, ধ্বংস হোক পোশাকের গোলাম, ধ্বংস হোক জামা-কাপড়ের গোলাম। ধ্বংস হোক, ধ্বংসেই নিমজ্জিত থাকুক সে। যখন দুনিয়ার মুসীবতে পতিত হয়, তা যেন হটানো না হয়। তাকে যখন দুনিয়া দেওয়া হয় তখন সে খুশি হয়, আর যখন তাকে দুনিয় দেওয়া হয় না তখন সে অসন্তুষ্ট হয়"।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "দুনিয়ার মহব্বত বান্দা ও তার আখিরাতের উপকারী কর্মের মাঝে প্রাচীর তৈরি করে। কারণ, তার সামনে যখন দুনিয়া পেশ করা হয় তখন সে আখিরাতকে বাদ দিয়ে দুনিয়াকে সে অধিক মহব্বত করে তা নিয়েই ব্যস্ত হয়। মানুষ এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, কতক লোক আছে যাদের দুনিয়ার মহব্বত ঈমান ও শরী'আত থেকে বিরত রাখে। কতক

আছে যাদের ওপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভ ও তার মাখলুকের খেদমতের জন্য যা পালন করা ওয়াজিব, তা পালন করা হতে তাদের বিরত রাখে। ফলে সে তার ওপর যেসব ওয়াজিব রয়েছে সেগুলো না বাহ্যিকভাবে পালন করে, না গোপনে পালন করে। আবার কতক আছে যাদের দুনিয়ার মহব্বত অসংখ্য করণীয় কাজ থেকে বিরত রাখে। কতক আছে তাদের দুনিয়ার মহব্বত শুধুমাত্র দুনিয়া লাভের প্রতিবন্ধক হয় এমন ওয়াজিব থেকে বিরত রাখে অন্যগুলো সে ঠিকই পালন করে। আবার কতক লোক এমন আছে তারা যে সময় ওয়াজিবটি আদায় করা দরকার তখন আদায় করা হতে বিরত থাকে। ফলে সে সময়মতো আদায় করতে অলসতা করে এবং যথাযথ পালন করে না। আবার কতক আছে কোনো ওয়াজিব আদায় করতে গিয়ে অন্তর দিয়ে এবং কেবল মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য তা আদায় করে না। ফলে সে লোক দেখানোর জন্য করে থাকে অন্তর থেকে আদায় করে না। দুনিয়ার মহব্বতের সর্বনিম্ন স্তর হলো, তা একজন বান্দাকে সৌভাগ্য লাভ হতে বিরত

রাখে। আর তা হলো, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহব্বতে অন্তর ব্যস্ত হওয়া, জবান মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের স্মরণে তরতাজা থাকা, তার অন্তর তার জবানের উপর একত্র হওয়া এবং তার জবান ও অন্তর তার প্রভুর ওপর একত্র হওয়া। সুতরাং বলাবাহুল্য দুনিয়ার মহব্বত ও তার প্রতি ভালোবাসা আখিরাতের ক্ষতি করে, যেমন আখিরাতের মহব্বত দুনিয়ার উপার্জনের ক্ষতি করে। হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু‘ সনদে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مْن أَحبَّ دنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَن أَحبَّ آخِرَتَهُ أَضَر بدِنْيَاهُ، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلى مَا يَفْنَىَ»

“যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভ করতে বেশি পছন্দ করে, সে তার আখিরাত লাভ করতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হবে, আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে অর্জন করতে মহব্বত করে, তাকে অবশ্যই দুনিয়া অর্জন করতে লোকসান দিতে হবে।

সুতরাং তোমরা যা চিরস্থায়ী তার অর্জনকে ক্ষণস্থায়ী বস্তুর অর্জনের ওপর প্রাধান্য দাও"।

পাঁচ. অন্তরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহব্বত সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধক হয় ও বিঘ্ন ঘটায়

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, "যখন অনেক বড় বড় ও শক্তিশালী উপাস্য (দিরহাম, দিনার, কু-প্রবৃত্তি ও নফস) যেগুলো অন্তরকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহব্বত ও তার ইবাদত থেকে বিরত রাখে তা অন্তরের ওপর কর্তৃত্ব করে, তখন সে অন্তরে কীভাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহব্বত থাকতে পারে। কারণ, এসবের মহব্বত অন্তরে থাকার দ্বারা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহব্বত তার প্রতিবন্ধক হয়। আর কারো অন্তর যদি দুনিয়ার মহব্বতে ভর্তি হয়ে থাকে তা মাখলুকের সাথে আল্লাহকে শরীক করারই নামান্তর। যে অন্তর তার রবের পরিপূর্ণ মহব্বত ও ইবাদত করে, সে অন্তরে আর কারো প্রতি মহব্বত থাকতে পারে না। অন্তর গাইরুল্লাহর মহব্বতকে কীভাবে প্রতিহত করবে

ও দূরে সরাবে। কারণ, প্রতিটি প্রেমিক তার প্রেমিকার অন্তরকে তার নিজের দিকেই আকৃষ্ট করতে থাকে এবং তার দিকে টানতে থাকে এবং সে তার প্রেমিকাকে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে মহব্বত করা হতে বিরত রাখে”[24]।

ছয়. মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিকিরে অন্তর স্বাদ-আস্বাদন না করা

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, “অন্তরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিকিরের জন্য। এ কারণেই সিরিয়ার পূর্বসূরি জ্ঞানীদের থেকে একজন জ্ঞানী (আমার জানা মতে তার নাম সুলাইমান আল খাওয়ায রহ.) তিনি বলেন, যিকির অন্তরের জন্য দেহের জন্য খাদ্যের মতো। দেহ যখন অসুস্থ হয়, তখন সে যেমন খাওয়ারের মজা পায় না অনুরূপভাবে যে অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত থাকে

[24] যুহুদ ও পরহেজগারী ৩৮।

সে অন্তর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিকিরের মজা পায় না”[25]।

আবি ইমরান আল মিসরী বলেন, “আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দাউদ আলাইহিস সালামের নিকট ওহী প্রেরণ করে বলেন, হে দাউদ তুমি আমার ও তোমারা মাঝে এমন কোনো আলিমকে নির্বাচন করো না যার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত জায়গা করে আছে। যেসব আলিমদের অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত গেঁথে আছে তারা আমার বান্দার জন্য পথের কাটা। আমি তাদের সর্বনিকৃষ্ট যে শাস্তি দেব, তা হলো, তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমার সাথে মোনাজাতের স্বাদ চিনিয়ে নেব”[26]।

সাত. সর্বদা দুশ্চিন্তা অভাব অনটন ও মতবিরোধ

যারা দুনিয়াকে অধিক মহব্বত করে তাদের মধ্যে সর্বদা দুশ্চিন্তা ও হতাশা বিরাজ করে। তারা কোনো কিছুতে শান্তি পায় না। সব সময় তাদের মন মগজ দুনিয়ার

---

[25] মাজমুয়ুল ফাতওয়া ৯/৩১৬।

[26] হাদীসে খাইসামাহ ১৬৬।

চিন্তায় বিভোর থাকে। তারা ঠিক মতো খেতে পারে না ঘুমাইতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ أَصبحَ والدُّنيَا أَكْبَر هِّمهِ شَتتَ اللّٰهُ عَلَيْهِ شَملَهُ، وجَعَلَ فقْرَهُ بيَن عَيْنْيهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ منْ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتبِ لَهُ، وَمْن أَصَبحَ والْآخِرة أَكْبُر هِّمهِ، جَعَلَ اللّٰهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَع عَلَيْهِ ضيعَتُه، وَأَتَتْهُ الدُّنيَا وَهِي راغِمةٌ»

"যে ব্যক্তির জীবনে দুনিয়া অর্জন করাই তার বড় টার্গেট বা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার ওপর বিশৃঙ্খলা চাপিয়ে দেন। আর দরিদ্রতা ও অভাব তার চোখের সামনে তুলে ধরেন। সে যতই চেষ্টা করুক না কেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার ভাগ্যে যতটুকু দুনিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন তার বাহিরে সে দুনিয়া হাসিল করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তির জীবনে আখিরাত অর্জন করাই তার বড় টার্গেট বা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার অন্তরকে অভাব মুক্ত করে দেন। তার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সম্পদকে

সহজ করে দেন। আর দুনিয়া তার নিকট অপমান অপদস্থ হয়ে আসতে থাকে”[27]।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, “অনুরূপভাবে যদি কোনো ব্যক্তি এমন হয় তার যাবতীয় চিন্তা দুনিয়া অর্জন করা অথবা তার বড় চিন্তা হলো দুনিয়া উপার্জন করা, তার অবস্থা উল্লিখিত হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হবে। তার পরিণতিও এমন হবে যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন। তিরমিযী ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ كَانَتِ الِآخرَةُ هُمه، جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبهِ، وَجَمَع لَه شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنيَا وَهِىَ راغِمةٌ، وَمْن كَانَتِ الدُّنيَا هَّمُه، جَعَلَ اللهُ فقْرَه بيَن عَيْنْيهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شْملَهَ، وَلَم يَأْتِهِ منَ الدُّنْيَا إلِا مَا قُدِّرَ لَهُ»

---

27 তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৬৫। আল্লামা আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

“যে ব্যক্তির জীবনে আখিরাত অর্জন করাই তার বড় টার্গেট বা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার অন্তরকে অভাব মুক্ত করে দেন। তার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সম্পদকে সহজ করে দেন। আর দুনিয়া তার নিকট অপমান অপদস্থ হয়ে আসতে থাকে। যে ব্যক্তির জীবনে দুনিয়া অর্জন করাই তার বড় টার্গেট বা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দরিদ্রতা ও অভাব তার চোখের সামনে তুলে ধরেন এবং তার ওপর বিশৃঙ্খলা চাপিয়ে দেন। সে যতই চেষ্টা করুক না কেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার ভাগ্যে যতটুকু দুনিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন, তার বাইরে সে দুনিয়া হাসিল করতে পারবে না”[28]।

দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় আযাব হলো, অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও অভাব অনটনের নিত্য সঙ্গী হওয়া। যদি দুনিয়া পিপাসুদের মাথায় পাগলামি না থাকত এবং দুনিয়ার

---

[28] তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৬৫। আল্লামা আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

মহব্বতে মাতাল না হত, তাহলে তারা এ আযাব হতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে পরিত্রাণ চাইত[29]।

আট. দুনিয়ার মহব্বত মানুষকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিকির থেকে বিরত রাখে

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "দুনিয়ার মহব্বত মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিকির ও তার ভালোবাসা থেকে মানুষকে বিরত রাখে। আর যার ধন-সম্পদ তাকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিকির থেকে বিরত রাখে, সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। মানবাত্মা যখন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিকির হতে গাফেল হয়, তখন শয়তান তাতে স্থান করে নেয় এবং সে যেদিক ইচ্ছা করে তাকে সেদিক নিয়ে যায়"[30]।

আল্লামা ইবনুল জাওজী রহ. বলেন, "আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি দুনিয়া প্রত্যেক তৃষ্ণার্তের জন্য

---

[29] উদ্দাতুস সাবেরীন ১৮৬।

[30] উদ্দাতুস সাবেরীন ১৮৬।

নিরেট পরিচ্ছন্ন হয়, প্রতিটি অনুসন্ধানকারীর জন্য সহজলভ্য এবং দুনিয়া আমাদের জন্য স্থায়ী হয়; কোনো ছিনতাইকারী চিনিয়ে না নেয়, তাহলেও দুনিয়া থেকে বিমুখ হওয়া ফরয ও ওয়াজিব। কারণ, দুনিয়া মানুষকে আল্লাহ হতে বিরত রাখে এবং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের স্মরণকে ভুলিয়ে দেয়। আর যে নি'আমত নি'আমতদাতা থেকে বিরত রাখে তাকে অবশ্যই পরিহার করতে হবে। অন্যথায় বিপদের সম্মুখীন হতে হবে"[31]।

নয়. একজন দুনিয়াদারের জন্য দুনিয়াই হলো, তার শেষ গন্তব্য

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "যখন কোনো বান্দা দুনিয়াকে মহব্বত করে, তখন দুনিয়াই তার লক্ষ্য হয়ে থাকে; সে দুনিয়া ছাড়া আর কোনো কিছুই বুঝতে রাজি হয় না। তার কাছে আর কোনো কিছুই ভালো লাগে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেসব আমলকে আখিরাত লাভ ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্য নির্ধারণ করছে, সেসব

---

[31] তাজকিরাতুল ওয়াজ ৭১।

আমলগুলোকে সে দুনিয়া উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। ফলে বিষয়টি পাল্টে যায় আর অর্ন্তনিহিত হিকমত উলটপালট হয়ে যায়। মোটকথা, এখানে দু’টি বিষয় আছে, এক- মাধ্যমকে লক্ষ্য বানিয়ে নেওয়া, দুই- আখিরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া উপার্জন করা। আর এ হলো সর্বনিকৃষ্ট উলটপালট এবং মানবাত্মার জন্য সবচেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক পরিণতি। এ ধরনের লোকের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী হুবহু প্রযোজ্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন,

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ فِيهَا وَهُمۡ فِيهَا لَا يُبۡخَسُونَ ١٥ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٦﴾ [الهود : 15,16]

“যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার জৌলুস কামনা করে, আমি সেখানে তাদেরকে তাদের আমলের ফল পুরোপুরি দিয়ে দিই এবং সেখানে তাদেরকে কম দেওয়া হবে না।

এরাই তারা, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তারা সেখানে যা করে তা বরবাদ হয়ে যাবে আর তারা যা করত, তা সম্পূর্ণ বাতিল"। [সূরা হুদ, আয়াত: ১৫, ১৬] আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرۡثَ ٱلۡأٓخِرَةِ نَزِدۡ لَهُۥ فِي حَرۡثِهِۦۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرۡثَ ٱلدُّنۡيَا نُؤۡتِهِۦ مِنۡهَا وَمَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ٢٠﴾ [الشورى: 20]

"যে আখিরাতের ফসল কামনা করে, আমরা তার জন্য তার ফসলে প্রবৃদ্ধি দান করি, আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমরা তাকে তা থেকে কিছু দিই এবং আখিরাতে তার জন্য কোনো অংশই থাকবে না"। [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ২০]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন

﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡعَاجِلَةَ عَجَّلۡنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلۡنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصۡلَىٰهَا مَذۡمُومٗا مَّدۡحُورٗا ١٨ وَمَنۡ أَرَادَ ٱلۡأٓخِرَةَ

﴿وَسَعَىٰ لَهَا سَعۡيَهَا وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ كَانَ سَعۡيُهُم مَّشۡكُورٗا ١٩﴾ [الإسرا: 18, 19]

“যে দুনিয়া চায় আমি সেখানে তাকে দ্রুত দিয়ে দিই, যা আমরা চাই, যার জন্য চাই। তারপর তার জন্য নির্ধারণ করি জাহান্নাম, সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত, বিতাড়িত অবস্থায়। আর যে আখিরাত চায় এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে মুমিন অবস্থায়, তাদের চেষ্টা হবে পুরস্কারযোগ্য”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১৮-১৯]

এখানে তিনটি আয়াত আছে একটি আয়াত অপর আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য এবং আয়াত তিনটির অর্থ এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার আমলের মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি ও আখিরাতের কল্যাণকে বাদ দিয়ে, দুনিয়া ও দুনিয়া সৌন্দর্য কামনা করে, তার ভাগে তাই মিলবে সে যা চায়; সে আর কোনো কিছু পাবে না। এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একাধিক বর্ণনা রয়েছে, যেগুলো

আয়াতের ব্যাখ্যা করে এবং আয়াতের অর্থকে সমর্থন করে”[32]।

দশ: বান্দার আমল নষ্ট হয় এবং সাওয়াব ও বিনিময় থেকে বঞ্চিত হয়

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, “তোমরা একটু চিন্তা করে দেখ! দুনিয়াদারের পরিণতি কতই খারাপ এবং সে কত বড় বড় ছাওয়াব ও বিনিময় থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। একজন মুজাহিদ যখন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রাস্তায় পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলে লক্ষ্যে জিহাদ করে শহীদ হয়, তখন সে আর কোনো সাওয়াব বা বিনিময় পায় না, তার আমল বরবাদ হয়ে যায় এবং সে সর্বপ্রথম জাহান্নামে প্রবেশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়[33]।

এগার. হঠকারিতা

দুনিয়ার মহব্বতের কারণে একজন মানুষের মধ্যে হঠকারীতা সৃষ্টি হয়। ফলে সে আর কাউকে মানতে

---

[32] উদ্দাতুস সাবেরীন ১৮৬।

[33] উদ্দাতুস সাবেরীন ১৮৬।

চায়না এমনকি আল্লাহর আদেশ নিষেধও তার নিকট গুরুত্বহীন হয়ে যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন,

﴿كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ ٦ أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰٓ ٧﴾ [العلق: 6-7]

"কখনো নয়, নিশ্চয় মানুষ সীমালঙ্ঘন করে থাকে। কেননা সে নিজকে মনে করে স্বয়ংসম্পূর্ণ"। [সূরা আল-'আলাক, আয়াত: ৬-৭] আল্লামা ইবন কাসীর রহ. বলেন, "ইবন আবী হাতেম রহ. বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেন যায়েদ ইবন ইসমাইল তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেন, জাফর ইবন আওন... আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«منهومان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان فأما صاحب العلم فيزداد رضى الرحمن،وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان»

"দুই লোভী ব্যক্তি কখনো পরিতৃপ্তি লাভ করে না। এক হলো, জ্ঞানী-লোক দ্বিতীয় হলো, দুনিয়াদার। তারা উভয় কখনো সমান হয় না। জ্ঞানী লোক তার জ্ঞানের কারণে

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়। আর দুনিয়াদার তার দুনিয়ার কারণে হৎকারীতা ও সীমালঙ্ঘন বৃদ্ধি পায়।” তারপর আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ﴿كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ ٦ أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰٓ﴾ “কখনো নয়, নিশ্চয় মানুষ সীমালঙ্ঘন করে থাকে। কেননা সে নিজকে মনে করে স্বয়ংসম্পূর্ণ”। আয়াত তিলাওয়াত করেন, কখনো নয়, নিশ্চয় মানুষ সীমালঙ্ঘন করে থাকে। কেননা সে নিজকে মনে করে স্বয়ংসম্পূর্ণ। [সূরা আল-‘আলাক, আয়াত: ৬-৭] আর অপর লোকের বিষয়ে বলেন, এ হাদীসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মারফু‘ সনদে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا»

“দুই লোভী তাদের লোভ কখনোই শেষ হয় না। এক- ইলম পিপাসী, দুই- দুনিয়া লোভী”।

বার. দীন বিক্রি করে দুনিয়া ক্রয় করা

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ، يُصبحِ الرَّجُل مُؤمًنا وَيُمْسِي كَافرًا، وَيمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبحِ كَافرا، يَبيِعُ دِينَهُ بعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا»

“অমবস্যার রাতের মতো অন্ধকার ফিতনা তোমাদের ঘ্রাস করার পূর্বে তোমরা নেক আমলসমূহ করার জন্য প্রতিযোগিতা কর। কারণ, তখন একজন লোক দিনের শুরুতে মুমিন থাকবে আর দিনের শেষে সে কাফির হয়ে যাবে। আর দিনের শেষে সে মুমিন থাকবে আবার দিনের শুরুতে সে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামান্য সম্পদের বিনিময় সে তার দীনকে বিক্রি করে দেবে”।

তের. মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে না জেনে কথা বলা এবং দীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কার করা

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, “মহা মূল্যবান বাণী: যে সব আহলে ইলমগণ, দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দেয় ও মহব্বত করে, সে অবশ্যই ফতওয়া বা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে না হক কথা বলবে। কারণ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতির জন্য যে বিধান নাযিল করেছেন তা অনেক সময় মানুষের মতের পরিপন্থী হয়ে থাকে। বিশেষ করে যারা দুনিয়াদার, নেতৃত্বের লোভী ও কু-প্রবৃত্তির পূঁজারী। কারণ, তাদের উদ্দেশ্য কখনোই হকের বিরুদ্ধাচরণ বা বিরোধিতা করা ছাড়া হাসিল হয় না। যখন কোনো আলিম বা জ্ঞানী নেতৃত্ব-লোভী ও প্রবৃত্তির পূজারী হয়, তখন সে তার উদ্দেশ্যে সত্যের বিরোধিতা করা ছাড়া সফল হতে পারে না। বিশেষ করে যখন তার মধ্যে সন্দেহ, সংশয় তৈরি হয়, তখন তার সন্দেহ ও কু-প্রবৃত্তি তার নফসের চাহিদাকে আরও উসকিয়ে দেয়। তখন তার থেকে সত্য সুস্পষ্ট বা তার মধ্যে কোনো প্রকার আবরণ না থাকা স্বত্বেও আত্মগোপন করে এবং সত্যের বিরোধিতা করতে

সে কোনো প্রকার কুণ্ঠাবোধ করে না। আর সে বলে আমার জন্য তাওবার পথ খোলা আছে, আমি মৃত্যুর আগে তাওবা করে নেব মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। এদের মত লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন,

﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ٥٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا ٦٠﴾ [مريم: 59,60]

“তাদের পরে আসল এমন এক অসৎ বংশধর যারা সালাত বিনষ্ট করল এবং কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। তবে তারা নয় যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে; তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৬-৬০]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের বিষয়ে আরও বলেন,

﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٞ وَرِثُواْ ٱلۡكِتَٰبَ يَأۡخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا ٱلۡأَدۡنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغۡفَرُ لَنَا وَإِن يَأۡتِهِمۡ عَرَضٞ مِّثۡلُهُۥ يَأۡخُذُوهُۚ أَلَمۡ يُؤۡخَذۡ عَلَيۡهِم مِّيثَٰقُ ٱلۡكِتَٰبِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِۗ وَٱلدَّارُ ٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ١٦٩﴾ [الأعراف: 169]

“অতঃপর তাদের পরে স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এমন অযোগ্য বংশধর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা এ নগণ্যতর (দুনিয়ার) সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, ‘শীঘ্রই আমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে’। বস্তুত যদি তার অনুরূপ সামগ্রী (আবারও) তাদের নিকট আসে তবে তারা তা গ্রহণ করবে। তাদের কাছ থেকে কি কিতাবের অঙ্গীকার নেওয়া হয় নি যে, তারা আল্লাহর ব্যাপারে সত্য ছাড়া বলবে না? আর তারা এতে যা আছে, তা পাঠ করেছে এবং আখিরাতের আবাস তাদের জন্য উত্তম, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। তোমরা কি বুঝ না?” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৬৯] তারা দুনিয়ার নিকৃষ্ট ও পচা-গন্ধ জিনিসকে গ্রহণ করল, অথচ তারা জানে

এগুলোকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের জন্য হারাম ঘোষণা করছে। তারা বলে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের ক্ষমা করবেন। আবার যখন তাদের সামনে অপর কিছু তুলে ধরা হয়, তারা তাও গ্রহণ করে। তারা দুনিয়ার কোনো বস্তু পেলেই তা গ্রহণ করতে থাকে। দুনিয়ার প্রতি তাদের অধিক লোভই তাদের মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওপর না হক ও অসত্য কথা বলার প্রতি প্রেরণা যোগায়। তখন তারা বলে, এটি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান শরী'আত ও দীন। অথচ তারা জানে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দীন শরী'আত ও বিধান তার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথমত তারা জানে এটি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দীন শরী'আত ও বিধান। আবার কখনো কখনো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে এমন কথা বলে যা তারা জানে না। আবার কখনো কখনো এমন কথা বলে, যে কথা যে বাতিল তা তারা জানে। আর যারা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করে তারা জানে যে আখিরাত দুনিয়া থেকে অতি উত্তম। দুনিয়ার মহব্বত ও নেতৃত্বের লোভ

তাদেরকে দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার প্রতি উৎসাহ দেয় না।

চৌদ্দ. ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করা ছেড়ে দেয় এবং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রাস্তায় জিহাদ করা ছেড়ে দেয়

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ٣٨﴾ [التوبة: 38]

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হলো, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা যমীনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য"। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩৮]

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَلاَلا يمْنعَنَّ أَحدَكُمْ رهْبَةُ الناَّسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا رَآهُ أَو شَهِدَهُ؛ فَإِنهُ لَا يَقِّربُ مِن أَجلٍ، وَلَا يُبَاِعدُ مِنْ رِزْقٍ أَنْ يَقُولَ بحقٍ أَوْيُذِّكَر بعظيِم»

"সাবধান! মানুষের ভয় যেন তোমাদের কাউকে সত্য কথা বলা হতে বিরত না রাখে যখন তুমি কোনোটি সত্য তা জান বা প্রত্যক্ষ কর। কারণ, তুমি যদি যদি সত্য কথা বল বা কোনো মহান কাজকে স্মরণ করিয়ে দাও তবে মানুষ তোমার মৃত্যুকে কাছে টেনে আনতে পারবে না এবং তোমাকে তোমার রিযিক থেকে দূরে সরাতে পারবে না"।

পনের: মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাহায্য বিলম্ব হবে এবং শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভীতি দূর হবে

সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يُوشِكُ الْأممُ أَن تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَما تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلى قَصْعَتِهَا .فقال قائل :ومن قلة نحن يومئذ؟ قال :بَلْ أَنْتُمْ يوْمئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللهُ من صُدورِ عَدُوِّكُمْ المَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، فقال قائل :يا رسول الله وما الوهن؟ قال :حُبُّ الدُّنيَا وَكرَاهِيَةُ المَوْتِ»

"অচিরেই এ উম্মতের লোকদের ওপর এমন একটি সময় আসবে তোমাদের বিপক্ষে তোমাদেরকে এমনভাবে ডাকা হবে যেমনটি মেজবান মেহমানদের খাওয়ারের টেবিলের দিকে ডাকতে থাকে। একজন এ কথা শোনে একজন সাহাবী বলল, সেদিন কি আমাদের মুসলিমদের সংখ্যা কম হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। বরং, সেদিন তোমাদের সংখ্যা আরও বেশি হবে! তবে তোমরা সেদিন বন্যার পানিতে ভেসে আসা আবর্জনার মতো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভীতিকে দুর করে দিবে এবং তোমাদের অন্তরসমূহে ওহান ঢেলে দেবে। তারপর একজন সাহাবী দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ওহান জিনিসটি কী? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওহান হলো, দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা”।

ষোল. দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرۡفٖۖ فَإِنۡ أَصَابَهُۥ خَيۡرٌ ٱطۡمَأَنَّ بِهِۦۖ وَإِنۡ أَصَابَتۡهُ فِتۡنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجۡهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةَۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبِينُ ١١﴾ [الحج: 11]

“মানুষের মধ্যে কতক এমন রয়েছে, যারা দ্বিধার সাথে আল্লাহর ইবাদাত করে। যদি তার কোনো কল্যাণ হয় তবে সে তাতে প্রশান্ত হয়। আর যদি তার কোনো বিপর্যয় ঘটে, তাহলে সে তার আসল চেহারায় ফিরে যায়। সে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি হলো সুস্পষ্ট ক্ষতি।” [সূরা আল-হজ, আয়াত: ১১]

হাসান রহ. বলেন, প্রতিটি মানুষের উপার্জন হলো সে যে নিয়ে চিন্তা করে তা। যে ব্যক্তি কোনো কিছুর ইচ্ছা করে সে তারা আলোচনা বেশি করে। মনে রাখবে, যার

আখিরাত নেই তার বর্তমানও নেই আর যে ব্যক্তি দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দেবে তার দুনিয়াও নেই আখিরাতও নেই।

সতের. পেটের পূজা করা ও আত্মার মৃত্যু হওয়া

আল্লামা ইবনুল যাওজী রহ. বলেন, "দুনিয়ার মহব্বতকারীর দৃষ্টান্ত যদিও সে ইবাদত বন্দেগীতে খুব কষ্ট করে থাকে, ধান ছিটানোর মতো একজন উঠায় অপরজন রাখে। ফলে তা আর তার জায়গা থেকে সরে না, কমও হয় না আবার বেশিও হয় না। অনুরূপভাবে যার অন্তর দুনিয়ার মহব্বতে মশগুল, আর তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল, বাহ্যিক দিক দিয়ে সে আজীবন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভে পরিশ্রম করে যাচ্ছে, আর অন্তরের দিক দিয়ে সে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন থেকে দূরে সরছে। তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন নাই। সে তা জায়গাই অবস্থান করছে, জায়গা থেকে সরতে পারছ না।

আঠার. খারাপ পরিণতি

হাফেয আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক ইবন আব্দুর রহমান আল-আসবিলী রহ. বলেন, খারাপ পরিণতির (মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের তা হতে রক্ষা করুক) একাধিক কারণ ও মাধ্যম আছে। খারাপ পরিণতির সবচেয়ে বড় কারণ হলো, দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়া, অধিক লোভ করা এবং শুধুমাত্র দুনিয়ার অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করা; আখিরাত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা ও আখিরাতের কল্যাণের প্রতি কোনো প্রকার ভ্রুক্ষেপ না করা। একটি কথা মনে রাখতে হবে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নাফরমানি ও গুনাহের দুঃসাহস মানুষকে খারাপ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। এ ছাড়াও অনেক সময় দেখা যায়, মানুষের মধ্যে এক ধরনের গুনাহ প্রাধান্য বিস্তার করে, ফলে সে সত্যকে অস্বীকার করতে ঔদ্ধত্য হয়। আবার একধরনের মানুষ আছে তার মধ্যে কোনো একটি বিষয়ে তার সাহস অতিরিক্ত হয়ে থাকে, তখন অতিরিক্ত সাহসের কারণে সে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তার অন্তর বা আত্মা নিয়ন্ত্রণ হারা হয়,

জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পায় এবং তার অন্তর থেকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নুর নিবে যায়। তখন তার নিকট তাকে তার এ করুণ পরিণতি হতে বাঁচানোর জন্য উপদেষ্টা বা বার্তাবাহক পাঠানো হয়। কিন্তু তার উপদেশ, আদেশ নিষেধ তার কোনো উপকারে আসে না এবং ওয়াজ নছিহত কোনো কাজে লাগে না। অনেক সময় এমন হয়, লোকটি এ করুণ অবস্থায় মারা যায়। তখন সে অনেক দুর থেকে একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনতে পায়, যে তাকে ডেকে বলে এখন তোমার কি হবে? তোমাকে কত শত শত বার সতর্ক করা হয়েছিল কিন্তু তুমি আমাদের কথায় কর্ণপাত কর নি। এখন তার নিকট আহ্বানকারী কি বলে তার অর্থ স্পষ্ট হয় না, সে কি চায় তা এখন আর কেউ জানতে পারে না। যদিও আহ্বানকারী বার বার আহ্বান করে এবং পুনরায় ডাকতে থাকে।

দুনিয়ার মহব্বতের চিকিৎসা

দুনিয়ার মহব্বত মানবাত্মার জন্য একটি মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক ব্যাধি । এ ব্যাধির চিকিৎসা অত্যন্ত জরুরী।

আর মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক রোগেরই চিকিৎসা আছে। চিকিৎসা ছাড়া কোনো রোগ নেই। চাই দৈহিক রোগ হোক অথবা আত্মার রোগ। দৈহিক রোগের চেয়ে আত্মার রোগ মানুষের জন্য আরও অধিক ক্ষতিকর ও মারাত্মক। মানুষ দুনিয়াতে দৈহিক রোগকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে, আত্মার রোগকে সেভাবে গুরুত্ব দেয় না। যার ফলে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অশান্তির সৃষ্টি হয়। মানবাত্মার ব্যাধি একজন মানুষের জীবনকে বিষণ্ণ করে তুলে। সুতরাং মানবাত্মায় যেসব সংক্রামক ও ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তার চিকিৎসা কি তা জানা ও তদনুযায়ী চিকিৎসা করা ফরয। দুনিয়া মহব্বত এটি মানবাত্মার একটি ক্ষতিকর ও মারাত্মক ব্যাধি। অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাধিতে আক্রান্ত ও জর্জরিত। এ ব্যাধির চিকিৎসা কি তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

এক. দুনিয়ার হাকীকত ও বাস্তবতা সম্পর্কে গভীর ইলম থাকতে হবে

দুনিয়ার হাকীকত ও বাস্তবতা বিষয়ে আমরা উপরে আলোচনা করেছি।

দুই. দুনিয়াকে নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ বলে জানা

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "ইসহাক ইবন হানী রহ. তার মাসায়েলের আলোচনায় বলেন, "একদিন আবু আব্দুল্লাহ রহ. হাসান রহ. এর কথা নকল করে বলেন, একদিন আমি তার ঘর থেকে বের হই: তখন হাসান রহ. বলেন, তোমরা দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে কর। আল্লাহর শপথ করে বলছি! তুমি দুনিয়াকে একবারেই তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট পাবে, যখন তুমি তাকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট বলে জানবে। হাসান রহ. আরও বলেন, আমি পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে থাকলাম নাকি পূর্ব প্রান্তে তাতে আমি কোনো পরওয়া করি না। আমাকে আবু আব্দুল্লাহ রহ. বলেছেন, হে ইসহাক! আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট দুনিয়া কতই না নিকৃষ্ট![34]

---

[34] উদ্দাতুস-সাবেরীন ১৮৫

তিন. দুনিয়া খুব দ্রুত ধ্বংস আর আখিরাত অতি নিকটে এ বিষয়ে চিন্তা করা

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, “যে দুনিয়া প্রেমিক ও দুনিয়ার মহব্বতকারী দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে, সে দুনিয়াতে সবচেয়ে নির্বোধ, বোকা ও জ্ঞানহীন। কারণ, সে বাস্তবতার ওপর নিছক ধারণাকে প্রাধান্য দিয়েছে। আর নিদ্রাকে প্রাধান্য দিয়েছে জাগ্রত থাকার ওপর। দুনিয়াতে সে ক্ষণস্থায়ী ছায়া যা একটু পর থাকবে না, তাকে বেঁচে নিয়েছে, চিরস্থায়ী নিয়ামত যার কোনো শেষ বা পরিণতি নেই তার বিপরীতে। আর সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী জীবনকে স্থায়ী জীবনের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছে। চিরস্থায়ী হায়াত, উন্নত জীবন ব্যবস্থাকে ক্ষণস্থায়ী, পথনিন্দ্রা ও স্বপ্নের বিনিময় বিক্রি করে দিয়েছে। কান্না জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোক এ কাজ করতে পারে না এবং এ ধরনের ধোঁকায় পড়তে পারে না। তাদের দৃষ্টান্ত হলো, একজন লোক অপরিচিত লোক কোনো সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট আসল, তখন তারা তার সামনে খাওয়া, দাওয়া পেশ করলে, সে খেয়ে একটি

তাঁবুর ছায়াতে গিয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর তারা যখন তাঁবুটি খুলে ফেলল, তখন লোকটি আক্রান্ত হলে ঘুম থেকে উঠে বলল,

وان امرؤ دنياه أكبر همه * لمستمسك منها بحبل غرور

"যদি কোনো মানুষের নিকট তার বড় চাওয়া পাওয়া দুনিয়াই হয়ে থাকে। তাহলে মনে রাখতে হবে সে অবশ্যই একটি ধোঁকার রশিকে মজবুত করে ধরে আছে। এ ছাড়া আর কিছুই না"।

এ কবিতার মতই আরও একটি কবিতা কোনো এক মনীষী বলেছিলেন,

يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها * إن اغترارا بظل زائل حمق

"হে দুনিয়ার মজা উপভোগকারী! মনে রেখো! দুনিয়ার কোনো স্থায়িত্ব নেই এবং দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। এ তো শুধু সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী ছায়া, যদ্বারা আহমকরা ধোঁকায় পতিত হয়"।

ইউনুস ইবন আব্দুল আলা রহ. বলেন, "দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হলো, ঐ লোকের মতো যে ঘুমল এবং ঘুমের মধ্যে কিছু

খারাপ স্বপ্ন দেখল, আবার কিছু ভালো স্বপনও দেখল। স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে ঘুম থেকে উঠে গেল। তখন সে দেখতে পেল আরে আমিতো আমার বিছানায় শুয়ে আছি! আর এতক্ষণ আমি কত জায়গায় না ঘুরে বেড়াচ্ছি। অর্থাৎ দুনিয়া কেবলই স্বপ্ন, এছাড়া অন্য কিছু নয়"।[35]

আল্লামা ইবন কাসীর রহ. বলেন,

"আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন, ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ অর্থাৎ এ তো হলো, দুনিয়ার জীবনের সাময়িক সৌন্দর্য ও ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্য। وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلۡمَـَٔابِ আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট রয়েছে, তোমাদের উত্তম প্রত্যাবর্তন ও বিনিময়"।

আল্লামা ইবন জারির রহ. বলেন, উমার ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ "মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালোবাসা" নাযিল হলে,

---

[35] উদ্দাতুস-সাবেরীন ১৮৫।

আমি বললাম এখনই সময় হে আমার রব! তুমি আমাদের জন্য দুনিয়াকে সজ্জিত করলে! তারপর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ আয়াত নাযিল করেন, قُلۡ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيۡرٖ مِّن ذَٰلِكُمۡۖ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন, قُلۡ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيۡرٖ مِّن ذَٰلِكُمۡۖ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ "হে মুহাম্মাদ তুমি মানুষকে জানিয়ে দাও, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন, যে জীবনের সৌন্দর্য ও নি'আমত অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে, তা থেকে তোমাদের কি আমি চিরন্তন ও উত্তম জীবন সম্পর্কে সংবাদ দেব? তারপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ বিষয়ে বলেন, قُلۡ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيۡرٖ مِّن ذَٰلِكُمۡۖ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ "বল, 'আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম বস্তুর সংবাদ দিব? যারা তাকওয়া অর্জন করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর পবিত্র স্ত্রীগণ ও আল্লাহর

পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি'। আর আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও বলেন,

﴿وَلَا تَشۡتَرُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ ثَمَنٗا قَلِيلًاۚ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [النحل: 95]

"আর তোমরা স্বল্প মূল্যে আল্লাহর অঙ্গীকার বিক্রি করো না। আল্লাহর কাছে যা আছে, তোমাদের জন্যই তাই উত্তম যদি তোমরা জানতে"। [সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ৯৫] ঈমানের বিনিময়ে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্যকে ক্রয় করো না। কারণ, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া একেবারেই নগণ্য। যদি আদম সন্তানকে সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা আছে সব দেওয়া হয়, তবুও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট যা আছে তা অবশ্যই সমগ্র দুনিয়া হতে উত্তম হবে। আর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট যে সব বিনিময় ও সাওয়াব রয়েছে, তা তাদের জন্য অতি উত্তম, যারা ঈমান আনে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট সাওয়াব ও বিনিময় চায়, সাওয়াবের

আশায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। এ কারণে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও বলেন, إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ তারপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও বলেন,

﴿مَا عِندَكُمۡ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٖۗ وَلَنَجۡزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓاْ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٦﴾ [النحل: 96]

"তোমাদের নিকট যা আছে তা ফুরিয়ে যায়। আর আল্লাহর নিকট যা আছে তা স্থায়ী। আর যারা সবর করেছে, তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমরা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিব"। [সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ৯৬]

চার: অল্পে তুষ্টি

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন,

﴿أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ١﴾ [التكاثر: 1]

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে।" [সূরা আত-তাকাসুর, আয়াত: ১]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ كَانَتِ الآخرَةُ هَمهُ، جعَلَ اللهُ غِنَاهُ في قَلْبِهِ، وَجَمَع لَه شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وهِيَ راغِمةٌ، وَمَن كَانَتِ الدُّنيَا هَمهُ، جَعَلَ اللهُ فقْرَه بيَن عَيْنَيهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَملَهَ، وَلَم يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إلا مَا قُدِّرَ لَهُ»

"যে ব্যক্তির জীবনে আখিরাত অর্জন করাই তার বড় টার্গেট বা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার অন্তরকে অভাব মুক্ত করে দেন। তার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সম্পদকে সহজ করে দেন। আর দুনিয়া তার নিকট অপমান অপদস্থ হয়ে আসতে থাকে। আর যে ব্যক্তির জীবনে দুনিয়া অর্জন করাই তার বড় টার্গেট বা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দরিদ্রতা ও অভাব তার চোখের সামনে তুলে ধরেন এবং তার ওপর বিশৃঙ্খলা চাপিয়ে দেন। সে যতই চেষ্টা করুক না কেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার ভাগ্যে যতটুকু

দুনিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন, তার বাহিরে সে দুনিয়া হাসিল করতে পারবে না”[36]।

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম রহ. বলেন, হাসান রহ. আরও বলেন, “হে আদম সন্তান! তুমি তোমার অন্তরকে দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করো না। যদি তাই কর, তবে তুমি খুব খারাপ বস্তুর সাথে তোমার অন্তরকে সম্পৃক্ত করলে। তুমি তার সাথে সম্পর্কের রশি কেটে দাও, দরজাসমূহ বন্ধ করে দাও। হে আদম সন্তান! তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যতটুকু তোমাকে তোমার আসল গন্তব্যে পৌঁছাবে”[37]।

পাঁচ. দুনিয়ার মহব্বতের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করা

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, “দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে মানুষের পেটে খাওয়ারের ক্ষুধার মতো। বান্দা যখন মারা যাবে তখন সে অবশ্যই তার অন্তরে

---

[36] তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৬৫। আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

[37] উদ্দাতুস-সাবেরীন।

মহব্বতের পরিণতি দুর্গন্ধ ও খারাবী দেখতে পাবে। মানুষের খাওয়ার যখন হজম হয়ে যায়, তখন তা ঘৃণিত, পচা ও দুর্গন্ধ হয়ে মলদ্বার দিয়ে বের হয়। অনুরূপভাবে দুনিয়ার মহব্বতের পরিণতি। মানুষ যখন মারা যাবে তখন সে দুনিয়ার মহব্বতের পরিণতি কি তা চাক্ষুষ দেখতে পাবে। দুনিয়ার মহব্বতের দুর্গন্ধ সে অনুভব করবে। দুনিয়াতে খাদ্য যত উন্নত ও মজাদার হয় তার দুর্গন্ধ তত বেশি হয়। মানুষের নিকট প্রবৃত্তির চাহিদা যত বেশি আনন্দ দায়ক বা মজাদার হয়, তার মৃত্যু যন্ত্রণাও হবে বেশি কষ্টদায়ক ও যন্ত্রণাদায়ক। মানুষ যখন কাউকে অধিক ভালবাসে, তখন তাকে হারালে সে অধিক কষ্ট পায়; তার মহব্বত অনুযায়ী সে কষ্ট পেতে থাকবে। ভালোবাসা বেশি হলে কষ্ট বেশি আর ভালোবাসা কম হলে কষ্ট কম।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহহাক ইবন সুফিয়ানকে বলেন,

«يَا ضحَّاكُ مَا طَعَامُك» قال: اللحم واللبن قال: ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَاذَا؟ قال: إلى ما قد علمت، قال: «فَإِنَّ اللهَ ضَرَبَ مَا يَخرُجُ مِن اْبِن آدَمَ مثَلًا لِلدُّنْيَا»

“হে যাহহাক তোমার খাদ্য কী? উত্তরে সে বলল, গোস্ত ও দুধ। রাসূল বললেন, খাওয়ার পর এগুলো কী হয়? তখন সে বলল, যা আপনি জানেন। তখন রাসূল বললেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আদম সন্তানের পেটের থেকে যা বাহির হয় তাকে দুনিয়ার উপমা হিসেবে বর্ণনা করেছেন”[38]।

অনেক মনীষী তার সাথীদের বলতেন, চল আমার সাথে, আমি তোমাদের দুনিয়া দেখাবো। তারপর তাদের তিনি পায়খানায় নিয়ে যেতেন আর বলতেন, দেখ তোমরা তোমাদের ফলফলাদি, গোস্ত, মাছ ও পোলাও কোরমার পরিণতি”[39]।

---

[38] আহমদ, হাদীস নং ২০৭৩৩; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৭০২।

[39] উদ্দাতুস-সাবেরীন।

ছয়. সত্যিকার মজার কারণ লাভের জন্য ব্যস্ত হওয়া অনর্থক কোনো লাভের দিকে না তাকানো

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম রহ. বলেন, “দুনিয়াতে সবচেয়ে মজা ও উপভোগ্য বস্তু হলো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মারেফাত লাভ ও তার মহব্বতের মজা; এর চেয়ে অধিক মজা বা স্বাদ আর কোনো কিছুতে হতে পারে না। কারণ, এটাই হলো দুনিয়ার আসল মজা ও সর্বোচ্চ নি‘আমত। এ ছাড়া দুনিয়াতে আর যে সব ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক উপভোগ্য রয়েছে, তা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো; যার কোনো স্থায়িত্ব নেই। মানবাত্মা, দেহ ও অন্তরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভালোবাসা ও তার মহব্বতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই দুনিয়াতে সব চেয়ে উত্তম জিনিস হলো, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহব্বত ও তার মারেফাত হাসিল করা। আর জান্নাতে সবচেয়ে উপভোগ্য ও মজাদার বস্তু হলো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দিদার ও তার সাথে সাক্ষাত ও তাকে স্বচক্ষে দেখা। সুতরাং বলা যায় যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহব্বত ও তার

মারেফাত লাভ করা চক্ষুর শীতলতা আত্মার প্রশান্তি ও অন্তরের তৃপ্তিদায়ক। আর দুনিয়ার নি‘আমত ও আনন্দ হলো, ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক। আজকে যারা আনন্দ উপভোগ করছে বা শান্তিতে আছে আগামী দিন তারা এ শান্তিতে থাকতে পারবে না; তার শান্তি অশান্তিতে পরিণত হবে এবং তার খুশি দুঃখে পরিণত হবে। অবশেষে লোকটি এক অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে কালাতিপাত করবে। সুতরাং মনে রাখতে হবে আল্লাহ তা‘আলাকে বাদ দিয়ে কখনোই হায়াতে তাইয়্যেবার চিন্তা করা যায় না। অনেক আল্লাহ প্রেমিক সময় সময় বলতেন, আমরা যে শান্তিতে আছি জান্নাতীরা যদি এ ধরনের শান্তিতে থাকে তাহলে অবশ্যই বলতে হবে তারা কতনা শান্তিতে আছে। অপর এক আল্লাহ প্রেমিক বলেন, আমরা যে শান্তিতে আছি, তা যদি রাজা-বাদশাহ ও তাদের সন্তানেরা জানত, তাহলে আমাদের এ শান্তি

কেড়ে নেওয়ার জন্য তারা আমাদের সাথে তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করত[40]।

সাত. মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টিকে যাবতীয় সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেওয়া

আল্লামা ইবন রজব রহ. বলেন, "পূর্বেকার কোনো কোনো মনীষীদের কিতাবে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে মহব্বত করে, তার নিকট মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহব্বতের চেয়ে প্রিয় আর কোনো কিছু হতেই পারে না; সে সব সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহব্বতকে প্রাধান্য দেবে, অন্য কিছুকে সে প্রাধান্য দেবে না। আর যদি কোনো ব্যক্তি দুনিয়াকে মহব্বত করে, তাহলে তার নিকট দুনিয়া ছাড়া আর কোনো কিছু প্রাধান্য পাবে না। ইবন আবিদ দুনিয়া রহ. স্বীয় সনদে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি কোনো বস্তুকে আমার চক্ষু দ্বারা দেখি নি, কোনো কথা আমর জবান দ্বারা উচ্চারণ করি নি, কোনো বস্তুকে আমার হাত দ্বারা

---

[40] আল-জাওয়াবুল কাফী ১৬৮

স্পর্শ করি নি এবং পা দ্বারা পদপিষ্ট করিনি যতক্ষণ না, আমি চিন্তা করে দেখি যে এতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি নাকি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নাফরমানি। যদি দেখতাম এতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি রয়েছে, তখন আমি তা অতি তাড়াতাড়ি স্বআগ্রহে পালন করতাম আর যদি দেখতাম না এতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নাফরমানি রয়েছে, তাহলে তা থেকে আমি বিরত থাকতাম।

আট. জান্নাতের নি'আমতসমূহে ফিকির করা

আল্লামা ইবন রজব রহ. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَةِ» "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ আখিরাতের

জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নেই। আখিরাতের জীবনই একমাত্র জীবন”[41]।

এর কারণ, হলো, আদম সন্তানকে রূহ ও দেহের সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর রুহ ও দেহ উভয়টি বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য-বস্তু ও যা দ্বারা তার শক্তি সঞ্চার হয় তার প্রতি রুহ ও দেহ উভয় মুখাপেক্ষী। এর এটাই হলো তার বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় এবং এটাই হলো একমাত্র জীবন। খাদ্য, পানীয়, বিবাহ লেবাস, পোশাক ইত্যাদি আরো যে সব জীবেনাপকরণ আছে তা নিয়ে হলো দেহের জীবন। এগুলো ছাড়া দেহ টিকে থাকতে পারে না। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাই মানুষের সাথে জীব-জন্তুর একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আর মানবাত্মা হলো, একেবারেই সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক, যার তুলনা হলো ফিরিশতা। তার বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য-পানীয়ের প্রয়োজন হয় না। তার শক্তি, আরাম, আয়েশ, আনন্দ,

---

[41] আল্লামা তাবরানী হাদীসটি সাহাল ইবন সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন।

খুশি সবকিছুই হলো, তার স্রষ্টা, প্রতিপালক ও তার প্রভূকে চেনা, তার সাক্ষাত লাভের আকাঙ্ক্ষা, তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং যেসব ইবাদত বন্দেগী, যিকির-আযকার ও মহব্বত করলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভ করা যায় তা পালন করা। আর এটাই হলো, মানবাত্মার জীবন। আর যখন মানবাত্মার এসব খোরাক না থাকে দেহ যেমন খাদ্যের অভাবে হালাক হয়, অনুরূপভাবে মানবাত্মাও অসুস্থ ও ধ্বংস হয়। বরং মানব আত্মার পরিণতি আরও করুন হয়ে থাকে। এ কারণেই দেখা যায় অনেক ধনী ও সম্পদশালী সে তার দেহের চাহিদা পুরোপুরি পূরণ করা সত্ত্বেও সে তার অন্তরে ব্যথা ও ভয়ভীতি অনুভব করকে থাকে। দুনিয়ার নারী বাড়ী গাড়ী সবকিছু থাকা সত্ত্বে সে অস্থির। তখন অনভিজ্ঞ লোকেরা মনে করে লোকটিকে খাদ্য-পানীয় বাড়িয়ে দিতে হবে, তাহলে সে সুস্থ হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ ধারণা করে তার মাতলামি দুর হলে, তার ব্যথা ও যন্ত্রণা দুর হয়ে যাবে। কিন্তু না! এগুলো সবই তার ব্যথা ও ভীতিকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

কারণ, তার ব্যথা ও ভীতির আসল কারণ হলো, তার আত্মার শক্তির অভাব ও তার আত্মার খাদ্যাভাব। সে তার আত্মার চাহিদার যোগান দিতে পারছে না, ফলে সে ব্যথা অনুভব করছে এবং অসুস্থ হয়ে পড়ছে[42]।

নয়. বিশ্বাস করতে হবে যে দুনিয়ার জীবন ও আখিরাতের জীবনের মাঝে একত্র করা একটি কঠিন কাজ। সুতরাং কেবল আখিরাতের জীবনকে দুনিয়ার জীবনের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে

আল্লামা ইবন রজব রহ. বলেন,

মনে রাখতে হবে, দুনিয়ার জীবনে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনকে একত্র করা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি আত্মা ও অন্তরের জীবন নিয়ে ব্যস্ত হবে, সে অবশ্যই এ জীবন থেকে অনেক কিছুই লাভ করতে পারবে। তবে সে তার দেহ ও শরীরের সব চাহিদা মিটাতে পারবে না। তার দ্বারা তার মানবিক সব চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে না। ইন্দ্রিয় চাহিদাগুলো পূরণ করা তার জন্য সহজ হবে না।

---

[42] হাদীসে লাব্বাইয়িক-এর ব্যাখ্যা।

কেবল যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই সে পূরণ করতে পারবে। এতে করে তার দৈহিক জীবনে কিছু ক্ষতি হতে পারে এবং কিছু চাহিদা অপূরণীয় থেকে যেতে পারে। নবী রাসূলগণ ও তাদের অনুসারীদের জীবন এ ধরনেরই ছিল। তারা তাদের মানবিক জীবনের সব চাহিদা কুরবান করে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের বস্তুগত জীবনের উপকরণগুলো কমিয়ে দেন। পক্ষান্তরে তাদের আত্মার ও আধ্যাত্মিক জীবনের উপকরণ অফুরন্ত করে দেন। তারা দুনিয়ার জীবনে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেন। আর আখিরাতের জীবনেও তাদের জন্য রয়েছে চিরন্তন শান্তি ও অনাবিল আনন্দ। আল্লামা সাহাল আত্ তাসতরী রহ. বলেন, "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার কোনো বান্দাকে যে পরিমাণ নৈকট্য ও তার মারেফাত দান করেছেন, সে পরিমাণ তাকে দুনিয়ার জীবন থেকে কমিয়ে দিয়েছেন এবং তার জন্য সে পরিমাণ দুনিয়া হারাম করে দিয়েছেন। আর যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার জীবন থেকে কিছু অংশ দিয়েছেন, সে পরিমাণ অংশ তার জন্য আখিরাত থেকে কমিয়ে

দিয়েছেন বা সে পরিমাণ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য ও মারেফাত লাভ হতে সে বঞ্চিত হয়েছে[43]।

দশ. দুনিয়ার জীবন যে ক্ষণস্থায়ী এ বিষয়ে ফিকির করা

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "দুনিয়াদার লোকদের দৃষ্টান্ত সে সম্প্রদায়ের কাওমের মতো যারা একটি নৌকায় আরোহণ করল, নৌকাটি তাদের নিয়ে একটি দ্বীপের নিকট পৌঁছল। সেখানে পৌছার পর নৌকার মাঝি তাদের পায়খানা পেশাবের জন্য নৌকা হতে নামতে বলল। তারা সবাই পায়খানা পেশাব করার জন্য নৌকা হতে নামল। নামার সময় নৌকার মাঝি তাদের সবাইকে সতর্ক করে বলল তোমরা তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, অন্যথায় নৌকা তোমাদের রেখে চলে যাবে। আরোহী যাত্রীরা সবাই নৌকা থেকে নেমে পুরো দ্বীপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন স্থানে চলে গেল। তাদের কেউ

---

[43] হাদীসে লাব্বাইয়িক-এর ব্যাখ্যা।

কেউ নিজ নিজ প্রয়োজন শেষ করে দ্রুত নৌকায় আরোহণ করল। যারা তাড়াতাড়ি ফিরে আসল, নৌকায় এসে তারা দেখতে পেল নৌকা একেবারেই খালি, তাই তারা তাদের পছন্দমত ভালো ভালো জায়গাগুলো তাদের বসার জন্য বেছে নিল এবং উত্তম ও মনোরম আসনগুলো তারা তাদের বসার জন্য দখল করে নিল। আর কিছু লোক ছিল তারা দ্বীপের মধ্যে অনেক সময় অবস্থান করল; সেখানে তারা সুন্দর সুন্দর ফুল, গাছপালা, তরুলতা ও বাগ বাগিচা দেখতে লাগল এবং বিভিন্ন ধরনের পশু পাখির আওয়াজ ও গান শুনতে লাগল। তারা দ্বীপের সুন্দর সুন্দর পাথর দেখে অভিভূত হলো এবং তা উপভোগ করতে লাগল। তারপর তাদের মনে পড়ল নৌকার কথা! আমরাতো আরও দেরি করলে নৌকা হারাবো; নৌকা আমাদের রেখে চলে যাবে। তাই তারা তাড়াতাড়ি গিয়ে নৌকায় আরোহণ করল, তখন তারা গিয়ে দেখল নৌকা তাদের আসার আগেই ভরে গেছে। তখন তারা তুলনামূলক সংকীর্ণ জায়গা পেল এবং তাতে তারা বসে পড়ল। আর এক শ্রেণির লোক তারা সুন্দর

সুন্দর ও মহামূল্যবান পাথরের ওপর একবারে আসক্ত হয়ে পড়ল; তারা কিছু পাথর সেখান থেকে নিয়ে আসল। তারপর যখন তারা ফিরে আসল, তারা দেখতে পেল নৌকায় তাদের পাথর রাখার জায়গা-তো দুরের কথা তাদের জন্যও সংকীর্ণ জায়গা ছাড়া খোলামেলা কোনো বসার জায়গা আর অবশিষ্ট নেই। ফলে তাদের বহনকৃত পাথর তাদের কষ্টের কারণ হলো এবং এগুলো তাদের জন্য এক মহাবিপদ হলো। লজ্জায় তারা পাথরগুলো ফেলেও দিতে পারছে না এবং বহন করা ছাড়া কোনো উপায়ও দেখতে পারছে না। তারপর তারা নিরুপায় হয়ে পাথরগুলোকে তাদের কাঁধে নিল। এতে তারা খুব লজ্জা পাচ্ছিল; কিন্তু তাদের লজ্জা তাদের কোনো উপকারে আসে নি। কিছু সময় অতিবাহিত হলে, তাদের ফুলগুলো শুকিয়ে দুর্গন্ধ বের হলো এবং উপস্থিত লোকদের কষ্টের কারণ হলো। আর কিছু লোক দ্বীপের সৌন্দর্য ও চাকচিক্য দেখে এমনভাবে ডুবে পড়ল, সে নৌকার কথা পুরোই ভুলে গেল এবং উপভোগ করতে করতে অনেক দূরে চলে গেল। নৌকা ছাড়ার সময় যখন মাঝি উচ্চস্বরে

তাদের ডাক দিল, তারা তাদের খেল তামাশার কারণে মাঝির চিৎকার একটুও শুনতে পেল না। তারা তাদের কাজেই ব্যস্ত ছিল; কোনো সময় ফুলের ঘ্রাণ নেয়, আবার কোনো সময় ফল ছিঁড়ে, আবার কোনো সময় তারা গাছের সৌন্দর্য অবলোকন করে। তারা এ অবস্থার ওপর থাকতে থাকতে এমন একটি সময় আসল, এখন তারা বাঘের আতংকে ভুগতে ছিল, না জানি বাঘ এসে তাদের খেয়ে ফেলে। কাঁটাযুক্ত গাছ তাদের ঘিরে ফেলছে যা তাদের কাপড়কে নষ্ট করে ফেলে এবং পায়ের মধ্যে বিধে। চতুর্দিক থেকে গাছ-পালা ও ডালপালা তাদের উপর ছিটকে পড়ার আশঙ্কায় তারা আতংকিত[44]।

এগার. দুনিয়াকে মহব্বত করা থেকে বিরত থাকার ওপর ধৈর্য ধারণ করা

আল্লামা ইবন কাসীর রহ. বলেন,

“আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে কারুন সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেন, একদিন কারুণ অত্যন্ত

---

[44] উদ্দাতুস-সাবেরীন ১৯৫-১৯৬।

সেজে-গুজে তার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট উপস্থিত হলো। তার সাথে ছিল খুব সুন্দর সুন্দর যানবাহন ও মূল্যবান পোশাক। চতুর পাশে চাকর-বাকর ও খাদেমগণ ছিল তার নিরাপত্তা প্রহরী। তাকে দেখে যারা দুনিয়ার প্রতি দুর্বল এবং দুনিয়ার সৌন্দর্য ও চাকচিক্যের প্রতি লোভী, তারা বলল, হায়! কারুনের মতো যদি তাদেরও এ ধরনের ধন-সম্পদ থাকত! ... যারা প্রকৃত জ্ঞানী তারা যখন তাদের কথা শুনল, তখন তারা বলল,

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আখিরাতে তার মুমিন ও নেককার বান্দাদের যে সাওয়াব ও বিনিময় দিয়ে থাকেন, তা তোমরা এখন যা দেখছ, তা থেকে অধিক উত্তম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٧﴾[السجدة:17]

“অতঃপর কোনো ব্যক্তি জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী জিনিস লুমিয়ে রাখা হয়েছে, তারা যা করতে তার বিনিময়স্বরূপ”। [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ১৭]

«أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ واقرؤوا إن شئتم»

“আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন কিছু বস্তু তৈরি করছি, যা কোনো চক্ষু দেখে নি, কোনো কর্ণ কোনো দিন শোনে নি এবং কোনো মানুষের অন্তর তা চিন্তাও করে নি। তোমরা যদি চাও পড়তে পার”।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন,

﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ وَيۡلَكُمۡ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيۡرٞ لِّمَنۡ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗاۚ وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّٰبِرُونَ ٨٠﴾[القصص:80]

“আর যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, ‘ধিক তোমাদেরকে! আল্লাহর প্রতিদানই উত্তম যে ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তার জন্য। আর তা শুধু সবরকারীরাই পেতে পারে।” [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৮০]

আল্লামা সুদ্দি রহ. বলেন, জান্নাতে কেবল ধৈর্যশীলদেরই প্রবেশ করানো হবে। এ কথাটি যেন যাদের মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে ইলম দেওয়া হয়েছে

তাদের কথারই প্রতিধ্বনি। আল্লামা ইবন জারির রহ. বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যারা দুনিয়ার মহব্বত থেকে বিরত থাকছেন এবং তার ওপর ধৈর্য ধারণ করছেন আর দুনিয়ার তুলনায় আখিরাতের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ছেন। এ কথাটি যেন তাদের কথারই একটি অংশ।

পরিশিষ্ট

তুমি তোমার দুনিয়া বিষয়ে চিন্তা কর তুমি কত সময় নষ্ট করছ! তারপর তুমি স্মরণ কর সেদিনগুলোকে যে গুলো তুমি তোমার বন্ধু-বান্ধবের সাথে নষ্ট করছ; তুমি তাদের সাথে কীভাবে জীবন যাপন করছ। তুমি সতর্ক হও কারণ, তুমি তোমার করনীয় ও আবশ্যকীয় কাজ থেকে একেবারেই বেখবর। আর তুমি সাবধান হও দুনিয়া তোমার মধ্যে স্থান করে নেওয়া হতে। কারণ, সে যখন তোমার মধ্যে নামবে সাথে সাথে চলে যাবে। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

«مر رسول الله بشاة ميتة قد ألقاها أهلها، فقال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هذِهِ عَلى أَهْلِهِا»

“একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মৃত ছাগলের পাশে অতিক্রম করেন। যাকে ছাগলের মালিক রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। তারপর তিনি বললেন, যে কুদরতের হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, নিশ্চয় এ মৃত ছাগলটি তার মালিকের নিকট যতটুকু

মূল্যহীন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিকট দুনিয়া তার চেয়ে আরও অধিক মূল্যহীন তুচ্ছ”।

মুস্তাওরেদ ইবন সাদ্দাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا الدُّنْيَا في الآخِرَة إلَا مِثْلُ مَا يَجعلُ أَحَدُكمْ أصْبعَهُ فِي الْيَمِّ فَلَينظُر بمَا تَرْجِعُ»

“আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হলো, তোমাদের কেউ অথৈই সমুদ্রে তার স্বীয় আঙ্গুল ডুবাইলে কুল কিনারাহীন সমুদ্রের পানির তুলনায় তার আঙ্গুলের সাথে কতটুকু পানি আসে”।

আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করি যে তিনি যেন আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা এ ধোঁকার দুনিয়া হতে দুরে থাকেন এবং চিরস্থায়ী ও চির সুখের জীবন আখিরাতের প্রতি ধাবিত হন।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

অনুশীলনী

তোমার সামনে দুই ধরনের প্রশ্ন পেশ করা হলো এক ধরনের প্রশ্ন যে গুলোর উত্তর তুমি সাথে সাথে দিতে পারবে। আর এক ধরনের উত্তর তুমি সাথে সাথে দিতে পারবে না, বরং তোমাকে একটু চিন্তাভাবনা করে উত্তর দিতে হবে।

প্রথম প্রকার প্রশ্ন:

১. দুনিয়ার মহব্বতের নিদর্শনসমূহ কী?

২. দুনিয়ার মহব্বতের উল্লেখ যোগ্য কারণ সমূহ কি আলোচনা কর।

৩. দুনিয়ার মহব্বতের কারণে যে সব ক্ষতি ও অনিষ্ট সংঘটিত হয় তা কি?

৪. দুনিয়ার মহব্বতের চিকিৎসা কী?

দ্বিতীয় প্রকার প্রশ্ন:

১. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الدُّنْيَا سِجْنُ المُؤْمِنِ وجَنةَّ الْكَافِرِ»

“দুনিয়া মুমিনদের জন্য জেলখানা আর কাফিরদের জন্য জান্নাত” এ কথাটি ব্যাখ্যা কী?

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা দেখে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদল এবং তাকে কোনো কথাটি বলল? তার কথার উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বললেন?

৩. মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওপর মিথ্যা কথা বলা আর দুনিয়ার মহব্বত উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী?

অন্তর-বিধ্বংসী বিষয়সমূহ: নিফাক

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

৯০৩

অনুবাদ: জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদনা: ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

مفسدات القلوب: النفاق

محمد صالح المنجد

ترجمة: ذاكر الله أبو الخير

مراجعة: د/ محمد منظور إلهي

সূচীপত্র

১৫	৯. তারা মুমিনদের পরিণতি দেখার অপেক্ষায় থাকে	
১৬	১০. মুনাফিকদের চরিত্র হলো, আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়া ও ইবাদতে অলসতা করা	
১৭	১১. দ্বিমুখী নীতি ও সিদ্ধান্ত হীনতা	
১৮	১২. মুমিনদের ধোঁকা দেওয়া	
১৯	১৩. গাইরুল্লাহর নিকট বিচার ফায়সালা নিয়ে যাওয়া	
২০	১৪. মুমিনদের মাঝে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা	
২১	১৫. মিথ্যা শপথ করা, কাপুরুষতা ও ভীরুতা	
২২	১৬. তারা যা করে নি তার ওপর তাদের প্রশংসা শুনতে পছন্দ করত	
২৩	১৭. মুনাফিকরা নেক আমলসমূহের দুর্নাম করত	
২৪	১৮. তারা নিম্নমান ও অপারগ লোকদের প্রতি সন্তুষ্টি	
২৫	১৯. মুনাফিকরা খারাপ কাজের আদেশ দেয় আর ভালো কাজ থেকে নিষেধ করে	
২৬	২০. জিহাদকে অপছন্দ করা ও জিহাদ হতে বিরত থাকা	
২৭	২১. অপমান ও অপদস্থের দায়িত্ব কাঁধে নেয়া	
২৮	২২. মুমিনদের থেকে পিছে হটা	
২৯	২৪. জিহাদে না গিয়ে বিভিন্ন ওজুহাত দাঁড় করানো	
৩০	২৬. মুমিনদের মুসিবতে খুশি হওয়া	

৩১	২৭. যখন আমানত রাখা হয় খিয়ানত করে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, আর যখন প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ভঙ্গ করে আর যখন ঝগড়া করে অকাট্য ভাষায় গাল-মন্দ করে	
৩২	২৮. সময় মতো সালাত আদায় না করা	
৩৩	২৯. জামা'আতে সালাত আদায় করা হতে বিরত থাকা	
৩৪	৩০. অশ্লীল কথা বলা ও বেশি কথা বলা	
৩৫	৩১. গান শ্রবণ করা	
৩৬	নিফাক থেকে বাঁচার উপায়	
৩৭	এক. প্রথম ওয়াক্তের মধ্যে সালাত আদায় করা এবং ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমায় শরীক হওয়া।	
৩৮	দুই. উত্তম চরিত্র ও দীনের জ্ঞান	
৩৯	তিন. সদকা করা	
৪০	চার. কিয়ামুল্লাইল করা	
৪১	পাঁচ. আল্লাহর রাহে জিহাদ করা	
৪২	ছয়. আল্লাহর যিকির বেশি করা	
৪৩	সাত. দো'আ করা	
৪৪	আট. আনসারীদের মহব্বত করা	
৪৫	মুনাফিকদের বিষয়ে একজন ঈমানদারের অবস্থান কী হওয়া উচিত?	
৪৬	১. মুনাফিকদের আনুগত্য করা থেকে বিরত থাকা	

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। আর সালাত ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদের ওপর এবং তার পরিবার পরিজন ও সকল সাহাবীগণের ওপর।

মুনাফিকী বা কপটতা হলো এমন একটি কঠিন ব্যাধি, যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ ও মারাত্মক ক্ষতিকর। মুনাফিকী বা কপটতা মানুষের অন্তরের জন্য এত ক্ষতিকর যে, তা মানুষের অন্তরকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়, যার ফলে একজন মানুষ দুনিয়াতে ঈমান হারা হয় এবং দুনিয়া থেকে তাকে বেঈমান হয়ে চির বিদায় নিতে হয়। মানুষের অন্তর নষ্ট করার জন্য মুনাফেকি বা কপটতার চেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর আর কোনো কিছুই হতে পারে

না। একজন মানুষ কখনই মুনাফেকি বা কপটতাকে পছন্দ করে না। কিন্তু তারপরও তাকে তার অজান্তে মুনাফেকি বা কপটতাতে আক্রান্ত হতে হয়। বিশেষ করে নিফাকে আমলী বা ছোট নিফাক এর অর্থ এ নয় যে, মানুষ মুনাফেকি বা কপটতাকে প্রতিহত করতে অক্ষম বা মুনাফিকী বা কপটতা হতে বেঁচে থাকা মানুষের জন্য অসম্ভব। যারা মুনাফেকিকে হালকা করে দেখে বা নিফাক হতে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা কম করে তারাই মুনাফিকীতে আক্রান্ত হয়। নিফাক মানুষের যাবতীয় ভাল ও প্রশংসনীয় গুণকে ছিনিয়ে নেয় ও ঘৃণার পাত্রে পরিণত করে। কুরআনে করীমে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের অবস্থা তাদের গুণ ও তাদের তৎপরতা তুলে ধরে একটি সূরা নাযিল করেন। আমরা এ কিতাবে নিফাকের সংজ্ঞা, প্রকার, মুনাফিকদের চরিত্র ও নিফাক থেকে বাঁচার উপায়গুলো সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করব। যারা এ কিতাব লিখতে আমাদের সহযোগিতা করবে এবং মানুষের মধ্যে তা প্রকাশে অংশ গ্রহণ করবে আমরা তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

নিফাকের সংজ্ঞা

নিফাকের আভিধানিক অর্থ:

(نفق) নূন, ফা ও কাফ বর্ণগুলোর সমন্বয়ে গঠিত শব্দটি অভিধানে দু'টি মৌলিক ও বিশুদ্ধে অর্থে ব্যবহার হয়। প্রথম অর্থ দ্বারা কোনো কিছু বন্ধ হয়ে যাওয়া ও দূরীভূত হওয়াকে বুঝায় আর দ্বিতীয় অর্থ দ্বারা কোনো কিছুকে গোপন করা ও আড়াল করাকে বুঝায়।

নিফাক শব্দটি 'নাফাক' শব্দ হতে নির্গত। 'নাফাক' "জমির অভ্যন্তরে বা ভূ-গর্ভের গর্ত যে গর্তে লুকানো যায়, গোপন থাকা যায়। আর নিফাককে নিফাক বলে নাম রাখা হয়েছে, কারণ মুনাফিকরা তাদের অন্তরে কুফুরীকে লুকিয়ে রাখে বা গোপন করে।[1]

---

[1] দেখুন লিসানুল আরব ১০/৩৫৭ আরো দেখুন, মুজামু মাকায়েসুললুগাহ ৫/৪৫৫।

ইসলামী শরী‘আতে নিফাকের অর্থ: নিজেকে ভালো বলে প্রকাশ করা আর অন্তরে খারাবী ও অন্যায়কে গোপন করা।

ইবনে জুরাইজ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুনাফিক বলা হয়, যার কথা তার কাজের বিপরীত, সে যা প্রকাশ করে অন্তর তার বিপরীত, তার অভ্যন্তর বাহির হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তার প্রকাশ ভঙ্গি বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক।[2]

নিফাকের প্রকার:

নিফাক দুই প্রকার: এক. বড় নিফাক দুই. ছোট নিফাক।

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, নিফাক কুফুরীর মতোই। বড় নিফাক ও ছোট নিফাক। এ কারণেই অধিকাংশ সময়ে বলা হয়ে থাকে, কোনো কুফুর আছে যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় আবার কোনো কুফুর আছে যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ

---

[2] তাফসীরুল কুরআনীল আযীম ১/১৭২।

করে না। অনুরূপভাবে নিফাকও দু ধরনের: কিছু আছে যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়, তাকে বলা হয়, নিফাকে আকবর বা বড় নিফাক। আর কিছু আছে তা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে না, তাকে বলা হয় নিফাকে আসগর বা ছোট নিফাক।[3]

এক. বড় নিফাক এর সংজ্ঞা:

বড় নিফাক বা নিফাকে আকবর হলো, মুখে ঈমান ও ইসলামকে প্রকাশ করা আর অন্তরে কুফরকে গোপন রাখা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এ প্রকারের নিফাকই ছিল। কুরআনে করীম এ প্রকারের মুনাফিকদের কাফির বলে আখ্যায়িত করে এবং তাদের নিন্দা করেন। আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দেন যে, এ ধরনের মুনাফিক জাহান্নামের একেবারেই নীচের স্তরে অবস্থান করবে এবং তারা চির জাহান্নামী হবে। তারা কখনোই জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না।

---

[3] মাজমুউল ফতাওয়া ৭/৫২৪।

আল্লামা ইবন রজব রহ. বলেন, নিফাকে আকবর হলো, একজন মানুষ আল্লাহ, তার ফিরিশতা ও রাসূলগণ, আখিরাত দিবস এবং আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান প্রকাশ করা আর অন্তরে উল্লিখিত বিষয় সমূহের প্রতিটির প্রতি ঈমানের পরিপন্থী অথবা যে একটির প্রতি ঈমানের পরিপন্থী বিষয়কে গোপন করা।[4]

ফিকহবিদগণ মুনাফিকদের ক্ষেত্রে যিন্দীক শব্দটিও ব্যবহার করে থাকেন। তারা মুনাফিকদের যিন্দীক বলে আখ্যায়িত করেন।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "যিন্দীকের দল, তারা হলো, যারা ইসলাম ও রাসূলদের আনুগত্য প্রকাশ করে এবং কুফুর, শির্ক, আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিদ্বেষকে গোপন করে। তারা অবশ্যই মুনাফিক এবং তারা জাহান্নামের সর্ব নিম্নে অবস্থান করবে। আর তাতেই তারা চিরকাল অবস্থান করবে"। [5]

---

[4] জামে'উল উলুম ওয়াল হিকাম ১/৪৩১।

[5] তরীকুল হিজরাতাইন পৃ. ৫৯৫।

দুই. নিফাকে আমলী বা ছোট নিফাক:

নিফাকে আমলী বা ছোট নিফাকে লিপ্ত হলো তারা, যাদের অন্তরে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস আছে এবং তাদের আক্বীদা সঠিক, তবে গোপনে দীনি আমলসমূহের ওপর আমল করাকে ছেড়ে দেয়, আর প্রকাশ করে যে, সে আমল করে যাচ্ছে। এ ধরনের নিফাককে নিফাকে আমলী বা ছোট নিফাক বলে।

আল্লামা ইবন রজব রহ. বলেন, “নিফাকে আসগর বা ছোট নিফাক হলো, আমলের নিফাক। অর্থাৎ কোনো মানুষ নিজেকে নেক-কার বলে প্রকাশ করা আর অন্তরে এর পরিপন্থী বিষয়কে গোপন করা”।[6]

একজন মুসলিমের অন্তরে সে ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও নিফাকে আসগর বা ছোট নিফাক একত্র হতে পারে। তাতে তার ঈমান নষ্ট হবে না। যদিও এটি কবিরা গুনাহসমূহের অন্যতম কবিরা গুনাহ। কিন্তু নিফাকে আকবর বা বড় নিফাক ঈমানের সাথে একত্র হতে পারে

---

[6] জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম ১/৪৩১।

না। কারণ, এটি ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই কোনো বান্দা যখন আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, তার মধ্যে নিফাকে আকবর থাকতে পারে না।

কিন্তু যখন কোনো মানুষের অন্তরে নিফাকে আসগর প্রগাঢ় ও মজবুত হয়ে গেঁথে বসে, তখন তা কখনো বান্দাকে বড় নিফাকের দিকে নিয়ে যায় এবং তাকে দীন থেকে পরিপূর্ণ রূপে বের দেয়। ফলে সে ঈমান হারা হয়ে মারা যাওয়ার আশংকা থাকে। এ জন্য নিফাকে আমলীকে কখনোই খাট করে দেখার অবকাশ নাই।

হে পাঠক বন্ধুরা! তুমি যদি তোমার মধ্যে নিফাকের কোনো গুণ বা চরিত্র দেখতে পাও বা অনুভব কর, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা তুমি বর্জন কর। অন্যথায় দিন দিন তা তোমার মধ্যে আরো বেড়ে যাবে। আর যখন তুমি তোমার মধ্যে নিফাকের গুণকে বাড়তে দিবে, সে তোমাকে ধীরে ধীরে কুফরের দিকে পৌঁছাবে। তখন তোমার পরিণতি যে কত ভয়াবহ হবে তা তুমি নিজেই

বুঝতে পার। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।

আর নিফাকে আমলী বান্দাকে চির জাহান্নামী করে না, বরং তার বিধান অন্যান্য কবিরা গুনাহ কারীর মতোই। আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, আর যদি তিনি চান তাকে তার গুনাহের কারণে শাস্তি দিবেন। তারপর তার ঠিকানা হবে জান্নাত। এ গুনাহের থেকে মাপ পাওয়ার জন্য তাকে অবশ্যই খালেস তওবা করতে হবে।

দীনের মধ্যে নিফাকের ধরণ:

দীনের বিষয়ে মুনাফেকি দুই ধরনের হতে পারে: এক- মৌলিক, দুই- আকস্মিক সংঘটিত।

মৌলিক নিফাক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে নিফাকের পূর্বে সত্যিকার ইসলাম ছিল না বা ইসলাম অতিবাহিত হয়নি। অনেক মানুষ আছে যারা দুনিয়ার ফায়দা লাভ ও পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে নিজেকে মুসলিম বলে আখ্যায়িত করে, মূলতঃ সে তার জীবনের শুরুতেই অন্তর থেকে

ইসলামকে গ্রহণ করে নি ও আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করে নি। সুতরাং এ লোকটি তার জীবনের শুরু থেকেই একজন খাঁটি মুনাফিক, যদিও সে মুখে ইসলাম প্রকাশ করে বা মুসলিম সমাজে বসবাস করে। আবার অনেক লোক এমন আছে যারা সত্যিকার অর্থে মুসলিম, ঈমানে তারা সত্যবাদী। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের বিপদ-আপদ ও মুসীবত যদ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমানের পরীক্ষা নিয়ে থাকে, তাতে তারা সফলকাম হতে পারে নি এবং ঈমানের ওপর অটল থাকতে পারে নি। ফলে তাদের অন্তরে ইসলামের সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয় এবং তারা ইসলাম হতে মুরতাদ হয়ে যায়। তাদের ওপর মুরতাদের বিধান প্রয়োগ করা হবে। আবার অনেক মানুষ আছে তারা দুনিয়ার কোনো সুবিধা যা মুসলিম থাকলে লাভ করত, তা হতে বঞ্চিত হবে, এ আশংকায় সে তার মুরতাদ হওয়াকে গোপন রাখে। আর মুসলিম সমাজেই মুসলমানের নামে বসবাস করে। সে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় না যে আমি মুরতাদ। বরং যখন কোনো সুযোগ পায়, তখন ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিষোদাগার

করে এবং বিদ্বেষ ছড়ায়। এ ধরনের মুনাফিক আমাদের সমাজে অনেক রয়েছে। তারা ইঁদুরের মতো মুসলিমদের সমাজে আত্ম গোপন করে আছে। যখনই সুযোগ পায় ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি করতে কার্পণ্য করে না। আর সব সময় তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

একজন মুসলিম যখন কোনো মুসলিম সমাজে বসবাস করে তারপর যখন সে মুরতাদ হয়ে যায়, তাকে অবশ্যই দুর্নামের ভাগি হতে হবে এবং সামাজিক মর্যাদা হারাতে হবে। এ কথা আমাদের কারোই অজানা নয়। আমাদের সমাজে এ ধরনের মুনাফিক অসংখ্য। যারা বাস্তবে ইসলামের অনুশাসনে বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না; কিন্তু তারা সমাজে নিজেদের মুসলিম বলে প্রকাশ করে এবং মুসলিম হওয়ার সুবিধাও ভোগ করে, অপর দিকে বিজাতিদের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের থেকেও সুবিধা নেয়। তারা ইসলামের শত্রুদের দালালি করে। মুসলিম সমাজে বসবাস করে মুসলিমদের কীভাবে ক্ষতি করবে এ চিন্তায় তারা বিভোর থাকে।

নিফাক থেকে ভয় করা:

হে মুসলিম ভাইয়েরা! নিফাককে কঠিন ভয় করতে হবে। আমরা যাতে আমাদের মনের অজান্তে নেফাকের মধ্যে নিপতিত না হই সেদিকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে নিফাক অত্যন্ত খারাপ গুণ যা একজন মানুষের সামাজিক মর্যাদা থেকে নিয়ে সব কিছুকেই ধ্বংস করে দেয়। মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানকে ধ্বংস করে দেয়। সমাজে সে ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়।

সাহাবীগণ এবং তাদের পর সালফে সালেহীনরা নিফাককে কঠিন ভয় করতেন। এমনকি আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি যখন সালাতে তাশাহহুদ পড়ে শেষ করতেন, তখন তিনি আল্লাহর নিকট নিফাক হতে পরিত্রাণ কামনা করতেন এবং তিনি বেশি বেশি আশ্রয় প্রার্থনা করত। তার অবস্থা দেখে একজন সাহাবী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

«ومالك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟، فقال دعنا عنك، فو الله إن الرجل ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيُخلع منه»

“কি ব্যাপার হে আবু দারদা! তুমি নিফাককে এত ভয় কর কেন? তখন সে বলল, আমাকে আপন অবস্থায় থাকতে দাও। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, একজন লোক মুহূর্তের মধ্যেই তার দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলতে পারে। ফলে সে দীন হতে বের হয়ে যায়”।[7]

বড় বড় সাহাবীরাও নিফাককে ভয় করত। হানযালা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নিফাককে ভয় করার ঘটনা আমাদের নিকট সুপ্রসিদ্ধ। তিনি নিজেই তার ঘটনার বর্ণনা দেন।

«لقيَني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت يذكّرنا بالنار والجنة حتى كأنّا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا

---

[7] সীয়ারে আ-লামুন নুবালা ৬/৩৮২, আল্লামা যাহাবী বলেন হাদীসের সনদটি বিশুদ্ধ।

كثيرا .قال أبو بكر :فو الله، إنا لنلقى مثل هذا .فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله قلت :نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَمَا ذَاكَ ؟» قلت :يا رسول الله، نكون عندك تذكّرنا بالنار والجنة حتى كأنّا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونونَ عِنْدِي، وَفِي الذِّكْر، لَصافَحتْكُمُ الملائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُم وَفِي طُرُقِكُم، لَكِنِ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وسَاعَةً»

“একদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাথে আমার সাক্ষাত হলে, সে আমাকে বলে, হে হানযালা তুমি কেমন আছ? আমি উত্তরে তাকে বললাম, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে! আমার কথা শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলল, সুবহানাল্লাহ! তুমি কি বল? তখন আমি বললাম, আমরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে থাকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জান্নাত ও জাহান্নামের কথা আলোচনা করে

তখন আমরা যেন জান্নাত ও জাহান্নামকে দেখতে পাই। আর যখন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে বের হয়ে আসি এবং স্ত্রী, সন্তান ও দুনিয়াবি কাজে লিপ্ত হই, তখন আমরা অনেক কিছুই ভুলে যাই। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলল, আল্লাহর শপথ করে বলছি! আমাদের অবস্থাও তোমার মতোই। তারপর আমি ও আবু বকর উভয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে তার নিকট প্রবেশ করি এবং বলি হে আল্লাহর রাসূল! হানজালা মুনাফিক হয়ে গেছে! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলল, তা কীভাবে? আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যখন আপনার দরবারে উপস্থিত থাকি তখন আপনি আমাদের জান্নাত জাহান্নামের আলোচনা করেন, তখন আমাদের অবস্থা এমন হয়, যেন আমরা জান্নাত ও জাহান্নামকে দেখছি! আর যখন আমরা আপনার দরবার হতে বের হই এবং স্ত্রী, সন্তান ও দুনিয়াবি কাজে লিপ্ত হই, তখন আমরা অধিকাংশই ভুলে যাই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেন, আমি

ঐ সত্ত্বার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার জীবন, যদি আমার নিকট থাকা অবস্থায় তোমাদের যে অবস্থা হয়, সে অবস্থা যদি তোমাদের সব সময় থাকতো, তাহলে ফিরিশতারা তোমাদের সাথে তোমাদের বিছানায় ও চলার পথে সরাসরি মুসাফা করত। তবে হে হানাযালা! কিছু সময় এ অবস্থা হবে, আবার কিছু সময় অন্য অবস্থা হবে।[৪] (এ নিয়ে তোমাদের ঘাবড়ানোর কিছু নাই। এতে একজন মানুষ মুনাফিক হয়ে যায় না।)

হাদীসে হানযালা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মুনাফিক হয়ে গেছে, এ কথার অর্থ হলো, তিনি আশংকা করেন যে, তিনি মুনাফিক হয়ে গেছেন। কারণ, তিনি দেখলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিশে তার অবস্থার যে ধরন হয়ে থাকে, সেখান থেকে উঠে চলে গিয়ে যখন স্ত্রী, সন্তান, পারিবারিক কাজ ও দুনিয়াদারিতে লেগে যান, তখন তার অবস্থা আর ঐ রকম থাকে না। হানযালা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার এ দ্বৈত অবস্থাকেই মুনাফেকী

---

[৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৫০।

বলে আখ্যায়িত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জানিয়ে দেন যে, এ তো কোনো নিফাক নয়, আর মানুষ সর্বদা একই অবস্থার ওপর থাকার বিষয়ে দায়িত্বশীল নয়। কিছু সময় এক রকম থাকবে আবার কিছু সময় অন্য রকম থাকবে এটাই স্বাভাবিক।[9] (একজন মানুষের ঈমানও সব সময় এক রকম থাকে না। কখনো ঈমান বাড়ে আবার কখনো ঈমান কমে। আল্লাহ তা'আলা কথা, আল্লাহর দীনের কথা জান্নাত জাহান্নামের কথা আলোচনা হলে, তখন মানুষের ঈমান বাড়ে আর যখন মানুষ দুনিয়ার কাজ কর্মে লিপ্ত হয় তখন মানুষের ঈমান কমে। আমাদের উচিত হলো, আমরা বিজ্ঞ আলিম উলামা ও সালফে সালেহীনদের মজলিশে গিয়ে তাদের থেকে কুরআনের আলোচনা ও হাদীসের আলোচনা শোনা। তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, যারা বাণিজ্যিক বক্তা, মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কিচ্ছা কাহিনী, দুর্বল হাদীস, বানোয়াট হাদীস ও

---

[9] শরহে নববী লি-মুসলিম ১৭/৬৬-৬৭।

মিথ্যা কল্প কাহিনী দিয়ে ওয়াজ করে তাদের মজলিশে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকবে)।

খলিফাতুল মুসলিমিন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যাকে দুনিয়াতে জান্নাতের সু-সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তিনিও নিফাককে ভয় করতেন। যেমন, হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন,

دُعي عمر لجنازة فخرج فيها أو يريدها، فتعلّقتُ به فقلتُ : اجلس يا أمير المؤمنين، فإنّه من أولئك أي :من المنافقين، فقال :نشدتك الله، أنا منهم؟ قال :لا، ولا أبرئ أحداً بعدك

“একবার উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে একটি জানাযায় হাজির হতে দাওয়াত দেওয়া হলে, তিনি তাতে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন অথবা বের হওয়ার ইচ্ছা করেন। আমি তার পিছু নিয়ে তাকে বললাম! হে আমিরুল মুমিনীন আপনি বসুন! কারণ, আপনি যে লোকের জানাযায় যেতে চান সে ঐসব মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি! তুমি বলতো আমি কি তাদের

অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, না। তোমার পর আমি আর কাউকে এভাবে দায়মুক্ত ঘোষণা করব না"।[10]

ইবন আবি মুলাইকা রহ. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্রিশজন সাহাবীকে স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছি, তারা প্রত্যেকেই নিজের নফসের ওপর নিফাকের আশংকা করেন। তাদের কেউ এ কথা বলেনি: তার ঈমান জিবরীল বা মিকাইলের ঈমানের মতো মজবুত।[11]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, কাওমের লোকদের অন্তরসমূহ ঈমান ও বিশ্বাস এবং নিফাকের কঠিন ভয়ে ভরে গেছে। তাদের ছাড়া অনেক এমন আছে যাদের ঈমান তাদের গলদেশ অতিক্রম করে নি। অথচ তারা দাবি করে তাদের ঈমান জিবরীল ও মিকাইলের ঈমানের মতো।[12]

---

[10] ইবন আবি শাইবা এটি বর্ণনা করেছেন, আল-মুসান্নাফ ৮/৬৩৭।

[11] সহীহ বুখারী ১/২৬।

[12] মাদারেজুস সালেকীন ১/৩৫৮।

তাদের উল্লিখিত উক্তির অর্থ এ নয় যে, তারা ঈমানের পরিপন্থী আসল নিফাক বা বড় নিফাককে ভয় করছে। বরং তারা ভয় করছে ঈমানের সাথে যে নিফাক একত্র হতে পারে তাকে। অর্থাৎ ছোট নিফাক। সুতরাং এ নেফাকের কারণে সে মুনাফিক মুসলিম হবে মুনাফিক কাফির হবে না।[13]

[13] এহইয়াউ 'উলুমুদ্দিন ৪/১৭২।

কুরআন ও হাদীসে মুনাফিকদের চরিত্র

কুরআনে করীম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের অসংখ্য জায়গায় মুনাফিকদের আলোচনা এসেছে। তাতে তাদের চরিত্র ও কর্মতৎপরতা আলোচনা করা হয়েছে। আর মুমিনদেরকে তাদের থেকে সতর্ক করা হয়েছে যাতে তাদের চরিত্র মুমিনরা অবলম্বন না করে। এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাদের নামে একটি সুরাও নাযিল করেন। মুনাফিকদের চরিত্র:

১. মুনাফিকদের অন্তর রুগ্ন ও ব্যাধিগ্রস্ত:

মুনাফিকদের অন্তর রুগ্ন ও ব্যাধিগ্রস্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে করীমে এরশাদ করেন,

﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ﴾ [البقرة: 10]

“তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে

যন্ত্রণাদায়ক আযাব। কারণ তারা মিথ্যা বলত”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১০]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, সন্দেহ, সংশয় ও প্রবৃত্তির ব্যাধি তাদের অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলছে, ফলে তাদের অন্তর বা আত্মা ধ্বংস হয়ে গেছে। আর তাদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও নিয়তের ওপর খারাপ ও নগ্ন মানসিকতা প্রাধান্য বিস্তার করছে। ফলে তাদের অন্তর একদম হালাক বা ধ্বংসের উপক্রম। বিজ্ঞ ডাক্তাররাও এখন তার চিকিৎসা দিতে অক্ষম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًاۖ﴾ “তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।”

২. মুনাফিকদের অন্তরে অধিক লোভ-লালসা:

মুনাফিকরা অধিক লোভী হয়ে থাকে। যার কারণে তারা পার্থিব জগতকে বেশি ভালোবাসে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّۚ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا﴾ [الأحزاب: 32]

“হে নবী–পত্নিগণ, তোমরা অন্য কোনো নারীর মতো নও। যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩২]

অর্থাৎ যে ব্যক্তির অন্তরে ঈমান দুর্বল থাকে, সে তার দুর্বলতার কারণে লোভী হয়ে থাকে। আর সে তার ঈমানের দুর্বলতার কারণে ইসলাম বিষয়ে সন্দেহ পোষণকারী একজন মুনাফিক। যার ফলে সে আল্লাহ তা‘আলার দেওয়া বিধানকে গুরুত্বহীন মনে করে এবং হালকা করে দেখে। আর অন্যায় অশ্লীল কাজ করাকে কোনো অন্যায় মনে করে না।[14]

---

[14] জামেউল বয়ান ২০/২৫৮।

৩. মুনাফিকরা অহংকারী ও দাম্ভিক:

মুনাফিকরা কখনই তাদের নিজেদের দোষত্রুটি নিজেরা দেখতে পায় না। তাই তারা নিজেদের অনেক বড় মনে করে। কারো কোনো উপদেশ তারা গ্রহণ করে না, তারা মনে করে তাদের চাইতে বড় আর কে হতে পারে? আল্লাহ তা‘আলা তাদের অহংকারী স্বভাবের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ يَسۡتَغۡفِرۡ لَكُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوۡاْ رُءُوسَهُمۡ وَرَأَيۡتَهُمۡ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسۡتَكۡبِرُونَ﴾ [المنافقون: 5]

“আর তাদেরকে যখন বলা হয় এস, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা তাদের মাথা নাড়ে। আর তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে, অহঙ্কারবশত বিমুখ হয়ে চলে যেতে।” [সূরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত: ৫]

এ আয়াতে অভিশপ্ত মুনাফিকদের বিষয়ে সংবাদ দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ يَسۡتَغۡفِرۡ لَكُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوۡاْ رُءُوسَهُمۡ وَرَأَيۡتَهُمۡ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسۡتَكۡبِرُونَ﴾

“আর তাদেরকে যখন বলা হয় এস, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা তাদের মাথা নাড়ে। আর তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে, অহঙ্কারবশত বিমুখ হয়ে চলে যেতে”।

অর্থাৎ তাদের যা পালন করতে বলা হলো, অহংকার ও অহমিকা বশত বা নিকৃষ্ট মনে করে তারা তা পালন করা হতে বিরত থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা তাদের শাস্তি দিয়ে বলেন,

﴿سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ أَسۡتَغۡفَرۡتَ لَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ لَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ٦﴾ [المنافقون: ٦]

“তুমি তাদের জন্য ক্ষমা কর অথবা না কর, উভয়টি তাদের ক্ষেত্রে সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। অবশ্যই আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়েত দেন না।” [সূরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত: ৬]

৪. মুনাফিকদের চরিত্র হলো, আল্লাহ তা‘আলার আয়াতসমূহের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَحۡذَرُ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيۡهِمۡ سُورَةٞ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمۡۚ قُلِ ٱسۡتَهۡزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخۡرِجٞ مَّا تَحۡذَرُونَ﴾ [التوبة: 64]

“মুনাফিকরা ভয় করে যে, তাদের বিষয়ে এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হবে, যা তাদের অন্তরের বিষয়গুলি জানিয়ে দেবে। বল, ‘তোমরা উপহাস করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ বের করবেন, তোমরা যা ভয় করছ”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬৪]

আয়াতের ব্যাখ্যা: মুনাফিকরা সব সময় এ আশংকা করত যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের অন্তরে যা আছে, তা মুমিনদের নিকট একটি সূরা নাযিল করে জানিয়ে দিবেন। তাদের এ আশংকার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন। কারো মতে, আল্লাহ তা‘আলা তার রাসূলের ওপর এ আয়াত নাযিল করেন, কারণ, মুনাফিকরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো দোষ বর্ণনা, তার বা মুসলিমদের কোনো কর্মের সমালোচনা করত, তখন তারা নিজেরা বলাবলি করত,

আল্লাহ আমাদের গোপন বিষয় প্রকাশ করে না দেয়। তাদের কথার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে বলেন, আপনি তাদের ধমক ও হুমকি দিয়ে বলুন, ﴿ٱسۡتَهۡزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخۡرِجٞ مَّا تَحۡذَرُونَ﴾ "তোমরা উপহাস করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ বের করবেন, তোমরা যা ভয় করছ"।

৫. মুমিনদের সাথে বিদ্রূপ:

মুনাফিকরা মুমিনদের সাথে বিদ্রূপ করত। তারা যখন মুমিনদের সাথে মিলিত হত, তখন তারা মুমিনদের সাথে প্রকাশ করত যে, তারা ঈমানদার আবার যখন তারা তাদের কাফির বন্ধুদের সাথে মিলিত হত, তখন তারা তাদের সাথে ছির অন্তরঙ্গ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ ١٤ ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ﴾ [البقرة: 14-15]

"আর যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে 'আমরা ঈমান এনেছি' এবং যখন গোপনে তাদের

শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, ‘নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী’। আল্লাহ তাদের প্রতি উপহাস করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরার অবকাশ দেন।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪, ১৫]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, মুনাফিকদের দু’টি চেহারা: একটি চেহারা দ্বারা তারা মুমিনদের সাথে সাক্ষাত করত, আর আরেকটি চেহারা দ্বারা তারা তাদের মুনাফিক (কাফের) ভাইদের সাথে সাক্ষাত করত। তাদের দু’টি মুখ থাকত, একটি দ্বারা তারা মুসলিমদের সাতে মিলিত হত, আর অপর চেহারা তাদের অন্তরে লুকায়িত গোপন তথ্য সম্পর্কে সংবাদ দিত।

তারা কিতাব ও সুন্নাহ এবং উভয়ের অনুসারীদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ফিরে যায় এবং তারা তাদের নিকট যা আছে তার ওপর সন্তুষ্ট থাকে। আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল কৃত ওহীর বিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকে অস্বীকার করত। তারা মনে করত, তারাই বড় জ্ঞানী। হে

রাসূল আপনি তাদের বলে দিন, তাদের জ্ঞান যতই থাকুক না কেন, তা তাদের কোনো উপকারে আসে না, বরং তা তাদের অন্যায় অনাচারকে আরো বৃদ্ধি করে। আর আপনি কখনোই তাদের ওহীর প্রতি আনুগত্য করতে দেখবেন না। তাদের আপনি দেখবেন ওহীর প্রতি বিদ্রূপ কারী। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদের বিদ্রূপের বদলা দেবেন। ﴿ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ﴾ "আল্লাহ তাদের প্রতি উপহাস করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরার অবকাশ দেন।" তারা তাদের কু-কর্মে আনন্দ ভোগ করতে থাকবে।

৬. মানুষকে আল্লাহর রাহে খরচ করা হতে বিরত রাখা:

মুনাফিকরা মানুষকে আল্লাহর রাখে খরচ করাকে অনর্থক মনে করে। তাই তারা মানুষকে আল্লাহর রাহে খরচ করতে নিষেধ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْۗ وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَفۡقَهُونَ﴾ [المنافقون: 7]

“তারাই বলে, যারা আল্লাহর রাসূলের কাছে আছে তোমরা তাদের জন্য খরচ করো না, যতক্ষণ না তারা সরে যায়। আর আসমানসমূহ ও যমিনের ধন-ভাণ্ডার তো আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না। [সূরা আল মুনাফিকূন, আয়াত: ৭]

যায়েদ ইবন আরকাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,

«كنت في غزاة، فسمعت عبدالله بن أُبيّ يقول :لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضّوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ، فذكرت ذلك لعمّي أو لعمر، فذكره للنبي فدعاني فحدّثته، فأرسل رسول الله إلى عبد الله بن أُبيّ وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذّبني رسول الله وصدّقه،فأصابني همّ لم يصبني مثلُه قطّ، فجلست في البيت فقال لي عمّي :ما أردت إلى أن كذبك رسول الله

ومقتك، فأنزل الله تعالى فبعث إليّ النبي فقرأ إِنَّ الله قَدْ صَدقَك يَا زَيْدُ»

“আমি একদা একটি যুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবন উবাই কে বলতে শুনি সে বলে, তোমরা মুহাম্মদের আশ পাশে যে সব মুমিনরা রয়েছে, তাদের জন্য খরচ করো না, যাতে তারা তাকে ছেড়ে চলে যায়। আর যদি তারা মদিনায় ফিরে আসে তাহলে মদিনার সম্মানী লোকেরা এ সব নিকৃষ্ট লোকদের বহিষ্কার করবে। আমি বিষয়টি আমার চাচা অথবা উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বললে, তারা বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আলোচনা করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাকে বিস্তারিত বিষয়টি জানালাম। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ও তার সাথীদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, তারা শপথ করে বলল, আমরা এ ধরনের কোনো কথা বলি নাই। তাদের কথা শোনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথা বিশ্বাস করল, আর আমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করল। এরপর আমি এত

চিন্তিত হলাম ইতোপূর্বে আর কোনো দিন আমি এত চিন্তিত হই নাই। আমি লজ্জিত হয়ে ঘরে বসে থাকতাম। লজ্জায় ঘর থেকে বের হতাম না। তখন আমার চাচা আমাকে বলল, আমরা কখনো চাইছিলাম না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করুক বা তোমাকে অস্বীকার করুক। তারপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত-

﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ قَالُواْ نَشۡهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ﴾ [المنافقون: 1]

"যখন তোমার কাছে মুনফিকরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তার রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যবাদী" নাযিল করেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে পাঠান এবং আমাকে এ

আয়াত পাঠ করে শোনান এবং বলেন, হে যায়েদ! আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত করেন।”

৭. মুনাফিকদের মূর্খতা ও মুমিনদের মূর্খ বলে আখ্যায়িত করা:

মুনাফিকরা নিজেরা মূর্খ এ জিনিষটি তাদের চোখে ধরা পড়তো না। কিন্তু তারা মুমিনদের মূর্খ বলে আখ্যায়িত করত। এ কারণেই তাদের যখন মুমিনদের ন্যায় ঈমান আনার জন্য বলা হত, তখন তারা বলত, মুমিনরা-তো বুঝে না, তারা মূর্খ, তাই তারা ঈমান এনেছে। আমরাতো মূর্খ নই, আমরা শিক্ষিত আমরা কেন ঈমান আনব? আল্লাহ তা‘আলা তাদের বিষয়ে বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة: 13]

“আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা ঈমান আন যেমন লোকেরা ঈমান এনেছে’, তারা বলে, ‘আমরা কি ঈমান আনব যেমন নির্বোধরা ঈমান এনেছে’? জেনে রাখ,

নিশ্চয় তারাই নির্বোধ; কিন্তু তারা জানে না"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৩]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, যারা কুরআন ও হাদীসের আনুগত্য করে তারা তাদের নিকট নির্বোধ, বোকা। তাদের জ্ঞান বুদ্ধি বলতে কিছুই নাই। আর যারা ইসলামী শরী'আতের বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে চায় তারা তাদের নিকট সেই গাধার মত যে বোঝা বহন করে। তার কিতাব বা ব্যবসায়ীর মালামাল দ্বারা তার কোনো লাভ হয় না। সে নিজে কোনো প্রকার উপকার লাভ করতে পারে না। আর যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং তার আদেশের আনুগত্য করে তারা হলো, তাদের নিকট নির্বোধ, মূর্খ। তাই তারা তাদের মজলিশে তার উপস্থিতিকে অপছন্দ করত ও তার দ্বারা তারা তাদের অযাত্রা হতো বলে বিশ্বাস করত।[15]

[15] মাদারেজুস সালেহীন ১/৩৫০।

৮. কাফিরদের সাথে তাদের বন্ধুত্ব:

মুনাফিকরা কাফিরদেরকে তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত। মুমিনদের তারা কখনোই তাদের বন্ধু বানাত না। তারা মনে করত কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করলে তারা ইজ্জত সম্মানের অধিকারী হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿بَشِّرِ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣٨ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ أَيَبۡتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلۡعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلۡعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: 138، 139]

"মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও যে, নিশ্চয় তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। যারা মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান চায়? অথচ যাবতীয় সম্মান আল্লাহর"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩৮, ১৩৯]

আয়াতের ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে বলেন, হে মুহাম্মদ! بَشِّرِ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ তুমি ঐ সব মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও, যে সব মুনাফিকরা আমার দীন অস্বীকারকারী ও বেঈমানদের সাথে বন্ধুত্ব করে অর্থাৎ

মুমিনদের বাদ দিয়ে তারা কাফিরদের তাদের সহযোগী ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি আমার ওপর অবিশ্বাসী বেঈমানদের সাথে বন্ধুত্ব করার মাধ্যমে তাদের নিকট থেকে শক্তি, সামর্থ্য, সম্মান ও সাহায্য তালাশ করে?। তারা কি জানে না? ইজ্জত, সম্মান, শক্তি সামর্থ্য-তো সবই আল্লাহর জন্য। أَيَبۡتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلۡعِزَّةَ "তারা কি তাদের কাছে সম্মান চায়?" অর্থাৎ তারা কি তাদের নিকট ইজ্জত তালাশ করে? আর যারা নিকৃষ্ট ও সংখ্যালঘু কাফিরদের থেকে সম্মান পাওয়ার আশায় তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কেন মুমিনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে না? তারা যদি মুমিনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত, তাহলে তারা ইজ্জত, সম্মান ও সহযোগিতা আল্লাহর নিকটই তালাশ করত। কারণ, ইজ্জত সম্মানের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ। যাবতীয় ইজ্জত সম্মান কেবলই আল্লাহর। আল্লাহ বলেন, فَإِنَّ ٱلۡعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا "যাবতীয়

সম্মান আল্লাহর” তিনি যাকে চান ইজ্জত দেন, আর যাকে চান বে-ইজ্জত করেন।[16]

৯. তারা মুমিনদের পরিণতি দেখার অপেক্ষায় থাকে:

মুনাফিকরা সব সময় পিছনে থাকত, কারণ, তারা অপেক্ষা করত, যদি বিজয় মুমিনদের হয়, তাহলে তারা মুমিনদের সাথে মিলে যায় আর যদি বিজয় কাফিরদের হয়, তখন কাফিরদের পক্ষে চলে যায়। তাদের এ ধরনের অপকর্মের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمۡ فَإِن كَانَ لَكُمۡ فَتۡحٞ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَكُن مَّعَكُمۡ وَإِن كَانَ لِلۡكَٰفِرِينَ نَصِيبٞ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَسۡتَحۡوِذۡ عَلَيۡكُمۡ وَنَمۡنَعۡكُم مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ فَٱللَّهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 41]

“যারা তোমাদের ব্যাপারে (অকল্যাণের) অপেক্ষায় থাকে, অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি তোমাদের বিজয় হয়,

[16] জামেউল বায়ান ৯/৩১৯

তবে তারা বলে, ‘আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না’? আর যদি কাফিরদের আংশিক বিজয় হয়, তবে তারা বলে, ‘আমরা কি তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব করি নি এবং মুমিনদের কবল থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করি নি’? সুতরাং আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার করবেন। আর আল্লাহ কখনো মুমিনদের বিপক্ষে কাফিরদের জন্য পথ রাখবেন না।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪১]

আয়াতের ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে মুমিনগণ! ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمۡ যারা তোমাদের পরিণতি জানার জন্য অপেক্ষা করে। فَإِن كَانَ لَكُمۡ فَتۡحٞ مِّنَ ٱللَّهِ “যদি আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের বিজয় হয়।” অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা যদি তোমাদের দুশমনদের ওপর তোমাদের বিজয় দান করে এবং তোমরা গণিমতের মাল লাভ কর, তখন তারা তোমাদের বলবে, أَلَمۡ نَكُن مَّعَكُمۡ আমরা কি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করি নি এবং তোমাদের সাথে লড়াই করি নি? তোমরা আমাদেরকে গণিমতের মাল

হতে আমাদের ভাগ দিয়ে দাও! কারণ, আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধে শরিক ছিলাম। অথচ তারা তাদের সাথে যুদ্ধে শরিক ছিল না তারা জান প্রাণ চেষ্টা করত পরাজয় যাতে মুমিনদের ললাটে থাকে। وَإِن كَانَ لِلْكَـٰفِرِينَ نَصِيبٌ আর যদি বিজয় তোমাদের কাফির দুশমনদের হয়ে থাকে এবং তারা তোমাদের থেকে ধন-সম্পদ লাভ করে, তখন এসব মুনাফিকরা কাফিরদের গিয়ে বলবে, أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ আমরা কি তোমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করি নি? যার ফলে তোমরা মুমিনদের ওপর বিজয় লাভ করছ! তাদেরকে আমরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করা হতে বাধা দিতাম। আর তাদের আমরা বিভিন্নভাবে অপমান, অপদস্থ করতাম। যার ফলে তারা তোমাদের আক্রমণ করা হতে বিরত থাকে এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে। আর এ সুযোগে তোমরা তোমাদের দুশমনদের ওপর বিজয় লাভ কর। فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের মাঝে ও মুনাফিকদের মাঝে কিয়ামতের দিন ফায়সালা করবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুমিন ও মুনাফিকদের মাঝে কিয়ামতের দিন ফায়সালা

করবেন। যারা ঈমানদার তাদের আল্লাহ তা‘আলা জান্নাত দান করবেন, আর যারা মুনাফিক তাদের তিনি কাফির বন্ধুদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।[17]

১০. মুনাফিকদের চরিত্র হলো, আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়া ও ইবাদতে অলসতা করা:

মুনাফিকরা তাদের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহকে ধোঁকা দেয় এবং সালাতে তারা অলসতা করে। তাদের সালাত হলো, লোক দেখানো। তারা আল্লাহর ভয়ে ইবাদত করে না। তারা ইবাদত করে মানুষের ভয়ে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمۡ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلٗا﴾ [النساء: 142]

“নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়। অথচ তিনি তাদের ধোঁকা (-এর জবাব) দান কারী। আর যখন তারা

---

[17] জামেয়ুল বায়ান ৯/৩২৪

সালাতে দাঁড়ায় তখন অলস-ভাবে দাঁড়ায়, তারা লোকদেরকে দেখায় এবং তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪২]

আয়াতের ব্যাখ্যা: মুনাফিকরা তাদের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ তা‘আলাকে ধোঁকা দেয়। কারণ, তাদের নিফাকই তাদের জান-মাল ও ধন-সম্পদকে মুমিনদের হাত থেকে রক্ষা করে থাকে। মুখে ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করার কারণে, আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়। অথচ, আল্লাহ তা‘আলা তাদের অন্তরে তারা যে কুফুরকে লুকিয়ে রাখছেন তা জানেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে না করেন। এর দ্বারা তিনি দুনিয়াতে তাদের সুযোগ দেন। আর যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের থেকে এর বদলা নিবেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে তারা অন্তরে যে কুফরকে গোপন করত তার বিনিময়ে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ﴿وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ﴾ “আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন অলস-ভাবে দাঁড়ায়, তারা লোকদেরকে দেখায়” মুনাফিকরা আল্লাহ তা‘আলা যে সব নেক আমল ও ইবাদত বন্দেগী মুমিনদের ওপর ফরয করেছেন, তার কোনো একটি নেক আমল মুনাফিকরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে না। কারণ, কীভাবে করবে তারা তো আখিরাত, পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম কোনো কিছুই বিশ্বাস করে না। তারা প্রকাশ্যে যে সব আমল করে থাকে তা কেবলই নিজেদের রক্ষা করার জন্যই করে থাকে অথবা মুমিনদের থেকে বাঁচার জন্য করে থাকে। যাতে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে না পারে এবং তাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিতে না পারে। তাই তারা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন অলসতা করে দাঁড়ায়। সালাতে দাঁড়িয়ে তারা এদিক সেদিক তাকায় এবং নড়াচড়া করে। সালাতে উপস্থিত হয়ে তারা মুমিনদের দেখায় যে, আমরা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত অথচ তারা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, তারা সালাত আদায় করা যে ফরয বা ওয়াজিব

তাতে বিশ্বাস করে না। তাই তাদের সালাত হলো, লোক দেখানো সালাত, আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার সালাত নয়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ﴿وَلَا يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلٗا﴾ "এবং তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে।" এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে কি তারা আল্লাহর যিকির কম করে বেশি করে না? উত্তরে বলা হবে, এখানে তুমি আয়াতের অর্থ যা বুঝেছ, তা বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত। আয়াতের অর্থ হলো, তারা একমাত্র লোক দেখানোর জন্যই আল্লাহর যিকির করে, যাতে তারা তাদের নিজেদের থেকে হত্যা, জেল ও মালামাল ক্রোক করাকে প্রতিহত করতে পারে। তাদের যিকির আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করা বা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য নয়। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে কম বলে আখ্যায়িত করেন। কারণ, তারা তাদের যিকির দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও সাওয়াব লাভ করাকে উদ্দেশ্য বানায়নি। সুতরাং তাদের আমল যতই বেশি হোক না কেন তা

বাস্তবে মরীচিকার মতোই। যা বাহ্যিক দিক দিয়ে দেখতে পানি বলে মনে হয় কিন্তু বাস্তবে তা পানি নয়।[18]

১১. দ্বিমুখী নীতি ও সিদ্ধান্ত হীনতা:

মুনাফিকরা দ্বৈতনীতির হয়ে থাকে। তাদের বাহ্যিক এক রকম আবার ভিতর আরেক রকম। তারা যখন মুমিনদের সাথে মিলে তখন তারা যেন পাক্কা ঈমানদার, আবার যখন কাফিরদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা কাট্টা কাফির। তাদের এ দ্বি-মুখী নীতির কারণে তাদের কেউ বিশ্বাস করে না। সবার কাছেই তারা ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের দ্বিমুখী নীতির সমালোচনা করে বলেন,

﴿مُّذَبۡذَبِينَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِۚ وَمَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلٗا﴾

"তারা এর মধ্যে দোদুল্যমান, না এদের দিকে আর না ওদের দিকে। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি

---

[18] জামেউল বায়ান ৫/৩২৯।

কখনো তার জন্য কোনো পথ পাবে না”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪৩]

অর্থাৎ মুনাফিকরা তাদের দীনের ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে। তারা সঠিকভাবে কোনো কিছুকেই বিশ্বাস করতে পারে না। তারা বুঝে শুনে মুমিনদের সাথেও নয় আবার না বুঝে কাফিরদের সাথেও নয়; বরং তারা উভয়ের মাঝে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে।[19]

আব্দুল্লাহ উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ فِي هَذِهِ مَرَّةً وَفِي هَذِهِ مَرَّةً»

“মুনাফিকদের উপমা ছাগলের পালের মাঝে দড়ি ছাড়া বকরীর মত। একবার এটিকে গুঁতা দেয় আবার এটিকে গুঁতা দেয়।[20]

---

[19] জামেউল বায়ান ৯/৩৩৩।

[20] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৮৪।

ইমাম নববী রহ. বলেন, العائرة শব্দের "সিদ্ধান্তহীন লোক, সে জানেনা দু'টির কোনোটির পিছু নিবে। আর تعير "ঘুরাঘুরি করা, ছুটাছুটি করা।[21] মুনাফিকরাও অনুরূপ। তারা সর্বদা সিদ্ধান্ত হীনতায় ভুগতে থাকে। তাদের চিন্তা ও পেরেশানির কোনো অন্ত নাই। দুনিয়াতে এটি তাদের জন্য বড় ধরনের আযাব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ ধরনের 'আযাব থেকে হেফাযত করুন।

১২. মুমিনদের ধোঁকা দেওয়া:

মুনাফিকরা মনে করে তারা আল্লাহ তা'আলা ও মুমিনদের ধোঁকা দিয়ে থাকে, প্রকৃত পক্ষে তারা কাউকেই ধোঁকা দেয় না। তারা নিজেরাই তাদের নিজেদের ধোঁকা দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ﴾ [البقرة: 9]

---

21 শরহে নববী ১৭/১২৮।

“তারা আল্লাহকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে (বলে মনে করে)। অথচ তারা নিজদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে এবং তারা তা অনুধাবন করে না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৯]

আয়াতের ব্যাখ্যা: মুনাফিকরা তাদের রব ও মুমিনদের ধোঁকা দিত। তারা তাদের মুখে প্রকাশ করত যে, আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি, কিন্তু তাদের অন্তরে তারা অবিশ্বাস, অস্বীকার ও সন্দেহ-সংশয়কে গোপন করত, যাতে তারা তাদের জন্য অবধারিত শাস্তি- হত্যা, বন্দি করা ও তাদের বিরুদ্ধে অভিযান ইত্যাদি হতে মুক্তি পায়। তারা মুখের ঈমান ও স্বীকার করাকে নিজেদের বাঁচার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত। অন্যথায় তাদের ওপর ঐ শাস্তি বর্তাবে যা অস্বীকারকারী কাফিরদের ওপর বর্তায়। আর এটাই হলো, মুমিনদের ও তাদের রবকে ধোঁকা দেওয়া।[22]

১৩. গাইরুল্লাহর নিকট বিচার ফায়সালা নিয়ে যাওয়া:

---

[22] জামেউল বায়ান ১/২৭২।

মুনাফিকদের অন্যতম স্বভাব হলো, তারা বিচার ফায়সালার জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যেত না। তারা তাদের কাফির বন্ধুদের নিকট বিচার ফায়সালার জন্য যেত। যাতে তারা তাদের প্রতিপক্ষকে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত করতে সক্ষম হয়। কারণ, তারা জানতো যদি ন্যায় বিচার করা হয়, তখন ফায়সালা তাদের বিপক্ষে যাবে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই ন্যায় বিচার ও ইনসাফের বাহিরে যেতে পারবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا ٦٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيۡتَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودٗا﴾ [النساء: 60_61]

“তুমি কি তাদেরকে দেখ নি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার ওপর, যা নাযিল করা হয়েছে

তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা তাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা আস যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে’, তখন মুনাফিকদেরকে দেখবে তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাচ্ছে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬০, ৬১]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, যখন মুনাফিকদের আল্লাহ তা‘আলার সুস্পষ্ট ওহীর বিধান, আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের দিকে বিচার ফায়সালার জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তারা পলায়ন করে এবং তুমি তাদের দেখতে পাবে, তারা এ থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ। আর যখন তুমি তাদের বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে পারবে, তখন তুমি দেখতে পাবে তাদের মধ্যে ও বাস্তবতার মধ্যে বিশাল তফাৎ। তারা কোনো

ভাবেই আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ ওহীর আনুগত্য করে না।[23]

১৪. মুমিনদের মাঝে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা:

মুনাফিকরা চেষ্টা করে কীভাবে মুমিনদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি করা যায়। তারা সব সময় মুমিনদের মাঝে অনৈক্য, মতবিরোধ ও ইখতেলাফ লাগিয়ে রাখে। তারা একজনের কথা আরেক জনের নিকট গিয়ে বলে। চোগলখোরি করে বেড়ায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَوۡ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمۡ إِلَّا خَبَالٗا وَلَأَوۡضَعُواْ خِلَٰلَكُمۡ يَبۡغُونَكُمُ ٱلۡفِتۡنَةَ وَفِيكُمۡ سَمَّٰعُونَ لَهُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [التوبة: 47]

“যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত, তবে তোমাদের মধ্যে ফ্যাসাদই বৃদ্ধি করত এবং তোমাদের মাঝে ছুটোছুটি করত, তোমাদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির অনুসন্ধানে। আর তোমাদের মধ্যে রয়েছে তাদের কথা

---

[23] মাদারেজুস সালেকীন ১/৩৫৩।

অধিক শ্রবণকারী, আর আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৪৭]

অর্থাৎ ﴿لَوۡ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمۡ إِلَّا خَبَالٗا﴾ যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে বের হত, তবে তারা তোমাদের ক্ষতি ছাড়া কোনো উপকারে আসত না। কারণ, তোমাদের মধ্যে ফ্যাসাদই বৃদ্ধি করত। কারণ, তারা হলো, কাপুরুষ ও অপদস্থ সম্প্রদায়। তাদের মধ্যে যুদ্ধ করা ও কাফিরদের মোকাবেলা করার মত কোনো সাহস তাদের নাই। ﴿وَلَأَوۡضَعُواْ خِلَٰلَكُمۡ يَبۡغُونَكُمُ ٱلۡفِتۡنَةَ﴾ আর তারা তোমাদের মাঝে ছুটোছুটি করত, একবার এদিক যেত, আবার ওদিক যেত, একজনের কথা আরেক জনের নিকট গিয়ে বলত, চোগলখোরি করত, বিদ্বেষ চড়াত এবং তোমাদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির অনুসন্ধানে থাকত যা তোমাদের জন্য অকল্যাণ ও অশান্তি ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনত না। وَفِيكُمۡ سَمَّٰعُونَ لَهُمۡۗ আর তোমাদের মধ্যে রয়েছে এমন লোক, যারা তাদের কথা অধিক শ্রবণকারী, অর্থাৎ তাদের আনুগত্যকারী, তাদের কথাকে পছন্দকারী

ও তাদের হিতাকাংখি। যদিও তারা তাদের প্রকৃত অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে তারা অবগত নয়। ফলে এ সব অপকর্মের কারণে মুমিনদের মাঝে বড় ধরনের ফ্যাসাদ ও বিবাদ তৈরি হতে পারে। যা তোমাদের পরাজয়ের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালান করবে।[24]

১৫. মিথ্যা শপথ করা, কাপুরুষতা ও ভীরুতা:

মুনাফিকরা অধিক হারে মিথ্যা শপথ করে। তাদের যখন কোনো অপকর্মের জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তারা তা সাথে সাথে অস্বীকার করে এবং তারা তাদের নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য মিথ্যা শপথ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمۡ لَمِنكُمۡ وَمَا هُم مِّنكُمۡ وَلَٰكِنَّهُمۡ قَوۡمٞ يَفۡرَقُونَ ٥٦ لَوۡ يَجِدُونَ مَلۡجَـًٔا أَوۡ مَغَٰرَٰتٍ أَوۡ مُدَّخَلٗا لَّوَلَّوۡاْ إِلَيۡهِ وَهُمۡ يَجۡمَحُونَ ٥٧﴾ [التوبة: ٥٦، ٥٧]

---

[24] তাফসীরুল কুরআন আল-আযীম ৪/১৬০।

“আর তারা আল্লাহর কসম করে যে, নিশ্চয় তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তারা এমন কওম যারা ভীত হয়। যদি তারা কোনো আশ্রয়স্থল, বা কোনো গুহা অথবা লুকিয়ে থাকার কোনো প্রবেশস্থল পেত, তবে তারা সেদিকেই দৌড়ে পালাত। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫৬, ৫৭]

আয়াতের ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে মুনাফিকদের আকুতি, তাদের হৈ-চৈ ও তৎপরতা সম্পর্কে জানিয়ে দিয়ে বলেন, وَيَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمۡ لَمِنكُمۡ আর তারা আল্লাহর নামে কঠিন কসম করে বলে যে, নিশ্চয় তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, অথচ বাস্তবতা হলো, وَمَا هُم مِّنكُمۡ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং وَلَٰكِنَّهُمۡ قَوۡمٞ يَفۡرَقُونَ তারা হলো এমন এক সম্প্রদায় যারা ভীরু। আর মুমীনরা হলো সাহসী বীর, তারা কখনোই ভয় পায় না। তাদের ভয়ই তাদেরকে শপথ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَا যদি তারা কোনো আশ্রয়স্থল, বা مَغَرَٰتٍ কিল্লা পেত যেখানে গিয়ে তারা আত্মরক্ষা করতে পারত, বা مُدَّخَلًا কোনো পাহাড়ের গুহা অথবা যমিনে লুকিয়ে থাকার কোনো প্রবেশস্থল বা গর্ত পেত, তবে তারা সেদিকেই দৌড়ে পালাত। তারা কখনোই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত না। আল্লাহ বলেন, لَّوَلَّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ অর্থাৎ তারা তোমাদের রেখে সে আশ্রয়স্থলের দিকে দৌড়ে পালাত। কারণ, তারা যে তোমাদের সাথে মিলিত হয়, তা তোমাদের ভালোবাসায় নয় বরং বাধ্য হয়ে। বাস্তবে তারা চায় যে, যদি তোমাদের সাথে না মিলে থাকতে পারত! কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রয়োজনের জন্য আলাদা বিধান থাকে। অর্থাৎ তাদের বিষয়ে সব কিছু জানার পরও তোমরা যে তাদের সাথে যুদ্ধ কর না বা তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নাও না, তা একটি বৃহত্তর স্বার্থের দিক বিবেচনা ও একটি বিশেষ প্রয়োজনকে সামনে রেখে। অন্যথায় তাদের অপরাধ কাফির ও মুশরিকদের চেয়েও মারাত্মক। এ কারণে তারা সব সময় দুশ্চিন্তা, সিদ্ধান্তহীনতা ও পেরেশানিতে থাকে।

আর ইসলাম ও মুসলিমরা সব সময় ইজ্জত, সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বসবাস করে থাকেন। আর যখনই মুসলিমরা খুশি হয়, তা তাদের বিরক্তির কারণ হয়। তারা সব সময় পছন্দ করে, যাতে তোমাদের সাথে মিলতে না হয়। তাই আল্লাহ বলেন, ﴿لَوۡ يَجِدُونَ مَلۡجَـًٔا أَوۡ مَغَٰرَٰتٍ أَوۡ مُدَّخَلٗا لَّوَلَّوۡاْ إِلَيۡهِ وَهُمۡ يَجۡمَحُونَ﴾ অর্থাৎ যদি তারা কোনো আশ্রয়স্থল, বা কোনো গুহা অথবা লুকিয়ে থাকার কোনো প্রবেশস্থল পেত, তবে তারা সেদিকেই দৌড়ে পালাত।[25]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِذَا رَأَيۡتَهُمۡ تُعۡجِبُكَ أَجۡسَامُهُمۡۖ وَإِن يَقُولُواْ تَسۡمَعۡ لِقَوۡلِهِمۡۖ كَأَنَّهُمۡ خُشُبٞ مُّسَنَّدَةٞۖ يَحۡسَبُونَ كُلَّ صَيۡحَةٍ عَلَيۡهِمۡۚ هُمُ ٱلۡعَدُوُّ فَٱحۡذَرۡهُمۡۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُۖ أَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ﴾ [المنافقون: 4]

“আর যখন তুমি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখবে, তখন তাদের শরীর তোমাকে মুগ্ধ করবে। আর যদি তারা কথা বলে, তুমি তাদের কথা (আগ্রহ নিয়ে) শুনবে। তারা

---

[25] তাফসীরুল কুরআন আল আজীম ৪/১৬৩।

দেওয়ালে ঠেস দেওয়া কাঠের মতোই। তারা মনে করে প্রতিটি আওয়াজই তাদের বিরুদ্ধে। এরাই শত্রু, অতএব এদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ এদেরকে ধ্বংস করুন। তারা কীভাবে সত্য থেকে ফিরে যাচ্ছে। [সূরা আল-মুনাফিকূন, আয়াত: ৪]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, দেহের দিক দিয়ে তারা খুব সুন্দর, মুখের দিক দিয়ে তারা খুব সাহিত্যিক, কথার দিক দিয়ে তার খুব ভদ্র, অন্তরের দিক দিয়ে তারা সর্বাধিক খবিস নাপাক ও মনের দিক দিয়ে খুবই দুর্বল। তারা খাড়া কাঠের মত খাড়া করা, যাতে কোনো ফল নাই। গাছগুলোকে জড়ের থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে, ফলে সে গুলো একটি দালানের সাথে খাড়া করে রাখা হয়েছে, যাতে পথচারীরা পা পৃষ্ট না করে।[26]

১৬. তারা যা করে নি তার ওপর তাদের প্রশংসা শুনতে পছন্দ করত:

---

[26] মাদারেজুস সালেকীন ১/৩৫৪।

মুনাফিকরা যে কাজ করে না তার ওপর তাদের কোনো ভৎসনা মানতে রাজি না। এমনটি তারা কাজ না করে সে কাজের প্রশংসা শুনতে চায়। আল্লাহ তা'আলা তাদের অবান্তর চাহিদার নিন্দা করে বলেন,

﴿لَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحۡمَدُواْ بِمَا لَمۡ يَفۡعَلُواْ فَلَا تَحۡسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٖ مِّنَ ٱلۡعَذَابِۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ﴾ [آل عمران: 188]

"যারা তাদের কৃতকর্মের প্রতি খুশী হয় এবং যা তারা করে নি তা নিয়ে প্রশংসিত হতে পছন্দ করে, তুমি তাদেরকে আযাব থেকে মুক্ত মনে করো না। আর তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮৮]

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত,

«إن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله كان إذا خرج رسول الله إلى الغزو تخلّفوا عنه، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله فإذا قدم رسول الله اعتذروا إليه، وحلفوا وأحبّوا

أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت: « ﴿لَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡرَحُونَ بِمَآ أَتَوا۟ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحۡمَدُوا۟ بِمَا لَمۡ يَفۡعَلُوا۟...﴾

“মুনাফিকদের একটি জামা‘আত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো যুদ্ধে বের হত, তখন তারা যুদ্ধে যাওয়া হতে বিরত থাকতো। আর তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে না গিয়ে আত্ম-তৃপ্তিতে ভুগত। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যুদ্ধ হতে ফিরে আসতো, তখন তারা তার নিকট গিয়ে মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করিয়ে অপারগতা প্রকাশ করত এবং তারা মিথ্যা শপথ করত। আর তারা পছন্দ করত, যাতে তারা যে যুদ্ধে যায়নি তার জন্য যেন তাদের প্রশংসা করা হয়। তারপর আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন, ﴿لَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡرَحُونَ بِمَآ أَتَوا۟ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحۡمَدُوا۟ بِمَا لَمۡ يَفۡعَلُوا۟...﴾ “যারা তাদের

কৃতকর্মের প্রতি খুশী হয় এবং যা তারা করে নি তা নিয়ে প্রশংসিত হতে পছন্দ করে...।[27]

১৭. মুনাফিকরা নেক আমলসমূহের দুর্নাম করত:

মুনাফিকরা মুসলিমদের ভালো কাজগুলোকে মানুষের সামনে খারাপ করে তুলে ধরত। যতই ভালো কাজই হোক না কেন তাতে মুনাফিকরা তাদের স্বার্থ খুঁজত। যদি তাদের স্বার্থ হাসিল হত তখন তারা চুপ থাকতো আর যখন তাদের হীন স্বার্থ হাসিল না হত তখন তারা বদনাম করা আরম্ভ করত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنۡهُم مَّن يَلۡمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنۡ أُعۡطُواْ مِنۡهَا رَضُواْ وَإِن لَّمۡ يُعۡطَوۡاْ مِنۡهَآ إِذَا هُمۡ يَسۡخَطُونَ﴾ [التوبة: 58]

"আর তাদের মধ্যে কেউ আছে, যে সদকা বিষয়ে তোমাকে দোষারোপ করে। তবে যদি তাদেরকে তা থেকে দেওয়া হয়, তারা সন্তুষ্ট থাকে, আর যদি তা থেকে

---

[27] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৫৬৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৭৭।

দেওয়া না হয়, তখন তারা অসন্তুষ্ট হয়।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫৮][28]

আয়াতের ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿وَمِنۡهُم مَّن يَلۡمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ﴾ মুনাফিকদের একটি জামা‘আত আছে, যখন তুমি সদকা বণ্টন কর, তখন তারা সদকা বিষয়ে তোমাকে দোষারোপ করে অর্থাৎ তোমার ওপর দোষ চাপায় ও তোমার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তুলে এবং তুমি যে বণ্টন করেছ, সে বিষয়ে তারা তোমাকে মিথ্যা অপবাদ দেয়। মূলত: তারাই দোষী ও মিথ্যুক। তারা দীনের কারণে কোনো কিছুকে অপছন্দ করে না, তারা অপছন্দ করে নিজেদের স্বার্থের জন্য। এ কারণে যদি তাদেরকে যাকাত দেওয়া হয়, তারা সন্তুষ্ট থাকে, ﴿وَإِن لَّمۡ يُعۡطَوۡاْ مِنۡهَآ إِذَا هُمۡ يَسۡخَطُونَ﴾ আর যদি তা থেকে তাদের দেওয়া না হয়, তখন তারা অসন্তুষ্ট হয়।

---

[28] তাফসীরুল কুরআন আল-আযীম ১৮২/২।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يَلۡمِزُونَ ٱلۡمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهۡدَهُمۡ فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنۡهُمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: 79]

“যারা দোষারোপ করে সদকার ব্যাপারে মুমিনদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছা দানকারীদেরকে এবং তাদেরকে যারা তাদের পরিশ্রম ছাড়া কিছুই পায় না। অতঃপর তারা তাদেরকে নিয়ে উপহাস করে, আল্লাহও তাদেরকে নিয়ে উপহাস করেন এবং তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭৯]

আব্দুল্লাহ ইবন মাসুদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

«لما أُمرنا بالصدقة كنّا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون :إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء، فنزلت»: ﴿ٱلَّذِينَ

يَلۡمِزُونَ ٱلۡمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهۡدَهُمۡ...﴾

"আমাদেরকে যখন সদকা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন আমরা বাড়ী থেকে বহন করে সদকার মালামাল নিয়ে আসতাম। সামর্থ্য অনুযায়ী কেউ বেশি নিয়ে আসত, আবার কেউ কম নিয়ে আসত। আবু আকীল অর্ধ সা নিয়ে আসল আর অপর এক ব্যক্তি তার চেয়ে কিছু বেশি নিয়ে আসল। তখন মুনাফিকরা বলল, আল্লাহ তা'আলা তাদের এ সদকার প্রতি মুখাপেক্ষী নন, আর দ্বিতীয় লোকটি যে একটু বেশি নিয়ে আসছে, তার সম্পর্কে বলল, সে তা কেবলই লোক দেখানোর জন্যই করছে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার প্রেক্ষাপটে এ আয়াত নাযিল করেন- ﴿ٱلَّذِينَ يَلۡمِزُونَ ٱلۡمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهۡدَهُمۡ...﴾ "যারা দোষারোপ করে সদকার ব্যাপারে মুমিনদের মধ্য

থেকে স্বেচ্ছা দানকারীদেরকে এবং তাদেরকে যারা তাদের পরিশ্রম ছাড়া কিছুই পায় না।”...[29]

সব সময় তাদের বাড়াবাড়ি এবং তাদের অনাচার থেকে কেউ নিরাপদে থাকে না। এমনকি যারা সদকা করে তারাও তাদের অনাচার থেকে নিরাপদ নয়। যদি তাদের কেউ অনেক ধন-সম্পদ নিয়ে আসে, তখন তারা বলে, এ তো লোক দেখানোর জন্য নিয়ে আসছে। আর যদি সামান্য নিয়ে আসে, তখন তারা বলে, আল্লাহ তা‘আলা তার সদকার প্রতি মুখাপেক্ষী নয়।[30]

১৮. তারা নিম্নমান ও অপারগ লোকদের প্রতি সন্তুষ্টি:

মুনাফিকরা অপারগ মা’জুর লোকদের সাথে থাকতে পছন্দ করে। যারা ওযরের কারণে ঘর থেকে বের হতে পারে না, তারা তাদের সাথে থাকাকে তাদের জন্য নিরাপদ মনে করে। তাই তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বিভিন্ন ধরনের ওজর পেশ

---

[29] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৬৬৮) সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০১৮)

[30] তাফসীরুল কুরআন আল-আযীম ৪/১৮৪।

করে। যাতে তাদের যুদ্ধে যেতে না হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِذَآ أُنزِلَتۡ سُورَةٌ أَنۡ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَٰهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسۡتَـٔۡذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوۡلِ مِنۡهُمۡ وَقَالُواْ ذَرۡنَا نَكُن مَّعَ ٱلۡقَٰعِدِينَ﴾ [التوبة: 86]

“আর যখন কোনো সূরা এ মর্মে নাযিল করা হয় যে, ‘তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর রাসূলের সাথে জিহাদ কর’, তখন তাদের সামর্থ্য বান লোকেরা তোমার কাছে অনুমতি চায় এবং বলে, ‘আমাদেরকে ছেড়ে দাও, আমরা বসে থাকা লোকদের সাথে থাকব”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৮৬]

আল্লাহ তা‘আলা যারা শক্তি সামর্থ্য ও সব ধরনের উপকরণ থাকা সত্ত্বেও জিহাদে শরীক হয় না এবং তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের নিন্দা ও দোষারোপ করেন। তারা বলে, ﴿ذَرۡنَا نَكُن مَّعَ ٱلۡقَٰعِدِينَ﴾ “ ‘আমাদেরকে ছেড়ে দাও, আমরা

বসে থাকা লোকদের সাথে থাকব’ তারা তাদের নিজেদের দোষী সাব্যস্ত করতে কার্পণ্য করে না। সৈন্য দলেরা যুদ্ধে বের হলেও, তারা নারীদের সাথে ঘরে বসে থাকতেও লজ্জা করে না। যখন যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তখন তারা খুবই দুর্বল। আর যখন তারা বেঁচে যায় তখন অতি কথন করে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য এক আয়াতে বলেন,

﴿أَشِحَّةً عَلَيۡكُمۡۖ فَإِذَا جَآءَ ٱلۡخَوۡفُ رَأَيۡتَهُمۡ يَنظُرُونَ إِلَيۡكَ تَدُورُ أَعۡيُنُهُمۡ كَٱلَّذِي يُغۡشَىٰ عَلَيۡهِ مِنَ ٱلۡمَوۡتِۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلۡخَوۡفُ سَلَقُوكُم بِأَلۡسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلۡخَيۡرِۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَمۡ يُؤۡمِنُواْ فَأَحۡبَطَ ٱللَّهُ أَعۡمَٰلَهُمۡۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٗا﴾ [الأحزاب: 19]

“তোমাদের ব্যাপারে (সাহায্য প্রদান ও বিজয় কামনায়) কৃপণতার কারণে। অতঃপর যখন ভীতি আসে তখন তুমি তাদের দেখবে মৃত্যুভয়ে তারা মূর্ছিত ব্যক্তির ন্যায় চক্ষু উল্টিয়ে তোমার দিকে তাকায়। অতঃপর যখন ভীতি চলে যায় তখন তারা সম্পদের লোভে কৃপণ হয়ে শাণিত

ভাষায় তোমাদের বিদ্ধ করে। এরা ঈমান আনেনি। ফলে আল্লাহ তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন। আর এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ১৯] যুদ্ধের বাইরে তারা অতি কথন করে এবং তাদের গলাবাজির আর অন্ত থাকে না; কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে তার সর্বাধিক দুর্বল ও কাপুরুষ।[31]

১৯. মুনাফিকরা খারাপ কাজের আদেশ দেয় আর ভালো কাজ থেকে নিষেধ করে:

মুনাফিকরা মানুষকে খারাপ ও মন্দ কাজের দিকে আহ্বান করে। ভালো কাজের দিকে ডাকে না। পক্ষান্তরে মুমিনরা তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত, তারা মানুষকে ভালো কাজের দিকে আহ্বান করে এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

[31] তাফসীরুল কুরআন আল-আযীম ৪/১৯২।

﴿ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتُ بَعۡضُهُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمُنكَرِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَقۡبِضُونَ أَيۡدِيَهُمۡۚ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمۡۚ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾ [التوبة: 67]

"মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা একে অপরের অংশ, তারা মন্দ কাজের আদেশ দেয়, আর ভাল কাজ থেকে নিষেধ করে, তারা নিজদের হাতগুলোকে সঙ্কুচিত করে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, ফলে তিনিও তাদেরকে ভুলে গিয়েছেন, নিশ্চয় মুনাফিকরা হচ্ছে ফাসিক।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬৭]

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের অবস্থার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, তারা মুমিনদের বিপরীত গুণের অধিকারী। কারণ, মুমিনরা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেয়, আর খারাপ কাজ হতে বারণ করে। পক্ষান্তরে মুনাফিকরা ﴿يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمُنكَرِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَقۡبِضُونَ أَيۡدِيَهُمۡۚ﴾ খারাপ কাজের আদেশ দেয় এবং ভালো কাজ হতে নিষেধ করে। আর আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করা হতে তারা তাদের হাত-দ্বয় গুটিয়ে রাখে।

তারা আল্লাহর স্মরণকে ভুলে যায়, আল্লাহ তা'আলাও তাদের সাথে সে ব্যক্তির আচরণ করেন, যে তাদের ভুলে যান। যেমন, আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন, তাদের বলা হবে আজকের দিন আমরা তোমাদেরকে ভুলে যাব, যেমনটি তোমরা আজকের দিনের সাক্ষাতের দিনটি ভুলে গিয়েছিলে, ﴿إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾ নিশ্চয় মুনাফিকরা হলো, সত্যের পথ হতে বিচ্যুত, আর গোমরাহীর পথে পরিবেষ্টিত।[32]

২০. জিহাদকে অপছন্দ করা ও জিহাদ হতে বিরত থাকা:

মুনাফিকরা জিহাদকে অপছন্দ করে। তারা কখনোই আল্লাহর রাহে জিহাদ করতে চায় না। এ কারণে তারা বিভিন্ন অজুহাতে জিহাদ হতে বিরত থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[32] তাফসীরুল কুরআন আল আযীম ৪/১৭৩।

﴿فَرِحَ ٱلۡمُخَلَّفُونَ بِمَقۡعَدِهِمۡ خِلَٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ أَن يُجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلۡحَرِّۗ قُلۡ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّٗاۚ لَّوۡ كَانُواْ يَفۡقَهُونَ﴾ [التوبة: 81]

“পিছনে থাকা লোকগুলো আল্লাহর রাসূলের বিপক্ষে বসে থাকতে পেরে খুশি হলো, আর তারা অপছন্দ করল তাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে এবং তারা বলল, ‘তোমরা গরমের মধ্যে বের হয়ো না। বল, ‘জাহান্নামের আগুন অধিকতর গরম, যদি তারা বুঝত”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৮১]

তাবুকের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সাথে যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নি সে সব মুনাফিকদের সমালোচনা করে বলেন, তারা তাদের গৃহাভ্যন্তরে বসে থাকাকে পছন্দ করে এবং ﴿وَكَرِهُوٓاْ أَن يُجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ আর আল্লাহর রাস্তায় জান মাল দিয়ে জিহাদ করতে অপছন্দ করে। আর তারা একে অপরকে বলে, ﴿لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلۡحَرِّۗ﴾ তোমরা গরমের মধ্যে বের হয়ো না। অর্থাৎ তাবুকের যুদ্ধের

অভিযান ছিল উত্তপ্ত গরমের মৌসুমে এবং ফসল কাটার উপযুক্ত সময়। এ কারণেই মুনাফিকরা বলে তোমরা গরমের মধ্যে ঘর থেকে বের হয়ো না। আল্লাহ তা'আলা তার স্বীয় রাসূল কে বলেন, আপনি তাদের বলুন, ﴿نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّٗاۚ لَّوۡ كَانُواْ يَفۡقَهُونَ﴾ "তোমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশের বিরোধিতা করার মাধ্যমে জাহান্নামের যে পরিণতির দিকে যাচ্ছ, তা দুনিয়ার এ গরমের চেয়ে আরো বেশি উত্তপ্ত। যদি তোমরা বুঝতে পারতে"।[33] সুতরাং তোমাদের জন্য জাহান্নামের আগুনের চেয়ে দুনিয়ার গরম অনেক সহনীয়। কিন্তু তোমরা এখন তা বুঝতে পারছ না।

২১. অপমান ও অপদস্থের দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া:

মুনাফিকরা যুদ্ধ হতে বিরত থাকার জন্য অপমানিত হবে তবুও তারা যুদ্ধে যাবে না। তাদের নিকট মান-সম্মান ও ইজ্জতের কোনো দাম নাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[33] তাফসীরুল কুরআন আল আযীম ৪/১৭৯।

﴿وَإِذۡ يَقُولُ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورٗا ١٢ وَإِذۡ قَالَت طَّآئِفَةٞ مِّنۡهُمۡ يَٰٓأَهۡلَ يَثۡرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمۡ فَٱرۡجِعُواْۚ وَيَسۡتَـٔۡذِنُ فَرِيقٞ مِّنۡهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوۡرَةٞ وَمَا هِيَ بِعَوۡرَةٍۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارٗا﴾ [الأحزاب: 12، 13]

“আর স্মরণ কর, যখন মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তারা বলছিল, ‘আল্লাহ ও তার রাসূল আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যখন তাদের একদল বলেছিল, “হে ইয়াসরিববাসী, এখানে তোমাদের কোনো স্থান নেই, তাই তোমরা ফিরে যাও। আর তাদের একদল নবীর কাছে অনুমতি চেয়ে বলছিল, আমাদের বাড়ি–ঘর অরক্ষিত, অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। আসলে পালিয়ে যাওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ১২, ১৩]

২২. মুমিনদের থেকে পিছে হটা:

মুনাফিকদের চরিত্র হলো, তারা সব সময় পিছু হটে থাকে। তারা কোনো ভালো কাজের পিছনে থাকে। সালাতে তারা সবার পিছনে আসে এবং পিছনের কাতারে দাঁড়ায়। রাসূল সা. এর তালীমের মজলিশে তারা পিছনে থাকে। জিহাদে বের হলে তারা মুমিনদের পিছনে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِنَّ مِنكُمۡ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنۡ أَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةٞ قَالَ قَدۡ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذۡ لَمۡ أَكُن مَّعَهُمۡ شَهِيدٗا﴾ [النساء: 72]

“আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যে অবশ্যই বিলম্ব করবে। সুতরাং তোমাদের কোনো বিপদ আপতিত হলে সে বলবে, ‘আল্লাহ আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭২]

আয়াতের ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদের গুণাগুণ ও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা‘আলা তাদের মুমিন বলে সম্বোধন করেন এবং বলেন, হে মুমিনগণ! কিছু লোক আছে যারা

তোমাদের অন্তর্ভুক্ত ও তোমাদের সম্প্রদায়ের। আর তারা তোমাদেরই সাদৃশ্য। তারা মানুষের মধ্যে প্রকাশ করে যে, আমরা তোমাদের দাওয়াত ও ধর্মের অনুসারী অথচ তারা এ দাওয়াত ও ইসলাম ধর্মের অনুসারী নয়, সত্যিকার অর্থে তারা হলো মুনাফিক। যার ফলে তোমাদের শত্রুদের সাথে জিহাদ ও তাদের সাথে লড়াই করতে তারা বিলম্ব করে। তোমরা মুমিনগণ ঘর থেকে বের হলেও তারা ঘর থেকে বের হয় না। فَإِنۡ أَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةٞ যদি তোমাদের কোনো মুসীবত তথা পরাজয় নেমে আসে অথবা তোমাদের কেউ আহত বা শহীদ হয়, তখন তারা বলে, ﴿قَدۡ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذۡ لَمۡ أَكُن مَّعَهُمۡ شَهِيدٗا﴾ আল্লাহ আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না। কারণ, যদি আমি তাদের সাথে উপস্থিত থাকতাম, তবে আমিও আক্রান্ত হতাম; আহত বা নিহত হতাম। তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকাতে খুশি ও আনন্দ যোগায়। কারণ, সে তো মুনাফিক। আল্লাহর রাস্তায় আক্রান্ত হলে বা শহীদ হলে যে সব সাওয়াব ও বিনিময়ের ঘোষণা আল্লাহ

তা'আলা দিয়েছেন সে বিষয়ে সে বিশ্বাস করে না, বরং সন্দেহ পোষণকারী। সে কখনোই সাওয়াবের আশা করে না এবং আল্লাহর আযাবকে ভয় করে না।[34]

২৩. জিহাদ থেকে বিরত থাকতে অনুমতি চাওয়া:

মুনাফিকরা জিহাদে অংশ গ্রহণ করাকে অপছন্দ করে। তার জন্য তারা রাসূল সা. এর দরবারে এসে বিভিন্ন ধরনের অহেতুক অজুহাত দাড় করায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ ٱئۡذَن لِّي وَلَا تَفۡتِنِّيٓۚ أَلَا فِي ٱلۡفِتۡنَةِ سَقَطُواْۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُۢ بِٱلۡكَٰفِرِينَ﴾ [التوبة: 49]

"আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'আমাকে অনুমতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না'। শুনে রাখ, তারা ফিতনাতেই পড়ে আছে। আর নিশ্চয় জাহান্নাম কাফিরদের বেষ্টনকারী।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৪৯]

---

34 জামেউল বায়ান ৮/৫৩৮।

আয়াতের ব্যাখ্যা: আর মুনাফিকদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ তোমাকে বলবে হে মুহাম্মদ! ٱئۡذَن لِّي ‘আমাকে ঘরে বসে থাকতে অনুমতি দিন আমি যুদ্ধে তোমাদের সাথে শরিক হবো না। তুমি যদি আমাকে যুদ্ধে যেতে বাধ্য কর, আমি আমার বিষয়ে আশংকা করছি যে, রুমের সুন্দর সুন্দর রমণীদের কারণে আমি ফিতনায় আক্রান্ত হতে পারি। সুতরাং وَلَا تَفۡتِنِّيٓۚ তুমি আমাকে ফিতনায় ফেলবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, أَلَا فِي ٱلۡفِتۡنَةِ سَقَطُواْ শুনে রাখ, তারা তাদের এ কথার কারণেই ফিতনাতেই পড়ে আছে।[35]

২৪. জিহাদে না গিয়ে বিভিন্ন ওজুহাত দাঁড় করানো:

রাসূল সা. যখন জিহাদ থেকে ফিরে আসতো, তখন মুনাফিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বিভিন্ন ধরনের অজুহাত দাঁড় করান এবং

[35] তাফসীরুল কুরআন আল আযীম ৪/১৬১।

নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَعۡتَذِرُونَ إِلَيۡكُمۡ إِذَا رَجَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡۚ قُل لَّا تَعۡتَذِرُواْ لَن نُّؤۡمِنَ لَكُمۡ قَدۡ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنۡ أَخۡبَارِكُمۡۚ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ﴾ [التوبة: 94]

"তারা তোমাদের নিকট ওযর পেশ করবে যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে। বল, 'তোমরা ওযর পেশ করো না, আমরা তোমাদেরকে কখনো বিশ্বাস করব না। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের খবর আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন এবং তাঁর রাসূলও। তারপর তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে গায়েব ও প্রকাশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তোমরা আমল করতে সে সম্পর্কে"। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৯৪]

আয়াতের ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের বিষয়ে সংবাদ দেন যে, তারা যখন মদিনা ফিরে আসবে তখন

তারা তোমাদের নিকট ওজর পেশ করবে। আল্লাহ বলেন, قُل لَّا تَعۡتَذِرُواْ لَن نُّؤۡمِنَ لَكُمۡ বল, 'তোমরা ওজর পেশ করো না, আমরা তোমাদেরকে কখনো বিশ্বাস করব না। قَدۡ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنۡ أَخۡبَارِكُمۡۚ অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের খবর ও অবস্থা সম্পর্কে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের আমলসমূহ দেখবেন এবং তাঁর রাসূলও। অর্থাৎ তোমাদের আমলসমূহ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে মানুষের সম্মুখে প্রকাশ করে দেবেন। ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ তারপর তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে গায়েব ও প্রকাশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট। فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তোমরা আমল করতে সে সম্পর্কে'। অর্থাৎ তোমাদের খারাপ আমল ও ভালো আমল সম্পর্কে অবগত করবে আর তোমাদের তার ওপর বিনিময় দিবেন।[36]

[36] তাফসীরুল কুরআন আল আযীম ৪/২০১।

২৫. মানুষের থেকে আত্ম-গোপন করা:

মুনাফিকরা মাথা লুকাত এবং নিজেদের সব সময় আড়াল করে রাখতো। কারণ, তাদের মনে সব সময় আতংক থাকতো। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَسۡتَخۡفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسۡتَخۡفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمۡ إِذۡ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرۡضَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعۡمَلُونَ مُحِيطًا﴾ [النساء: 108]

“তারা মানুষের কাছ থেকে লুকাতে চায়, আর আল্লাহর কাছ থেকে লুকাতে চায় না। অথচ তিনি তাদের সাথেই থাকেন যখন তারা রাতে এমন কথার পরিকল্পনা করে যা তিনি পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তারা যা করে তা পরিবেষ্টন করে আছেন।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৮]

আয়াতের ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদের আমলের নিন্দা করে বলেন, তারা তাদের খারাপীগুলো মানুষের থেকে গোপন করে, যাতে তারা তাদের খারাপ না বলে, অথচ, আল্লাহ তা‘আলা তাদের চরিত্রগুলো প্রকাশ করে

দেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাদের গোপন বিষয় ও তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে কি আছে, সে সম্পর্কে জানেন। এ কারণেই তিনি বলেন, ﴿وَهُوَ مَعَهُمۡ إِذۡ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرۡضَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعۡمَلُونَ مُحِيطًا﴾ অথচ তিনি তাদের সাথেই থাকেন যখন তারা রাতে এমন কথার পরিকল্পনা করে যা তিনি পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তারা যা করে তা পরিবেষ্টন করে আছেন। এটি তাদের হুমকি ও ধমক আল্লাহর পক্ষ হতে।[37]

২৬. মুমিনদের মুসিবতে খুশি হওয়া:

মুমিনরা যখন কোনো মুসীবতে পতিত হয়, তখন মুনাফিকরা খুব খুশি হয়। তারা সব সময় মুমিনদের ক্ষতি কামনা করে এবং তাদের মুসিবতের অপেক্ষায় থাকে। কারণ, তারা তাদের অন্তরে মুমিনদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[37] তাফসীরুল কুরআন আল আযীম ৪/৪০৭।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمۡ لَا يَأۡلُونَكُمۡ خَبَالٗا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمۡ قَدۡ بَدَتِ ٱلۡبَغۡضَآءُ مِنۡ أَفۡوَٰهِهِمۡ وَمَا تُخۡفِي صُدُورُهُمۡ أَكۡبَرُۚ قَدۡ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡقِلُونَ ١١٨ هَٰٓأَنتُمۡ أُوْلَآءِ تُحِبُّونَهُمۡ وَلَا يُحِبُّونَكُمۡ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱلۡكِتَٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمۡ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ عَضُّواْ عَلَيۡكُمُ ٱلۡأَنَامِلَ مِنَ ٱلۡغَيۡظِۚ قُلۡ مُوتُواْ بِغَيۡظِكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١٩ إِن تَمۡسَسۡكُمۡ حَسَنَةٞ تَسُؤۡهُمۡ وَإِن تُصِبۡكُمۡ سَيِّئَةٞ يَفۡرَحُواْ بِهَاۖ وَإِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡـًٔاۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعۡمَلُونَ مُحِيطٞ﴾ [118-120]

“হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের সর্বনাশ করতে ত্রুটি করবে না। তারা তোমাদের মারাত্মক ক্ষতি কামনা করে। তাদের মুখ থেকে তো শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। আর তাদের অন্তরসমূহ যা গোপন করে তা মারাত্মক। অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্ট বর্ণনা করেছি। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে। শোন, তোমরাই তো তাদেরকে ভালবাস এবং তারা

তোমাদেরকে ভালবাসে না। অথচ তোমরা সব কিতাবের প্রতি ঈমান রাখ। আর যখন তারা তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। আর যখন তারা একান্তে মিলিত হয়, তোমাদের ওপর রাগে আঙ্গুল কামড়ায়। বল, 'তোমরা তোমাদের রাগ নিয়ে মর'! নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। যদি তোমাদেরকে কোনো কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন তাদের কষ্ট হয়। আর যদি তোমাদেরকে মন্দ স্পর্শ করে, তখন তারা তাতে খুশি হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছু ক্ষতি করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে, তা পরিবেষ্টনকারী।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১৮-১২০]

আয়াতের সারমর্ম: আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দাদেরকে মুনাফিকদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। অর্থাৎ আল্লাহ মুনাফিকদের অন্তরে কি আছে এবং তারা তাদের শত্রুদের জন্য কি গোপন করেন, তা জানিয়ে দেন। মুনাফিকরা তাদের সাধ্য অনুযায়ী

কখনোই মুমিনদের বন্ধু বানাবে না। তারা সব সময় তাদের বিরোধিতা ও ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে। মুমিনদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকবে। আর তারা মুমিনদের কষ্টের কারণ হয় বা তাদের কোন মুসিবত হয় এমন কাজই করতে থাকবে।[38]

২৭. যখন আমানত রাখা হয় খিয়ানত করে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, আর যখন প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ভঙ্গ করে আর যখন ঝগড়া করে অকাট্য ভাষায় গাল-মন্দ করে।

মুনাফিকদের কিছু মৌলিক গুণ আছে, যেগুলো একটি সমাজ, দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। এ সব গুণগুলো থেকে বেঁচে থাকা আমাদের সকলের জন্য একান্ত অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنۡهُم مَّنۡ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنۡ ءَاتَىٰنَا مِن فَضۡلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٧٥ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضۡلِهِۦ بَخِلُواْ بِهِۦ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعۡرِضُونَ ٧٦ فَأَعۡقَبَهُمۡ نِفَاقٗا فِي قُلُوبِهِمۡ إِلَىٰ يَوۡمِ

[38] তাফসীরুল কুরআনীল আযীম ২/১০৬।

﴿يَلۡقَوۡنَهُۥ بِمَآ أَخۡلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ﴾ [التوبة: 75-77]

“আর তাদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে যে, যদি আল্লাহ তার স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের দান করেন, আমরা অবশ্যই দান-খয়রাত করব এবং অবশ্যই আমরা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দান করলেন, তারা তাতে কার্পণ্য করল এবং বিমুখ হয়ে ফিরে গেল। সুতরাং, পরিণামে তিনি তাদের অন্তরে নিফাক রেখে দিলেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তারা আল্লাহকে যে ওয়াদা দিয়েছে তা ভঙ্গ করার কারণে এবং তারা যে মিথ্যা বলেছিল তার কারণে।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭৫-৭৭]

আয়াতের সারমর্ম: আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, মুনাফিকরা আল্লাহ তা‘আলাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদি আল্লাহ তা‘আলা তার করুণা দ্বারা তাদের ধন-সম্পদ ও অর্থ বিত্ত দান করেন, তবে সে আল্লাহর রাহে খরচ

করবে। আর সে নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের যখন ধন-সম্পদ দেওয়া হলো, তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নি। তারা যে সদকা করার দাবি করছিল তা পূরণ করে নি। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ অপকর্মের শাস্তি স্বরূপ তাদের অন্তরে নিফাক ঢেলে দেন। যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে অর্থাৎ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তা তাদের অন্তরে স্থায়ী হবে। আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি এ ধরনের নিফাক হতে।[39]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ ٨ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ﴾ [البقرة: 8]

"আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি',

---

[39] তাফসীরুল কুরআন আল আযীম ৪/৮৩

অথচ তারা মুমিন নয়। তারা আল্লাহকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে (বলে মনে করে) অথচ তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে এবং তারা তা অনুধাবন করে না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৮]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, মুনাফিকদের বড় পুঁজি হলো, ধোঁকা দেওয়া ও প্রতারণা করা। তাদের সম্পদ হলো, মিথ্যা ও খিয়ানত। তাদের মধ্যে দুনিয়ার জীবনের ওপর যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। উভয় দল, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা নিরাপদ। ﴿يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ﴾ “তারা আল্লাহ তা‘আলাকে ধোঁকা দেয় এবং যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনছে তাদের ধোঁকা দেয়, মূলতঃ তারা তাদের নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয় কিন্তু তারা তা অনুধাবন করে না।”[40]

---

40 মাদারেজুস সালেকীন ১/৩৪৯।

আবদুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَربعٌ من كُن فِيهِ كَانَ مُنَافِقا خَالِصا، وَمْن كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصلَةٌ مِنَ النفَّاقِ حَتَّى يَدَعَهَا :إِذِا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَاعَاَهَد غَدرَ، وَإِذِا وَعَد أَخلَفَ، وَإِذِا خَاصَم فَجَر»

“চারটি গুণ যার মধ্যে একত্র হবে, সে সত্যিকার মুনাফিক। আর যার মধ্যে এ তিনটি গুনের যে কোনো একটি থাকবে সে যতদিন পর্যন্ত তা পরিহার না করবে তার মধ্যে নেফাকের একটি গুণ অবশিষ্ট থাকল। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। আর যখন কোনো বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন তা লঙ্ঘন করে, আর যখন ওয়াদা করে তা খিলাফ করে, যখন ঝগড়া-বিবাদ করে, সে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করে।[41]

ইমাম নববী রহ. বলেন, এক দল আলেম এ হাদীসটিকে জটিল বলে আখ্যায়িত করেন। কারণ, এখানে যে কটি গুণের কথা বলা হয়েছে, তা একজন সত্যিকার মুসলিম

[41] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৮।

যার মধ্যে কোনো সন্দেহ বা সংশয় নাই তার মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে। যেমন, ইউসুফ 'আলাইহিস সালামের ভাইদের মধ্যেও এ ধরনের গুণ পাওয়া গিয়েছিল। অনুরূপভাবে আমাদের আলেম, ওলামা, পূর্বসূরি ও মনীষীদের মধ্য হতে অনেকের মধ্যে এসব গুণ বা এর কোনো একটি পাওয়া যাওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। তাই বলে তারাতো মুনাফিক নয়। এর সমাধানে ইমাম নববী বলেন, আলহামদু লিল্লাহ এ হাদীসে তেমন কোনো অসুবিধা নাই। তবে আলেমগণ হাদীসের বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেন, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেমগণ যা বলেছেন, তা হলো, মূলতঃ এ চরিত্রগুলো হলো, নেফাকের চরিত্র। যাদের মধ্যে এ সব চরিত্র থাকবে সে মুনাফিকদের সাদৃশ্য হবে, তাদের চরিত্রে চরিত্রবান হবে। কারণ, নিফাক হলো, তার ভিতরে যা আছে, তার বিপরীতটিকে প্রকাশ করা। যার মধ্যে উল্লেখিত চরিত্র গুলো পাওয়া যাবে, তার ক্ষেত্রে নেফাকের অর্থটিও প্রযোজ্য। সে যাকে ওয়াদা দিয়েছে, যার সাথে মিথ্যা কথা বলছে, যার আমানতের খিয়ানত করছে এবং যার

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছে, তার ব্যাপারে সে অবশ্যই মুনাফেকি করছে। তার সাথে সে অবশ্যই বাস্তবতাকে গোপন করছে। এ অর্থে লোকটি অবশ্যই মুনাফিক। কিন্তু সে ইসলামের ক্ষেত্রে মুনাফিক নয় যে, মুখে ইসলাম প্রকাশ করল আর অন্তরে কুফরকে লালন করল। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাণী দ্বারা এ কথা বলেননি যে, সে খাঁটি মুনাফিক ও চির জাহান্নামী হবে এবং জাহান্নামের নিম্নস্তরে তার অবস্থান হবে। এ অর্থটিই বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ আমাদের বোঝার তাওফীক দান করুন। আমীন!

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«كان منافقا خالصا»

“সে খালেস মুনাফিক” এ কথার অর্থ হলো, এ চরিত্রগুলোর কারণে লোকটি মুনাফিকদের সাথে অধিক সাদৃশ্য রাখে। আবার আরো কতক আলেম বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী ঐ লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যার মধ্যে এ চরিত্রগুলো প্রাধান্য বিস্তার

করছে। আর যার মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে নি তবে মাঝে মধ্যে পাওয়া যায়, সে এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়। মুহাদ্দিসগণ হাদীসের এ অর্থটিকেই গ্রহণ করেছেন।[42]

২৮. সময় মত সালাত আদায় না করা:

মুনাফিকরা সময় মত সালাত আদায় করে না। জামা'আতে ঠিক মত হাজির হয় না। তারা সালাতের জামা'আত কায়েম হওয়ার শেষ সময় আসে আবার সর্বাগ্রে চলে যায়।

আলা ইবন আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত,

«أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال : «أصليتم العصر؟ فقلنا له :إنما انصرفنا الساعة من الظهر، قال :فصلوا العصر، فقمنا فصلينا، فلمّا انصرفنا قال سمعت رسول الله يقول تِلْكَ صَلاَةُ المُنَافِقِ يَجلِسِ يَرْقُبُ الشَّمْسَ

---

[42] শরহে মুসলিম ২/৪৬-৪৭।

حتَّى إِذِا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبعًا الله لَا يَذْكُر فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً»

“একদিন তিনি বছরায় আনাস ইবন মালেকের বাড়ীতে প্রবেশ করেন। আর আনাস ইবন মালেক তখন যোহরের সালাত আদায় করে বাড়ীতে ফিরেন। তার ঘর ছিল মসজিদের একেবারে পাশেই। আলা ইবন আব্দুর রহমান বলেন, আমরা তার নিকট প্রবেশ করলে, তিনি আমাদের বলেন, তোমরা কি আসরের সালাত আদায় করছ? আমরা তাকে বললাম, আমরাতো কেবল যোহরের সালাত আদায় করে ফিরলাম। তখন তিনি বললেন, তাহলে তোমরা আসরের সালাত আদায় কর। তারপর আমরা দাঁড়ালাম এবং আসরের সালাত আদায় করলাম। আমরা সালাতের সালাম ফিরাইলে তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি মুনাফিকদের সালাত হলো, তারা বসে বসে সূর্যের অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর সূর্য যখন শয়তানের দু’টি শিংয়ের মাঝে অবস্থান করে, তখন তারা তাড়াহুড়া করে সালাতে দাঁড়ায়, কাকের ঠোকরের মতো চার রাকাত

সালাত আদায় করে, তাতে আল্লাহর যিকির বা স্মরণ খুব কমই করা হয়ে থাকে।[43]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, তারা সালাতকে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করে না। সালাতকে একদম শেষ ওয়াক্তে নিয়ে যায়, যখন সালাতের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তারা ফজর আদায় করে সূর্য উদয়ের সময়, আসর আদায় করে সূর্যাস্তের সময়। আর তারা সালাত আদায় করে কাকের ঠোকরের মত করে। তাদের সালাত হলো, দেহের সালাত, তাদের সালাত অন্তরের সালাত নয়। তারা সালাতের মধ্যে শিয়ালের মত এদিক সেদিক তাকায়।[44]

২৯. জামা'আতে সালাত আদায় করা হতে বিরত থাকা:

মুনাফিকরা জামা'আতে সালাত আদায় হতে বিরত থাকে। তাদের নিকট জামা'আতে সালাত আদায় করা অতীব

---

[43] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬২২।

[44] মাদারেজুস সালেকীন ১/৩৫৪।

কঠিন কাজ। তাই মুমীনদের উচিত, তারা যেন জামা‘আতে সালাত আদায় করবে।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসুদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«من سرّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنَنَ الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحطّ عنه بها سيئة، ولقد رأيتُنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف»

“যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, কিয়ামতের দিন সে একজন মুসলিম হিসেবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, সে যেন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতসমূহের জন্য আহ্বান করা হলে, তা

যথাযথ সংরক্ষণ করে। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের নবীর জন্য হেদায়েতের বিধান চালু করেন। আর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত হলো, হিদায়েতেরই বিধান। তোমরা যদি তোমাদের সালাতসমূহকে ঘরে আদায় কর, যেমনটি এ পশ্চাৎপদ লোকটি করে থাকে, তবে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নতকে ছেড়ে দিলে। আর যখন তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাতকে ছেড়ে দেবে তখন তোমরা গোমরাহ ও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। যে কোনো ব্যক্তিই হোক না কেন, সে যখন ভালোভাবে অযু করবে, তারপর মসজিদসমূহ থেকে কোনো একটি মসজিদের দিকে যাওয়ার জন্য রওয়ানা করে, আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতিটি কদমে কদমে নেকি লিপিবদ্ধ করেন, তার মর্যাদাকে এক ধাপ করে বৃদ্ধি করেন এবং একটি করে গুনাহ ক্ষমা করেন। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দেখেছি একমাত্র প্রসিদ্ধ মুনাফিক ছাড়া আর কেউ সালাত হতে বিরত থাকতো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা আরো দেখেছি, এক

লোককে দুইজন মানুষের কাঁধে ভর করে সালাতের কাতারে উপস্থিত করা হত।[45]

আল্লামা সুমনি রহ. বলেন, এখানে মুনাফিক দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ মুনাফিক নয় যারা কুফুরকে গোপন করে এবং ইসলাম প্রকাশ করে। যদি তাই হয়, তাহলে জামা'আতে সালাত আদায় করা ফরয হয়ে যাবে। কারণ, যে কুফুরকে গোপন করে সে অবশ্যই কাফির।"[46]

৩০. অশ্লীল কথা বলা ও বেশি কথা বলা:

মুনাফিকদের স্বভাব হলো, তারা কথায় কথায় মানুষকে গালি দেয়, লজ্জা দেয়। যে কথা লোক সমাজে বলা উচিত নয়, ঐ ধরনের অশ্লীল ফাহেশা কথা বলাবলি করত এবং তারা তাদের মজলিশে হাসাহাসি করত।

আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[45] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫৪।

[46] দেখুন 'আওনুল মাবুদ ২/১৭৯।

«الحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الإِيمَانِ، والْبذَاءُ وَالَبيَانُ شعْبَتَانِ مِنَ النفَّاقِ»

"লজ্জা ও কথা কম বলা, ঈমানের দু'টি শাখা আর অশ্লীলতা ও অতিকথন নেফাকের দু'টি শাখা।[47]

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসে الْعِيُّ শব্দটির অর্থ হলো, কম কথা বলা আর الَبذَاءُ শব্দের অর্থ হলো, অশ্লীল কথা বলা আর البيان অর্থ হলো অধিক কথা বলা। যেমন, বক্তা বা ওয়ায়েজরা মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য ও তাদের প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে এমন এমন কথা বলে যা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করে না।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, মুনাফিকদের অবস্থা মুসলিমদের মধ্যে অচল মুদ্রার মত। যা অনেক মানুষই তাদের অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে গ্রহণ করে থাকে। আর যারা অভিজ্ঞ ও যোগ্যতা সম্পন্ন তারা অবশ্যই বুঝতে পারে এটি কি আসল মুদ্রা না নকল মুদ্রা।

---

[47] তিরমিযী, হাদীস নং ২০২৭। হাকিম হাদীটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

আর এ ধরনের অভিজ্ঞ লোকের সংখ্যা সমাজে কমই হয়ে থাকে। দীনের জন্য এ ধরনের লোকের চাইতে ক্ষতি আর কিছুই হতে পারে না। এ সব লোকেরা দীন ও ধর্মকে স্ব-মুলে উৎখাত করে ফেলে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে করীমে তাদের অবস্থাকে পরিষ্কার করেন ও চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেন। একাধিক বার তাদের অবস্থান, বৈশিষ্ট্য ও আলোচনা তুলে ধরেন এবং তাদের ক্ষতি উম্মতকে থেকে সতর্ক করেন। এ উম্মতকে বার বার তাদের কারণে মাশুল দেওয়া এবং তাদের কারণেই এ উম্মতের ওপর বড় বড় মুসিবত নেমে আসায়, তাদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানার প্রয়োজন তীব্রভাবে দেখা দেয়। তাদের কথা শোনা হতে বেঁচে থাকা, তাদের এবং সাথে সম্পর্ক রাখা হতে দুরে থাকা উম্মতের ওপর ফরয হয়ে গেছে। তারা কত পথিককেই না তাদের গন্তব্যের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে! তাদেরকে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে গোমরাহি ও ভ্রষ্ট পথে নিয়ে গেছে। তারা কত মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভঙ্গ করছে! আর কত মানুষকে তারা আশাহত করছে। তারা মানুষকে

ওয়াদা দিয়ে প্রতারণা করছে এবং মানুষকে ধ্বংস ও হালাকের দিকে ঠেলে দিয়েছে।[48]

৩১. গান শ্রবণ করা:

গান-বাজনা হলো মুনাফিকদের একটি অন্যতম কু অভ্যাস, যা একজন মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে সম্পূর্ণ গাফেল করে দেয়। আর এ গান বাজনাই ছিল মুনাফিকদের নিত্য দিনের সাথী। তারা সব সময় গান বাজনা শ্রবণ করে সময় নষ্ট করত। বর্তমান সময়ে এ ব্যধিটি মুসলিম যুবকদের মধ্যেও প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুনাফিকদের এ ঘৃণিত স্বভাব থেকে আমাদের সবাইকে বেঁচে থাকতে হবে।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসুদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

«الغناء ينبت النفاق في القلب»

"গান মানুষের অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে।[49]

---

[48] তরিকুল হিজরাতাইন ৬০৩।

[49] শুয়াবুল ঈমান ১০/২২৩।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, মনে রাখতে হবে, নিফাকের মুল ভিত্তি হলো, একজন মানুষের বাহ্যিক দিকটি তার অন্তরের অবস্থার বিপরীত হওয়া। একজন গায়ক তার দুই অবস্থা হতে পারে, সে তার গানে কারো চরিত্রকে হনন করে, ফলে সে ফাজির। অথবা সে মিথ্যা গুণগান করে তাহলে সে মুনাফিক। একজন গায়ক সে দেখায় যে, তার মধ্যে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি আগ্রহ আছে কিন্তু তার অন্তর নফসের খায়েশাতে ভরপুর। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল যে সব গান বাজনা বাদ্য যন্ত্র ও অনর্থক গলাবাজিকে অপছন্দ করে, তার প্রতি তার ভালোবাসা অটুট। তার অন্তর এসব দ্বারাই সব সময় ভর্তি। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল যা পছন্দ করে এবং যা অপছন্দ করে তা থেকে তার অন্তর একে বারেই খালি ও বিরান। তাদের এ চরিত্র নিফাক বৈ আর কিছুই না।... এ ছাড়াও নিফাকের আলামত হলো, আল্লাহর যিকির কম করা, সালাত আদায়ে অলসতা করা এবং সালাতে কাকের ঠোকরের মত ঠোকর দেওয়া। আর অভিজ্ঞতা হলো, যারা গান করে তাদের খুব কম লোকই আছে যাদের মধ্যে এ

চরিত্রগুলো পাওয়া যাবে না। গায়করা সাধারণত সালাতে অমনোযোগী ও আল্লাহর যিকির হতে গাফেল হয়ে থাকে। এ ছাড়াও নিফাকের ভিত্তিই হলো, মিথ্যার ওপর আর গান হলো সবচেয়ে অধিক মিথ্যাচার। গানে অসুন্দরকে সুন্দর ও খারাপকে ভালো করে দেখায় আর সুন্দরকে বিশ্রী আর ভালোকে মন্দ করে দেখায়। আর এই হলো আসল নিফাক বা কপটতা। আরো বলা যায়, নিফাক হলো ধোঁকা, ষড়যন্ত্র ও মিথ্যাচার আর গানের ভিত্তিই হলো এ সবের ওপর প্রতিষ্ঠিত।[50]

---

[50] ইগাসাতুল নাহকান ১/২৫০।

নিফাক থেকে বাঁচার উপায়

প্রতিটি মুসলিমের ওপর কর্তব্য হলো, সে নিজেকে নিফাক থেকে হেফাযত করবে। আর নেফাকের থেকে বাঁচার জন্য তাকে অবশ্যই নেক আমল সমূহের পাবন্দী করতে হবে এবং ভালো গুণে গুণান্বিত হতে হবে। নিফাক একটি মারাত্মক সমস্যা। মুমিনের জন্য নিফাক থেকে বাঁচার কোনো বিকল্প নাই। একজন মুমিন নিফাক থেকে নিজেকে না বাঁচাতে পারলে, সে অবশ্যই ধীরে ধীরে অধঃপতনের দিকে যাবে। ফলে সে এক সময় ঈমান হারা হয়ে মারা যাবে। সুতরাং নিফাক থেকে বাঁচার কোনো বিকল্প নাই।

যে সব নেক আমল সমূহের পাবন্দি করতে হবে তা নিম্নরূপ:

এক. প্রথম ওয়াক্তের মধ্যে সালাত আদায় করা এবং ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমায় শরীক হওয়া।

মুনাফিকদের স্বভাব হলো, তারা সালাতে দেরি করা এবং শেষ ওয়াক্তের মধ্যে গিয়ে কোনো রকম সালাত আদায় করা।

আনাস ইবন মালেক থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من صَلَّى للهِ أَرْبَعِيَن يَوْما فِي جَماعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُوْلَى، كُتبِتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ، بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النفَّاق»

“যে ব্যক্তি প্রথম তাকবীরের সাথে চল্লিশ দিন জামা‘আতে সালাত আদায় করে, তার জন্য দু’টি পুরস্কার লিপিবদ্ধ হয়, এক- তাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দেওয়া হবে। দুই- নিফাক থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে।

অর্থাৎ লোকটি জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও নাজাত পাবে। আর নিফাক থেকে মুক্তি পাওয়ার অর্থ হলো, সে লোকটি দুনিয়াতে মুনাফিকরা যে সব আমল করে তা হতে মুক্ত থাকবে। মুখলিস লোকেরা যে সব আমল করে আল্লাহ

তা'আলা তাকে তা করার তাওফীক দিবেন। আর আখেরাতে লোকটি মুনাফিকদের যে শাস্তি দেওয়া হবে তা থেকে মুক্ত থাকবে। এবং তার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হবে যে লোকটি মুনাফিক নয়। মোট কথা মুনাফিকরা সালাতে দাঁড়ালে অলসতা করে আর এ লোকটি তার বিপরীত হবে।[51]

দুই. উত্তম চরিত্র ও দীনের জ্ঞান:

উত্তম চরিত্র অবলম্বন ও দীন সম্পর্কে জান অর্জন করার মাধ্যমে একজন মুসলিমকে অবশ্যই নিফাক থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। কারণ, কখনোই দ্বীনি শিক্ষাকে ভালো চোখে দেখে না, তারা সব সময় ইসলামী শিক্ষাকে পরিত্যাগ করে এবং বিজাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পছন্দ করে।

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[51] তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৪০।

«خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ، وَلَا فِقْهٌ فِي الدِّينِ»

“একজন মুনাফিকের মধ্যে দু’টি চরিত্র কখনোই একত্র হয় না, সুন্দর চরিত্র ও দীনের জ্ঞান।[52]

সুন্দর চরিত্র বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে, সালেহীনদের গুণে গুণান্বিত হওয়া এবং কল্যাণকর কাজগুলো অনুসন্ধান করে তার ওপর জীবন যাপন করা। আর খারাপ ও মন্দ কাজ থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখা।

তিন. সদকা করা:

সদকা হলো, নিফাক থেকে বাঁচার গুরুত্বপূর্ণ উপায়। কারণ, মানুষের অন্তরে টাকা, পয়সা ও ধন সম্পদের লোভ অত্যধিক হয়ে থাকে। তাই সে যখন সদকা করবে তখন তার অন্তর থেকে পার্থিব জগতের মুহাব্বাত কমবে এবং সে আখেরাতমুখী হবে।

---

[52] তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৮৪। আল্লামা আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

আবু মালেক আল-আশয়ারী থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الطُّهُورُ شَطرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ للهِ تَملأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَملآنِ أَوْ تَملأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصلَاةُ نُورٌ، وَالصدَقَةُ بُرْهانٌ، وَالصْبرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعتقِهَا أَوْ مُوبقِهَا»

"পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ, আলহামদু লিল্লাহ মীযানকে ভরে দেয়, আর সুবহানাল্লাহ ও আলহামদু লিল্লাহ উভয়টিকে ভরপুর করে দেয় অথবা আসমান ও যমিনে মধ্যবর্তী সব কিছুকে ভরপুর করে দেয়। সালাত হলো নুর, সদকা হলো প্রমাণ, ধৈর্য হলো আলো, আর কুরআন হয় তোমার পক্ষে দলীল অথবা তোমার বিপক্ষে প্রমাণ। প্রতিটি আত্মাই ব্যবসায়ী। কেউ হয়ত, লাভবান হয় আর কেউ হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়"।[53]

---

[53] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৩।

সদকা করা একজন মানুষের ঈমানদার হওয়ার ওপর বিশেষ প্রমাণ। কারণ, একজন মুনাফিক তার মধ্যে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস না থাকাতে সে কখনোই সদকা করবে না। সুতরাং, যে সদকা করল, তা তার ঈমানের সত্যতার ওপর প্রমাণস্বরূপ।[54]

চার. কিয়ামুল্লাইল করা:

কাতাদাহ রহ. বলেন, একজন মুনাফিক কখনোই রাত জেগে ইবাদত করতে পারে না।[55]

কারণ হলো, একজন মুনাফিক তখন নেক আমল করে, যখন লোকেরা তাকে দেখে আর যখন লোকজন ঘুমিয়ে থাকে বা না দেখে, তখন তার নেক আমল করার কোনো কারণ থাকে না। সুতরাং যখন একজন লোক রাতে উঠে সালাত আদায় করে, তাহলে বুঝতে হবে লোকটি মুনাফিক নয় বরং ঈমানদার। আমাদের সকলেরই উচিত

---

[54] শরহে নববী ৩/১০১।

[55] হুলয়াতুল আওলিয়া ২/৩৩৮।

রাতে কিয়ামুল্লাইল করা। এতে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ ও নিফাক থেকে বাঁচা সহজ হয়।

পাঁচ. আল্লাহর রাহে জিহাদ করা:

জিহাদ হলো, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ সোপান ও শৌর্যবীর্য। ইসলামকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করা এবং টিকিয়ে রাখার জন্য জিহাদের কোনো বিকল্প নাই। সুতরাং, একজন ঈমানদারের জন্য যখনই সুযোগ আসবে, তাকে অবশ্যই জিহাদে শরীক হতে হবে। অন্যথায় তার অন্তরে শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। যদি কারো অন্তরে এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা না থাকে তাকে বুঝতে হবে, তার অন্তরে নিফাকের ব্যাধি রয়েছে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَن مَاتَ وَلَم يَغْزُ وَلَم يحدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ مَاتَ عَلَى شُعبَةٍ مْن نفِاقٍ»

“যে ব্যক্তি মারা গেল, জীবনে কখনো জিহাদ করে নি এবং অন্তরে জিহাদের আকাঙ্ক্ষাও জাগে নি, সে নিফাকের একটি অধ্যায়ের ওপর মৃত্যু বরণ করল।[56]

ইমাম নববী রহ. বলেন, এখানে অর্থ হলো, যার অবস্থা এমন হবে সে যে সব মুনাফিকরা জিহাদ করা থেকে বিরত থাকে তাদের মতোই হবে। কারণ, জিহাদ ছেড়ে দেওয়া নিফাকের একটি অন্যতম শাখা। হাদীস দ্বারা একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ইবাদত করার নিয়ত করে এবং সে কাজটি করার আগেই মারা যায় তাহলে তাকে নিন্দা করা হবে না। যেমনটি নিন্দা করা হবে ঐ ব্যক্তির যে নিয়তই করল না।[57]

ছয়. আল্লাহর যিকির বেশি করা:

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, আল্লাহর যিকির বেশি করে করা দ্বারা নিফাক থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

---

[56] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯১০।

[57] শরহে নববী ১৩/৫৬।

কারণ, মুনাফিকরা আল্লাহর যিকির করেই না। আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمۡ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلٗا ١٤٢ ﴾ [النساء: ١٤٢]

“নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করে। বস্তুতঃ তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন, আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়। শুধুমাত্র লোকদেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪২]

আর কা‘ব রহ. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির বেশি করে সে নিফাক হতে মুক্ত থাকবে। এ কারণেই হতে পারে আল্লাহ তা‘আলা সূরা মুনাফিককে শেষ করেছেন-

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلۡهِكُمۡ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ٩ ﴾ [المنافقون: ٩]

“হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ উদাসীন হবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।” [সূরা আল-মুনাফিকূন, আয়াত: ০৯] এ কথা দ্বারা। কারণ, এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদের ফিতনা থেকে সতর্ক করেন। যারা আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল হওয়ার কারণে নিফাকে নিপতিত হয়। কোনো কোনো সাহাবীকে খারেজীদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো, তারা কি মুনাফিক? উত্তরে তারা বলল, না। কারণ, মুনাফিকরা আল্লাহর যিকির করে না। আল্লাহর যিকির না করা নিফাকের আলামত। আল্লাহর যিকির করা নিফাক থেকে বাঁচার অন্যতম উপায়। যে অন্তর আল্লাহর যিকিরে মশগুল ঐ অন্তরকে নিফাকে লিপ্ত করা কোনো ক্রমেই সমীচীন নয়। নিফাক হলো ঐ অন্তরের জন্য যে অন্তর আল্লাহর যিকির হতে গাফেল ও বেখবর।[58]

সাত. দো‘আ করা:

---

58 আল ওয়াবেলুস সাইয়েব পৃ. ১১০।

যুবাইর ইবন নুফাইর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

«دخلت على أبي الدرداء منزله بحمص، فإذا هو قائم يصلي في مسجده، فلما جلس يتشهد جعل يتعوذ بالله من النفاق، فلما انصرف قلت :غفر الله لك يا أبا الدرداء، ما أنت والنفاق؟ قال :اللَّهُمَّ غفرًا ثلاثا، من يأمن البلاء؟ !من يأمن البلاء؟ !والله إن الرجل ليفتتن في ساعة فينقلب عن دينه

“আমি আবু দারদার ঘরে প্রবেশ করে দেখি সে সালাত আদায় করছে, তারপর যখন সে তাশাহুদের জন্য বসল, তখন তাশাহুদ পড়ে আল্লাহর নিকট নিফাক হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছে, যখন সালাম ফিরাল আমি তাকে বললাম আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে ক্ষমা করুক হে আবু দারদা! তুমি নিফাককে এত ভয় করছ কেন? তোমার সাথে নিফাকের সাথে সম্পর্ক কী? এ কথার জবাবে সে তিনবার হে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন এ কথা বলল এবং আরো বললেন, এ মহা প্রলয় হতে কে নিরাপদে থাকবে? এ মহা প্রলয় থেকে কে নিরাপদ? আমি আল্লাহর

শপথ করে বলছি একজন লোক মুহূর্তের মধ্যে ফিতনার সম্মুখীন হয় তারপর সে তার দীন থেকে ফিরে যায়।[59]

আট. আনসারীদের মহব্বত করা:

আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«آيَةُ الإِيمَان حُبُّ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النفاقِ بُغْضُ الأنصارِ»

"ঈমানের আলামত হলো, আনছারদের মহব্বত করা আর নিফাকের আলামত হলো, আনসারদের ঘৃণা করা"।[60]

নয়. আলী ইবন আবী তালেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে মহব্বত করা:

যুর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আলী ইবন আবী তালেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

---

[59] সীয়ারু আলামীন নুবালা ৬/৩৮২, আল্লামা যাহাবী বলেন, সনদটি সহীহ।

[60] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৪।

«وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعهْدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ إِلَي أَنَّهُ لا يُحِبِّنِي إِلا مُؤمِنٌ ولا يُبْغِضُنِي إِلا مُنَافِقِ»

“আমি ঐ সত্তার শপথ করে বলছি যিনি বীজ থেকে অঙ্কুর উৎপন্ন করেন এবং মানবাত্মাকে সৃষ্টি করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই আমাকে জানান যে, আমাকে শুধু মুমিনরাই মহব্বত করবে আর যারা আমাকে ঘৃণা করবে তারা হলো মুনাফিক”।[61]

[61] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৭৮।

মুনাফিকদের বিষয়ে একজন ঈমানদারের অবস্থান কি হওয়া উচিত?

মুনাফিকদের সাথে কোনো প্রকার নমনীয়তা প্রদর্শন সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। তাদের ক্ষতিকে কোনো ক্রমেই ছোট মনে করা যাবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের মুনাফিকদের তুলনায় বর্তমান যুগের মুনাফিকরা আরো অধিক ভয়ঙ্কর।

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون»

"বর্তমান যুগের মুনাফিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের মুনাফিকদের তুলনায় আরো বেশি ভয়ঙ্কর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে

তারা গোপনে কাজ করত, আর বর্তমানে তারা প্রকাশ্যে মুনাফেকি করে।”[62]

তাদের বিষয়ে একজন মুসলিমের অবস্থান:

১. মুনাফিকদের আনুগত্য করা হতে বিরত থাকা:

কখনোই মুনাফিকদের আনুগত্য করা যাবে না। কারণ, তারা কখনোই মুসলিমদের কল্যাণ চায় না তারা চায় ক্ষতি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الأحزاب: 1]

“হে নবী, আল্লাহকে ভয় কর এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সম্যক জ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাময়।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ১]

আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা তাবারী রহ. আল্লাহ তা‘আলা তার স্বীয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ﴾ “হে নবী, আল্লাহকে ভয়

[62] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭১১৩।

কর” অর্থাৎ হে নবী! তুমি আল্লাহকে তার আনুগত্যের মাধ্যমে ভয় কর। তোমার জন্য যা করা কর্তব্য ও তোমার ওপর যা ফরয করা হয়েছে, তা আদায় কর এবং যে সব নিষিদ্ধ কাজ হতে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তা করা হতে বিরত থাক। ﴿لَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾ “আর তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না।” যারা তোমাকে বলে, তুমি তোমার আশপাশ থেকে দুর্বল, গরীব, মিসকিন ও অসহায় ঈমানদারদের সরিয়ে দাও। তাদের তুমি আনুগত্য করো না। وَٱلۡمُنَٰفِقِينَۚ আর তুমি মুনাফিকদের আনুগত্য করো না যারা তোমার নিকট এসে প্রকাশ করে যে, তারা ঈমানদার ও তোমার সহযোগী। বাস্তবে তারা ঈমানদার নয়, তারা কখনোই তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে বন্ধু বানাবে না। তুমি তাদের থেকে কোনো মতামত নিয়ো না এবং তাদের কোনো পরামর্শ গ্রহণ করো না। কারণ, তারা তোমার দুশমন ও আল্লাহর দীনের দুশমন। إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা সম্যক জ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা তারা তাদের অন্তরে যা কিছু গোপন করে তা জানেন। আর

তারা প্রকাশ্যে তোমার কল্যাণকামী হওয়ার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ও জানেন। আল্লাহ তা'আলা তোমার ও তোমার সাহাবীদের এবং দীনের যাবতীয় কর্মের আঞ্জাম দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং সমগ্র মাখলুকের যাবতীয় পরিচালনায় তিনি সম্যক জ্ঞানী।[63]

২. মুনাফিকদের সাথে বিতর্ক করা থেকে বিরত থাকা, তাদের ধমক দেওয়া ও ভালো হওয়ার জন্য উপদেশ দেওয়া:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿بَشِّرِ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء : 137]

"তুমি মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

---

[63] জামেউল বায়ান ২০/২০২

﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ وَعِظۡهُمۡ وَقُل لَّهُمۡ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ قَوۡلَۢا بَلِيغٗا﴾ [النساء: 63]

"ওরা হলো সেসব লোক, যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তাদেরকে সদুপদেশ দাও। আর তাদেরকে তাদের নিজদের ব্যাপারে মর্মস্পর্শী কথা বল"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৩]

আয়াতের ব্যাখ্যা: হে মুহাম্মাদ! ঐ সব মুনাফিক যাদের বর্ণনা আমি তোমাকে দিয়েছি, তারা তোমার নিকট বিচার ফায়সালা নিয়ে আসা বাদ দিয়ে তাগুতের নিকট বিচার ফায়সালা নিয়ে যাওয়াতে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জানেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَعۡلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ "তাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ তা জানেন" যদিও তারা শপথ করে বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য ভালোই ছিল। আমরা কখনোই খারাপ চাইনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَأَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ وَعِظۡهُمۡ তুমি তাদের থেকে বিরত থাক। তাদের দৈহিক ও শারীরিক কোনো প্রকার শাস্তি

দিও না। তবে তাদের ওপর নাযিল হওয়া আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে তাদের ভয় দেখিয়ে তাদের উপদেশ দাও। আর তাদের শাস্তি হলো, তারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে যে সন্দেহ পোষণ করে তার কারণে তাদের ঘরে বাড়ীতে আযাব নাযিল হওয়া। আল্লাহ তার রাসূলকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَقُل لَّهُمۡ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ قَوۡلَۢا بَلِيغٗا আর তুমি আল্লাহকে ভয় করতে এবং তার রাসূল তাদের আযাবের যে ওয়াদা ও হুমকি দিয়েছো তার প্রতি বিশ্বাস করতে বল।[64]

৩. তাদের সাথে বিতর্ক না করা এবং তাদের থেকে আত্মরক্ষা করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تُجَٰدِلۡ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخۡتَانُونَ أَنفُسَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيما﴾ [النساء: 107]

[64] জামেউল বায়ান ৮/৫১৫।

“আর যারা নিজেদের খিয়ানত করে তুমি তাদের পক্ষে বিতর্ক করো না। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন না তাকে, যে খিয়ানতকারী, পাপী।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৭]

“হে মুহাম্মাদ! তুমি বিতর্ক করো না তাদের পক্ষে যারা নিজেদের খিয়ানত করে। নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ঐ সব লোকদের পছন্দ করেন না যাদের গুণ হলো, মানুষের সম্পদে খিয়ানত করা এবং আল্লাহ তা‘আলা যে সব কাজ করতে নিষেধ করছে তা করা।[65]

৪. তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকা:

মুনাফিকদের কখনোই অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمۡ لَا يَأۡلُونَكُمۡ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمۡ قَدۡ بَدَتِ ٱلۡبَغۡضَآءُ مِنۡ أَفۡوَٰهِهِمۡ وَمَا تُخۡفِي

[65] জামে’উল বায়ান ৯/১৯০

صُدُورُهُمۡ أَكۡبَرُۚ قَدۡ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ [آل عمران: 118]

"হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের সর্বনাশ করতে ত্রুটি করবে না। তারা তোমাদের মারাত্মক ক্ষতি কামনা করে। তাদের মুখ থেকে তো শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। আর তাদের অন্তরসমূহ যা গোপন করে তা মারাত্মক। অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্ট বর্ণনা করেছি। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১৮]

মুসলিমদের এক দল সম্পর্কে নাযিল হয়, যাদের সহযোগী ছিল ইয়াহুদী ও মুনাফিক। ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়াতের যুগে তাদের সাথে যে সব কারণে বন্ধুত্ব ছিল, সে সব কারণে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে আল্লাহ তা'আলা তাদের নিষেধ করেন এবং তাদের কোনো বিষয়ে উপদেশ দিতে নিষেধ করেন।[66]

---

[66] জামেউল বায়ান ৭/১৪০।

৫. তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের বিষয়ে কঠোর হওয়া:

মুনাফিকদের বিষয়ে কোনো প্রকার নমনীয়তা প্রদর্শন করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡۚ وَمَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ﴾

"হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের ওপর কঠোর হও, আর তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম"। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭৩]

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা তার স্বীয় রাসূলকে নির্দেশ দেন যে, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلۡكُفَّارَ﴾ হে নবী আপনি কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করেন তলোয়ার ও অস্ত্র নিয়ে। وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ আর মুনাফিকদের সাথেও জিহাদ করুন। মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করা অর্থ কি এ বিষয়ে, মুফাসসিরদের মধ্যে একাধিক মত আছে, তাদের সাথে জিহাদ হলো হাত ও মুখ দ্বারা। আর যা কিছু দ্বারা

তাদের সাথে জিহাদ করা সম্ভব হয়। এটিই হলো, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদের মতামত।[67]

৬. মুনাফিকদের নিকৃষ্ট বলে জানা এবং কখনো তাদের কাউকে নেতা না বানানো:

বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ»

“তোমরা মুনাফিকদের কখনোই নেতা বলে সম্বোধন করো না। কারণ, যদি তোমরা তাদেরকে সরদার বল, তাহলে তোমরা তোমাদের রবকে অসন্তুষ্ট করলে ও কষ্ট দিলে।

৬. তারা মারা গেলে তাদের জানাজায় অংশ গ্রহণ করা হতে বিরত থাকা:

---

[67] জামেউল বায়ান ১৪/৩৬০

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ إِنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُواْ وَهُمۡ فَٰسِقُونَ﴾ [التوبة: 84]

“আর তাদের মধ্যে যে মারা গিয়েছে, তার ওপর তুমি জানাজা পড়বে না এবং তার কবরের ওপর দাঁড়াবে না। নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং তারা ফাসিক অবস্থায় মারা গিয়েছে।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৮৪]

আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«لما توفي عبد الله بن أُبَيّ جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال يا رسول الله، أعطني قميصَك أكفنه فيه وصلِّ عليه واستغفِر له، فأعطاه قميصه وقال إِذَا فَرَغْتَ مِنْهُ فَآذِنَّا فلمّا فرغ آذنه به، فجاء ليصلّي عليه، فجذبه عمر، فقال أليس قد نهاك الله أن تصلّي على المنافقين ؟ !فقال... »

“আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সুলুল মারা গেলে তার ছেলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলে,

হে আল্লাহর রাসূল! তুমি তোমার পরিধেয় কাপড়টি আমার নিকট দাও! তাতে আমি আমার পিতাকে কাফন দেবো। আর তুমি তার ওপর সালাতে জানাজা পড় এবং তার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাও। তার প্রস্তাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মত হয়ে তাকে তার জামাটি দিয়ে দেয় এবং তাকে বলে, তুমি যখন কাফন থেকে ফারেগ হবে, তখন আমাকে খবর দেবে। তারপর যখন তারা কাফন থেকে ফারেগ হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খবর দিল। খবর পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওপর সালাতে জানাজা আদায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলে, উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে টেনে ধরে বলেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে মুনাফিকদের ওপর সালাতে জানাজা পড়তে নিষেধ করে নি? তখন তিনি বলেন, আমি তাদের জন্য ক্ষমা চাই বা না চাই উভয়টি সমান। আর আমি যদি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা চাই আল্লাহ তা'আলা তাদের কখনোই ক্ষমা করবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল

করেন, ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ إِنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُواْ وَهُمۡ فَٰسِقُونَ﴾ আর তাদের মধ্যে যে মারা গিয়েছে, তার ওপর তুমি জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের ওপর দাঁড়াবে না। নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং তারা ফাসিক অবস্থায় মারা গিয়েছে। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ওপর সালাত আদায় করা ছেড়ে দেন।[68]

পরিশিষ্ট

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা মুনাফিকদের তৎপরতা ও নিফাকের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আমরা কিছুটা হলেও জানতে পারছি। নিফাক এমন একটি মারাত্মক ব্যাধি ও নিন্দনীয় চরিত্র, যা মানুষের জন্য খুবই ক্ষতি ও মারাত্মক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা নিফাকের গুণে গুণান্বিত তাদের গাদ্দার, খিয়ানত কারী, মিথ্যুক ও ফাজের বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ, একজন

[68] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭৯৬।

মুনাফিক তার ভিতরে যা আছে, সে তার বিপরীত জিনিসটিকে প্রকাশ করে। সে নিজেকে সত্যবাদী দাবী করলেও সে নিজেই জানে নিশ্চয় সে একজন মিথ্যুক। সে নিজেকে আমানতদার দাবী করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে একজন খিয়ানত কারী। অনুরূপভাবে সে দাবি করে যে, সে প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী কিন্তু সত্যি হলো, সে একজন গাদ্দার। একজন মুনাফিক তার প্রতিপক্ষের লোকদের নানান ধরনের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে, অথচ সে নিজেই ফাজের অশ্লীল ও অন্যায় কাজে লিপ্ত। মুনাফিকদের চরিত্রই হলো, ধোঁকা দেওয়া, প্রতারণা করা ও মিথ্যাচার করা। যদি কোনো মুসলিমের মধ্যে এ ধরনের কোনো চরিত্র পাওয়া যায়, তাহলে আশংকা হয় যে, তাকে বড় নিফাক- ঈমান হারা- আক্রান্ত করতে পারে। কারণ, নিফাকে আমলী যদিও এমন এক অপরাধ বা কবিরা গুনাহ যা বান্দাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না, কিন্তু যখন একজন বান্দার মধ্যে তা প্রগাঢ় হয়ে যায় বা গেঁথে বসে, তখন তার চরিত্র ধীরে ধীরে মিথ্যাচার, প্রতারণা ও ধোঁকা দেওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে থাকে।

তারপর যখন তার চরিত্রের আরো অবনতি ঘটে তখন সে আল্লাহর মাখলুকের সাথে যে ধরনের আচরণ করে, তার প্রভুর সাথেও ঠিক একই ধরনের আচরণ করে। অতঃপর তার অন্তর থেকে ঈমান হরণ করা হয়, তার পরিবর্তে তাকে দেওয়া হয়ে নিফাক, আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি ও হুমকি।

আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা হলো, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের অন্তরসমূহকে সংশোধন করে দেন। আমাদেরকে প্রকাশ্য ও গোপনীয় যাবতীয় ফিতনা হতে দূরে রাখেন। আমীন!

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

অনুশীলনী

তোমার সামনে দুই ধরনের প্রশ্ন আছে, এক ধরনের প্রশ্ন যা তুমি সাথে সাথে উত্তর দিতে পারবে। আর এক

ধরনের প্রশ্ন আছে যে গুলো গভীর চিন্তা ভাবনা ও ফিকির করার প্রয়োজন আছে।

প্রথম প্রকার প্রশ্ন:

1. নিফাকের শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থ কি?

2. নিফাকের প্রকার গুলো কি?

3. নিফাকে ইতিকাদী ও নিফাকে আমলীর মধ্যে পার্থক্য কি?

4. মুনাফিকদের কিছু আলামত ও গুণ রয়েছে, সে গুলোর থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আলোচনা কর।

5. একজন মুসলিম কীভাবে নিজেকে নিফাক থেকে রক্ষা করবে?

3. মুনাফিকদের সাথে একজন মুসলিমের অবস্থান কি হওয়া উচিৎ?

দ্বিতীয় প্রকার প্রশ্ন:

১. নিফাকে আসলি আর নিফাকে আমলীর মধ্যে পার্থক্য কি?

২. মদিনায় কেন নিফাক প্রকাশ পেল কিন্তু মক্কায় নিফাক প্রকাশ পেল না?

৩. আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, «الغناء ينبت النفاق في القلب» এ কথাটির ব্যাখ্যা কর।

৪. ইমাম নববী রহ. উল্লেখ করেন, আলেমগণ নিম্ন বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আসের হাদীসটিকে মুশকিল বলে উল্লেখ করেন হাদীসটির বিশুদ্ধ অর্থ কি?

«أَرْبعٌ مَن كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصا، وَمَن كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النفَّاقِ حَتَّى يَدَعَهَا :إِذا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذا عَاَهَد غدرَ، وَإِذا وَعَدَ أَخلَفَ، وَإِذا خَاصَمَ فَجَرَ»

“চারটি গুণ যার মধ্যে একত্র হবে, সে সত্যিকার মুনাফিক। আর যার মধ্যে এ চারটি গুণের যে কোনো একটি থাকবে সে যতদিন পর্যন্ত তা পরিহার না করবে,

তার মধ্যে নিফাকের একটি গুণ অবশিষ্ট থাকল। গুণগুলো হলো, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। আর যখন কোনো বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন তা লঙ্ঘন করে, আর যখন ওয়াদা করে তা খিলাফ করে, যখন ঝগড়া-বিবাদ করে, সে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করে।

সমাপ্ত

নিফাক একটি মারাত্মক ব্যাধি যা একজন মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতকে ধ্বংস করে দেয়। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এর পরিণতি খুবই মারাত্মক। এর কারণে মানুষের অন্তর কঠিন হয় এবং পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়। তাই নিফাক থেকে সতর্ক থাকা এবং মুনাফেকদের চরিত্র থেকে নিজেকে হিফাযত করা খুবই জরুরি। এ গ্রন্থে নিফাকের সংজ্ঞা, মুনাফিকদের চরিত্র ও নিফাক থেকে বাঁচার উপায় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

অন্তর বিধ্বংসী বিষয়সমূহ: অহংকার

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

৯০৩

অনুবাদ: জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদনা: ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

مفسدات القلوب: الكبر

محمد صالح المنجد

ترجمة: ذاكر الله أبو الخير

مراجعة: د/ محمد منظور إلهـي

সূচীপত্র

২৯	চার. অহংকারীর সম্মানে ছুটাছুটি করা ও দাঁড়িয়ে সম্মান করাকে পছন্দ করা	
৩০	পাঁচ. অতিরিক্ত কথা বলা	
	ছয়, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, চোগলখোরি ও নাম পরিবর্তন করা	
৩১	সাত, গীবত করা	
৩১	আট, গরীব, মিসকিন, অসহায় ও দুর্বল লোকদের সাথে উঠা বসা করা হতে বিরত থাকা	
৩২	নয়. নিকৃষ্ট ও দোষনীয় কাজের ওপর অটুট থাকা	
৩৩	দশ. কারো উপদেশ গ্রহণ না করা	
৩৪	এগার. জ্ঞান অর্জন না করা	
৩৫	বার. অহংকারীর সাথে সাক্ষাত হলে, সে সালাম দেয় না	
৩৬	তের. হাঁটার সময় যদি তার সাথে অন্য কেউ থাকে, তাকে তার পিছনে হাটতে পছন্দ করা	
৩৭	**অহংকারীর শাস্তি**	
৩৮	**দুনিয়াতে অহংকারীর শাস্তি**	
৩৯	১. একজন অহংকারীকে তার চাহিদার বিপরীত দান করার মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হয়	
৪০	২. চিন্তা-ফিকির, উপদেশ গ্রহণ করা ও আল্লাহর আয়াতসমূহ হতে নছিহত অর্জন করা হতে বঞ্চিত হয়	
৪১	৩. দুনিয়াতে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়।	

৪২	চার. অহংকারীদের থেকে নি'আমতসমূহ ছিনিয়ে নেওয়া হয়।	
৪৩	৫. অহংকার জমি ধ্বস ও কবর আযাবের কারণ হয়	
৪৪	**পরকালের জীবনে অহংকারের শাস্তি**	
৪৫	১. অহংকারী ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের সাথে ধ্বংস হবে	
৪৬	দুই. অহংকারীরা কিয়ামত দিবসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ও অবস্থানের দিক দিয়ে অনেক দুরে হবে	
৪৭	তিন. অহংকারীরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, যে অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তার ওপর ক্ষুব্ধ	
৪৮	চার. অহংকারীদের আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন অত্যন্ত অপমান অপদস্ত করে একত্র করবে	
৪৯	পাঁচ. অহংকার জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধক	
৫০	ছয়. অহংকারীদের জন্য জাহান্নামের ওয়াদা দেওয়া আছে	
৫১	সাত. অহংকারীদের অপমান অপদস্ত করে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে	
৫২	**অহংকারের চিকিৎসা**	
৫৩	১. অন্তর থেকে অহংকারের মূলোৎপাটন করা	
৫৪	২. অহংকারের বস্তুসমূহ নিয়ে চিন্তা করা	
৫৫	তিন. দো'আ করা ও আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া	
৫৬	চার. বিনয় অবলম্বন করা	

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

যাবতীয় প্রশংসা কেবলই আল্লাহ তা‘আলার যিনি সমগ্র জগতের মালিক ও রব। **আর সালাত ও সালাম নাযিল হোক আমাদের নবী** মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, যিনি সমস্ত নবীগণের সরদার ও সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। আরও নাযিল হোক তার পরিবার-পরিজন ও সমগ্র সাথী-সঙ্গীদের ওপর।

মনে রাখতে হবে, অহংকার ও বড়াই মানবাত্মার জন্য খুবই ক্ষতিকর ও মারাত্মক ব্যাধি, যা একজন মানুষের নৈতিক চরিত্রকে শুধু কলুষিতই করে না বরং তা একজন মানুষকে হেদায়াত ও সত্যের পথ থেকে দূরে সরিয়ে ভ্রষ্টতা ও গোমরাহির পথের দিকে নিয়ে যায়। যখন

কোনো মানুষের অন্তরে অহংকার ও বড়াইর অনুপ্রবেশ ঘটে, তখন তা তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও ইরাদার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং তাকে নানাবিধ প্রলোভন ও প্ররোচনার মাধ্যমে খুব শক্ত হস্তে টেনে নিয়ে যায় ও বাধ্য করে সত্যকে অস্বীকার ও বাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান করতে। আর একজন অংহকারী সবসময় চেষ্টা করে হকের নিদর্শনসমূহকে মিটিয়ে দিতে। **অতঃপর** তার নিকট সজ্জিত ও সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়ে ওঠে কিছু বাতিল, ভ্রান্ত, ভ্রষ্টতা ও গোমরাহি যার কোনো বাস্তবতা নেই। **ফলে সে এ সবেরই অনুকরণ করতে থাকে এবং গোমরাহিতে নিপতিত থাকে।** এ সবের সাথে আরও যোগ হবে, মানুষ সে যত বড়ই হোক না কেন, তাকে সে নিকৃষ্ট মনে করবে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তাকে অপমান করবে।

এ পুস্তিকায় অহংকার কাকে বলে তা বর্ণনা করা হয়েছে এবং অহংকার ও বড়াইর মধ্যে পার্থক্য কি তা আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও এ পুস্তিকায় থাকছে অহংকারের ক্ষতি, নিদর্শন, কারণ ও মানব জীবনে তার প্রভাব কি

তার একটি সার-সংক্ষেপ। সবশেষে অহংকারের চিকিৎসা কি তা আলোচনা করে রিসালাটির সমাপ্তি টানা হয়েছে।

এ পুস্তিকাটি তৈরি করা ও এটিকে একটি সন্তোষজনক অবস্থানে দাঁড় করাতে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আমি কখনোই ভুলবো না।

আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি, আল্লাহ তা'আলা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের স্থায়ী ও চিরন্তন কল্যাণ দান করুন। আমাদের ক্ষমা করুন। আমীন।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

অহংকার বা কিবিরের সংজ্ঞা

কিবিরের আভিধানিক অর্থ:

আল্লামা ইবন ফারেস রহ. বলেন, কিবির অর্থ: বড়ত্ব, বড়াই, অহংকার ইত্যাদি। অনুরূপভাবে الكبرياء অর্থও বড়ত্ব, বড়াই, অহংকার। প্রবাদে আছে:

ورثوا المجد كابرًا عن كابر.

“ইজ্জত সম্মানের দিক দিয়ে যিনি বড়, তিনি তার মত সম্মানীদের থেকে সম্মানের উত্তরসূরি বা উত্তরাধিকারী হন।”

আর আল্লামা ইবন মানযূর উল্লেখ করেন, الكِبْر শব্দটিতে কাফটি যের বিশিষ্ট। এর অর্থ হলো, বড়ত্ব, অহংকার ও দাম্ভিক।

আবার কেউ কেউ বলেন, তাকাব্বারা শব্দটি কিবির থেকে নির্গত। আর من السن تَكابَر শব্দটি দ্বারা বার্ধক্য বুঝায়।

আর তাকাব্বুর ও ইস্তেকবার শব্দটির অর্থ হলো, বড়ত্ব, দাম্ভিক ও অহমিকা।[1]

ইসলামী পরিভাষায় কিবিরের সংজ্ঞা:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই স্বীয় হাদীসে কিবিরের সংজ্ঞা বর্ণনা করেন।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসুদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا يَدخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبرٍ قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبِّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حسَنًا، وَنَعْلُه حَسَنَةً. قَالَ: إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُ الجَمَالَ، الْكِبِرِ بَطَرُ الحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ»

“যার অন্তরে একটি অণু পরিমাণ অহংকার থাকে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বললে, এক লোক দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোনো কোনো লোক এমন আছে, সে সুন্দর

---

[1] লিসানুল আরব ১২৫/৫০।

কাপড় পরিধান করতে পছন্দ করে, সুন্দর জুতা পরিধান করতে পছন্দ করে, এসবকে কি অহংকার বলা হবে? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর তা'আলা নিজেই সুন্দর, তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। (সুন্দুর কাপড় পরিধান করা অহংকার নয়) অহংকার হলো, সত্যকে গোপন করা এবং মানুষকে নিকৃষ্ট বলে জানা।[2]

এ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি অংশে অহংকারের সংজ্ঞা তুলে ধরেন।

এক:

হককে অস্বীকার করা, হককে কবুল না করে তার প্রতি অবজ্ঞা করা এবং হক কবুল করা হতে বিরত থাকা। বর্তমান সমাজে আমরা অধিকাংশ মানুষকে দেখতে পাই, যখন তাদের নিকট এমন কোনো লোক হকের দাওয়া নিয়ে আসে, যে বয়স বা সম্মানের দিক দিয়ে তার থেকে ছোট, তখন সে তার কথার প্রতি কোনো প্রকার গুরুত্ব

---

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯১।

দেয় না। আর তা যদি তাদের মতামত অথবা তারা যা নির্ধারণ ও যার ওপর তারা আমল করছে, তার পরিপন্থী হয়, তখন তারা তা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে| আর অধিকাংশ মানুষের স্বভাব হলো, যে লোকটি তাদের নিকট দাওয়াত নিয়ে আসবে, তাকে ছোট মনে করবে এবং তার বিরোধিতায় অটল ও অবিচল থাকবে, যদিও কল্যাণ নিহিত থাকে সত্য ও হকের আনুগত্যের মধ্যে এবং তারা যে অন্যায়ের অপর অটুট রয়েছে, তাতে তাদের ক্ষতি ছাড়া কোনোই কল্যাণ না থাকে| আমাদের সমাজে এ ধরনের লোকের অভাব নেই| বিশেষ করে ছোট পরিসরে এ ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটতে থাকে। যেমন, পরিবার, স্কুল মাদ্রাসায়, অফিস আদালত ও বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে এ ধরনের ঘটনা নিত্যদিন ঘটে থাকে|

অহংকারীরা যে বিষয়টির আশংকা করে অপর থেকে সত্যকে গ্রহণ করে না, তা হলো, সে যদি অপর ব্যক্তি থেকে প্রমাণিত সত্যকে গ্রহণ করে, তাকে মানুষ সম্মান দেবে না, মানুষ অপর লোকটিকে সম্মান দেবে। তখন সম্মান অপরের হাতে চলে যাবে এবং সেই মানুষের

সামনে বড় ও সম্মানী লোক হিসেবে বিবেচিত হবে, অহংকারীকে কেউ সম্মান করবে না। এ কারণেই সে কাউকে মেনে নিতে পারে না, সে মনে করে সত্যকে গ্রহণ করলে তার সম্মান নিয়ে টানাটানি হবে এবং মানুষ তার প্রতি আর আকৃষ্ট হবে না। মানুষ সে লোকটিকেই বড় মনে করবে এবং তাকেই মানবে। আর বাধ্য হয়ে অহংকারীকেও অপরের অনুসারী হতে হবে।

কিন্তু এ অহংকারী লোকটি যদি বুঝতে পারত, তার জন্য সত্যিকার ইজ্জত ও সম্মান হলো, হকের অনুসরণ ও আনুগত্য করার মধ্যে, বাতিলের মধ্যে ডুবে থাকাতে নয়, তা ছিল তার জন্য অধিক কল্যাণকর ও প্রশংসনীয়।

উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আবু মুসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নিকট চিঠি লিখেন, তুমি গত কাল যে ফায়সালা দিয়েছিলে, তার মধ্যে তুমি চিন্তা ফিকির করে যখন সঠিক ও সত্য তার বিপরীতে পাও, তাহলে তা থেকে ফিরে আসাতে যেন তোমার নফস তোমাকে বাধা না দেয়। কারণ, সত্য চিরন্তন, সত্যের

পথে ফিরে আসা বাতিলের মধ্যে সময় নষ্ট করার চেয়ে অনেক উত্তম।[3]

আব্দুর রহমান ইবন মাহদী রহ. বলেন, একদা আমরা একটি জানাযায় উপস্থিত হলাম, তাতে কাজী উবাইদুল্লাহ ইবনুল হাসান রহ. হাযির হলো। **আমি তাকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে**, সে ভুল উত্তর দেয়, আমি তাকে বললাম, আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করে দিক, এ মাসআলার সঠিক উত্তর এভাবে...। তিনি কিছু সময় মাথা নিচু করে চুপ করে বসে থাকলেন, তারপর মাথা উঠিয়ে বললেন, আমি আমার কথা থেকে ফিরে আসলাম, আমি লজ্জিত। সত্য গ্রহণ করে লেজ হওয়া আমার নিকট মিথ্যার মধ্যে থেকে মাথা হওয়ার চেয়ে অধিক উত্তম।[4]

দ্বিতীয়: [غمط الناس] মানুষকে নিকৃষ্ট জানা।

---

[3] দারাকুতনী ২০৬/৪।

[4] তারিখ বাগদাদ ৩০৭/১০।

الغمط বলা হয়, নিকৃষ্ট মনে করা, ছোট মনে করা ও অবজ্ঞা করাকে।

সুতরাং [غمط الناس] "মানুষ কে নিকৃষ্ট মনে করা, অবজ্ঞা করা, তুচ্ছ মনে করা ও মানুষকে ঘৃণা করা। মানুষের গুণের থেকে নিজের গুণকে বড় মনে করা। কারো কোনো কর্মকে স্বীকৃতি না দেওয়া, কোনো ভালো গুণকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা না থাকা।

মনে রাখতে হবে, যারা মানুষকে খারাপ জানে, তাদের কর্মের পরিণতি হলো, মানুষ তাদের খারাপ জানবে। এ ধরনের লোকেরা মানুষের সুনামকে ক্ষুণ্ণ এবং তাদের যোগ্যতাকে ম্লান করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। সে অন্যদের ওপর তার নিজের বড়ত্ব ও উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করার লক্ষ্যে, মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন ও ছোট করে। মানুষের সম্মানহানি ঘটানোর উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করে ও অপবাদ রটায়। অহংকারীরা কখনোই মানুষের চোখে ভালো হতে পারে না, মানুষ তাদের ভালো চোখে দেখে না।

অহংকারী তার নিজের কর্ম ও গুণ দিয়ে কখনোই উচ্চ মর্যাদা বা সম্মান লাভ করতে সক্ষম নয়। তাই সে নিজে সম্মান লাভ করতে না পেরে নিজের মর্যাদা ঠিক রাখার জন্য অন্যদের কৃতিত্বকে নষ্ট করে এবং তাদের মান-মর্যাদাকে খাট করে দেখে।

কিবির (অহংকার) ও 'উজব (আত্মতৃপ্তি) দু'টির মধ্যে পার্থক্য

আবু ওহাব আল-মারওয়ারজী রহ. বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন মুবারককে জিজ্ঞাসা করলাম কিবির কি? উত্তরে তিনি বলেন, মানুষকে অবজ্ঞা করা।

তারপর আমি তাকে উজব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'উজব কী? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি তোমাকে মনে করলে যে, তোমার নিকট এমন কিছু আছে, যা অন্যদের মধ্যে নেই। তিনি বলেন, নামাজিদের মধ্যে 'উজব বা আত্মতৃপ্তির চেয়ে খারাপ আর কোনো মারাত্মক ত্রুটি আমি দেখতে পাই না।[5]

---

[5] সীয়ারু আলামিন নুবালা ৪০৭/৭

কিবিরের কারণসমূহ

একজন অহংকারী মনে করে, সে তার সাথী সঙ্গীদের চেয়ে জাতিগত ও সত্তাগতভাবেই বড় এবং সে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র, তার সাথে কারো কোনো তুলনা হয় না। ফলে সে কাউকেই কোনো প্রকার তোয়াক্কা করে না, কাউকে মূল্যায়ন করতে চায় না এবং কারো আনুগত্য করার মানসিকতা তার মধ্যে থাকে না। যার কারণে সে সমাজে এমনভাবে চলা ফেরা করে মনে হয় তার মত এত বড় আর কেউ নেই।

অহংকারের কারণসমূহ নিম্নরূপ:

এক. কারো প্রতি নমনীয় না হওৎয়া বা আনুগত্য না করার স্পৃহা:

একজন অহংকারী কখনোই চায় না, সে কারো আনুগত্য করুক বা কারো কোনো কথা শুনুক। সে চিন্তা করে আমার কথা মানুষ শোনবে আমি কেন মানুষের কথা শোনবো। আমি মানুষকে উপদেশ দেবো আমাকে কেন মানুষ উপদেশ দেবে। এভাবেই তার দিন অতিবাহিত

হয়। দিন যত যায়, অহংকারীর অহংকারের স্পৃহা আরও বাড়তে থাকে এবং তার অহংকারও দিন দিন বৃদ্ধি পায়। ফলে সে দুনিয়াতে আর কাউকেই মানতে বা কারো আনুগত্য করতে রাজি হয় না। তার অহংকার করার স্পৃহাটি ধীরে ধীরে এমন এক পর্যায় পৌঁছে, শেষ পর্যন্ত যে আল্লাহর হাতে আসমান ও জমিনের কর্তৃত্ব, তার আনুগত্যও সে আর করতে চায় না। তার এ ধরনের স্পৃহার কারণে তার মধ্যে এ অনুভূতি জাগে যে, সে কারো মুখাপেক্ষী নয়, সে নিজেই সর্বেসর্বা, তার কারো প্রতি আনুগত্য করার প্রয়োজন নেই। **অহংকারীর এ ধরনের** দাম্ভিকতা থেকে সৃষ্টি হয়, হঠকারিতা ও কুফরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ ٦ أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰٓ ٧ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجۡعَىٰٓ ٨﴾ [سورة العلق: 6- 8]

"কখনো নয়, নিশ্চয় মানুষ সীমালঙ্ঘন করে থাকে। কেননা সে নিজকে মনে করে স্বয়ংসম্পূর্ণ। নিশ্চয়

তোমার রবের দিকেই প্রত্যাবর্তন। [সূরা আলাক, আয়াত: ৬-৮]

আল্লামা বাগাবী রহ. বলেন, মানুষ তখনই সীমালঙ্ঘন এবং তার প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করে, যখন সে দেখতে পায়, সে নিজেই স্বয়ংসম্পন্ন।[6] তার আর কারো প্রতি নত হওয়া বা কারো আনুগত্য করার কোনো প্রয়োজন নেই।

দুই. অন্যদের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য অপ্রতিরোধ্য অভিলাষ:

একজন অহংকারী, সে মনে করে, সমাজে তার প্রাধান্য বিস্তার, সবার নিকট প্রসিদ্ধি লাভ ও নেতৃত্ব দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। **তাকে এ লক্ষ্যে সফল হতেই হবে। কিন্তু যদি সমাজ তার** কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য মেনে না নেয়, তখন সে চিন্তা করে, তাকে যে কোনো উপায়ে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে হবে। চাই তা বড়াই করে

---

[6] মায়ালেমুত তানযীল ৪৭৯/৮

হোক অথবা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তখন সে যা ইচ্ছা তাই করে এবং সমাজে হট্টগোল সৃষ্টি করে।

তিন. নিজের দোষকে আড়াল করা:

একজন অহংকারী তার স্বীয় কাজ কর্মে নিজের মধ্যে যে সব দুর্বলতা অনুভব করে, তা গোপন রাখতে আগ্রহী হয়। কারণ, তার আসল চরিত্র যদি মানুষ জেনে যায়, তাহলে তারা তাকে আর বড় মনে করবে না ও তাকে সম্মান দেবে না। যেহেতু একজন অহংকারী সব সময় মানুষের চোখে বড় হতে চায়, এ কারণে সে পছন্দ করে, তার মধ্যে যে সব দুর্বলতা আছে, তা যেন কারো নিকট প্রকাশ না পায় এবং কেউ যাতে জানতে না পারে। কিন্তু মূলত: সে তার অহংকার দ্বারা নিজেকে অপমানই করে, মানুষকে সে নিজেই তার গোপনীয় বিষয়ের দিকে পথ দেখায়। কারণ, সে যখন নিজেকে বড় করে দেখায়, তখন মানুষ তার বাস্তব অবস্থা জানার জন্য তার সম্পর্কে গবেষণা করতে আরম্ভ করে, তার কোথায় কি আছে, না আছে তা অনুসন্ধান করতে থাকে। তখন তার আসল

চেহারা প্রকাশ পায়, আসল রূপ খুলে যায়, তার যাবতীয় দুর্বলতা প্রকাশ পায় এবং তার অবস্থান সম্পর্কে মানুষ বুঝতে পারে। ফলে মানুষ আর তাকে শ্রদ্ধা করে না, বড় করে দেখে না, তাকে নিকৃষ্ট মনে করে এবং ঘৃণা করে।

একজন অহংকারী ইচ্ছা করলে তার দোষগুণ গুলো বিনয়, নম্রতা, মানুষের সাথে বন্ধুত্ব ও চুপ-চাপ থাকার মাধ্যমে গোপন রাখতে পারত, কিন্তু তা না করে অহংকার করার কারণে তার সব গোমর ফাঁক হয়ে যায়। এ ছাড়াও মানুষ যা পছন্দ করে না, তা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করা, কোনো বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করা হতে দুরে থাকা এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য মিথ্যা দাবি করা হতে বিরত থাকার মাধ্যমে, সে তার যাবতীয় দুর্বলতা ও গোপন বিষয়গুলো দামা-চাপা দিতে পারত। কিন্তু তা না করে সে অহংকার করাতে তার অবস্থা আরও প্রতিকুলে গেল এবং ফলাফল তার বিপক্ষে চলে গেল। তার বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে তার যাবতীয় অপকর্ম মানুষ জানতে পারল।

চার. অহংকারী যেভাবে অহংকারের সুযোগ পায়:

কতক লোকের অধিক বিনয়ের কারণে অহংকারীরা অহংকারের সুযোগ পায়।

অহংকারীরা যখনই কোনো সুযোগ পায়, তা তারা কাজে লাগাতে কার্পণ্য করে না। অনেক সময় দেখা যায় কিছু লোক এমন আছে, যারা বিনয় করতে গিয়ে অধিক বাড়াবাড়ি করে, তারা নিজেদের খুব ছোট মনে করে, নিজেকে যে কোনো প্রকার দায়িত্ব আদায়ের অযোগ্য বিবেচনা করে এবং যে কোনো ধরনের আমানতদারিতা রক্ষা করতে সে অক্ষম বলে দাবি করে, তখন অহংকারী চিন্তা করে এরা সবাইতো নিজেদের অযোগ্য ও আমাকে যোগ্য মনে করছে, প্রকারান্তরে তারা সবাই আমার মর্যাদাকে স্বীকার করছে, তাহলে আমিই এসব কাজের জন্য একমাত্র যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি। সুতরাং আমিতো তাদের সবার ওপর নেতা। শয়তান তাকে এভাবে প্রলোভন দিতে ও ফুঁসলাতে থাকে, আর লোকটি নিজে নিজে ফুলতে থাকে। ফলে এখন সে অহংকার বশতঃ আর কাউকে পাত্তা দেয় না সবাইকে নিকৃষ্ট মনে করে। আর নিজেকে যোগ্য মনে করে।

পাঁচ. মানুষকে মূল্যায়ন করতে না জানা:

মানুষ শ্রেষ্ঠ হওয়ার মানদণ্ড কি এবং মানুষকে কিসের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে হবে, তা আমাদের অবশ্যই জানা থাকতে হবে। অহংকারের অন্যতম কারণ হলো, মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড নির্ধারণে ত্রুটি করা। একজন মানুষ শ্রেষ্ঠ হওয়ার মানদণ্ড কি তা আমাদের অনেকেরই অজানা। যার কারণে তুমি দেখতে পাবে, যারা ধনী ও পদ মর্যাদার অধিকারী তাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে, যদিও তারা পাপী বা অপরাধী হয়। অন্যদিকে একজন পরহেজগার, মুত্তাকী ও সৎ লোক তার ধন সম্পদ ও পদমর্যাদা না থাকাতে সমাজে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না এবং তাকে মূল্যায়ন করা হয় না। অনৈতিক, চোর, বাটপার যাদের অগ্রাধিকার দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়, বর্তমান সমাজে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে বা অনুপযুক্ত ও অযোগ্য ব্যক্তিদের দায়িত্ব বা নেতৃত্ব দেওয়ার কারণেই বর্তমান সমাজের করুণ অবস্থা। স্বার্থান্বেষী ও ভোগবাদীরা সমাজের হোমরাচোমরা হওয়ার কারণে তারা অন্যদের

নিকৃষ্ট মনে করে এবং তাদের ওপর বড়াই দেখায় ও অহংকার করে। ইসলাম মানুষকে মূল্যায়নের একটি মাপকাঠি ও মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিয়েছে। বর্তমান সমাজে যদি তা অনুসরণ করা হত, তবে সামাজিক অবক্ষয় সম্পূর্ণ দুর হয়ে যেত এবং সমাজের এ করুণ পরিণতি হতে মানব জাতি রক্ষা পেত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের একটি সুস্পষ্ট ও বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে, একজন মানুষকে কিসের ভিত্তিতে মূল্যায়ন ও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং তাকে কিসের ভিত্তিতে অবমূল্যায়ন ও পিছনে ফেলে রাখা হবে। মানুষের মর্যাদা তার পোষাকে নয়, বরং মানুষের মর্যাদা, তার অন্তরনিহীত সততা, স্বচ্ছতা ও আল্লাহ-ভীতির ওপর নির্ভর করে। যার মধ্যে যতটুকু আল্লাহ-ভীতি থাকবে, সে তত বেশি সৎ ও উত্তম লোক হিসেবে বিবেচিত হবে।

সাহাল ইবন সা'দ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«مَرَّ رجل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قالوا حِرًّي إن خطب أَنْ ينكح وَإن شفع أن يُشَفَّعَ، وإن قال أَنْ يُسْتَمعَ، قال ثم سكت، فَمَرّ رجل من فقراء المسلمين، فقال مَاتَقُولُونَ فِي هَذَا قالواحِرًّي إنْ خطب أن لا ينكح وـإِنْ شفع أَنْ لَا يُشَفَّعَ، وإن قال أَنْ لَا يُسْتَمعَ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا»

"একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে এক ব্যক্তি অতিক্রম করে যাচ্ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমবেত লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এ লোকটি সম্পর্কে কি বল, তারা উত্তরে বলল, লোকটি যদি কাউকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তাহলে তার ডাকে সাড়া দেওয়া হয়, যদি কারো বিষয়ে সুপারিশ করে, তাহলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়, আর যদি কোনো কথা বলে, তার কথা শোনা হয়। তাদের কথা শোনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করে থাকেন। একটু পর অপর একজন দরিদ্র মুসলিম রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে সাহাবীদের জিজ্ঞাসা

করে বলেন, তোমরা এ লোকটি সম্পর্কে মতামত দাও! তারা বলল, যদি সে প্রস্তাব দেয়, তাহলে তার প্রস্তাবে সাড়া দেওয়া হয় না, আর যদি সে কারো বিষয়ে সুপারিশ করে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না, আর যদি সে কোনো কথা বলে তার কথায় কান দেওয়া হয় না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ লোকটি যমিন ভরপুর যত কিছু আছে, তার সব কিছু হতে উত্তম।[7]

ছয়. আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমতকে অন্যদের নেয়ামতের সাথে তুলনা করা ও আল্লাহকে ভুলে যাওয়া:

কিবির বা অহংকারের অন্যতম কারণ হলো, একজন মানুষকে আল্লাহ তা'আলা যে সব নি'আমত দান করছে, সে সব নি'আমতকে ঐ লোকের সাথে তুলনা করা যাকে আল্লাহ তা'আলা কোনো হিকমতের কারণে ঐ সব নি'আমতসমূহ দেয় নি। তখন সে মনে করে, আমিতো ঐ সব নি'আমতসমূহ লাভের যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি, তাই আল্লাহ তা'আলা আমাকে আমার যোগ্যতার দিক

[7] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৯১।

বিবেচনা করেই নি‘আমতসমূহ দান করেছেন। ফলে সে নিজেকে সব সময় বড় করে দেখে এবং অন্যদের ছোট করে দেখে ও নিকৃষ্ট মনে করে। অন্যদেরকে সে মনে করে তারা নি‘আমত লাভের উপযুক্ত নয়, তাদের যদি যোগ্যতা থাকতো তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তাদের অবশ্যই নি‘আমতসমূহ দান করত।

মানুষ যে সব জিনিস নিয়ে অহংকার করে তার বর্ণনা

মানুষ বিভিন্ন জিনিস নিয়ে অহংকার করে থাকে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিভিন্ন ধরনের যোগ্যতা ও গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেন। কারো সৌন্দর্য আছে কিন্তু ধন সম্পদ নেই, সে সৌন্দর্য নিয়ে অহংকার করে, আবার কেউ আছে তার সম্পদ আছে, কিন্তু সৌন্দর্য নেই, সে তার সম্পদ নিয়ে বড়াই বা অহংকার করে। এভাবে এক একজন মানুষ এক একটি নিয়ে অহংকার করে। নিম্নে মানুষ যে সব নি'আমত নিয়ে অহংকার করে, তার কয়েকটি আলোচনা করা হলো।

এক. ধন-সম্পদ:

মানুষ আল্লাহর দেওয়া ধন-সম্পদ নিয়ে অহংকার বা বড়াই করে থাকে। তারা মনে করে ধন-সম্পদ লাভ তাদের যোগ্যতার ফসল, তারা নিজেরা তাদের যোগ্যতা দিয়ে ধন-সম্পদ উপার্জন করে থাকে। সুতরাং যাদের ধন-সম্পদ থাকে না তারা অযোগ্য ও অক্ষম। আল্লাহ

তা‘আলা কুরআন করীমে দুইজন বাগান মালিক সম্পর্কে বলেন,

﴿وَكَانَ لَهُۥ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَٰحِبِهِۦ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَنَا۠ أَكۡثَرُ مِنكَ مَالٗا وَأَعَزُّ نَفَرٗا﴾ [الكهف: 34]

“আর (এতে) তার ছিল বিপুল ফল-ফলাদি। তাই সে তার সঙ্গীকে কথায় কথায় বলল, ‘সম্পদে আমি তোমার চেয়ে অধিক এবং জনবলেও অনেক শক্তিশালী”। [সূরা কাহাফ, আয়াত: ৩৪]

এখানে লোকটি তার ধন-সম্পদ নিয়ে তার অপর ভাইয়ের ওপর অহংকার করে থাকে। আল্লাহ তার অহংকারের নিন্দা করেন আর যে ভাই অহংকার করত না তার প্রশংসা করেন।

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿إِنَّ قَٰرُونَ كَانَ مِن قَوۡمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيۡهِمۡۖ وَءَاتَيۡنَٰهُ مِنَ ٱلۡكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓأُ بِٱلۡعُصۡبَةِ أُوْلِي ٱلۡقُوَّةِ إِذۡ قَالَ لَهُۥ قَوۡمُهُۥ لَا تَفۡرَحۡۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡفَرِحِينَ ٧٦ وَٱبۡتَغِ فِيمَآ

ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ﴾ [القصص:76-77.]

"নিশ্চয় কারূন ছিল মূসার কাওমভূক্ত। অতঃপর সে তাদের ওপর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। অথচ আমি তাকে এমন ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম যে, নিশ্চয় তার চাবিগুলো একদল শক্তিশালী লোকের ওপর ভারী হয়ে যেত। স্মরণ কর, যখন তার কাওম তাকে বলল, 'দম্ভ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিকদের ভালবাসেন না'। আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ কর। আর যমীনে ফাসাদ করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না"। [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৭৬,৭৭]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿فَإِذَا مَسَّ ٱلۡإِنسَٰنَ ضُرّٞ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلۡنَٰهُ نِعۡمَةٗ مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلۡمِۭۚ بَلۡ هِيَ فِتۡنَةٞ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ [الزمر: 49.]

"অতঃপর কোনো বিপদাপদ মানুষকে স্পর্শ করলে সে আমাকে ডাকে। তারপর যখন আমরা আমাদের পক্ষ থেকে নি'আমত দিয়ে তাকে অনুগ্রহ করি তখন সে বলে, 'জ্ঞানের কারণেই কেবল আমাকে তা দেওয়া হয়েছে'। বরং এটা এক পরীক্ষা। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।" [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৪৯]

মানুষ যখন ধন-সম্পদ লাভ করে, তখন সে মনে করে এ তো তার যোগ্যতার ফসল। সে তার বুদ্ধি, বিবেক ও জ্ঞান দিয়েই ধন-সম্পদ লাভ করে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বলেন, আসলে মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত তারা এও জানে না যে, তাদের ধন-সম্পদ কোথা থেকে আসে।

দুই. ইলম বা জ্ঞান:

অহংকারের অন্যতম একটি কারণ হলো, ইলম বা জ্ঞান। একটি কথা মনে রাখতে হবে, আলিম, ওলামা, তালিবে

ইলম ও তথাকথিত পীর মাশাইখদের মধ্যে অহংকার খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, শয়তান তাদের পিছনে লেগে থাকে, চেষ্টা করে কীভাবে তাদের ধোকায় ফেলা যায়। এ কারণেই বর্তমানে আমরা দেখতে পাই, আলিমদের মধ্যে ফিতনা-ফ্যাসাদ, ঝগড়া-বিবাদ ও মতবিরোধ খুব বেশি। একজন আলিম মনে করে, ইলমের দিক দিয়ে সেই হলো পরিপূর্ণ ও স্বয়ং সম্পন্ন, তারমত এত বড় জ্ঞানী জগতে আর কেউ নেই। অনেক সময় দেখা যায়, একজন আলিম অন্য আলিমকে একেবারেই মূল্যয়ন করে না এবং নিজেকে মনে করে বড় আলিম, আর অন্যদের সে জাহেল ও নিকৃষ্ট মনে করে। এ ধরনের স্বভাব একজন আলেমের জন্য কত যে জঘন্য তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ইলম নিয়ে অহংকার করার কারণ দু'টি:

প্রথম কারণ:

ইলম হলো, আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক কায়েমের মাধ্যম। ফলে যাদের মধ্যে ইলম আছে তারা আল্লাহর একে বারেই কাছের লোক। তারা কখনোই তাদের ইলম

দ্বারা গর্ব বা অহংকার করতে পারে না। যে ইলম মানুষের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে তা হলো, তথাকথিত ইলম বা জ্ঞান। এ ধরনের ইলম নিয়ে ব্যস্ত থাকার কোনো অর্থ হতে পারে না। কারণ, বাস্তব ও সত্যিকার ইলম হলো, যে ইলম বা জ্ঞান দ্বারা বান্দা তার প্রভুকে চিনতে পারে এবং নিজেকে জানতে পারে। সত্যিকার ইলম একজন বান্দার মধ্যে আল্লাহর ভয় ও বিনয়কে সৃষ্টি করে, অহংকার সৃষ্টি করে না। একজন মানুষের মধ্যে যখন সত্যিকার ইলম বা জ্ঞান থাকবে, তখন সে সর্বাধিক বিনয়ী হবে এবং আল্লাহকেই ভয় করতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَـٰٓؤُاْۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: 28]

"বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল। [সূরা ফাতির, আয়াত: ২৮]

দ্বিতীয় কারণ:

ইলম বা জ্ঞান হলো, পবিত্র আমানত, যা পবিত্র পাত্রেই মানায়, অপবিত্র পাত্রে তা কখনোই মা-নায়না। আর এমন ব্যক্তির ইলম নিয়ে মগ্ন হওয়া, যার অন্তর নাপাকিতে ভরপুর ও চারিত্রিক দিক দিয়ে সে অত্যন্ত নিকৃষ্ট, তা কখনোই শুভ হয় না। এ লোকটি যখন কোনো কিছু শিখে, তা নিয়ে সে অহংকার করা আরম্ভ করে এবং যত বেশি শিখে তার অহংকার আরও বাড়তে থাকে। ফলে তার জ্ঞান মানুষের জন্য অশান্তির কারণ হয়।

যেমনটি বলেছিল, মুয়াররি, যে তার নিজের প্রশংসা নিজেই করেছিল, অথচ তার মধ্যে কোনো ভালো গুণ আছে বলে কখনোই দেখা যায়নি!

وإني وإن كنتُ الأخيرَ زمانُهُ

لآتٍ بما لم يَأْتِ به الأوائلُ

“যুগের দিক দিয়ে যদিও আমি সবার শেষে, তবে আমি এমন কিছু নিয়ে আসবো, যা আমার পূর্বের লোকেরা নিয়ে আসতে পারে নি”।

অহংকারের আরেকটি প্রকার হলো, বর্তমানে অনেক ছোট ছোট তালিবে ইলমকে বড় বড় আলিমদের সমকক্ষ বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরনের কথা বলতে দেখা যায়। **কোনো** মাসআলাতে বড় আলিমদের মতামতকে উপেক্ষা করে তারা নিজেরা মতামত দেয় এবং বলে, তারাও মানুষ আমরাও মানুষ!! এ ধরনের উক্তি তাদের জন্য কখনোই উচিৎ নয়।

আইউব আল আততার বলেন, আমি বিশির ইবনুল হারেসকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমাকে হাম্মাদ ইবন যায়েদ হাদীস বর্ণনা করেন। তারপর তিনি বলেন, আসতাগফিরুল্লাহ! সনদ উল্লেখ করার কারণে অন্তরে অহংকার জন্মেছিল। অর্থাৎ সনদ বর্ণনা করে হাদীস বর্ণনাতে তার মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হয়, তাই সে সাথে সাথে তা হতে বিরত থাকে। কারণ, যখন একজন মানুষ সনদসহ হাদীস বর্ণনা করে, তখন মানুষ মনে করে লোকটি হাদীসের সনদসহ মুখস্থ করেছে। এতে হাদীস বর্ণনা কারীর অন্তরে অহংকার আসতে পারে, তাই তিনি সনদ বর্ণনা করাকে পরিহার করেন। বর্তমানে অনেক

আলিমকে দেখা যায়, তারা হাদীসের সনদ বর্ণনা করেন, যাতে মানুষ তাকে বড় আলিম মনে করে। এ উদ্দেশ্যে হাদীস সনদসহ বর্ণনা না করাই উত্তম। কিন্তু যদি কেউ হাদীসটিকে মজবুত বলে প্রমাণ করার জন্য সনদসহ বর্ণনা করে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

তিন. আমল ও ইবাদত:

অনেকেই তাদের ইবাদত ও আমল নিয়ে গর্ব ও অহংকার করে। সে মনে করে মানুষের কর্তব্য হলো, তারা তাকে সম্মান করবে, সব কাজে তাকে অগ্রাধিকার দিবে এবং তার তাকওয়া, তাহারাত ও বুজুর্গি নিয়ে বিভিন্নভাবে আলোচনা করবে। আর সে মনে করে সব মানুষ ধ্বংসের মধ্যে আছে, শুধু সে একাই নিরাপদ। এ কারণে সে মাঝে মধ্যে বলে থাকে সব মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে। অথচ, কোনো একজন মানুষের জন্য সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে বলা কোনো ক্রমেই উচিৎ নয়।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِذَا قَالَ الرَّجُل هَلَك النَّاسُ فَهُوَ أَهلَكُهُمْ»

“যখন কোনো লোক বলে মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে, মূলত: সেই তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি| আল্লামা আবু ইসহাক বলেন, আমি জানি না أَهلَكُهُمْ শব্দটি যবর বিশিষ্ট যার অর্থ ‘সে তাদের ধ্বংস করল’, নাকি পেশ বিশিষ্ট যার অর্থ ‘সেই তাদের চেয়ে অধিক ধ্বংসের মধ্যে আছে’|

ইমাম নববী রহ. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী- إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم এর দু’টি প্রসিদ্ধ অর্থ আছে। এক হলো, কাফ-এর উপর পেশ, আর একটি হলো, কাফ-এর উপর যবর। পেশ হওয়াটা অধিক প্রসিদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ তাদের মধ্য হতে সে নিজেই অধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত। আর যখন যবর বিশিষ্ট হবে, তখন অর্থ হবে, সে তাদের ধ্বংস হয়ে গেছে বলে ঘোষণা দিল, বাস্তবে তারা ধ্বংস হয় নেই| উলামারা এ বিষয়ে একমত যে, এখানে যে দূষণীয় বিষয়টি আলোচনা করা হয়, তা সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে

মানুষকে নিকৃষ্ট জেনে, নিজেকে তাদের ওপর প্রাধান্য দেয়, আর তাদের মন্দ মনে করে এবং তাদের ওপর বড়াই করে, এ ধরনের কথা বলে। কারণ, সে কাউকে ভালো বা মন্দ বলার অধিকার রাখে না। এ তো হলো কেবল আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। তবে যদি তার নিজের মধ্যে ও বর্তমান মুসলিমদের মধ্যে দ্বীনের ব্যাপারে যে দুরবস্থা বিদ্যমান তার ওপর আফসোস ও দুঃখ প্রকাশ করে এ ধরণের কথা বলে, তখন তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

যেমনটি বলেছিল উম্মে দারদা। তিনি বলেন, একদিন আবু দারদা বিক্ষুব্ধ হয়ে ঘরে প্রবেশ করে, আমি তাকে বললাম, তোমাকে কিসে ক্ষুব্ধ করল? তখন সে বলল, আমি মুহাম্মাদের উম্মতের বিষয়ে কিছুই বুঝতে পারছি না, তারা সবাই জাহান্নামে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। ইমাম মালেক রহ. হাদীসটি ব্যাখ্যা এ রকমই করেছেন এবং অন্যান্য লোকেরাও তার অনুকরণ করেছেন।[৪]

---

[৪] ইমাম নববী রহ.-এর শরহে মুসলিম ১৭৫/১৬।

আর আল্লামা ইবন যাওজী রহ. বলেন, কতক অসতর্ক ছুফী আছে, যারা তাদের নিজেদের মনে করে, তারা আল্লাহর মাহবুব ও মকবুল বান্দা আর অন্যরা সবাই নিকৃষ্ট ও পাপি বান্দা। তারা আরও ধারণা করে, তার মান-মর্যাদা অতি উচ্চে, তাই সবাই তাকে সম্মান করে, তার মান মর্যাদা যদি উচ্চে না হত তাহলে তাকে কেউ সম্মান করত না। আবার কখনো কখনো সে এ ধারণা করে, সে যমিনের কুতুব, সে যে মর্যাদায় পৌঁছেছে তার এ আসন পর্যন্ত পৌঁছার মতো আর কেউ দুনিয়াতে নেই।[9]

আল্লামা খাত্তাবী রহ. তার আযলা কিতাবে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবন মুবারক খোরাসানে পৌছলে, মানুষের মুখে শুনতে পেলেন, এখানে একজন লোক আছে যিনি তাকওয়া ও পরহেজগারিতে প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত| এ কথা শোনে আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক রহ. তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার ঘরে প্রবেশ করেন, কিন্তু লোকটি তার দিকে একটুও তাকাল না এবং তার প্রতি বিন্দু

---

[9] সাইদুল খাতের ১৩৫।

পরিমাণও ভ্রুক্ষেপ করেনি। তার অবস্থা দেখে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক কাল ক্ষেপণ না করে তার ঘর থেকে বের হয়ে চলে আসেন। তারপর তার সাথীদের থেকে এক লোক তাকে বলল, তুমি কি জান এ লোকটি কে? সে বলল, না। তখন সে বলল, এ হলো আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, এ কথা শোনে লোকটি হতভম্ব ও নির্বাক হলো এবং দৌড়ে আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক রহ.-এর নিকট গেল, তার নিকট ক্ষমা চাইল এবং তার আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করল। তারপর বলল, হে আবু আব্দুর রহমান! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং উপদেশ দাও!

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলল, যখন তুমি ঘর থেকে বের হও, তখন যাকেই দেখ, মনে করবে সে তোমার থেকে উত্তম, আর তুমি তাদের চেয়ে অধম ও নিকৃষ্ট। তাকে এ উপদেশ দেওয়ার কারণ হলো, লোকটি নিজেকে বড় মনে করত এবং অহংকার করত। এ ছিল ধোঁকায় নিমজ্জিত একজন অহংকারীর অবস্থা। সালফে সালেহীন ও আমাদের পূর্বসূরিদের অবস্থা হলো, এ

লোকটি হতে সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা কখনোই এ ধরনের আচরণ করত না। তাদের থেকে একজন লোকের কথা বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ‘আরাফায় অবস্থান কারীদের নিকট তাকিয়ে দেখি, আমার মত পাপিষ্ঠ ও গুনাহগার লোক যদি না থাকত, তাহলে আল্লাহ তা‘আলা সকল আরাফাবাসীকে ক্ষমা করে দিত।

একজন মুমিন সব সময় নিজেকে ছোট ও নিকৃষ্ট মনে করবে এটাই স্বাভাবিক। তার আমল, ইবাদত ও বন্দেগী যতই বেশি হোক না কেন, সে তার যাবতীয় সব ইবাদতকে খুব কমই বিবেচনা করবে। উমার ইবন আব্দুল আজীজ রহ. কে বলা হলো, যদি তুমি মারা যাও তবে আমরা তোমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামরায় দাফন করব, তখন তিনি বললেন, একমাত্র শিরক ছাড়া আর বাকী সব গুনাহ নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করা, আমার নিকট রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে দাফনের যোগ্য মনে করা হতে উত্তম।

চার. বংশ:

কতক লোক আছে তারা উচ্চ বংশীয় হওয়ার কারণে অন্যদের ওপর বংশ নিয়ে গর্ব ও অহংকার করে। সে অহংকার বসত মানুষের সাথে মিশতে চায়না, তাদের সাথে মিশতে অপছন্দ করে এবং মানুষকে ঘৃণা করে। অনেক সময় অবস্থা এমন হয়, তার মুখ দিয়েও অহংকার প্রকাশ পায়। ফলে সে মানুষকে বলতে থাকে, তুমি কে? তোমার পিতা কে? তুমি আমার মতো লোকের সাথে কথা বলছ?!!

ইসলামের আদর্শ হলো, বংশ মর্যাদা না থাকার কারণে কাউকে হেয় প্রতি-পন্ন করা যাবে না। একজন লোক সে যে বংশেরই হোক না কেন, তার পরিচয় ঈমান ও আমলের মাধ্যমে। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাবশী গোলাম বেলাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর মূল্য মক্কার কাফির সরদার আবু জাহল থেকে বেশি। একমাত্র ঈমানের কারণে হাবশী গোলাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে খলিফাতুল মুসলিমীন উমার

রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার নিজের সরদার বলে আখ্যায়িত করেন।

যেমন, হাদীসে বর্ণিত, যাবের ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا[يعني بلالًا»

“উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আমাদের সরদার এবং তিনি আমাদের সরদার বিলাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে দাসত্ব ও গোলামী থেকে মুক্ত করেন।”

মা‘রুর ইবন সুয়াইদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«رأيت على أبي ذر بُرْدًا وعلى غلامه بُرًدا فقُلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر فقال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال لي: أَسَابَبْتَ فُلَانًا قلت: نعم، قال: أَفَنِلْتَ مِنْ أُمِّهِ قلت : نعم، قال: إِنَّكَ امْرُؤٌ فيكَ جَاهِلِيَّةٌ

قلت: على حين ساعتي هذه من كبر السن قال: نَعْم هُم إِخْوَانُكُمْ جَعَلهُمْ الله تَحت أَيْدِيكُم فَمَنْ جَعَلَ الله أَخَاهُ تَحت يَدِهِ فَلْيُطْعِمهُ مِمَاَّ يَأْكُلُ، وَلِيُلبسِهُ مِّما يَلْبَسُ، وَلَا يَكلِّفُه مِن الْعَمِل مَا يَغْلبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ ما يَغلبُهُ فَلْيُعِنهُ عَلَيْهِ»

“আমি আবু যর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখি এবং তার গোলামকেও ঠিক একই চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখি। আমি তাকে বললাম, যদি তুমি এ চাদরটি নিতে এবং তা পরিধান করতে, তাহলে তোমার জন্য একটি সেট হয়ে যেত! আর গোলামকে তুমি অন্য একটি কাপড় পরতে দিতে পারতে| তখন তিনি বললেন, আমি ও অপর এক লোকের সাথে আমার কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা হত| তার মা ছিল একজন অনারবী মহিলা। ঘটনা ক্রমে আমি তার সাথে মেলামেশা করি| তারপর আমার বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আলোচনা হলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বলল, তুমি কি অমুককে বন্দী করছ? আমি উত্তর দিলাম হাঁ, তারপর তিনি বললেন, তুমি কি তার মায়ের সাথে মেলামেশা

করছ? আমি বললাম হাঁ, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এমন এক লোক, তোমার মধ্যে এখনও জাহেলিয়াত রয়ে গেছে। আমি বললাম, আমি এখন বুড়ো হয়ে গেছি, তা সত্ত্বেও আমার মধ্যে জাহেলিয়াত! তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা তোমাদের ভাইয়ের মতো, আল্লাহ তা'আলা তাদের তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। মনে রাখবে, যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কোনো ভাইকে তোমাদের অধীনস্থ করে দেয়, সে যেন নিজে যা খায় তাকেও তা খেতে দেয়, আর সে যা পরিধান করে তাকেও যেন তা পরিধান করতে দেয়। তার ওপর এমন কোনো কাজ চাপিয়ে দিবে না, যা তার কষ্টের কারণ হয় ও তাকে পরাহত করে। আর যদি এ ধরনের কোনো কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে সে যেন তাকে সহযোগিতা করে।

আল্লামা ইবন হাজার রহ. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী তারা তোমাদের ভাই এ কথার অর্থ হলো, তোমাদের চাকর ও খাদেম। অর্থটি এ

জন্য করা হলো, যাতে যারা কৃতদাস নয় তারাও বিধানের অন্তর্ভুক্ত থাকে। এখানে একটি কথা স্পষ্ট হয়, চাকর, খাদেম ও গোলামদের গাল দেওয়া একেবারেই নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত কাজ। কারণ, এতে একজন মুসলিমের ইজ্জত সম্মানের ওপর আঘাত করা হয়। আর ইসলামের আদর্শ হলো, মুসলিমদের মাঝে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করা। কে গোলাম আর কে আজাদ বা স্বাধীন, তা ইসলাম কখনোই বিবেচনা করে না, মুসলিম হিসেবে সবাই ভাই ভাই। কেউ কারো পর নয়। ইসলামে কারোর ওপর কারো কোনো প্রাধান্য নেই একমাত্র প্রাধান্য হলো, তাকওয়ার ভিত্তিতে। সুতরাং একজন উচ্চ বংশের লোক তার মধ্যে যদি তাকওয়া না থাকে, তা হলে তার উচ্চ বংশীয় মর্যাদা কোনো কাজে আসবে না। আর একজন লোক সে নিম্ন বংশের, কিন্তু তার মধ্যে তাকওয়া আছে, তাহলে সে তার তাকওয়ার কারণে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ﴾ [الحجرات: 13]

"হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত"। [**সূরা** আল-হুজরাত, আয়াত: ১৩][10]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنّكَ امرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ»

"তোমার মধ্যে এমন একটি স্বভাব রয়ে গেছে, যা জাহেলি যুগে তোমাদের মধ্যে ছিল।" এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, আবু যর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এ

---

[10] ফাতহুল বারী ৪৬৮/১০।

ধরনের ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার কারণ হলো, তিনি বিষয়টি যে, হারাম করা হয়েছে, তা এখনও জানতেন না। অন্যথায় তার মো একজন বিশিষ্ট সাহাবী থেকে এ ধরণের একটি অনৈতিক কাজ প্রকাশ পাওয়ার কোনো অবকাশ দেখি না। তিনি বিষয়টি জানতেন না বলেই জাহিলি যুগের এ স্বভাবটি এখনো পর্যন্ত তার কাছে অবশিষ্ট ছিল। এ কারণেই তিনি বলেন,

قلت :على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال :نَعَمْ

“বুড়ো হয়ে যাওয়ার পরও| তার কাছে বিষয়টি জানা না থাকায় সে আশ্চর্য বোধ করল। তারপর তাকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, কাজটি শরী‘আতের বিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ অবৈধ।”[11]

[11] ফাতহুল বারী ৮৭/১।

যে সব অহংকারীকে তার অহংকার হকের অনুকরণ হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, তাদের দৃষ্টান্ত

এক- ইবলিস:

অভিশপ্ত ইবলিসের কুফুরী করা ও আল্লাহর আদেশের অবাধ্য হওয়ার একমাত্র কারণ, তার অহংকার।

আল্লাহ তা'আলা তার বর্ণনা দিয়ে বলেন,

﴿إِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي خَٰلِقُۢ بَشَرٗا مِّن طِينٖ ٧١ فَإِذَا سَوَّيۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ٧٢ فَسَجَدَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمۡ أَجۡمَعُونَ ٧٣ إِلَّآ إِبۡلِيسَ ٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٧٤ قَالَ يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ أَسۡتَكۡبَرۡتَ أَمۡ كُنتَ مِنَ ٱلۡعَالِينَ ٧٥ قَالَ أَنَا۠ خَيۡرٞ مِّنۡهُ خَلَقۡتَنِي مِن نَّارٖ وَخَلَقۡتَهُۥ مِن طِينٖ ٧٦ قَالَ فَٱخۡرُجۡ مِنۡهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٞ ٧٧ وَإِنَّ عَلَيۡكَ لَعۡنَتِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٧٨ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرۡنِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ ٧٩ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلۡمُنظَرِينَ ٨٠ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡوَقۡتِ ٱلۡمَعۡلُومِ ٨١ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغۡوِيَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ ٨٢ إِلَّا عِبَادَكَ مِنۡهُمُ ٱلۡمُخۡلَصِينَ ٨٣ قَالَ فَٱلۡحَقُّ وَٱلۡحَقَّ أَقُولُ ٨٤ لَأَمۡلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ

﴿وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنۡهُمۡ أَجۡمَعِينَ ٨٥ قُلۡ مَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُتَكَلِّفِينَ ٨٦ إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٌ لِّلۡعَٰلَمِينَ﴾ [سورة ص: 28]

“তিনি বললেন, ‘স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফিরিশতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ‘আমি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তার মধ্যে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে যাও| ফলে ফিরিশতাগণ সকলেই সিজদাবনত হলো| **ইবলীস ছাড়া**, সে অহঙ্কার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। আল্লাহ বললেন, ‘হে ইবলীস, আমার দু’হাতে আমি যাকে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সাজদাবনত থেকে কিসে তোমাকে বাধা দিল? তুমি কি অহঙ্কার করলে, না তুমি অধিকতর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? সে বলল, ‘আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নি থেকে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। তিনি বললেন, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। কেননা নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত। আর নিশ্চয় বিচার দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি আমার

লা'নত বলবৎ থাকবে। সে বলল, 'হে আমার রব, আমাকে সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে।' তিনি বললেন, আচ্ছা তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে- 'নির্ধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।' সে বলল, 'আপনার ইজ্জতের কসম! আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করে ছাড়ব।' তাদের মধ্য থেকে আপনার একনিষ্ঠ বান্দারা ছাড়া। আল্লাহ বললেন, 'এটি সত্য আর সত্য-ই আমি বলি', তোমাকে দিয়ে এবং তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করত তাদের দিয়ে নিশ্চয় আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব।' বল, 'এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না আর আমি ভানকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। সৃষ্টিকুলের জন্য এ তো উপদেশ ছাড়া আর কিছু নয়"। [**সূরা সাদ**, আয়াত: ৭১-৮৭]

দুই: ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা:

অনুরূপভাবে ফিরআউনের কুফুরী করার কারণ ছিল, তার অহংকার। আল্লাহ তা'আলা তার বর্ণনা দিয়ে বলেন,

﴿ وَقَالَ فِرۡعَوۡنُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمَلَأُ مَا عَلِمۡتُ لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرِي فَأَوۡقِدۡ لِي يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجۡعَل لِّي صَرۡحٗا لَّعَلِّيٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٣٨ وَٱسۡتَكۡبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمۡ إِلَيۡنَا لَا يُرۡجَعُونَ ٣٩ فَأَخَذۡنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡيَمِّۖ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلظَّٰلِمِينَ ٤٠ وَجَعَلۡنَٰهُمۡ أَئِمَّةٗ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ ٤١ وَأَتۡبَعۡنَٰهُمۡ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنۡيَا لَعۡنَةٗۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ هُم مِّنَ ٱلۡمَقۡبُوحِينَ ﴾ [القصص: 38- 42]

“আর ফির‘আউন বলল, ‘হে পারিষদবর্গ, আমি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ আছে বলে আমি জানি না। অতএব, হে হামান, আমার জন্য তুমি ইট পোড়াও, তারপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরী কর। যাতে আমি মূসার ইলাহকে দেখতে পাই। আর নিশ্চয় আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত’। আর ফির‘আউন ও তার সেনাবাহিনী অন্যায়ভাবে যমীনে অহঙ্কার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না। অতঃপর আমরা তাকে ও তার

সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম, তারপর তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব, দেখ যালিমদের পরিণাম কীরূপ হয়েছিল? আর আমরা তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম, তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। এ যমীনে আমি তাদের পিছনে অভিসম্পাত লাগিয়ে দিয়েছি আর কয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিতদের অন্তর্ভুক্ত”। [**সূরা কাসাস**, আয়াত: ৩৮-৪২]

তিন: সালেহ 'আলাইহিস সালামের কাওম, সামুদ গোত্র:

সামুদ গোত্রের কুফুরীর কারণও একই। অর্থাৎ তাদের অহংকার। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالَ ٱلۡمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوۡمِهِۦ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِمَنۡ ءَامَنَ مِنۡهُمۡ أَتَعۡلَمُونَ أَنَّ صَٰلِحٗا مُّرۡسَلٞ مِّن رَّبِّهِۦۚ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرۡسِلَ بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ ٧٥ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ إِنَّا بِٱلَّذِيٓ ءَامَنتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ﴾ [الأعراف: 75، 76]

“তার কাওমের অহঙ্কারী নেতৃবৃন্দ তাদের সেই মুমিনদেরকে বলল যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত,

‘তোমরা কি জান যে, সালিহ তার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত’? তারা বলল, ‘নিশ্চয় সে যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তাতে বিশ্বাসী’। যারা অহংকার করেছিল তারা বলল, ‘নিশ্চয় তোমরা যার প্রতি ঈমান এনেছ, আমরা তার প্রতি অস্বীকারকারী’’। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৭৫-৭৬]

চার: হূদ ‘আলাইহিস সালামের কাওম আদ সম্প্রদায়:

﴿فَأَمَّا عَادٌ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَقَالُواْ مَنۡ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةًۖ أَوَ لَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمۡ هُوَ أَشَدُّ مِنۡهُمۡ قُوَّةٗۖ وَكَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَجۡحَدُونَ ١٥ فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ رِيحٗا صَرۡصَرٗا فِيٓ أَيَّامٖ نَّحِسَاتٖ لِّنُذِيقَهُمۡ عَذَابَ ٱلۡخِزۡيِ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَعَذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أَخۡزَىٰۖ وَهُمۡ لَا يُنصَرُونَ﴾ [فصلت: 15، 16]

“আর ‘আদ সম্প্রদায়, তারা যমীনে অযথা অহঙ্কার করত এবং বলত, ‘আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী কে আছে’? তবে কি তারা লক্ষ্য করে নি যে, নিশ্চয় আল্লাহ যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদের চেয়ে অধিক

শক্তিশালী? আর তারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করত।

তারপর আমরা তাদের ওপর অশুভ দিনগুলোতে ঝঞ্ঝাবায়ু পাঠালাম যাতে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব আস্বাদন করাতে পারি। আর আখিরাতের আযাব তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।" [সূরা ফুসসলিাত, আয়াত: ১৫-১৬]

পাঁচ: শুয়াইব 'আলাইহিস সালামের কাওম মাদায়েনের অধিবাসী:

আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন,

﴿قَالَ ٱلۡمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوۡمِهِۦ لَنُخۡرِجَنَّكَ يَٰشُعَيۡبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرۡيَتِنَآ أَوۡ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاۚ قَالَ أَوَلَوۡ كُنَّا كَٰرِهِينَ﴾ [الأعراف: 88]

"তার কাওম থেকে যে নেতৃবৃন্দ অহঙ্কার করেছিল তারা বলল, 'হে শু'আইব, আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে

যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে।’ সে বলল, ‘যদিও আমরা অপছন্দ করি তবুও?’ [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৮৮]

ছয়: নূহ ‘আলাইহিস সালামের কাওম:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيٓ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓاْ أَصَٰبِعَهُمْ فِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْاْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ۞ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۞ ثُمَّ إِنِّيٓ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾ [نوح: 5- 9]

“সে বলল, ‘হে আমার রব! আমি তো আমার কাওমকে রাত-দিন আহবান করেছি। ‘অতঃপর আমার আহ্বান কেবল তাদের পলায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে’। ‘আর যখনই আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি ‘যেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন’, তারা নিজদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, নিজদেরকে পোশাকে আবৃত করেছে, (অবাধ্যতায়) অনড় থেকেছে এবং দম্ভভরে ঔদ্ধত্য প্রকাশ

করেছে’। ‘তারপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহবান করেছি’। অতঃপর তাদেরকে আমি প্রকাশ্যে এবং অতি গোপনেও আহ্বান করেছি।” [সূরা নূহ, আয়াত: ৫-৯]

সাত. বনী ইসরাঈল:

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ بِٱلرُّسُلِ ۖ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: 87- 88]

“আর আমরা নিশ্চয় মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে একের পর এক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং মারইয়াম পুত্র ঈসাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ। আর তাকে শক্তিশালী করেছি ‘পবিত্র আত্মা’র মাধ্যমে। তবে কি তোমাদের নিকট যখনই কোনো রাসূল এমন কিছু নিয়ে এসেছে, যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখন তোমরা অহঙ্কার করেছ, অতঃপর (নবীদের) একদলকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ আর একদলকে হত্যা করেছ। আর

তারা বলল, আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত; বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন। অতঃপর তারা খুব কমই ঈমান আনে। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৮৭-৮৮]

আট. আরবের মুশরিকরা:

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمۡ لَيَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشُونَ فِي ٱلۡأَسۡوَاقِۗ وَجَعَلۡنَا بَعۡضَكُمۡ لِبَعۡضٖ فِتۡنَةً أَتَصۡبِرُونَۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرٗا ۝٢٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرۡجُونَ لِقَآءَنَا لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيۡنَا ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ أَوۡ نَرَىٰ رَبَّنَاۗ لَقَدِ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ وَعَتَوۡ عُتُوّٗا كَبِيرٗا﴾ [الفرقان: 20، 21]

“আর তোমার পূর্বে যত নবী আমরা পাঠিয়েছি, তারা সবাই আহার করত এবং হাট-বাজারে চলাফেরা করত। আমি তোমাদের একজনকে অপরজনের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে? আর তোমার রব সর্বদ্রষ্টা। আর যারা আমার সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করে না, তারা বলে, ‘আমাদের নিকট ফিরিশতা নাযিল হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাই

না কেন’? অবশ্যই তারা তো তাদের অন্তরে অহঙ্কার পোষণ করেছে এবং তারা গুরুতর সীমালংঘন করেছে।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২০-২১]

মানব জীবনে অহংকারের প্রভাব

একটি কথা মনে রাখতে হবে, অহংকারের পরিণতি মানবজাতির জন্য খুবই খারাপ ও করুণ। নিম্নে অহংকারের কয়েকটি পরিণতি আলোচনা করা হলো।

এক. আল্লাহর ওপর ঈমান আনা, তার ইবাদত করা হতে বিরত থাকা:

﴿لَّن يَسۡتَنكِفَ ٱلۡمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبۡدٗا لِّلَّهِ وَلَا ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ ٱلۡمُقَرَّبُونَۚ وَمَن يَسۡتَنكِفۡ عَنۡ عِبَادَتِهِۦ وَيَسۡتَكۡبِرۡ فَسَيَحۡشُرُهُمۡ إِلَيۡهِ جَمِيعٗا ١٧٢ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمۡ أُجُورَهُمۡ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضۡلِهِۦۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡتَنكَفُواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا﴾ [النساء: 173-173]

“মাসীহ কখনো আল্লাহর বান্দা হতে (নিজকে) হেয় মনে করে না এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতারাও না আর যারা তাঁর ইবাদাতকে হেয় জ্ঞান করে এবং অহঙ্কার করে, তবে অচিরেই আল্লাহ তাদের সবাইকে তাঁর নিকট

সমবেত করবেন। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তিনি তাদেরকে তাদের পুরস্কার পরিপূর্ণ দেবেন এবং তাঁর অনুগ্রহে তাদেরকে বাড়িয়ে দেবেন। আর যারা হেয় জ্ঞান করেছে এবং অহঙ্কার করেছে, তিনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তারা তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৭২-১৭৩]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنۡهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمۡ أَبۡوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلۡجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلۡخِيَاطِۚ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُجۡرِمِينَ ۝٤٠ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٞ وَمِن فَوۡقِهِمۡ غَوَاشٖۚ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [الأعراف: 40-41]

“নিশ্চয় যারা আমাদের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তার ব্যাপারে অহঙ্কার করেছে, তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না উট সূঁচের ছিদ্রতে প্রবেশ

করে। আর এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে প্রতিদান দেই। তাদের জন্য থাকবে জাহান্নামের বিছানা এবং তাদের উপরে থাকবে (আগুনের) আচ্ছাদন। আর এভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিদান দেই।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৪০-৪১]

দুই. অহংকারের পরিণতির মুখোমুখি হওয়া:

লোকমান হাকিম তার ছেলেকে যে নসীহত করে, তা থেকে তুমি অহংকারের পরিণতি কি তা জানতে পারবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًاۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٖ فَخُورٖ﴾ [لقمان : 18]

““আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না’। [সূরা লোকমান, আয়াত: ১৮]

وتصعير الخد للناس এ কথাটির অর্থ হলো, অহংকার করে মানুষের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। আর والمشي في الأرض অর্থ হলো যমীনে অহংকার করে হাঁটা, বুক ফুলিয়ে হাটা।

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٖ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কোনো দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করে না।" অর্থাৎ যারা মানুষের ওপর বড়াই করে তাদের সাথে অহংকার ও গরিমা দেখায়, তাদের আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করে না।

فَخُورٖ অর্থাৎ শক্তির বড়াই, জ্ঞানের বড়াই, ধন-সম্পদের বড়াই ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা যমিনে বুক ফুলিয়ে হাঁটা ও অহংকার করে চলাচল করা হতে সম্পূর্ণ নিষেধ করেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে করীমে এরশাদ করে বলেন,

﴿وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ إِنَّكَ لَن تَخۡرِقَ ٱلۡأَرۡضَ وَلَن تَبۡلُغَ ٱلۡجِبَالَ طُولٗا﴾ [الإسراء: 37]

“আর যমীনে বড়াই করে চলো না; তুমি তো কখনো যমিনকে ফাটল ধরাতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড় সমান পৌঁছতে পারবে না।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩৭]

অহংকারীদের অভ্যাস হলো, যমিনে অহংকার ও বুক ফুলিয়ে হাটা। পক্ষান্তরে মুমিনদের গুণ হলো, তারা যমিনে বিনয়ের সাথে হাটে। তারা লোক দেখানোর জন্য রাস্তায় বের হয় না। তারা তাদের জরুরি প্রয়োজনে রাস্তায় বের হয়, মানুষকে ছোট মনে করে না এবং ঘৃণার চোখে দেখে না। আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের গুণের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا ٦٣ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمۡ سُجَّدٗا وَقِيَٰمٗا ٦٤ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ٦٥﴾ [الفرقان: 63-65]

“আর রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদেরকে

সম্বোধন করে তখন তারা বলে ‘সালাম’। আর যারা তাদের রবের জন্য সিজদারত ও দণ্ডায়মান হয়ে রাত্রি যাপন করে। আর যারা বলে, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয় এর আযাব হলো অবিচ্ছিন্ন”। [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৬৩-৬৫]

আমাদের সলফগণ যখন ঘর থেকে বের হতেন, তারা তাদের হাঁটার পথে নিজেদের খুব হেফাযতে ও সংকোচিত করতেন এবং বিনয়ের সাথে হাঁটতেন। খালেদ ইবন মেদান রহ. বর্ণনা করেন, আমর ইবন আসওয়াদ আল-আনাসি যখন মসজিদ থেকে বের হতেন, তখন তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাতকে চেপে ধরতেন। তাকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, আমি আশংকা করি, আমার হাত আমার সাথে বেঈমানি করবে!।[12]

---

[12] সীয়ারু আলামীন নুবালা ৮০/৪।

আল্লামা হাফেয যাহবী রহ. বলেন, তিনি হাঁটার সময় হাত নড়াচড়া করা ও দোলানোর আশংকায় হাত-দ্বয় জোড়া করে রাখতেন। কারণ, হাত দোলানো অহংকারের অন্তর্ভুক্ত।

আলী ইবন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন হাঁটতেন, তার হাত-দ্বয় তার উরু অতিক্রম করত না এবং সে হাত নড়াচড়া করত না।[13]

তিন. কাপড় ঘোরালির নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করা ও যমিনে তা ছেঁচানো:

অহংকারীদের অভ্যাস হলো, তারা তাদের কাপড় ঘোরালির নিচে পরিধান করে মাটির সাথে ছেঁচাতে থাকে। রাসূল সা. এ থেকে নিষেধ করেন।

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا يَنظُر الله إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ»

---

[13] সীয়ারু আলামীন নুবালা ৩৯৬/৪ তারিখে দেমেশক ৪১৭/৪৫।

“আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাবে না, যে অহংকার করে তার কাপড়কে ঝুলিয়ে পরিধান করে।

ইমাম নববী রহ. বলেন, والكبر، والبطر، والمخيلة، الخيلاء، والزهو،

والتبختر، সব কটি শব্দের অর্থ একই, অর্থাৎ অহংকার। আর অহংকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম।

خالَ الرجل واختالَ اختيالاً

যখন কোনো লোক অহংকার করে, তখন এ কথাটি বলা হয়।

যাবের ইবন সুলাইম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«قَلت : يا رسول الله، اعهد إلي قال : لَا تَسُبَّنَّ أَحدًا قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة، قال: وَلَا تَحقِرَنَّ شَيْئًا مِنْ المَعْرُوفِ، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلِيهِ وَجْهُكَ، إِنَّ ذَلكَ مِنْ المَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نصِف السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ

فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَاكَ وَإِسبالَ الْإِزَارِ فَإِنَّها مِنْ المَخِيلَة، وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ المَخِيلَةَ، وَإِنْ امْرُؤٌ شَتمَكَ وَعَيَّرَك بِمَا يَعْلَم فِيكَ، فَلَا تَعيَّرُه بِما تَعْلَمُ فِيهِ؛ فَإِنَمَا وَبَالُ ذَلكَ عَلَيْهِ»

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি কি কাজ করবো না সে বিষয়ে আমার থেকে আপনি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন,। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি কাউকে গালি দিবে না। তিনি বলেন, তারপর থেকে আমি কোনো স্বাধীন, গোলাম, উট ও বকরীকে গাল দেইনি। আর কোনো ভাল কাজকে তুমি কখনোই ছোট মনে করবে না। তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে কথা বলবে। মনে রাখবে, এটি অবশ্যই একটি ভালো কাজ। আর তুমি তোমার পরিধেয়কে অর্ধ নলা পর্যন্ত উঠাও, যদি তা সম্ভব না হয়, তবে গোড়ালি পর্যন্ত। পরিধেয়কে গোড়ালির নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করা হতে বিরত থাক। কারণ, তা অহংকার। আর আল্লাহ তা'আলা অহংকারকে পছন্দ করে না। যদি কোনো ব্যক্তি তোমাকে গাল দেয় বা তোমার মধ্যে আছে, এমন কোনো দোষ জেনে, তোমাকে অনর্থক দোষারোপ করে বা

তোমাকে লজ্জা দেয়, তুমি তার মধ্যে বিদ্যমান এমন কোনো দোষ জেনে, তাকে দোষারোপ করবে না ও লজ্জা দেবে না। কারণ, তার কর্মের পরিণাম তার ওপরই বর্তাবে।

বর্তমান যুগে ঝুলিয়ে পরিধান করা ছাড়াও পোশাকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন ও পদ্ধতি আছে যা অহংকারকে প্রমাণ করে। অনেকে আছে অহংকার করে খুব পাতলা কাপড় পরিধান করে। আবার কেউ কেউ আছে খুব মূল্যবান কাপড় পরিধান করে, যাতে লোকেরা বলে লোকটি দামি কাপড় পরিধান করছে।

চার. অহংকারীর সম্মানে ছুটাছুটি করা ও দাঁড়িয়ে সম্মান করাকে পছন্দ করা।

আবি মিজলায রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية لابن عامر اجلس فإني سمعت رسول الله

صلى الله عليه و سلم يقول: « مَنْ أَحبَّ أَنْ يَتَمَثَّل لهُ الرِّجالُ قِيَاًما فلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَه مِن النَّارِ»

"মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর ও আব্দুল্লাহ ইবন আমের রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর দরবারে উপস্থিত হলে, আব্দুল্লাহ ইবন আমের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার সম্মানে দাঁড়াল, আর আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বসেছিল, সে দাঁড়ায়নি। মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ইবন আমেরকে বলল, তুমি বস! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পছন্দ করে, লোকেরা তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান করুক, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।"[14]

পাঁচ. অতিরিক্ত কথা বলা:

যাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[14] আবু দাউদ ৫৬৬৯, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেন।

: « إن مِن أَحبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُم مِنِّي مَجْلسًا يَوْم الْقِيَامِة أَحَاسِنكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضُكمْ إلي وَأَبعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلسًا يَوْم الْقِيَامِة الثَّرْثارُونَ وَالمتُشَدِّقُونَ وَالمتُفَيهْقُونَ قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المُتَكَبِّرُونَ»

"কিয়ামত দিবসে আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি এবং মজলিশের দিক দিয়ে আমার সর্বাধিক কাছের লোক সে হবে, তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র খুব সুন্দর। আর কিয়ামত দিবসে তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত ব্যক্তি, মজলিশের দিক দিয়ে আমার থেকে সর্বাধিক দুরের লোক, যে ইচ্ছা করে বেশি কথা বলে, কথার মাধ্যমে মানুষের ওপর অহংকার করে এবং যে ব্যক্তি দীর্ঘ কথা বলে অন্যের ওপর নিজের ফযিলত বর্ণনা করে।

ছয়, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, চোগলখোরি ও নাম পরিবর্তন করা:

অহংকারী নিজেকে অনেক বড় করে দেখে, ফলে সে মানুষকে ঘৃণা করে তাদের উপহাস করে এবং তিরস্কার করে।

সাত, গীবত করা:

অহংকারী এ কথা প্রকাশ করতে চায় যে, নিশ্চয় সে অন্যদের তুলনায় অধিক সম্মানী। আর গীবত, অন্যদের দোষ প্রকাশ ও তাদের দুর্বলতা বর্ণনা করাকে, সে তার বড়ত্ব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে।

আট, গরীব, মিসকিন, অসহায় ও দুর্বল লোকদের সাথে উঠা বসা করা হতে বিরত থাকা:

একজন অহংকারী যাকে ধন-সম্পদ, বংশ মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থানের দিক দিয়ে তার থেকে দুর্বল মনে করে, তার সাথে উঠবস করাকে ঘৃণার চোখে দেখে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে অনেক মুশরিকদের ইসলামে প্রবেশ না করার কারণও এটি ছিল, তারা যখন দেখত যে, অনেক লোক যারা ইসলামে প্রবেশ করেছে, তারা ধন-সম্পদ, বংশ মর্যাদা ও সামাজিক

অবস্থানের দিক দিয়ে তাদের থেকে দুর্বল, তারা যদি ইসলামে প্রবেশ করে তাদেরও তাদের সাথে উঠবস করতে হবে, এ আশংকায় তারা ইসলামে প্রবেশ হতে বিরত থাকে।

সায়াদ ইবন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه و سلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه و سلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل» ﴿وَلَا تَطۡرُدِ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥۖ مَا عَلَيۡكَ مِنۡ حِسَابِهِم مِّن شَيۡءٖ وَمَا مِنۡ حِسَابِكَ عَلَيۡهِم مِّن شَيۡءٖ فَتَطۡرُدَهُمۡ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [الأنعام: ٥٢]

"আমরা ছয় ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিশে উপস্থিত ছিলাম, তখন মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, তাদেরকে দূরে সরিয়ে দাও, যাতে তারা আমাদের ওপর প্রাধান্য

বিস্তার না করে। তাদের কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তরে যা জাগার জন্য আল্লাহ চাইল, তা জাগল এবং তিনি নমনীয় হলেন। তারপর সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন,

﴿وَلَا تَطۡرُدِ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥۖ مَا عَلَيۡكَ مِنۡ حِسَابِهِم مِّن شَيۡءٖ وَمَا مِنۡ حِسَابِكَ عَلَيۡهِم مِّن شَيۡءٖ فَتَطۡرُدَهُمۡ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [الأنعام: ٥٢]

"আর তুমি তাড়িয়ে দিও না তাদেরকে, যারা নিজ রবকে সকাল সন্ধ্যায় ডাকে, তারা তার সন্তুষ্টি চায়। তাদের কোনো হিসাব তোমার ওপর নেই এবং তোমার কোনো হিসাব তাদের ওপর নেই যে, তুমি তাদেরকে তাড়িয়ে দিবে, এরূপ করলে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে"। [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৫২]

আল্লাহ তা'আলার উল্লিখিত বাণী সম্পর্কে খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, একদিন আকরা ইবন হাবেস আত-তামীমি ও উয়াইনা ইবন হিসন আল ফাযারী উভয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে

দেখেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দরবারে উপস্থিত ছিল, সুহাইব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বিলাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু। **তাদের ছাড়াও** আরও কতক দুর্বল মুমিনদের নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিল। তারা যখন তাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে দেখল, তাদের অপছন্দ করল, তারপর তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে, একান্তে বলল, আমরা চাই তুমি আমাদের বিশেষ একটি মজলিশ নির্ধারণ করবে, যাতে আরবরা আমাদের বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে জানতে পারবে। কারণ, আমরা আরবরা যখন তোমার নিকট উপস্থিত হই, তখন আরবরা আমাদেরকে এসব গোলাম ও নিকৃষ্ট লোকদের সাথে দেখাকে আমরা আমাদের জন্য অপমান বোধ করছি। আমরা যখন উপস্থিত হই, তখন তাদেরকে তোমার দরবার থেকে দুরে সরিয়ে দিবে। আর যখন আমরা তোমার সাথে আলোচনা শেষ করব, তখন তুমি ইচ্ছা করলে তাদের সাথে বসবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন

করলেন এবং বললেন, হাঁ। তখন তারা বলল, ঠিক আছে তাহলে এ বিষয়ের ওপর একটি চুক্তি সাক্ষরিত হোক, বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাগজ কলম নিয়ে আসার জন্য বলেন এবং চুক্তি লিপিবদ্ধ করার জন্য আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে ডেকে পাঠালেন, আমরা সবাই এক কোনে বসা ছিলাম, তারপর জিবরীল 'আলাইহিস সালাম যমীনে এসে এ আয়াত নাযিল করেন:

﴿وَلَا تَطۡرُدِ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥۖ مَا عَلَيۡكَ مِنۡ حِسَابِهِم مِّن شَيۡءٖ وَمَا مِنۡ حِسَابِكَ عَلَيۡهِم مِّن شَيۡءٖ فَتَطۡرُدَهُمۡ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [الأنعام: 52]

তারপর আকরা ইবন হাবেস ও উয়াইনাহ ইবন হিসনের আলোচনা করে বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لِّيَقُولُوٓاْ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنۢ بَيۡنِنَآۗ أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِأَعۡلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ﴾ [الأنعام:53]

“আর এভাবেই আমরা একককে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা বলে, ‘এরাই কি, আমাদের মধ্য থেকে যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞাত নয়? [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৫৩] তারপর আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِـَٔايَٰتِنَا فَقُلۡ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡۖ كَتَبَ رَبُّكُمۡ عَلَىٰ نَفۡسِهِ ٱلرَّحۡمَةَ أَنَّهُۥ مَنۡ عَمِلَ مِنكُمۡ سُوٓءَۢا بِجَهَٰلَةٖ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعۡدِهِۦ وَأَصۡلَحَ فَأَنَّهُۥ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥٤﴾ [الأنعام: 54]

“আর যারা আমাদের আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে, তারা যখন তোমার কাছে আসে, তখন তুমি বল, ‘তোমাদের ওপর সালাম’। তোমাদের রব তাঁর নিজের ওপর লিখে নিয়েছেন দয়া। নিশ্চয় যে তোমাদের মধ্য থেকে না জেনে খারাপ কাজ করে তারপর তাওবা করে এবং শুধরে নেয়, তবে তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৫৪] তিনি বলেন, তারপর আমরা তার একে বারে কাছাকাছি গেলাম এমনকি আমাদের হাঁটু তার হাঁটুর ওপর রাখলাম এ অবস্থায়

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে বসে থাকতো। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উঠতে চাইত, আমরা তাকে ছেড়ে দিতাম। তারপর আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন,

﴿وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥۖ وَلَا تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَا تُطِعۡ مَنۡ أَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذِكۡرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمۡرُهُۥ فُرُطٗا ٢٨﴾ [الكهف:28]

“আর তুমি নিজকে ধৈর্যশীল রাখ তাদের সাথে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশে এবং দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে। তোমার দু’চোখ যেন তাদের থেকে ঘুরে না যায়। আর ওই ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমরা আমাদের যিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে।” সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ২৮]

খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসে থাকতাম। আর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিশ থেকে উঠার সময় হত, তখন আমরা উঠে যেতাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে দিতাম, যাতে তিনি উঠতে পারেন।

নয়. নিকৃষ্ট ও দোষণীয় কাজের ওপর অটুট থাকা:

অহংকারী কখনো তার নিজের সংশোধন ও তার দোষের চিকিৎসা বিষয়ে চিন্তা করে না, কারণ, সে মনে করে তার চেয়ে নির্দোষ, নিরপরাধ ও কামেল ব্যক্তি আর কেউ হতেই পারে না এবং সে পরিপূর্ণ ও কামিল ব্যক্তি। ফলে তার মধ্যে কোনো দোষ থাকতে পারে, তা কখনো সে চিন্তাও করে না এবং কারো কোনো উপদেশ সে শুনে না। যার ফলে সে তার অহংকারের মধ্যে আজীবন পড়ে থাকে। তাকে দোষণীয় গুণ ও কু-অভ্যাস নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু এসে যায় এবং তার হায়াত শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুক!

অবশেষে তার অবস্থা তাদের মতো হয়, যাদের বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ هَلۡ نُنَبِّئُكُم بِٱلۡأَخۡسَرِينَ أَعۡمَٰلًا ١٠٣ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا ١٠٤﴾ [الكهف: 104-103]

“বল, ‘আমরা কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাব, যারা আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত’? দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে করছে যে, তারা ভাল কাজই করছে’! [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ১০৩-১০৪]

দশ. কারো উপদেশ গ্রহণ না করা:

অহংকারী ব্যক্তি কখনো কারো উপদেশ গ্রহণ করে না। সে মনে করে আমিতো কামিল ব্যক্তি আমার থেকে বড় আর কে হতে পারে? যে আমাকে উপদেশ দিবে। এছাড়াও সে কিভাবে মানুষের উপদেশ গ্রহণ করবে? সে নিজেই মানুষকে উপদেশ দিয়ে বেড়ায়। এ ধরনের অহংকারীদের বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتۡهُ ٱلۡعِزَّةُ بِٱلۡإِثۡمِۚ فَحَسۡبُهُۥ جَهَنَّمُۖ وَلَبِئۡسَ ٱلۡمِهَادُ ٢٠٦﴾ [البقرة: 206]

"আর যখন তাকে বলা হয়, 'আল্লাহকে ভয় কর' তখন আত্মাভিমান তাকে পাপ করতে উৎসাহ দেয়। সুতরাং জাহান্নাম তার জন্য যথেষ্ট এবং তা কতই না মন্দ ঠিকানা।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০৬]

এগার. জ্ঞান অর্জন না করা:

অহংকারী ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন হতে বঞ্চিত হয়। সে তার অহংকারের কারণে পড়া লেখা করতে পারে না। সে মনে করে আমিতো সব জানি তাহলে আমাকে আবার পড়তে হবে কেন?

আল্লামা মুজাহিদ বলেন, অহংকারী ও লজ্জিত লোক কখনোই জ্ঞান অর্জন করতে পারে না।[15] একজন

[15] বুখারী সংক্ষিপ্ত সনদে কথাটি বর্ণনা করেন। পরিচ্ছেদ: ইলম অর্জনে লজ্জা, আর আবু নয়াই হুলিয়াতে ২৮৭/৩ বর্ণনা করেন, আল্লামা ইবনে হাজর ফতহুল বারীতে [২২৯/১] বলেন, মুজাহিদের এ কথাটি আলী ইবন আল-

অহংকারীকে তার অহংকার সব সময় তাকে বড় করে ও সে সবার ঊর্ধ্বে দেখায়। ফলে সে অন্যের নিকট থেকে কোনো ইলম, জ্ঞান, হিকমত, অভিজ্ঞতা ও টেকনিক শিখতে রাজি না। তাই আজীবন সে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, মূর্খ ও জাহিল হয়েই বেঁচে থাকে।

বার. অহংকারীর সাথে সাক্ষাত হলে, সে সালাম দেয় না।

আর যখন কেউ তাকে সালাম দেয় তখন চিন্তা করে, সে অনেক বড় হয়ে গেছে। কারো জন্য নত হয় না, তার মত কোনো লোকই হয় না। তার ওপর কারো কোনো অধিকার বা পাওনা নেই, সেই শুধু মানুষের নিকট পায়। মানুষ তার কাছে কৃতজ্ঞ সে কারো কাছে কৃতজ্ঞ নয়। কাউকে সে তার চেয়ে উত্তম মনে করে না, বরং সেই সবার থেকে উত্তম। এ ধরনের ধ্যান ধারণার ফলে সে প্রতিদিনই আল্লাহর রহমত থেকে দুরে সরতে থাকে।

মাদীনের সনদে আবু নুয়াইমের নিকট পোছে। তিনি ইবন উয়াইনা থেকে আর তিনি মানছুর থেকে বর্ণনা করেন। মুসান্নিফের শর্তানুযায়ী সনদটি বিশুদ্ধ।

আর মানুষের নিকট ঘৃণার পাত্র ও নিকৃষ্ট মানুষ বলে গণ্য হয়।[16]

তের. হাঁটার সময় যদি তার সাথে অন্য কেউ থাকে, তাকে তার পিছনে হাটতে পছন্দ করা:

হাঁটার সময় তার সামনে কেউ হাঁটুক তা সে পছন্দ করে না। নিজেই আগে আগে হাঁটতে পছন্দ করে। আর কোনো মজলিশে উপস্থিত হলে অহংকারী সব সময় মজলিশের সামনে বসতে পছন্দ করে। সবার পরে এসে সামনে চলে যায়, পিছনে বসে না। মানুষের মধ্যে সুনাম সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধটা অর্জন করতে পছন্দ করে| কিন্তু একজন বিনয়ী কখনোই এ গুলো পছন্দ করে না। সে এসব থেকে পলায়ন করে।

আমের ইবন সায়াদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[16] আর-রুহ ২৩৬।

«كان سعد بن أبي وقاص في إبله فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال :أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل .فقال له :أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم فضرب سعد في صدره، فقال: اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقولُ إِنَّ اللّٰه يُحِبِّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيّ الْخَفِيَّ»

“একদা সায়াদ ইবন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু স্বীয় উটে সাওয়ার ছিল, তাকে দেখে তার ছেলে উমার সামনে অগ্রসর হলো। সায়াদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাকে দেখে বলল, এ আরোহণকারীর অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তারপর সে নিচে অবতরণ করলে তাকে বলা হলো, তুমি তোমার উট ও ছাগল নিয়ে ব্যস্ত হলে, অথচ লোকেরা পরস্পর বাদশাহকে নিয়ে বিবাদ করছে। এ কথা শোনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার বাহুতে আঘাত করে বলল, তুমি চুপ কর! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা‘আলা নিরুত্তাপ, মুত্তাকী, গণিকে অধিক পছন্দ করেন।

ইমাম নববী রহ. বলেন, হাদীসে 'গিনা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নফসের গিনা। অন্তরের দিক দিয়ে যে গণি সেই হলো, আল্লাহর প্রিয় গণি বান্দা। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সত্যিকার গেনা হলো, নফসের গেনা।[17] আর এখানে নিরুত্তাপ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে লোক দুনিয়ার ঝামেলা বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকে এবং ব্যক্তিগত কাজেই মনোযোগী হয়।[18]

---

[17] মুসলিম ২৯৬৫

[18] ইমাম নববীর মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যা ১০০/১৮

অহংকারীর শাস্তি

একজন অহংকারীকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই শাস্তি দেবেন। আল্লাহ তা'আলা তার শাস্তি দুনিয়াতেও দেবেন এবং আখেরাতেও দেবেন।

দুনিয়াতে অহংকারীর শাস্তি:

১. একজন অহংকারীকে তার চাহিদার বিপরীত দান করার মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হয়। যেমন, সে মানুষের নিকট চায় সম্মান কিন্তু মানুষ তাকে বিপরীতটি উপহার দেয়, অর্থাৎ ঘৃণা করে।

অহংকারীকে লোকেরা নিকৃষ্ট মানুষ মনে করে এবং ঘৃণা করে। এটি হলো, একজন অহংকারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ শাস্তি। দুনিয়ার চিরন্তন নিয়মই হলো, অহংকারীকে কেউ ভালো চোখে দেখে না, সবাই তাকে ঘৃণা করে। আর যে ব্যক্তি অহংকার করে, নিজেকে বড় মনে করে আল্লাহ তা'আলা তাকে ছোট করে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে। আর যে ব্যক্তি

হকের বিপক্ষে বড়াই করে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে অসম্মান ও অপমান করে।

২. চিন্তা-ফিকির, উপদেশ গ্রহণ করা ও আল্লাহর আয়াতসমূহ হতে নছিহত অর্জন করা হতে বঞ্চিত হয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿سَأَصۡرِفُ عَنۡ ءَايَٰتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَإِن يَرَوۡاْ كُلَّ ءَايَةٖ لَّا يُؤۡمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوۡاْ سَبِيلَ ٱلرُّشۡدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلٗا وَإِن يَرَوۡاْ سَبِيلَ ٱلۡغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلٗاۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَكَانُواْ عَنۡهَا غَٰفِلِينَ ١٤٦﴾ [الأعراف: 146]

“যারা অন্যায়ভাবে যমীনে অহঙ্কার করে আমার আয়াতসমূহ থেকে তাদেরকে আমি অবশ্যই ফিরিয়ে রাখব। আর তারা সকল আয়াত দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না এবং তারা সঠিক পথ দেখলেও তাকে পথ হিসাবে গ্রহণ করবে না। আর তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে তা পথ হিসাবে গ্রহণ করবে। এটা এ জন্য যে, তারা আমার

আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং সে সম্পর্কে তারা ছিল গাফেল।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৪৬]

আল্লামা সাদী রহ. বলেন, আমার আয়াতসমূহ হতে তাদের আমি ফিরিয়ে রাখবো এ কথার অর্থ হলো, আমি তাদের আমার আয়াত হতে উপদেশ গ্রহণ করতে এবং আমার আয়াতের মর্মার্থ বুঝা হতে ফিরিয়ে রাখবো।

অর্থাৎ যারা আমার বান্দাদের ওপর অহংকার করে, হকের বিরুদ্ধাচরণ করে ও যারা হক নিয়ে যারা আসছে, তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, আমি তাদের আমার আয়াতসমূহ থেকে উপদেশ গ্রহণ করা হতে বিরত রাখবো। আর যারা এ ধরনের গুণে গুণান্বিত হবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে অনেক কল্যাণ হতে বঞ্চিত ও অপমান অপদস্থ করবে। আল্লাহর আয়াতসমূহ হতে যা তার উপকারে আসবে তা হতে তাকে ফিরিয়ে রাখা হবে। বরং, অনেক সময় অবস্থা এমন হবে, তার নিকট সব কিছুর বাস্তবতা উলট পলট হয়ে যাবে। তখন সে ভালোকে খারাপ জানবে আর খারাপকে ভালো জানবে।

৩. দুনিয়াতে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহংকারীদের দুনিয়াতে শাস্তির ঘোষণা দেন।

সালামা ইবন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِينَ فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ»

“একজন মানুষ সর্বদা অহংকার করতে থাকে। অতঃপর একটি সময় আসে তখন তার নাম জাব্বারিনদের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন তাকে এমন আযাব আক্রান্ত বা গ্রাস করে, যা অহংকারীদের গ্রাস করেছিল”।[19]

মানুষ অহংকার করতে করতে নিজেকে অনেক বড় মনে করে, সে মনে করে তার মর্যাদা অন্য মানুষের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে, এভাবে চলতে চলতে একটি সময় আসে,

[19] তিরমিযী, হাদীস নং ২০০০ এবং তিনি বলেন হাদীসটি হাসান।

তখন তার নাম অহংকারী যালেমদের খাতায় লিখা হয়। ফিরআউন হামান ও কারূনের কাতারে তাকে শামিল করা হয়। এ হাদীসটি একটি বাস্তব নমুনা তুলে ধরে, তা হলো, একজন মানুষ প্রথমেই বড় ধরনের যালিম হয়ে যায় না। বরং তা হলো চলমান পক্রিয়া। একটা সময় আসে তখন সে আর ইচ্ছা করলে ফিরে আসতে পারে না। এ কারণেই আমরা বলি, হে জ্ঞানীরা তোমরা অহংকারের পরিণতিকে ভয় কর। প্রথম থেকেই তোমরা অহংকার থেকে বাঁচতে চেষ্টা কর। রোগ যখন ছোট থাকে তখন চিকিৎসা করতে হয়, অন্যথায় যখন বড় হয়ে যায়, তখন চিকিৎসা করা সম্ভব নাও হতে পারে। অনুরূপভাবে যত বড় বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তা প্রথমে ছোট কয়লা থেকেই শুরু হয় তারপর তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। যদি প্রথমেই তা নিভিয়ে দেওয়া যেত, তা হলে এতবড় বিপদ হত না।

চার. অহংকারীদের থেকে নি'আমতসমূহ ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

অহংকার নি‘আমতসমূহ ছিনিয়ে নেওয়া ও আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হয়ে থাকে।

সালামাহ ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه و سلم بشماله فقال: كُلْ بيَمِينكِ قال لا أستطيع قال: لَا اسَتَطْعَت ما منعه إلا الكبر .قال: فما رفعها إلى فيه»

“একদিন এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বাম হাত দিয়ে খাওয়া শুরু করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি ডান হাত দিয়ে খাও। উত্তরে লোকটি বলল, আমি পারছিনা! তার কথার প্রেক্ষাপটে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলল, তুমি পারবে না? মূলত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার অনুকরণ করা হতে তাকে তার অহংকারই বিরত রাখে| বর্ণনাকারী

বলেন, লোকটি আর কখনোই তার হাতকে তার মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারে নি।[20]

ইমাম নববী রহ. বলেন, এ হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি কোনো প্রকার অপারগতা ও যুক্তি ছাড়া শরী'আতের বিধানের বিরোধিতা করে তার জন্য বদদোয়া করা জায়েয আছে। এ লোকটিকে তার অহংকার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ ও তার নির্দেশ মানা হতে বিরত রাখে, তার অহংকারের তড়িৎ শাস্তি হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অক্ষমতার জন্য বদ-দো'আ করেন। আল্লাহ তা'আলা তার নবীর বদ-দো'আ কবুল করেন এবং সাথে সাথে লোকটি আক্রান্ত হয়। ফলে সে আর কখনোই তার হাতকে তার মুখ পর্যন্ত উঠাতে সক্ষম হন নি।

ঐ সব অহংকারী যাদেরকে তাদের অহংকার সত্যের অনুকরণ করা হতে নিষেধ করে, তারা কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সে সব নি'আমতসমূহ

---

[20] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০২১

ছিনিয়ে নেবেন যে সব নি'আমতের তারা নাফরমানী করে এবং অহংকার করে।

৫. অহংকার জমি ধ্বস ও কবর আযাবের কারণ হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে বিষয়টি স্পষ্ট করেন। যেমন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« بَيْنَمَا رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ الْأَرْض فَهُو يَتَجَلْجُل فِيهَا إِلى يَوْمِ الْقِيَامِةَ»

"তোমাদের পূর্বের যুগের এক লোক একটি কাপড় ও লুঙ্গি পরিধান করে ও তার চুল গুলো তার কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে অহংকার করে হাঁটছিল। কাপড়দ্বয় লোকটিকে অহংকারের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা লোকটিকে যমিনের অভ্যন্তরে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত পুঁততে থাকবে।

আর সে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত এ দিক সেদিক নড়াচড়া করতে থাকবে।”[21]

আল্লামা ফিরোজ আবাদি রহ. বলেন, স্থান ধ্বসে যাওয়া অর্থ হলো, সে ভু-গর্বে চলে গেল। আর আল্লাহ অমুককে যমিনে ধ্বসে দিল, অর্থাৎ তাকে যমিনে গায়েব করে ফেলল।

আল্লামা ইবন হাজার রহ. বলেন, يمشي في حلة এর অর্থ হলো, একটি চাদর ও লুঙ্গি পরিধান করে হাঁটছিল। আর সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে হাদীসটি এ শব্দে বর্ণিত-

«بَيْنَمَا رجُل يتَبخْتَر فِي بُرْدَيْهِ»

مرجل جمته এ কথাটির “চুলগুলোকে একত্র করে মাথা থেকে নিয়ে কাঁধ পর্যন্ত অথবা তার চেয়ে আরও বেশি ঝুলিয়ে দেওয়া। ترجيل الشعر “তারজীলুশ শার” কথাটির “মাথা আঁচড়ানো ও মাথায় তেল লাগানো।

---

[21] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭৮৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৮৮।

«إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ الْأَرْض فَهَو يتَجَلْجَل فيِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة»

التجلجل: التحرك তাজালজুল শব্দের অর্থ হলো, নড়াচড়া করা। আবার কেউ কেউ বলেন, আওয়াযের সাথে নড়াচড়া করা। আর আল্লামা ইবন ফারেস রহ. বলেন, التجلجل শব্দের “কঠিন ভু-কম্পনসহ যমীনে ধ্বসে যাওয়া এবং এদিক সেদিক নড়বড় করা। সুতরাং يتجلجل في الأرض শব্দের অর্থ হলো, যমীনে নামতে থাকবে কঠিন কম্পন ও হরকত সহ। আর হাদীসের অর্থ হলো, যমিন এ লোকটির দেহকে ভক্ষণ করবে না ফলে তাকে ধ্বংস করা সহজ হবে। আর বলা হবে সে এমন এক কাফির যার দেহ মৃত্যুর পর নিঃশেষ হবে না।[22]

পরকালের জীবনে অহংকারের শাস্তি:

১. অহংকারী ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের সাথে ধ্বংস হবে।

ফুযালা ইবন উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[22] ফাতহুল বারী ২৬১/১০।

« ثلاَثةٌ لا تَسْألَ عَنْهُمْ :رَجُل يُنازِعُ اللهَ فِي كِبرِيَاءِهِ، فَإنَ رِدَاءَه الْكِبرِيَاءُ، وَإزاره الِعَزَّة، وَرُجلُّ يَشُك فِي أَمْرِ اللهِ، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحَمةِ الل »

“তিন ব্যক্তির পরিণতি সম্পর্কে তোমরা আমাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। এক- যে ব্যক্তি আল্লাহ বড়ত্ব নিয়ে আল্লাহর সাথে ঝগড়া করে। কারণ, বড়ত্ব হলো আল্লাহর চাদর আর তার পরিধেয় হলো ইজ্জত। দুই- যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে। তিন- যে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়।”[23]

দুই. অহংকারীরা কিয়ামত দিবসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ও অবস্থানের দিক দিয়ে অনেক দুরে হবে।

জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[23] ইবন হাব্বান, হাদীস নং ৪৫৫৯।

«إِنّ مِنْ أَحبِّكُمْ إِلَيّ وَأَقْرَبِكُم مِنِّي مَجْلسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضُكمْ إِلَيّ وَأَبعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثارونَ وَالمُتَشَدِّقونَ وَالمُتَفَيْهِقُونَ .قَالُوا :يَا رَسُولَ الله، قَدْ عَلمِنا الثَّرْثارُونَ وَالمُتَشَدِّقونَ، فَما المُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ : المُتَكَبِّرُونَ»

“কিয়ামত দিবসে তোমাদের মধ্যে যে আমার খুব প্রিয় ও মজলিশের দিক দিয়ে আমার একেবারে নিকটে অবস্থান করবে, সে হলো তোমাদের মধ্যে যারা আখলাক ও চরিত্রে উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে যে সর্বাধিক ঘৃণিত এবং মজলিশের দিক দিয়ে আমার অনেক দুরে অবস্থান করবে, সে হলো, যে অতিরিক্ত ও দীর্ঘ কথা বলে এবং মানুষের নিকট মুখ ভরে কথা বলে| সাহাবারা বললেন, যারা অতিরিক্ত ও দীর্ঘ কথা বলে, তাদের আমরা জানলাম, কিন্তু যারা মানুষের নিকট মুখ ভরে কথা বলে, তারা কারা? তিনি বললেন, অহংকারীরা।[24]

---

[24] তিরমিযী, হাদীস নং ২০১৮।

তিন. অহংকারীরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, যে অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা তার ওপর ক্ষুব্ধ:

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: مَن تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ أَوْ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»

“আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মনে মনে নিজেকে বড় মনে করে এবং হাঁটার সময় অহংকার করে, সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে যে অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা তার ওপর রাগান্বিত”।[25]

চার. অহংকারীদের আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন অত্যন্ত অপমান অপদস্ত করে একত্র করবে:

আমর ইবন শোয়াইব থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[25] আহমদ: ৫৯৫৯

« يُحْشَرُ المُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ، يَغْشَاهُمْ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يسَمَّى بُولَس، تَعلُوهُم نَارُ الْأَنيَارِ يُسقَوْن مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الخَبَالِ»

"অহংকারীদের কিয়ামতের দিন বড় মানুষের আকৃতিতে ছোট ছোট পিপড়ার মত করে একত্র করা হবে। অপমান অপদস্থ সব দিক থেকে তাকে গ্রাস করে ফেলবে। তারপর তাকে জাহান্নামের মধ্যে একটি জেলখানা যার নাম 'বুলাস', তার দিকে টেনে হেঁচড়ে নেওয়া হবে। তাদেরকে জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুন চতুর্দিক থেকে গ্রাস করে ফেলবে। আর তাদেরকে জাহান্নামীদের পিত্ত, পুঁজ ও বমি থেকে তাদের পানীয় দেওয়া হবে।[26]

হাদীসের ব্যাখ্যা:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: يحشرالمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر এখানে الذر শব্দটির অর্থ নিহায়া কিতাবে, ছোট ছোট লাল পিপড়ার দল বলে

[26] তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৯২। তিনি বলেন হাদীসটি হাসান।

উল্লেখ করা হয়েছে। আর يحشرالمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر এ কথাটির অর্থ হলো, নিকৃষ্ট ও ছোট হওয়ার দিক দিয়ে তারা গুড়ো গুড়ো পিপড়ার মত। আর في صور الرجال এর অর্থ হলো, তারা আকৃতিতে মানুষের আকৃতি, কিন্তু তাদের দেহ পিপড়ার মত ছোট। يغشاهم الذل من كل مكان এ কথাটির অর্থ হলো, তারা কিয়ামতের দিন এতই অপমান অপদস্ত হবে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাদের কোনো মান-সম্মান বলতে কিছুই থাকবে না। হাশরবাসীরা তাদের পা দিয়ে তাদেরকে পা-পৃষ্ট করবে, তাদের প্রতি কোনো কোনো প্রকার ভ্রুক্ষেপ করবে না। يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس এ কথাটির অর্থ হলো, জাহান্নামের মধ্যে একটি জেলখানার দিকে তাদের টেনে নেওয়া হবে, যার নাম বুলুস। تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار এ কথাটির অর্থ হলো, জাহন্নামের আগুন তাদের গ্রাস করে ফেলবে এবং ঢেকে ফেলবে এবং জাহান্নামীদের দেহ হতে যে সব পুঁজ, বমি ও রক্ত বের হবে, তাই তাদের খেতে দেওয়া হবে। কারণ,

একজন অহংকারী দুনিয়াতে বড় একটি আকার ধারণ করেছিল এবং দুনিয়াতে বড় ধরনের আসন দখল করে নিয়েছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সমগ্র মানুষের সামনে তাকে ছোট ছোট পিপড়ার পালের মত করে একত্র করে তাকে লজ্জা ও শাস্তি দিবেন।

পাঁচ. অহংকার জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধক:

আব্দুল্লাহ ইবন মাসুদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا يْدخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قال رجل : إن الرجل : يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة .قال إن الله جَمِيلٌ يُحِبُ الجَمَالَ، الِكْبر بَطُر الْحقّ، وَغمط النَاّسِ»

"যার অন্তরে একটি অণু পরিমাণ অহংকার থাকে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বললে, এক লোক দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোনো কোনো লোক এমন আছে, সে সুন্দর কাপড় পরিধান করতে পছন্দ করে, সুন্দর জুতা পরিধান করতে পছন্দ করে, এসবকে কি অহংকার বলা হবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর তা‘আলা নিজেই সুন্দর তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। অহংকার হলো, সত্যকে গোপন করা এবং মানুষকে নিকৃষ্ট বলে জানা।[27]

ছয়. অহংকারীদের জন্য জাহান্নামের ওয়াদা দেওয়া আছে:

আব্দুল্লাহ ইবন মাসুদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ، كُلُّ ضَعِيفٍ مَتَضَعِّفٍ لَوْ أَقسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّه، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ، كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ»

“আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি তোমাদের থেকে কারা জান্নাতি তাদের বিষয়ে খবর দিব কি? তারা হলো সব দুর্বল ও অসহায় লোকেরা তারা যদি আল্লাহর শপথ করে আল্লাহ তা‘আলা তাদের দায় মুক্ত করে। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

[27] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯১।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি কি তোমাদের কারা জাহান্নামে যাবে তাদের বিষয়ে খবর দিব? তারা হলো, সব অহংকারী, দাম্ভিক ও হঠকারী লোকেরা”।[28]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اْحتجّْت النَّارُ وَالجَنَّةُ فَقَالَتْ النارُ: يْدخُلُنِي الجَبَّارُونَ وَالمُتَكَبِّرُونَ وَقَالَتْ الجَنَّةُ :مَا لِي لَا يْدخُلُنِي إلا ضعَفَاءُ الناَّسِ وَسَقَطُهُمْ؟ فَقَالَ الله عزَّ وَجَلَّ لِلناَّرِ أَنْتِ عَذَابِي أُعذِّب بكِ مَنْ أَشَاءُ وَرُبمَا قَالَ أُصِيبُ بكِ مَنْ أَشَاءُ وَقَالَ لِلجَنةِ :أَنْتِ رَحَمتِي أَرْحُم بكِ مَنْ أَشَاءُ وَلكُلِّ وَاحِدٍة مِنْكُمَا مِلْؤُهَا»

“জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ে আল্লাহ তা‘আলার দরবারে বিতর্ক করে, জাহান্নাম বলে, আমার নিকট বড় বড় দাম্ভিক ও অহংকারীরা প্রবেশ করবে আর জান্নাত আল্লাহকে বলে, কি ব্যাপার আমার ভিতর শুধু দুর্বল ও বিতাড়িত লোকেরা প্রবেশ করে। তখন আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামকে বলে, তুমি হলে আমার আযাব। আমি

[28] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৯১৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৫৩।

তোমার মাধ্যমে যাকে চাই তাকে আযাব দিব। অথবা আল্লাহ বলেন, তোমার মাধ্যমে আমি যাকে চাই তাকে পাকড়াও করবো আর জান্নাতকে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি আমার রহমত আমি তোমার দ্বারা যাকে চাই তাকে রহম করব। আর তোমাদের উভয়ের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে যথাযোগ্য অধিবাসী।[29]

আল্লামা ইবন হাজার রহ. বলেন, হাদীসে দু'টি শব্দ অর্থাৎ الْمُتَكِّبِرِينَ ও المتَجَّبرِينَ উল্লেখ করা হয়, কেউ কেউ বলেন, শব্দ দু'টির অর্থ একই। আবার কেউ কেউ বলেন, না, দু'টি শব্দের অর্থ দু'টি الْمُتَكِّبِرِينَ শব্দের অর্থ হলো ঐ সব অহংকারী যারা তাদের মধ্যে নেই এমন কিছু নিয়ে অহংকার করে। আর المتَجِّبرِينَ শব্দের "তার নিকট যা আছে তা নিয়ে বড়াই করা।

আর হাদীসে যে দুর্বল লোকের কথা বলা হয়েছে, তারা হলো, যারা অহংকারীদের দৃষ্টিতে দুর্বল ও নিকৃষ্ট এবং তাদের চোখে তারা মানুষ হিসেবে গণ্য নয়। অন্যথায়

[29] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮৫০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৪৬।

আল্লাহ তা‘আলার দরবারে তারা অনেক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তাদের অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব ও কুদরতের অনুভূতি থাকার কারণে তারা তাদের নিকট যা আছে তাকে তুচ্ছ মনে করে এবং আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত বন্দেগীতে তারা অত্যধিক বিনয়ী ও ছোট হয়ে থাকে। এ কারণেই হাদীসে তাদের দুর্বল লোক বলা হয়েছে।

সাত. অহংকারীদের অপমান অপদস্ত করে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَآ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ رُسُلٞ مِّنكُمۡ يَتۡلُونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِ رَبِّكُمۡ وَيُنذِرُونَكُمۡ لِقَآءَ يَوۡمِكُمۡ هَٰذَاۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَٰكِنۡ حَقَّتۡ كَلِمَةُ ٱلۡعَذَابِ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ٧١ قِيلَ ٱدۡخُلُوٓاْ أَبۡوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَاۖ فَبِئۡسَ مَثۡوَى ٱلۡمُتَكَبِّرِينَ ٧٢﴾ [الزمر: 71,72]

“আর কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে এসে পৌঁছবে তখন তার দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কি রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের রবের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করত এবং এ দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করত’? তারা বলবে, ‘অবশ্যই এসেছিল’; কিন্তু কাফিরদের ওপর আযাবের বাণী সত্যে পরিণত হলো। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর চিরকাল তোমরা সেখানে অবস্থান করবে। অহংকারীদের বাসস্থান কতই না মন্দ”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৭১-৭২]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60]

“আর তোমাদের রব বলেছেন, ‘তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহঙ্কার বশতঃ আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” [সূরা গাফির, আয়াত: ৬০]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«قَالَ اللهُ عَزّ وَجَلَّ :الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ»

“আল্লাহ তা‘আলা বলেন, অহংকার হলো আমার চাদর আর বড়ত্ব হলো আমার পরিধেয়। যে ব্যক্তি আমার এ দু’টির যে কোনো একটি নিয়ে টানাটানি করবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।[30]

অহংকারের চিকিৎসা

[30] আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৯০। আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলেন।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, কিবির তথা অহংকার এমন একটি কবীরা গুনাহ যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয় এবং একজন মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতকে নষ্ট করে দেয়। এ কারণেই একজন মানুষের জন্য অহংকার থেকে দুরে থাকা বা তার জীবন থেকে তা দুর করা অকাট্য ফরয। আর এ কথাও সত্য যার মধ্যে অহংকার থাকে সে শুধু আশা করলে বা ইচ্ছা করলেই অহংকারকে দুর করতে বা অহংকার হতে বাঁচতে পারবে না। তাকে অবশ্যই এ মারাত্মক ব্যাধির চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। অহংকারের চিকিৎসা নিম্নরূপ:

১. অন্তর থেকে অহংকারের মূলোৎপাটন করা:

প্রথমে অহংকারী নিজেকে চিনতে হবে, তারপর তাকে তার প্রভুকে চিনতে হবে। একজন মানুষ যখন নিজেকে ভালোভাবে চিনতে পারবে এবং আল্লাহ তা'আলা বড়ত্ব ও মহত্বকে সঠিকভাবে বুঝতে পারবে তখন তার মধ্যে বিনয় ও নম্রতা ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না, অহংকার তার থেকে এমনিতেই দুর হয়ে যাবে। আল্লাহ

তায়ালাকে যখন ভালোভাবে চিনবে, তখন সে অবশ্যই জানতে পারবে বড়ত্ব ও মহত্ব একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য প্রযোজ্য নয়।

মানুষ তাকে চেনার জন্য প্রথমে তাকে তার নিজের সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা করতে হবে। সে নিজে প্রথমে কি ছিল, তারপর দুনিয়াতে আসার পর মাঝখানে তার অবস্থা কেমন ছিল এবং তার পরিণতি কি হবে?

এসব নিয়ে চিন্তা করলে তার মধ্যে অহংকার থাকতেই পারে না। কিভাবে অহংকার করবে? আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রথমে এক ফোটা নিকৃষ্ট পানি থেকে বীর্য হিসেবে তৈরি করেন তারপর তিনি বীর্যকে আলাকায় রূপান্তরিত করেন তারপর আলাকাকে গোশতের টুকরা তারপর গোশতের টুকরাকে হাঁড়ে পরিণত করেন। তারপর আবার হাঁড়কে গোশতের আবরণ দিয়ে সাজান।

এ ছিল তার সৃষ্টির সূচনা আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রথমেই পরিপূর্ণ মাখলুক রূপে সৃষ্টি করেন নি, বরং আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার হায়াতের পূর্বে মৃত্যু দিয়েই শুরু

করেন। অনুরূপভাবে শক্তির পূর্বে দুর্বলতা, ইলমের পূর্বে অজ্ঞতা, হিদায়াতের পূর্বে গোমরাহী এবং সম্পদশালী হওয়ার পূর্বে অভাব ও দরিদ্রতা দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেন। এতদসত্ত্বেও তার কিসের অহংকার, বড়াই, গৌরব ও অহমিকা?!!

তারপর যখন লোকটি দুনিয়াতে বসবাস করতে থাকে তখন সে তার নিজের ইচ্ছায় বেঁচে থাকতে পারে না, সে যে রকম চায় সবকিছু তার মনের মত হয় না। সে চায় সুস্থ থাকতে কিন্তু পারে না, চায় ধনী ও অভাব মুক্ত থাকতে কিন্তু তা হয় না। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ওপর বিপদ-আপদ আসতেই থাকে। সে পিপাসিত, ক্ষুধার্ত ও অসুস্থ হতে বাধ্য হয়, কোনো কিছু তাকে বিরত রাখতে পারে না। কোনো কিছু মনে রাখতে চাইলে সে পারে না, ভুলে যায়। আবার কোনো কিছু ভুলতে চাইলে তা ভুলতে পারে না এবং কোনো কিছু শিখতে চাইলে তা শিখতে পারে না। মোট কথা, সে একজন অধীনস্থ গোলাম, সে তার নিজের কোনো উপকার করতে পারে না, আবার কোনো ক্ষতিকে সে নিজের থেকে প্রতিহত করতে পারে

না। নিজের কোনো কল্যাণ ভয়ে আনতে পারে না এবং কোনো অকল্যাণ বা ক্ষতিকে ঠেকাতে পারে না।

এর চেয়ে অপমানকর আর কি হতে পারে, যদি সে নিজেকে চিনতে পারে!

তারপর সর্বশেষ অবস্থা ও পরিণতি হলো, মৃত্যু। মৃত্যু তার জীবন, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিকে কেড়ে নিবে। আর কোনো কিছু দেখতে পারবে না, শুনতে পারবে না। তার জ্ঞান, বুদ্ধি শক্তি ও অনুভূতি আর অবশিষ্ট থাকবে না। বন্ধ হয়ে যাবে তার দেহের নড়চড় ও অনুভূতি, সে একেবারেই নিস্তেজ ও জড় পদার্থে রূপান্তরিত হবে, যেমনটি সৃষ্টির প্রথমে ছিল। তারপর তাকে মাটিতে পুঁতে রাখা হবে। তখন সে হয়ে যাবে দুর্গন্ধযুক্ত অপবিত্র লাশ।

তারপরও যদি এই হত তার শেষ পরিণতি এবং এ অবস্থার ওপর যদি শেষ হত সব কিছু!! আর যদি জীবিত করা না হত! কিন্তু না, এতো শেষ নয় বরং শুরু। চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার পর তাকে আবারো জীবিত করা হবে, যাতে তাকে কঠিন বিচারের সম্মুখীন করা হয়। তাকে তার

কবর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হবে কিয়ামতের ভয়াবহতায় ও উত্তপ্ত মাঠে। তারপর তার কর্মের দফতর তার সম্মুখে খুলে দেওয়া হবে আর তাকে বলা হবে, তুমি তোমার কর্মের দফতর পড়। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা দিয়ে বলেন,

﴿وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلۡزَمۡنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِي عُنُقِهِۦۖ وَنُخۡرِجُ لَهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ كِتَٰبٗا يَلۡقَىٰهُ مَنشُورًا ١٣ ٱقۡرَأۡ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفۡسِكَ ٱلۡيَوۡمَ عَلَيۡكَ حَسِيبٗا ١٤﴾ [الإسراء: 14]

"আর আমরা প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার ঘাড়ে সংযুক্ত করে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন তার জন্য আমি বের করব একটি কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। পাঠ কর তোমার কিতাব, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশকারী হিসেবে যথেষ্ট"। [**সূরা আল**-ইসরা, আয়াত: ১৪]

যখন সে তার আমল নামা প্রত্যক্ষ করবে, তখন বলবে-

﴿وَوُضِعَ ٱلۡكِتَٰبُ فَتَرَى ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُشۡفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَٰوَيۡلَتَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٗ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحۡصَىٰهَاۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرٗاۗ وَلَا يَظۡلِمُ رَبُّكَ أَحَدٗا ٤٩﴾ [الكهف: 49]

“আর আমলনামা রাখা হবে। তখন তুমি অপরাধীদেরকে দেখতে পাবে ভীত, তাতে যা রয়েছে তার কারণে। আর তারা বলবে, ‘হায় ধ্বংস আমাদের! কী হলো এ কিতাবের! তা ছোট-বড় কিছুই ছাড়ে না, শুধু সংরক্ষণ করে’ এবং তারা যা করেছে, তা হাযির পাবে। আর তোমার রব কারো প্রতি যুলম করেন না। [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ৪৯]

আল্লামা আখনফ রহ. বলেন, আমার আশ্চর্য হয়, যে লোকটি প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে দুইবার আগমন করল, সে কীভাবে অহংকার করে।

মাতরাফ ইবন শাখির ইয়াযিদ ইবন মাহলাবকে দেখল, সে তার পরিধেয় নিয়ে অহংকার করছে। তখন সে তাকে বলল, তোমার এ হাঁটাকে আল্লাহ তা‘আলা অপছন্দ করে।

এ কথা শুনে বলল, তুমি কি আমাকে চিন না? তখন বলল, হ্যাঁ আমি তোমাকে চিনি, তোমার শুরু হলো, এক ফোটা নাপাক বীর্য, আর তোমার শেষ হলো, দুর্গন্ধময় লাশ আর এ দু'টির মাঝে তুমি একজন পায়খানা ও ময়লা বহনকারী।

এ কথাগুলোকে আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-বাছছামী আল-খাওয়ারেজমী পদ্য আকারে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

بصورتهِ مُعْجَبٍ من عجبتُ

مِذَره نطفةً قبلُ مِنْ وكان

صورتهِ حسنِ بعد غدٍ وفي

قذره جيفةً الأرضِ في يصيرُ

ونَخْوَتِهِ عُجْبِه على وهو

العذره يحملُ ثوبيهِ بين ما

“যে ব্যক্তি তার সুন্দর সুরত নিয়ে অহংকার করে তার বিষয়ে আশ্চর্য না হয়ে পারি না। (সে কিভাবে অহংকার করে?) সে তো ইতোপূর্বে এক ফোটা নিকৃষ্ট বীর্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর তার এত সুন্দর আকৃতির পর তার পরিণাম হলো, আগামীকাল তাকে একটি দুর্গন্ধময় লাশ হিসেবে মাটিতে পুঁতে রাখা হবে। সে দুনিয়াতে যতই বড়াই আর অহংকার করুক না কেন, সে তো তার দুই কাপড়ের মাঝে আজীবন ময়লাই বহনকারী ছিল।”

অপর এক কবি বলেন,

يا مُظهرَ الكبرِ إعجاباً بصورتهِ

مهلاً فإنك بعدَ الكبْرِ مسلوبُ

لو فكر الناسُ فيما في بطونهمُ

ما استشعر الكبرَ شبانٌ ولا شيبُ

يا ابنَ الترابِ ومأكولَ الترابِ غداً

أقْصِرْ فإنك مأكولٌ ومشروبُ

“স্বীয় সৌন্দর্য ও সুরত নিয়ে হে অহংকার-কারী! মনে রাখ, তুমি অবশ্যই তোমার অহংকারের পর বিলুপ্ত হবে।

যদি মানুষ তাদের পেটের মধ্যে কি আছে তা নিয়ে চিন্তা করত! কোনো যুবক বা বৃদ্ধ কারো মধ্যেই অহংকার করার মানসিকতা জাগত না।

হে মাটির ছেলে ও আগামী দিনের মাটির খাদ্য, তুমি অহংকার থেকে বিরত থাক! কারণ, তুমি অবশ্যই একদিন খাদ্য ও পানীয়তে রূপান্তরিত হবে।”

২. অহংকারের বস্তুসমূহ নিয়ে চিন্তা করা:

যে সব বস্তু নিয়ে অহংকার করে তাতে চিন্তা ফিকির করা এবং মেনে নেওয়া যে তার জন্য এসব বস্তু নিয়ে অহংকার করা উচিত নয়। কেউ যদি তার বংশ মর্যাদা নিয়ে অহংকার করে, তখন তাকে বুঝতে হবে যে এটি একটি মূর্খতা বৈ কিছুই হতে পারে না। কারণ, সে তো তার নিজের ভিতরের কোনো যোগ্যতা নিয়ে অহংকার করছে না। সে অহংকার করছে অন্যদের যোগ্যতা নিয়ে, যা একেবারেই বিবেক ও বুদ্ধিহীন কাজ।

উবাই ইবন কা‘আব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«انتسب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أحدهما :أنا فلان بن فلان فمن أنت لا أُمَّ لك، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انْتَسَبَ رجلان عَلَى عَهْدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام فَقَالَ أَحَدهمَا :أَنَا فُلَانُ بنُ فُلَانٍ حتى عَدَّ تسعةً فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ، قَالَ :أَنَا فُلَانُ بنُ فُلَانٍ ابْنُ الْإِسْلَامِ، قَالَ :فَأُوحَى الله إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام أَنَّ هَذَيْنِ الْمُنْتَسَبِيْنِ أَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْمُنْتَمِي أَوْ الْمُنْتَسِبُ إِلَى تسْعَة فِي النَّارِ فَأَنْتَ عَاشُرهمْ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا هَذَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى اثْنِيَن فِي الجَنَّةِ فَأنت ثَالِثِهُمَا فِي الجَنَّةِ»

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দুই লোক বংশ নিয়ে বিবাদ করে। অতঃপর তাদের একজন বলল, আমি অমুকের ছেলে অমুক তুমি কে? তোমার মাতা নেই। **তাদের বিবাদ শোনে রাসূল** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুসা ‘আলাইহিস সালামের যুগে দুই ব্যক্তি বংশ নিয়ে ঝগড়া করে। তখন তাদের একজন অপর জনকে বলে, আমি অমুকের ছেলে অমুক, অমুকের

ছেলে অমুক, এভাবে সে তার নয় পুরুষ পর্যন্ত গণনা করে, আর বলে তুমি কে? তোমার মা নেই। **তখন সে বলল**, আমি অমুকের ছেলে অমুক, আর অমুক হলো ইসলামের ছেলে। তিনি বলেন, তাদের বিতর্কের কারণে আল্লাহ তা'আলা মুসা 'আলাইহিস সালাম কে ওহী দিয়ে পাঠান যে, আপনি এ দুই ব্যক্তি যারা বংশ নিয়ে বিবাদ করছে তাদের বলেন, হে নয় পর্যন্ত গণনাকারী! তুমি যে নয় জনের নাম উল্লেখ করছ, তারা সবাই জাহান্নামে, আর তুমি হলে তাদের দশম ব্যক্তি। আর অপর ব্যক্তিকে বলেন, হে দুই পুরুষ পর্যন্ত গণনাকারী তুমি যে দুইজনের নাম নিলে তারা উভয়ে জান্নাতে যাবে আর তুমি হলে তৃতীয় ব্যক্তি"।[31]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عنْكُم عُبِّيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِن تُرَابٍ،

[31] আহমদ, হাদীস নং ২০৬৭৪। আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলেন।

لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخرَهُم بِأَقْوَامٍ إِنَّمَا هُمْ فَحْم مِنْ فحمِ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِن الْجِعلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النتَّنِ»

“আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের থেকে জাহেলি যুগের কুসংস্কার ও বাপ-দাদাদের নিয়ে অহংকার করাকে দূর করে দিয়েছেন। মানুষ দু’ধরনের : একজন ঈমানদার মুত্তাকী ব্যক্তি, আর একজন দূরাচার দুর্ভাগা ব্যক্তি। সমগ্র মানুষ আদম ‘আলাইহিস সালামের সন্তান, আর আদম ‘আলাইহিস সালাম হলো, মাটির তৈরি। আল্লাহর শপথ করে বলছি, এমন এক সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে যারা তাদের বংশের লোকদের নিয়ে অহংকার করবে। মনে রাখবে তারা জাহান্নামের কয়লা হতে একরকম কয়লা অথবা তারা আল্লাহ তা‘আলার নিকট নাকের থেকে শিন নিক্ষেপ করার নেকড়ার চেয়ে আরও অধিক নিকৃষ্ট।[32]

হাদিসের ব্যাখ্যা:

---

[32] আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১১৬। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেন।

عبية الجاهلية এ শব্দের অর্থ হলো, জাহিলি যুগের অহংকার, বড়াই ও কুসংস্কার। مومن تقي و فاجر شقي এ কথাটির অর্থ সম্পর্কে আল্লামা খাত্তাবী রহ. বলেন, মানুষ দুই ধরনের হতে পারে। এক ধরনের মানুষ হলো, মুমিন মুত্তাকী সে হলো, উত্তম ব্যক্তি যদিও সে তার সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানী ব্যক্তি নয়। আর একজন ব্যক্তি হলো, ফাজের বদখত যদিও সে তার সমাজে সম্মানী ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

আবার কেউ কেউ বলেন, অহংকারী হয় মুমিন হবে, তাহলে তার জন্য কারো ওপর অহংকার করা উচিত নয়। অথবা সে ফাজের গুনাহগার, সে এমনিতেই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট তার অহংকার করার অধিকারই নেই। সুতরাং অহংকার সর্বাবস্থায় রহিত। অহংকার করার কোনো সুযোগই নেই।

أنتم بنو آدم و آدم من تراب আর তোমরা হলে আদম সন্তান আর আদম 'আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টি করা হয়েছে,

মাটি থেকে। সুতরাং যার মুল হলো মাটি, তার জন্য অহংকার করা কোনো ক্রমেই উচিৎ নয়।

আবু রাইহানা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ انْتَسَبَ إِلَى تِسْعَةِ آبَاءٍ كُفَّارٍ يُرِيدُ بِهِمْ عزا وَكَرَمًا فَهُوَ عاشُرهمْ فِي النَّار»

"যে ব্যক্তি তার বংশের নয়জন লোকের কথা উল্লেখ করে এবং তা দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো, ইজ্জত সম্মান লাভ করা, তারা সবাই জাহান্নামে যাবে আর লোকটি তাদের দশম ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে"।[33]

যে ব্যক্তি ইলমের কারণে অহংকার করে, তাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যারা আহলে ইলম তাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও আরও অধিক কঠিন। আর

---

[33] বর্ণনায় আহমদ, হাদীস নং ১৬৭৬১। হাফেয ইবন হাজার রহ. ফাতহুল বারীতে বলেন, হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ।

যে ব্যক্তি ইলম থাকা সত্বেও আল্লাহর নাফরমানি করে তাকে মনে রাখতে হবে তার অপরাধ খুবই মারাত্মক।

আর একজন অহংকারীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, অহংকার কেবল আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর কারো জন্য অহংকার প্রযোজ্য নয়। যখন কোনো ব্যক্তি অহংকার করে, তখন সে আল্লাহর নিকট ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হবে। এসব চিন্তা যদি একজন মানুষ করে তাহলে তার মধ্যে অহংকার থাকতে পারে না। তাকে বিনয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, ইবাদত বন্দেগী ও নেক আমল নিয়ে অহংকার করা মানুষের জন্য একটি বড় ধরনের ফিতনা। এ বিষয়ে হাদীসে একটি ঘটনা বর্ণিত, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন,

«كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسَرائِيلَ مُتَوَاخِيَيْنِ فَكَانَ أَحَدُهَما يُذنبِ والْآخَرُ مُجْتِهُد فِي ٱلْعِبادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَالُ المجْتهد يَرَى ٱلآخَرَ عَلَى

الذَّنْبِ فَيَقُولُ :أَقْصِرْ، فَوَجَدُه يَوْما عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لهُ :أَقْصِرْ، فَقَالَ خَلِّنِي ورَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَيّ رَقِيبًا، فَقَالَ :واللهِ لَا يغفُر الله لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللهُ الجَنَّةَ .فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيَن، فَقَالَ لِهَذَا المجْتَهِدِ :أَكنتَ بِي عَالمًا أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا،وَقَالَ لِلْمُذنبِ :اُذْهبْ فادْخُلْ الجَنَّةَ بِرِحْمَتِي، وَقَالَ لِلْآخَرِ:اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته»

“বনী ইসরাইলের মধ্যে দুইজন লোক ছিল, তারা একে অপরের বন্ধু। তাদের একজন গুনাহ করত আর অপরজন ইবাদতে লিপ্ত থাকত। যে লোকটি ইবাদতে লিপ্ত থাকতো সে সব সময় দেখত তার অপর ভাই গুনাহে মগ্ন। তখন সে তাকে বলত, তুমি গুনাহের কাজ ছেড়ে দাও! কিন্তু সে তার কথা শুনত না। তারপর একদিন তাকে গুনাহ করতে দেখে বলল, তুমি গুনাহ করো না গুনাহ হতে বিরত থাক! সে তার কথায় কোনো ভ্রুক্ষেপ করল না এবং বলল, তুমি আমাকে আমার মত করে চলতে দাও। আমি এবং আমার রবের মাঝে আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি কি আমার দায়িত্বশীল হিসেবে দুনিয়াতে

প্রেরিত? তখন সে রাগ হয়ে তাকে বলল, আল্লাহর শপথ করে বলছি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করবে না। অথবা বলল, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়ের রুহকে কবজ করল, তারা উভয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে একত্র হলো, আল্লাহ তা'আলা ইবাদতে যে লোকটি লিপ্ত থাকতো তাকে বলল, তুমি কি আমার সম্পর্কে জানতে অথবা বলল, তুমি কি আমার হাতে কি আছে তা করার ক্ষমতা রাখতে? আর অপরাধীকে বলল, তুমি আমার রহমতের বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ কর! আর অপরজনের বিষয়ে ফিরিশতাদের ডেকে বলল, তোমরা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাও এবং তাতে তাকে নিক্ষেপ কর। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি ঐ সত্ত্বার কসম করে বলছি, তুমি এমন একটি কথা বলে থাক, যার দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতকে বরবাদ করে দাও"।[34]

[34] আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯০১। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেন।

আবু ইয়াযীদ আল-বুসতামী বলেন, যখন কোনো মানুষ মনে করে যে, মানুষের মধ্যে কোনো মানুষ তার থেকে খারাপ আছে, তা হলে সে অবশ্যই অহংকারী।

আর আল্লাহ তা'আলা যারা কল্যাণের প্রতি অগ্রগামী তাদের বিষয়ে বলেন, তারা হলেন, যারা ইবাদত ও আমলে সালেহ করেন আর ভয় করেন যে, তা তাদের থেকে কবুল করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের বিষয়ে বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يُؤۡتُونَ مَآ ءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمۡ وَجِلَةٌ أَنَّهُمۡ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ رَٰجِعُونَ ٦٠ أُوْلَٰٓئِكَ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَهُمۡ لَهَا سَٰبِقُونَ ٦١﴾ [المؤمنون: 60- 61]

"আর যারা যা দান করে তা ভীত-কম্পিত হৃদয়ে করে থাকে এজন্য যে, তারা তাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। তারাই কল্যাণসমূহের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এবং তাতে তারা অগ্রগামী।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن هذه الآية قالت أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بِنْتَ الصِّديقِ وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ»

“আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ আয়াত... সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বলি তারা ঐ সব লোক যারা মদ পান করে এবং চুরি করে? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন না, হে সিদ্দিক কন্যা! তারা হলো, যারা রোজা রাখে, সালাত আদায় করে এবং সদকা করে তবে তারা আশংকা করে যে, তাদের আমল আল্লাহ তা‘আলা কবুল করবে না। এরা তারাই যারা কল্যাণকর কাজে অগ্রসর।”[35]

তিন. দো‘আ করা ও আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া:

দো‘আ ও আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া হলো, অহংকার থেকে বাঁচার জন্য সব চেয়ে উপকারী ও কার্যকর ঔষধ। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা যাদের হেফাযত করেন, তারাই

[35] তিরমিযী, হাদীস নং ৩১৭৫। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেন।

অহংকার থেকে বাঁচতে পারে। আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া বাঁচার কোনো উপায় নেই। **এ কারণে রাসূল সা.** উম্মতদের দো‘আ শিখিয়ে দেন এবং তিনি নিজেও সালাতে বেশি বেশি করে আল্লাহর নিকট দো‘আ মুনাজাত করেন।

যুবাইর ইবন মুত‘য়ীম থেকে বর্ণিত,

«أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي صلاة، فقال: الله أَكْبر كَبِيًرا الله أَكْبر كَبِيًرا الله أَكْبر كَبِيًرا وَالحَمْدُ لله كَثِيراً وَالحَمْدُ لله كَثِيراً وَالحَمْدُ لله كَثِيراً وَسُبحَانَ الله بُكْرَةً وَأَصيلًا ثَلَاثًا، أَعُوذُ بِالله مِنْ الشَّيْطَانِ الرجيم مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهمْزِهِ قَالَ :نَفْثُهُ الشِّعر، وَنَفْخه الْكبْر، وَهُمزه المُوتَةُ»

“তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার সালাত আদায় করতে দেখেন, তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাতে এ কথাগুলো বলতে শোনেন-

اللهُ أَكْبر كَبِيًرا اللهُ أَكبر كَبِيًرا اللهُ أَكبر كَبِيًرا وَالحَمْدُ لله كَثِيراً وَالحَمْدُ لله كَثِيراً وَالحَمْدُ لله كَثِيراً وَسبحَانَ الله بُكْرَةً وَأصِيلًا ثَلَاَثا، أَعُوذُ بِالله مِنْ الشَّيطَانِ الرجيم مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهمْزِه

“আল্লাহ তা‘আলা সব কিছু হতে বড়, আল্লাহ তা‘আলা সব কিছু হতে বড়, আল্লাহ তা‘আলা সব কিছু হতে বড়। আর সর্বাধিক প্রশংসা কেবলই আল্লাহর, সর্বাধিক প্রশংসা কেবলই আল্লাহর, সর্বাধিক প্রশংসা কেবলই আল্লাহর। আমি বিতাড়িত শয়তান হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, আমি আরও আশ্রয় চাচ্ছি তার অহংকার থেকে তার প্ররোচনা থেকে ও ষড়যন্ত্র থেকে”।[36]

চার. বিনয় অবলম্বন করা:

«إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه و سلم فتنطلق به حيث شاءت»

আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদিনার অনেক কৃতদাস গোলামদের দেখা

[36] ইবন হাব্বান, হাদীস নং ১৭৮০।

যেত, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত ধরে তাকে তাদের ইচ্ছামত এদিক সেদিক নিয়ে যেত।”[37]

আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«سألت عائشة ما كان النبي يصنع في بيته؟ قالت :كان يكون في مهنة أهله .تعني خدمةأهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة »

“আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে জিজ্ঞাসা করি রাসূল সা. ঘরে কি কাজ করতেন? তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের মধ্যে তার পরিবারের খেদমত করতেন, যখন সালাতের সময় হত, তখন তিনি সালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন”।[38]

---

[37] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৭২।

[38] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭৬।

একই অর্থের অপর একটি হাদীস ইমাম তিরমিযী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে নকল করেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

ما كان إلا بشرا من البشر: يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য মানুষের মতো একজন মানুষ, তিনি নিজের কাজ নিজে করতেন, নিজেই কাপড় সিলাই করতেন এবং বকরীর দুধ ধোয়াতেন।

আর আহমদ ও ইবন হাব্বান ওরওয়া থেকে এবং ওরওয়া আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণনা করেন,

يخيط ثوبه، ويخصف نعله.

“তিনি নিজে তার কাপড় সিলাই করতেন এবং জুতায় তালি লাগাতেন”। হাদীসে অহংকার ছেড়ে দেওয়া, বিনয় অবলম্বন করা ও পরিবারের খেদমত করার প্রতি বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয়।

যুবাইর ইবন মুত‘য়ীম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«تقولون فيَّ التيه وقد ركبت الحمار ولبست الشملة وقد حلبت الشاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مَن فَعلَ هَذَا فَلَيْسَ فِيهِ مِنْ الْكِبْرِ شَيْءٌ»

“তোমরা বল, আমার মধ্যে অহংকার আছে! অথচ আমি গাধায় আরোহণ করছি, বস্তা পরিধান করছি এবং বকরীর দুধ দো‘আই-ছি। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ধরনের কাজ করে তার মধ্যে কোনো অহংকার থাকতেই পারেনা।[39]

অহংকারী এ ধরনের কোনো কাজ করতে পছন্দ করে না। তারা এ ধরনের কাজ হতে নাক ছিটকায়। সুতরাং যে এ ধরনের কাজগুলো করে তার মধ্যে অহংকার না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

---

[39] তিরমিযী, হাদীস নং ২০০১ এবং তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব।

আব্দুল্লাহ ইবন সালাম থেকে বর্ণিত,

«أنه مر في السوق وعليه حزمة من حطب، فقيل له: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا؟ فقال :أردت أن أدفع الكبر عن نفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال خردلة من كبر»

"তিনি একদিন বাজার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন আর তার মাথার ওপর একটি লাকড়ির বোঝা। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি কি কারণে মাথায় বোঝা বহন করছ? অথচ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এসব করার প্রতি মুখাপেক্ষী রাখেননি বরং তোমাকে এসব হতে মুক্ত করেছেন! তিনি বললেন, আমি আমার অন্তর থেকে অহংকারকে দুর করতে চাই। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে একবিন্দু পরিমাণও অহংকার থাকে"।[40]

---

[40] তাবরাণী, হাদীস নং ১২৯।

আমরা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদের ঐ সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা আল্লাহ ও তার মাখলুকের প্রতি বিনয়ী। আর আমাদের যেন অহংকার ও অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে হিফাযত করেন।

পরিশিষ্ট

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, গুনাহের মৌলিক উপাদান তিনটি:

এক. অহংকার: অহংকারই অভিশপ্ত ইবলীশকে ধ্বংসে নিপতিত করে এবং করুণ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।

দুই. লোভ: এ লোভই আদম 'আলাইহিস সালামকে জান্নাত থেকে বের করে।

তিন. বিদ্বেষ: হিংসা-বিদ্বেষই আদম সন্তানদের একজনকে তার ভাইকে হত্যার প্রতি বাধ্য করে।

যে ব্যক্তি এ তিন অপরাধ থেকে মুক্ত থাকবে, সে যাবতীয় সব অন্যায় অপরাধ থেকে বেঁচে থাকবে। কুফুরীর উৎপত্তি অহংকার থেকে আর গুনাহের উৎপত্তি লোভ থেকে এবং অন্যায়, অনাচার ও জুলুমের উৎপত্তি হিংসা বিদ্বেষ থেকে।[41]

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

---

[41] আল ফাওয়ায়েদ: ৫৮।

অনুশীলনী

এখানে দুই ধরনের প্রশ্ন পেশ করা হলো, এক ধরনের প্রশ্ন যেগুলোর উত্তর সাথে সাথে দেওয়া যাবে। আর এক ধরনের উত্তর সাথে সাথে দেওয়া যাবে না, বরং একটু চিন্তাভাবনা করে উত্তর দিতে হবে।

প্রথম প্রকার প্রশ্ন:

১- কিবিরের আভিধানিক অর্থ কি?

২- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবিরের পরিপূর্ণ ও প্রশ্নাতীত একটি সংজ্ঞা দেন, সে সংজ্ঞাটি কি?

৩- কিবির বা অহংকারের বিভিন্ন কারণ রয়েছে কারণগুলো কী?

৪- অহংকার বা কিবির কী কারণে হাসিল হয়?

৫- গুনাহের মৌলিক উপাদান কয়টি ও কী কী?

দ্বিতীয় প্রকার প্রশ্ন:

১- কিবর ও উজব দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

২- কখন ইলম অহংকারের কারণ হয়?

৩- দুনিয়াতে একজন অহংকারীকে কি দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে?

৪- আখিরাতে একজন অহংকারীকে কী দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে?

৫- কীভাবে একজন অহংকারীর চিকিৎসা করা যাবে?

অন্তর বিধ্বংসী বিষয়সমূহ: অহংকার, লেখক এ গ্রন্থে অহংকার ও অহংকারের মতো মারাত্মক রোগের অপকারিতা সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আলোকপাত করেছেন। সাথে সাথে অহংকার থেকে বাঁচার পথ-নির্দেশ করেছেন।
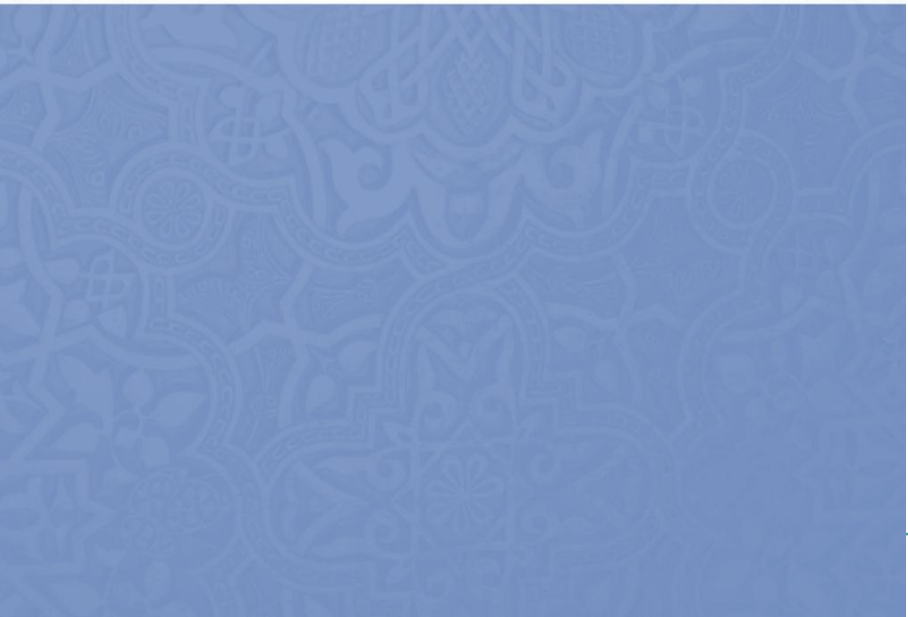
অন্তর-বিধ্বংসী বিষয়সমূহ: ঝগড়া-বিবাদ

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

৪০৩২

অনুবাদ: জাকের উল্লাহ্ আবুল খায়ের

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

مفسدات القلوب: الجدال والمراء

محمد صالح المنجد

ترجمة: : ذاكر الله أبو الخير

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচীপত্র

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ঝগড়া-বিবাদ এমন একটি কঠিন ব্যাধি ও মহা মুসিবত, যা মানুষের অন্তরকে করে কঠিন আর জীবনকে করে ক্ষতি ও হুমকির সম্মুখীন।

উলামায়ে কিরামগণ এর ক্ষতির দিক বিবেচনার বিষয়টি সম্পর্কে উম্মতদের খুব সতর্ক করেন এবং এ নিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের লেখালেখি করেন। এটি এমন একটি দুশ্চরিত্র যাকে সলফে সালেহীনরা খুব ঘৃণা করত এবং এ থেকে অনেক দূরে থাকত। আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, একজন কুরআন ওয়ালা বা জ্ঞানীর জন্য যে ঝগড়া করে তার সাথে ঝগড়া করা অনুরূপভাবে কোনো মূর্খের সাথে তর্ক করা কোনো ক্রমেই উচিৎ নয়। তার জন্য উচিৎ হলো, ঝগড়া- বিবাদ

পরিহার করা। ইবরাহীমে নখয়ী রহ. বলেন, সালফে সালেহীন ঝগড়া-বিবাদকে অধিক ঘৃণা করত।

তবে এ বিষয়ে প্রথমে আমাদের কয়েকটি বিষয় জানা অপরিহার্য।

এক. ঝগড়া-বিবাদ বলতে আমরা কী বুঝি?

দুই. আলিম উলামারা কেন ঝগড়া-বিবাদকে অধিক ঘৃণা করেন?

তিন. প্রসংশনীয় বিবাদ আর নিন্দনীয় বিবাদ কোনটি? উভয়টির উদাহরণ কী?

চার. ঝগড়া বিবাদ করা কি মানুষের স্বভাবের সাথে জড়িত নাকি তা তার উপার্জন।

এছাড়াও বিষয়টির সাথে আরো বিভিন্ন প্রশ্ন জড়িত। আশা করি এ কিতাবের মাধ্যমে আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাব। আমরা চেষ্টা করব সম্মানিত পাঠকদের এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে।

আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওফীক কামনা করি তিনি যেন আমাদের ভালো ও কল্যাণকর কাজগুলো করার তাওফীক দেন আর আমাদের ভুলগুলো শুধরিয়ে সঠিক ও কামিয়াবীর পথে পরিচালনা করেন। নিশ্চয় তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাশীল ও সক্ষম।

মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জেদ

ঝগড়া বিবাদ বলতে আমরা কী বুঝি?

এ বিষয়ে আরবীতে দু'টি শব্দ ব্যবহার হয়েছে। এক হলো, জিদাল আর দ্বিতীয় হলো, মিরা।

জিদাল: এর অর্থ হলো, ঝগড়া করা ও কথা কাটাকাটি করা। অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করা নিজের কথা সত্য প্রমাণ করা জন্য। এটি হলো, প্রতিপক্ষের সাথে ঝগড়া করা।

মুজাদালাহ: এর অর্থ হলো, বিতর্ক করা তবে সত্য বা সঠিককে প্রকাশ করার জন্য নয়, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য।

আল্লামা যাজ্জাজ রহ. বলেন, জিদাল "উচ্চ পর্যায়ের ঝগড়া ও বিতর্ক।

আল্লামা কুরতবী বলেন, কোনো কথাকে শক্তিশালী দলীল দ্বারা প্রতিহত করা।

আর মিরা' শব্দের অর্থ: কেউ কেউ বলেন, জিদাল। যেমন, আল্লামা তাবারী দু'টির অর্থ এক বলেছেন। আবার

কেউ কেউ বলেন, মিরা’ অর্থ হলো, অপরের কথার মধ্যে অপব্যাখ্যা করা। প্রতিপক্ষকে হেয় করা ছাড়া কোনো সৎ উদ্দেশ্য থাকে না।

কেউ কেউ বলেন, মিরা’ হলো, বাতিলকে সাব্যস্ত করার জন্য আর জিদাল কখনো বাতিলকে সাব্যস্ত করা ও না করা উভয়ের জন্য হয়ে থাকেন।

জিদাল ও মিরা’ উভয়ের মধ্যে প্রার্থক্য:

অনেকে বলেন, উভয় শব্দের অর্থ এক। তবে মিরা’ হলো নিন্দনীয় বিতর্ক। কারণ, এটি হলো, হক প্রকাশ পাওয়ার পরও তা নিয়ে অনর্থক বিতর্ক করা। তবে জিদাল এ রকম নয়।

কুরআন নিয়ে জিদাল করার অর্থ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«المِرَاءُ فِي القُرْآنِ كُفْرٌ»

“কুরআন নিয়ে ঝগড়া কুফুরী।[1]

কুরআন নিয়ে বিবাদ করাকে কুফুরী বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু কুরআন বিষয়ে বিবাদ করার অর্থ কি?

কুরআন বিষয়ে বিবাদের অর্থ: কুরআন বিষয়ে বিবাদের অর্থ হলো, কুরআনের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা। আর কুরআনের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা নিঃসন্দেহে কুফর। যদি কোনো ব্যক্তি সন্দেহ করে যে কুরআন কি আল্লাহর বাণী অথবা কেউ বলে যে, ইহা আল্লাহর মাখলুক সে অবশ্যই কাফির। **অনুরূপভাবে যদি** যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে যা নাযিল করেছেন, তার

---

[1] আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৩। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

কোনো বিধান বা কিছু অংশকে অস্বীকার করার অনুসন্ধানে থাকে, সেও নিঃসন্দেহে কাফির। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এখানে মুজাদালা বা মুমারাত অর্থ সন্দেহ সংশয়।

কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা তাফসীর বিষয়ে বিতর্ক করাকে জিদাল বলা হয় না। যেমন কোনো ব্যক্তি বলল, কুরআনের এ আয়াতের অর্থ এটি? নাকি এটি? তারপর একাধিক অর্থ হতে কোনো একটিকে প্রাধান্য দিল। এ ধরনের বিতর্ককে জিদাল বলা হবে না, বরং এ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণীর মর্মার্থ জানার জন্য পর্যালোচনা করা।

মোটকথা, কুরআন বিষয়ে বিবাদ করাকে কুফুর বলে আখ্যায়িত করা তখন হবে, যখন কুরআনকে সন্দেহ, সংশয় ও অস্বীকার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

জুনদুব ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ»

"যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মনোযোগ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর। আর যখন তোমাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তোমরা কুরআন পড়া ছেড়ে দাও।[2]

এ কথাটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে:

- যখন তোমরা কুরআনের অর্থ বোঝার মধ্যে মতবিরোধ কর, তখন তোমরা কুরআন নিয়ে আলোচনা ছেড়ে দাও। কারণ, হতে পারে তোমাদের ইখতেলাফ তোমাদেরকে কোনো খারাপ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে।
- অথবা হতে পারে এখানে যে নিষেধ করা হয়েছে, তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের সাথে খাস।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৬০।

➢ অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী যে অর্থ বোঝায় বা তোমাদের যে অর্থের দিক নিয়ে যায়, তার ওপর তুমি মনোযোগী হও এবং তাই তুমি গ্রহণ করতে থাক। আর যখন তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিবে বা সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হবে, যা তোমাকে বিবাদের দিকে ঠেলে দেয়, তখন তুমি তা থেকে বিরত থাক। আয়াতের প্রকাশ্য ও স্পষ্ট অর্থই গ্রহণ কর এবং অস্পষ্টতা যা বিবাদের কারণ হয় তা ছেড়ে দাও। বাতিল পন্থীরা কুরআনের অস্পষ্ট বিষয়গুলো নিয়েই টানাটানি করে এবং ফিতনা সৃষ্টি করার জন্য তাতেই তারা বিবাদ করে।

উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এমন কতক লোকের আগমন ঘটবে যারা কুরআনের সংশয়যুক্ত আয়াত নিয়ে তোমাদের সাথে বিবাদ করবে। তোমরা সুন্নাতের মাধ্যমে তাদের প্রতিহত কর। কারণ, যারা সুন্নাত বিষয়ে অভিজ্ঞ তারা আল্লাহর কিতাব বিষয়ে

অধিক জ্ঞান রাখে।[3] এ ছাড়া সুন্নাত আল্লাহর বাণীর মর্মার্থকে তুলে ধরে এবং কুরআনের ব্যাখ্যা করে।

---

[3] দারমী, হাদীস নং **১১৯**।

ঝগড়া-বিবাদ মানুষের স্বভাবের সাথে আঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত

ঝগড়া-বিবাদ করা মানুষের স্বভাবের সাথে জড়িত। প্রাকৃতিক ভাবে একজন মানুষ অধিক ঝগড়াটে স্বভাবের হয়ে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَقَدۡ صَرَّفۡنَا فِي هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٖۚ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ أَكۡثَرَ شَيۡءٖ جَدَلٗا﴾ [الكهف:54]

“আর আমরা এই কুরআনে মানুষের জন্য সকল প্রকার উপমা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। আর মানুষ সবচেয়ে বেশি তর্ককারী।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ৫৪]

অর্থাৎ সবচেয়ে অধিক ঝগড়াকারী ও প্রতিবাদী, সে সত্যের পতি নমনীয় হয় না এবং কোনো উপদেশ-কারীর উপদেশে সে কর্ণপাত করে না।[4]

আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ও তার মেয়ে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে তাদের উভয়ের দরজায়

---

[4] তাফসীরে কুরতবী ২৪১/৮।

পাড়ি দিয়ে উভয়কে জিজ্ঞাসা করে বলেন, তোমরা উভয়ে কি সালাত আদায় করনি? আমরা তাকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জীবনতো আল্লাহর হাতে, তিনি ইচ্ছা করলে আমাদের জাগাতে পারতেন। আমরা এ কথা বলার সাথে সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করে ফিরে যান। আমাকে কোনো প্রতি উত্তর করেন নি। তারপর আমি শুনতে পারলাম তিনি যাওয়ার সময় তার রানে আঘাত করে বলছে [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ৪৫] অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দ্রুত উত্তর দেওয়া ও ব্যাপারটি নিয়ে কোনো প্রকার নিজের দুর্বলতা প্রকাশ না করাতে অবাক হন। এ কারণেই তিনি স্বীয় উরুর উপর আঘাত করেন।

তবে এখানে একটি কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, তা হলো মানুষ হিসেবে সবার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করার গুণ প্রাকৃতিক হলেও কোনো কোনো মানুষ এমন আছে, যার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করার গুণ অন্যদের তুলনায় অধিক বেশি এবং সে ঝগড়া করতে অন্যদের তুলনায়

অধিক পারদর্শী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফিরদের নিকট রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করার পর কাফিরদের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِنَّمَا يَسَّرۡنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلۡمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوۡمٗا لُّدّٗا﴾ [مريم:97]

"আর আমরা তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি এর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং কলহপ্রিয় কওমকে তদ্বারা সতর্ক করতে পার।" [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৯৭]

এখানে লুদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অনর্থক ও অন্যায়ভাবে ঝগড়া-কারী যে সত্যকে গ্রহণ করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা আহলে বাতিল সম্পর্কে আরো বলেন,

﴿وَقَالُوٓاْ ءَأَٰلِهَتُنَا خَيۡرٌ أَمۡ هُوَۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَۢاۚ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ خَصِمُونَ﴾ [الزخرف:58]

"আর তারা বলে, 'আমাদের উপাস্যরা শ্রেষ্ঠ নাকি ঈসা'? তারা কেবল কূটতর্কের খাতিরেই তাকে তোমার সামনে

পেশ করে। বরং এরাই এক ঝগড়াটে সম্প্রদায়।” [সূরা আয-যুখরফ, আয়াত: ৫৮] অর্থাৎ ঝগড়ায় তারা পারদর্শী।

কোন কোনো মানুষকে আল্লাহ তা‘আলা ঝগড়া-বিবাদ করার জন্য অধিক যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করে থাকেন, তার প্রমাণ হলো, কা‘আব ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর হাদীস। কা‘আব ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যখন তাবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা হতে বিরত থাকেন, তখন তিনি তার নিজের বিষয়ে বর্ণনা দিয়ে বলেন,

«لم أتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، ...قال كعب بن مالك :فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول :بماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل : إن رسول الله قد أظل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه ... فجئته، فلما سلمت عليه تبسم تبسُّم المغضب، ثم قال **تَعالَ** فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي « مَا خَلَّفَكَ؟»

فقلت :إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا ... الحديث

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত যুদ্ধ করেছে, একমাত্র তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা হতে আমি বিরত থাকিনি। তারপর যখন আমার নিকট খবর পৌঁছল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাফেলা নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেছেন, তখন সব চিন্তা এসে আমাকে গ্রাস করে ফেলল, তখন আমি মিথ্যার অনুসন্ধান করতে লাগলাম। আগামী দিন আমি কি অপারগতা দেখিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আক্রোশ থেকে রেহাই পাব! আমি আমার পরিবারের বিজ্ঞ, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকদের কাছ থেকে মতামত নিতে থাকি।... তারপর যখন আমাকে জানানো হলো, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরৎ আসছে তখন আমার থেকে যাবতীয় সব ধরনের অনৈতিক ও বাতিল চিন্তা দূর হয়ে গেল। আর আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম হতে বাচার জন্য এমন কোনো কথা বলবো না যার মধ্যে মিথ্যার অবকাশ থাকে। আমি সব সত্য কথাগুলো আমার অন্তরে গেঁথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে উপস্থিত হই। আমি যখন তাকে সালাম দিলাম, তখন সে একটি মুচকি হাসি দিল; একজন ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত ব্যক্তির মুচকি হাসির মত। তারপর সে আমাকে বলে আস! আমি পায়ে হেটে তার দিকে অগ্রসর হয়ে তার সামনে বসে পড়লাম। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করে বলেন, কোনো জিনিস তোমাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ হতে বিরত রাখল? তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল! আল্লাহর শপথ করে বলছি! যদি আমি আপনি ছাড়া দুনিয়াদার কোনো লোকের সামনে বসতাম, তাহলে আমি কোনো একটি অপারগতা বা কারণ দেখিয়ে তার আক্রোশ ও ক্ষোভ হতে মুক্তি পেতাম। আমাকে এ

ধরনের ঝগড়া ও বিবাদ করার যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে...।[5]

এখানে হাদীসে কা‘আব ইবন মালেকের أعطيت جدلا কথাটিই হলো আমাদের প্রামাণ্য উক্তি। এখানে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, আমাকে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে কথা বলার এমন এক যোগ্যতা, শক্তি ও পাণ্ডিত্য দেওয়া হয়েছে, যার দ্বারা আমি আমার প্রতি যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, তা হতে অতি সহজেই বের হয়ে আসতে পারতাম। আমি আমাকে আঠা থেকে চুল যেভাবে বের করে আনে, সেভাবে বের করে আনতে পারতাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তার স্বীয় ঘরের দরজায় ঝগড়ার আওয়াজ শুনতে পেয়ে ঘর থেকে বের হলেন। তারপর তিনি তাদের বললেন,

---

[5] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪১৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৬৯।

«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ؛ فَأَحْسَبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا»

"অবশ্যই আমি একজন মানুষ। আর আমার নিকট অনেক বিচার ফায়সালা এসে থাকে। আমি দেখতে পাই অনেক এমন আছে যারা বিতর্কে তার প্রতিপক্ষের চেয়ে অধিক পারদর্শী। তখন তার কথার পেক্ষাপটে আমার কাছে মনে হয় সে সত্যবাদী। ফলে আমি তার পক্ষে ফায়সালা করে থাকি। তবে আমি যদি কোনো মুসলিম ভাইয়ের হককে কারো জন্য ফায়সালা করে দিই, মনে রাখবে, তা হলো আগুনের একটি খণ্ড! চাই সে তা গ্রহণ করুক অথবা ছেড়ে যাক"।[6]

মানুষের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করার এ গুণটি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হবে এমনকি কিয়ামত কায়েম হওয়ার পরেও

[6] বুখারি: ৪৪১৮ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৬৯

মানুষের মধ্যে ঝগড়া করার গুণটি অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَوۡمَ تَأۡتِي كُلُّ نَفۡسٖ تُجَٰدِلُ عَن نَّفۡسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا عَمِلَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ﴾[النحل:111]

“(স্মরণ কর সে দিনের কথা) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পক্ষে যুক্তি-তর্ক নিয়ে উপস্থিত হবে এবং প্রত্যেককে ব্যক্তি সে যা আমল করেছে তা পরি পূর্ণরূপে দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি জুলম করা হবে না”। [সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ১১১]

অর্থাৎ দুনিয়াতে সে যা করেছে, সে বিষয়ে সে ঝগড়া-বিবাদ করবে এবং প্রমাণ পেশ করবে। আর আত্মপক্ষ সমর্থন করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চেষ্টা করবে।

আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كنا عند رسول الله فضحك فقال: هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ ؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: مِنْ مُخَاطَبَةِ العَبدِ رَبَّهُ،

يَقُولُ :يَا رَبِّ، أَلَمْ تجُرْنِي مِنَ الظلمِ؟ قَالَ :يَقُولُ :بَلَى .قَالَ:
فَيقُولُ :فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِداً مِنِّي قَالَ :
فَيَقُولُ:كَفَى بنفسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيداً، وَبالكرامِ الكَاتبِينَ
شُهُوداً.قَالَ : فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُقَالُ لِأَرْكَانهِ: انْطِقِي قَالَ :
فَتَنْطقُ بأَعْمَالِهِ .قَالَ :ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَلَامِ، قَالَ :فَيَقُولُ :
بُعْداً لَكُنَّ وَسُحْقاً، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ»

“একদিন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি হাসি দিলেন। তারপর তিনি আমাদের বললেন, তোমরা কি জান আমি কি কারণে হাসলাম? আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমরা বললাম আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালো জানেন। বান্দা তার রবকে সম্বোধন করে যে কথা বলবে, তার কথা স্মরণ করে আমি হাসছি! সে বলবে, হে আমার রব তুমি আমাকে জুলুম থেকে মুক্তি দেবে না। তখন আল্লাহ বলবে অবশ্যই! তখন বান্দা বলবে আমি আমার পক্ষে মাত্র একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো আল্লাহ বলবে আজকের দিন তোমার জন্য কিরামান কাতেবীনের

অসংখ্য সাক্ষীর বিপরীতে একজন সাক্ষীই যথেষ্ট। তারপর আল্লাহ তা‘আলা তার মুখের মধ্যে তালা দিয়ে দিবে এবং তার অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা কথা বল! তখন প্রতিটি অঙ্গ তার কর্ম সম্পর্কে বলবে। তারপর তাকে তার কথা মাঝে ছেড়ে দেওয়া হবে। তখন সে তাদের বলবে তোমাদের জন্য ধ্বংস! আমি তোমাদের জন্যই বিতর্ক ও বিবাদ করছি![7] আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন কাফিরদের ঝগড়ার বিবরণ দিয়ে বলেন,

﴿وَيَوۡمَ نَحۡشُرُهُمۡ جَمِيعٗا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشۡرَكُوٓاْ أَيۡنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمۡ تَزۡعُمُونَ ٢٢ ثُمَّ لَمۡ تَكُن فِتۡنَتُهُمۡ إِلَّآ أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشۡرِكِينَ ٢٣ ٱنظُرۡ كَيۡفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡۚ وَضَلَّ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ ٢٤﴾[الأنعام:22-23]

“আর যেদিন আমরা তাদের সকলকে সমবেত করব তারপর যারা শিরক করেছে তাদেরকে বলব, ‘তোমাদের শরীকরা কোথায়, যাদেরকে তোমরা (শরীক) মনে করতে?’ অতঃপর তাদের পরীক্ষার জবাব শুধু এ হবে

---

[7] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৯৬৯।

যে, তারপর তারা বলবে, ‘আমাদের রব আল্লাহর কসম! আমরা মুশরিক ছিলাম না’। দেখ, তারা কীভাবে মিথ্যা বলেছে নিজদের ওপর, তারা যে মিথ্যা রটনা করত, তা তাদের থেকে হারিয়ে গেল।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ২২-২৪]

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتهُ، فَيقولُ الله تَعَالَى :هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيقول :نَعمْ، أَيْ رَبِّ .فَيقُولُ لِأمتهِ :هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيقُولوُنَ :لَا، مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِي .فَيقَولُ لنوحٍ: منْ يَشْهَدُ لكَ؟ فَيقولُ :مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ . فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ، وَهُوَ قَوْلُه جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ﴾ »

“নূহ ‘আলাইহিস সালাম ও তার উম্মতরা আল্লাহর দরবারে আসবে তখন আল্লাহ তা‘আলা নুহকে জিজ্ঞাসা করবে তুমি তাদের দাওয়াত দিয়েছ? বলবে হা, হে আমার রব! তারপর উম্মতদের জিজ্ঞাসা করা হবে

তোমাদের নিকট কি দাওয়াত দিয়েছে? তার বলবে না হে আমাদের প্রভু! আমাদের নিকট কোনো নবী আসেনি। তখন আল্লাহ তা‘আলা নূহ ‘আলাইহিস সালামকে বলবে হে নূহ, তোমার পক্ষে কে সাক্ষ্য দেবে? তখন সে বলবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার উম্মতেরা। তারপর আমরা সাক্ষী দেব যে, সে তার উম্মতদের পৌঁছিয়েছে। আর তা হলো, আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ﴾[البقرة:143]

“ আর এভাবেই আমরা তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষী হও এবং রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের ওপর”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪৩]

ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির কারণসমূহ

আমরা যদি একটু নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, কি কারণে মানুষের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ ও মতবিরোধ তৈরি হয়? তাহলে আমরা এর অনেকগুলো কারণ খুঁজে পাবো। সব কারণ উল্লেখ করা সম্ভব নয়। নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আলোচনা করা হলো:

1. প্রকাশ্যে উপদেশ দেওয়া।
2. অসময়ে উপদেশ দেওয়া।
3. অনুপযোগী স্থানে উপদেশ দেওয়া। **যার ফলে অন্যরা তাকে ঘৃণা করে ও লজ্জা দেয়।**
4. আবার কখনো ঝগড়া বিবাদের কারণ হয়, অন্যের নিকট যা আছে তা লাভের জন্য পদক্ষেপ নেয়া বা তার প্রতি লোভ করা।
5. অন্যের ওপর যে কোনো উপায়ে প্রাধান্য বিস্তার বা বিজয়ী হওয়ার জন্য অধিক চেষ্টা করা। আর তা চাই অনৈতিক পদ্ধতিতে হোক বা সঠিক পদ্ধতিতে। মোট

কথা যে কোনোভাবে তাকে প্রাধান্য বিস্তার করতেই হবে।

6. আর কখনো সময় পরিবেশ ও পরিপার্শ্বিকতা মানুষের মধ্যে ঝগড়া বিবাদকে উসকিয়ে দেয়। বিশেষ করে যুব সমাজকে পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থা ঝগড়া-বিবাদের দিকে ঠেলে দেয়। তাই উচিৎ হলো, তাদের এ ব্যাপারে অধিক সতর্ক করা। আবার কখনো কখনো দেখা যায়, দীনদার ও দা'ঈদের মধ্যেও ঝগড়া-বিবাদ পরিলক্ষিত হয়, যা তাদের মধ্যে ফিরকা-বন্দি ও দলাদলিকে উসকিয়ে দেয়। আবার কখনো দেখা যায় স্কুল মাদ্রাসার শিক্ষকদের মধ্যেও ঝগড়া-বিবাদ দেখা দেয়। অনেক সময় তারা ছাত্রদের সাথে বিবাদ ও বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে, যার প্রভাবে ছাত্রদের মধ্যেও এ ঘৃণিত গুণটি সয়লাব করে এবং তারা ঝগড়াটে স্বভাবের হয়ে যায়। আবার কখনো এমন হয় যে, মাতা-পিতা ঝগড়াটে হলে, তার প্রভাবে ছেলে সন্তানও ঝগড়াটে হয়। এ জন্য অভিভাবকদের

উচিৎ তারা যেন এ ঘৃণিত অভ্যাসটি পরিহার করে এবং তা থেকে বেচে থাকে।

7. অহংকার, ধোঁকাবাজি ও অহমিকা ইত্যাদি ঝগড়ার কারণ হয়।
8. আল্লাহর ভয় না থাকাও ঝগড়া-বিবাদের অন্যতম কারণ।
9. অবসর থাকা। কোনো কাজকর্ম না থাকলে মানুষ ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। একজন অবসর সৈনিক তাকে দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। তুমি যদি চিন্তা কর, তাহলে দেখতে পাবে কেবল অবসর লোক, যাদের কোনো কাজ নাই তারাই বেশিরভাগ ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকে। আর এটাই ঝগড়া বিবাদের অন্যতম কারণ।

প্রশংসনীয় বিতর্কের শর্তাবলী

আমরা যখন কোনো বিষয়ে বিতর্ক করতে যাব, তখন আমাদের বিতর্কে যাওয়ার পূর্বে কি কি শর্তাবলী মেনে চলা উচিৎ, তা অবশ্যই জানা থাকতে হবে।

প্রশংসনীয় বিতর্কের শর্তাবলী নিম্নরূপ:

এক. বিতর্ক হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। বিতর্ক দ্বারা বরকত লাভ ও ফায়েদা হাসিলের জন্য এখলাস হলো পূর্বশর্ত। কারণ, তর্কের উদ্দেশ্য হলো, সত্য উদঘাটন করা এবং হককে জানা। এ কারণে এ বিষয়ে বিতর্কে যাওয়ার পূর্বে আল্লাহর ভয় অন্তরে বিদ্যমান থাকতে হবে এবং সদিচ্ছা ও সুন্দর নিয়ত থাকতে হবে। তাহলেই বিতর্ক দ্বারা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছা যাবে।

দুই. বিতর্ক হতে হবে উত্তম পদ্ধতিতে।

তিন. বিতর্ক করতে হবে ইলমের দ্বারা। অর্থাৎ যে বিষয়ে বিতর্ক করবে, সে বিষয়ে অবশ্যই তার জ্ঞান থাকতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿هَٰٓأَنتُمۡ هَٰٓؤُلَآءِ حَٰجَجۡتُمۡ فِيمَا لَكُم بِهِۦ عِلۡمٞ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيۡسَ لَكُم بِهِۦ عِلۡمٞۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾[آل عمران:66]

“সাবধান! তোমরা তো সেসব লোক, বিতর্ক করলে এমন বিষয়ে, যার জ্ঞান তোমাদের রয়েছে। তবে কেন তোমরা বিতর্ক করছ সে বিষয়ে যার জ্ঞান তোমাদের নেই? আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৬৬]

চার. আল্লাহ তা‘আলার নামের মাধ্যমে বিতর্ক শুরু করবে। সুতরাং, উভয় পক্ষ আল্লাহর নাম ও বিছমিল্লাহ দ্বারা বিতর্ক শুরু করবে। যদি মুখে উচ্চারণ করতে না পারে, তবে তাকে অবশ্যেই অন্তরে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে হবে।

পাঁচ. মজলিশের আদব ও প্রতিপক্ষের সম্মান রক্ষা করতে হবে এবং তার সামনে সুন্দর ও বিনম্র-ভাবে বসবে।

ছয়. প্রবৃত্তির পূজা করা হতে বের হতে হবে। তর্কের মাঝে যদি কোনো মানুষ বুঝতে পারে, সে ভুলের ওপর আছে এবং তার প্রতিপক্ষ হকের ওপর, তখন তার উচিৎ হলো, সে তার ভুল থেকে ফিরে আসবে এবং প্রতি পক্ষের কথা মেনে তার নিকট আত্মসমর্পণ করবে। যে ব্যক্তি সালফে সালেহীনদের জীবনী পাঠ করবে, তার জন্য ভুল থেকে ফিরে আসা অনেকটা সহজ হবে।

মুহাম্মদ ইবন কা'ব থেকে বর্ণিত, এক লোক আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি তার মতামত দেন। কিন্তু লোকটি তাকে বলল, বিষয়টি এমন নয় বরং বিষয়টি এ রকম। তখন আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলল, তুমি সঠিক বলছ আর আমি ভুল করছি। আল্লাহ বলেন,

﴿وَفَوۡقَ كُلِّ ذِي عِلۡمٍ عَلِيمٌ﴾[يوسف:76]

“এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপর রয়েছে একজন জ্ঞানী। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৬]

তাউস রহ. বর্ণনা করেন, যায়েদ ইবন সাবেত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উভয় তাওয়াফে বিদা করার আগে কোনো মহিলার মাসিক আরম্ভ হলে তার বিধান কি হবে, এ নিয়ে মতবিরোধ করেন। মহিলাটি কি তাওয়াফে বিদা না করে বিদায় নিবে, নাকি সে তাওয়াফ করবে? ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, সে বিদায় নিবে, আর যায়েদ ইবন সাবেত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন সে বিদায় নিবে না। তারপর যায়েদ ইবন সাবেত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, সে বিদায় নিবে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার উত্তর শুনে যায়েদ ইবন সাবেত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মুচকি হেসে বের হন এবং আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলেন, কথা সেটাই যা তুমি বলছ।

ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন, এটাই হলো ইনসাফ! যায়েদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হলেন ইবন আব্বাসের শিক্ষক। তারপরও তিনি তার ওপর কোনো চাপ সৃষ্টি

করেননি। আমরা কেন তাদের অনুকরণ করব না। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমরা জানি ইমাম আবু হানিফা রহ. ছিলেন বিতর্কে অত্যন্ত পারদর্শী ও বুদ্ধিমান বিতর্ককারীদের একজন। যারা সত্য ও হককে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিতর্ক করত তিনি ছিলেম তাদের অন্যতম ও বিখ্যাত। কিন্তু তিনি তার ছেলেকে বিতর্ক করতে নিষেধ করেন। তখন তার ছেলে তাকে বলে আপনাকে আমি বিতর্ক করতে দেখছি, অথচ আপনি আমাদের না করছেন!

উত্তরে তিনি বলেন, আমরা যখন কথা বলতাম, তখন আমাদের প্রতিপক্ষের সম্মানহানি হওয়ার ভয়তে এমন করে বসতাম, যেন আমাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। আর বর্তমানে তোমরা বিতর্ক কর, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল ও সম্মানহানি করার জন্যই।

ইমাম শাফে‘ঈ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কল্যাণ কামনা করা ছাড়া কখনোই কারো সাথে বিতর্ক করি নি। আর কারো সাথে এ জন্য বিতর্ক করিনি যে সে ভুল

করুক।[৪] অর্থাৎ আমরা এ কামনা করে কখনোই বিতর্ক করিনি যে, আমার প্রতিপক্ষ হেরে যাক। কারণ, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সত্যকে উদঘাটন করা সেটা চাই আমার পক্ষ থেকে হোক বা তার পক্ষ থেকে হোক।

বর্ণিত আছে একবার ইমাম শাফে‘ঈ রহ. একটি বিষয় যার মধ্যে দুইটি মতামত বিদ্যমান, তা নিয়ে কোনো এক আহলে ইলমের সাথে বিতর্ক করেন। তারপর ইমাম শাফে‘ঈ রহ. তার প্রতিপক্ষের মতকে গ্রহণ করেন আর প্রতিপক্ষ ইমাম শাফে‘ঈর মতকে গ্রহণ করে। এভাবেই তাদের বিতর্কের সমাপ্তি হয়।

সাত. ধৈর্য ও সহনশীলতা থাকতে হবে। কারণ, ধৈর্য ও সহনশীলতা ছাড়া বিতর্ক তিক্ততা ও খারাপ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে।

আট. বিতর্কের সময় ধীরস্থিরিতা থাকতে হবে। শুধু তাড়াহুড়া করলে চলবে না। কারণ, শুধু আমি আমার কথা বলতে থাকলাম আমার প্রতিপক্ষকে কথা বলার

[৪] দেখুন: তারিখে দেমশক ৩৮৪/৫১

সুযোগ দিলাম না তাহলে শুধু কথা বলাই হবে। প্রতিপক্ষের নিকট কি আছে তা শোনা বা জানা হবে না।

নয়. সত্য কথা বলার ওপর অটল অবিচল থাকতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗا ٣٦﴾ [الإسراء: ٣٦]

“আর যে বিষয় তোমার জানা নাই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তকরণ- এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।” [সুরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩৬]

দশ. প্রতিপক্ষের সাথে বিনম্র আচরণ করতে হবে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, আমরা যখন কোনো বিষয়ে তর্ক করি আমাদের উদ্দেশ্য হলো, ফলাফল বের ও সত্য উদঘাটন করা। আমাদের উদ্দেশ্য সময় নষ্ট করা বা প্রতিপক্ষের ওপর বিজয় লাভ করা নয়।

সুতরাং প্রতিপক্ষকে নাজেহাল করা, মানুষের সামনে তাকে নির্বাক ও হেয় প্রতিপন্ন করা, তাকে কথা বলার সুযোগ না দেওয়া বা তার সাথে এমন কথা বলা, যা তার অন্তরে আঘাত আনে ও ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার শামিল হয় এবং মানুষের সামনে তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ ও হাসির পাত্র বানিয়ে ফেলে, তা কোনো ক্রমেই উচিৎ নয়।

এগার. প্রতিপক্ষ ফিরে আসার জন্য পথকে উম্মুক্ত রাখবে। সে যদি হেরে যায় তাহলে তাকে হেয় করবে না। তার সাথে কোনো প্রকার দুর্ব্যবহার করবে না। তার কথা ভালোভাবে শুনবে। কারণ, তার কথা ভালোভাবে শুনা দ্বারা তুমি অর্ধেক ফলাফলে পৌঁছে যাবে।

বার. ইনসাফ করা। যদি তোমার প্রতিপক্ষ কোনো সত্য কথা বলে, তা স্বীকার করে নেয়া এবং তার মান-মর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়া।

আবু মুহাম্মদ ইবন হাযাম বলেন, একবার আমি আমার এক সাথীর সাথে মুনাযারা করি। তার মুখের মধ্যে তোতলামি থাকাতে আমি তার ওপর বিজয় লাভ করি।

আমাকে মজলিশে বিজয়ী ঘোষণা করে মজলিশ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আমি যখন মজলিশ শেষ করে ঘরে ফিরি, তখন আমার অন্তরে সন্দেহ হলে আমি কিতাবের শরণাপন্ন হই এবং কিতাবে একটি বিশুদ্ধ প্রমাণ দেখতে পাই যা আমার প্রতিপক্ষের কথাকে বিশুদ্ধ আর আমার কথাকে বাতিল বলে প্রমাণ করে। আমার সাথে একজন সাথী ছিল যে আমাদের তর্কের মজলিসে উপস্থিত ছিল। আমি তাকে কিতাবের বিষয়টি অবহিত করলে সে বলে তুমি এখন কি করতে চাও? আমি বললাম কিতাবটি নিয়ে তার কাছে গিয়ে পেশ করবো এবং তাকে বলব তুমি হক আর আমি বাতিল। আর তার কথা কবুল করে নেব। সে বলল, তুমি তোমাকে হেয় করবে? আমি বললাম হা! আমি যদি এ মুহূর্তে তা করতে পারতাম তাহলে আগামীর জন্য অপেক্ষা করতাম না। তবে আমি এখনই আমার মতকে প্রত্যাখ্যান করে তার মতের দিকে ফিরে আসলাম।

তের. মার্জিত ও সম্মান সূচক বাক্য ব্যবহার করে কথা বলবে। চিৎকার করবে না ও অমার্জিত কথা বলবে না।

কোনো এক ব্যক্তি মজলিশে চিৎকার করলে পরিচালনাকারী বলেন, হে আব্দুস সামাদ সত্য তো সঠিক কথার মধ্যে কঠিন আওয়াজে নয়। সুতরাং চিৎকার দ্বারা কোনো ফায়সালা হয় না।

চৌদ্দ. ঝগড়া পরিহার করা। অনেক লোক আলিমদের ইলম থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের সাথে বিবাদ করার কারণে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কোনো এক ছাত্র বলছিল, আমি যদি ইবন আব্বাসের সাথে বন্ধুত্ব করতাম, তাহলে তার থেকে আরো অনেক ইলম শিখতে পারতাম।[9] ইবন জুরাইয রহ. বলেন, আমি যত কিছু আতা থেকে শিখেছি তা তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ দ্বারাই শিখছি।[10]

পনের. বিতর্কের জন্য শর্ত হলো, তা আলিমদের সম্মুখে হবে যাহেলদের সম্মুখে নয়।

---

[9] দেখুন তারিখে দামেশক [২৯৭/২৯]

[10] দেখুণ: মিফতাহুস সাআদাত [১৬৯/১]

ষোল. মতামতের পার্থক্য বন্ধুত্ব নষ্ট করতে পারবে না। ইমাম আহমদ রহ. একবার আলী ইবনুল মাদিনীর সাথে বিতর্ক করতে গিয়ে মজলিশে তারা একে অপরের সাথে উচ্চ বাচ্য করেন। কিন্তু আলী ইবনুল মাদীনি যখন মজলিশ থেকে উঠে চলে যেতে লাগল, তখন ইমাম আহমদ উঠে তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে তাকে বিদায় দেন।

সতের. যে সব কথা মানুষের চিন্তা চেতনা ও বিশ্বাসের পরিপন্থী ঐ ধরনের কথা হতে বিরত থাকা উচিৎ।

আঠার. সব ধরনের হিলা ও ষড়যন্ত্র পরিহার করবে। আর একজন বিচারক নির্ধারণ করবে যে উভয় পক্ষের কথা নোট করবে, যাতে কেউ কোনো কথা বলে অস্বীকার করতে না পারে।

উনিশ. কতক লোক আছে তাদের সাথে বিতর্ক সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। যেমন, মূর্খ যে তার মূর্খতাকে স্বীকার করে না, সীমালঙ্ঘন কারী, আহাম্মক এবং যে মিথ্যা সাক্ষী দেয়।

বিতর্কের প্রকারভেদ

বিতর্ক দুই প্রকার:

এক- প্রশংসনীয় বিতর্ক।

দুই- নিন্দনীয় বা মন্দ বিতর্ক।

বিতর্ক দ্বারা কখনো কথোপকথন, প্রমাণ উত্থাপন ও মতামত প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এ ধরণের বিতর্ক প্রশংসনীয়। আর বিতর্ক মানে যখন তিক্ততা, বাক বিতণ্ডা ও ঝগড়া-বিবাদ হয়, তা হলো, নিন্দনীয় বা মন্দ বিতর্ক। আল্লাহ তা'আলা উত্তম ও প্রশংসনীয় বিতর্কের জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ﴾ [النحل:125]

"তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে

তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াত প্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন। [সূরা নাহাল: ১২৫]

সুতরাং তোমাদের বিতর্ক যেন হয় উত্তম পদ্ধতিতে, নম্র, ভদ্র ও সুন্দর বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমে। আর আমাদের বিতর্ক যেন খারাপ ভাষায় না হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡۖ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمۡ وَٰحِدٞ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ﴾ [العنكبوت:46]

“আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করো না। তবে তাদের মধ্যে ওরা ছাড়া, যারা জুলুম করেছে। আর তোমরা বল, ‘আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই। আর আমরা তাঁরই সমীপে আত্মসমর্পণকারী”। [সূরা আল-‘আনকাবুত, আয়াত: ৪৬] আর উত্তম দ্বারা বিতর্ক করার অর্থ:

১. কুরআন দ্বারা বিতর্ক করা।

২. কেউ কেউ বলে, লা ইলাহা... দ্বারা বিতর্ক করা।

৩. আবার কেউ কেউ বলে, তাদের সাথে বিতর্ক করা কোনো প্রকার কঠোরতা ও তিক্ততা ছাড়া আর তাদের জন্য তুমি তোমার পার্শ্বকে বিছিয়ে দাও।

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী-

﴿وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡۖ﴾

এর অর্থ হলো, কিন্তু যারা তোমাদের জন্য সত্যকে স্বীকার করতে অস্বীকার করে এ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না। তবে যারা কর দিতে অস্বীকার করে এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকে, তাদের সাথে মৌখিক বিতর্ক নয়। কারণ, তাদের সাথে বিতর্ক হলো, তলোয়ার বা যুদ্ধ। তাদের সাথে এ অবস্থায় মৌখিক বিতর্ক করা সম্ভব নয়।

নিন্দনীয় বা মন্দ বিতর্ক:

যে বিতর্ক দ্বারা বাতিলকে বিজয়ী করা হয় এবং সঠিক ও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাকে নিন্দনীয় বা মন্দ বিতর্ক বলা হয় ।

আল্লামা যাহবী রহ. বলেন, বিতর্ক যদি সত্য উদঘাটন ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তাহলে তা হবে প্রশংসনীয়। আর যদি তা সত্যকে প্রতিহত করা অথবা না জেনে করা হয়, তা হবে নিন্দনীয়।[11]

প্রশংসনীয় বিতর্ক:

যে বিতর্ক খালেস নিয়ত ও কোনো কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তা হলো, প্রশংসনীয়। আর এ ধরনের বিতর্ক আল্লাহর দ্বীনের জন্য করা একজন মুসলিমের ওপর দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লামা ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, যে ব্যক্তি নাস্তিক মুরতাদ ও বেদাতিদের সাথে এমন বিতর্ক না করে, যে বিতর্ক

[11] আল-কাবায়ের।

তাদের মুলোৎপাটন ও জড় কেটে দেয়, তাহলে সে ইসলামের হক আদায় করেনি এবং সে ঈমান ও ইলমের চাহিদা পূরণ করেনি। তার কথা দ্বারা তার অন্তরের তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করেনি। আর তার কথা তার ঈমান ও ইলমের কোনো উপকারে আসেনি।[12]

একটি কথা মনে রাখতে হবে, হকের পক্ষে বিতর্ক করা মহান ইবাদত। যখন নূহ আ. এর কওমের লোকেরা নূহ আ. কে বলল,

﴿قَالُواْ يَٰنُوحُ قَدۡ جَٰدَلۡتَنَا فَأَكۡثَرۡتَ جِدَٰلَنَا فَأۡتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ [هود:32]

“তারা বলল, ‘হে নূহ, তুমি আমাদের সাথে বাদানুবাদ করছ এবং আমাদের সাথে অতিমাত্রায় বিবাদ করেছ। অতএব যার প্রতিশ্রুতি তুমি আমাদেরকে দিচ্ছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে আস, যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও”। [সূরা হূদ, আয়াত: ৩২]

---

[12] মাজমুয়ুল ফাতওয়াহ ১৬৪/২০।

এখানে একটি কথা প্রমাণিত হয়, নূহ ‘আলাইহিস সালাম তার কাওমের লোকদের সাথে হককে জানানো ও মানানোর জন্য বিতর্ক করেন। এ কারণেই তিনি তাদের কথার জবাব দেন এবং বলেন,

﴿قَالَ إِنَّمَا يَأۡتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ ٣٣ وَلَا يَنفَعُكُمۡ نُصۡحِيٓ إِنۡ أَرَدتُّ أَنۡ أَنصَحَ لَكُمۡ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغۡوِيَكُمۡۚ هُوَ رَبُّكُمۡ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ﴾ [هود:33-34]

“সে বলল, ‘আল্লাহই তো তোমাদের কাছে তা হাজির করবেন, যদি তিনি চান। আর তোমরা তাকে অক্ষম করতে পারবে না’। ‘আর আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না, যদি আল্লাহ তোমাদের বিভ্রান্ত করতে চান। তিনি তোমাদের রব এবং তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে”। [সূরা হুদ, আয়াত: ৩৩-৩৪]

কুরআন কারীম নবীদের বিতর্কের কাহিনীর আয়াত দ্বারা ভরপুর। যেমন, মূসা ‘আলাইহিস সালামের ফিরআউনের

সাথে বিতর্ক, নূহ ‘আলাইহিস সালামের তার কাওমের লোকদের সাথে, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম নমরূদের সাথে ও তার পিতার সাথে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরাইশদের সাথে এবং সাহাবীদের মুশরিকদের সাথে বিতর্ক করেন। এ সব বিতর্ক হলো, হক পন্থীদের সাথে বাতিল পন্থীদের বিতর্ক, যাতে তারা হককে কবুল করে এবং বাতিল থেকে ফিরে আসে। আর এগুলো হলো, প্রশংসনীয় বিতর্ক।

অনুরূপভাবে কুরআনে যে মহিলাটির ঘটনা উল্লেখ করা হয়, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে ফাতওয়া চান। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قَدۡ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوۡلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوۡجِهَا وَتَشۡتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَآۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة:01]

আল্লাহ অবশ্যই সে রমনীর কথা শুনেছেন যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছিল আর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছিল। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন

শোনেন। নিশ্চয় সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা”। [**সূরা** আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০১]

মহিলাটি তার স্বামীর সাথে তার পরিণতি ও তার সাথে তার করণীয় সম্পর্কে জানতে চান। তার স্বামী তার জন্য হালাল নাকি হারাম? এ হলো, প্রশংসনীয় বিতর্ক।

মন্দ বা খারাপ বিতর্ক:

এমন বিতর্ক যা পরিষ্কার বাতিল অথবা বাতিলের দিকে নিয়ে যায়। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا نُرۡسِلُ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَۚ وَيُجَٰدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلۡبَٰطِلِ لِيُدۡحِضُواْ بِهِ ٱلۡحَقَّۖ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَٰتِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوٗا ﴾[الكهف:56]

“আর আমরা তো রাসূলদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই পাঠিয়েছি এবং যারা কুফুরী করেছে তারা বাতিল দ্বারা তর্ক করে, যাতে তার মাধ্যমে সত্যকে মিটিয়ে দিতে পারে। আর তারা আমার আয়াতসমূহকে এবং যা দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তাকে

উপহাস হিসেবে গ্রহণ করে।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ৫৬]

অর্থাৎ যাতে তারা হককে প্রতিহত করতে পারে এবং মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারে। আর নিন্দনীয় বিতর্ক হলো, কাফিরদের স্বভাব। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَمَا نُرۡسِلُ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَۚ وَيُجَٰدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلۡبَٰطِلِ لِيُدۡحِضُواْ بِهِ ٱلۡحَقَّۖ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَٰتِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوٗا ﴾[الكهف:56]

“আর আমরা তো রাসূলদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই পাঠিয়েছি এবং যারা কুফুরী করেছে তারা বাতিল দ্বারা তর্ক করে, যাতে তার মাধ্যমে সত্যকে মিটিয়ে দিতে পারে। আর তারা আমার আয়াতসমূহকে এবং যা দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তাকে উপহাস হিসেবে গ্রহণ করে”। [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ৫৬]

এ মহান আয়াত দ্বারা এ কথা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, কাফিররা সর্বদা হককে প্রতিহত ও দূরীভূত করতে

ঈমানাদরদের সাথে বিতর্ক করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿كَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نُوحٖ وَٱلۡأَحۡزَابُ مِنۢ بَعۡدِهِمۡۖ وَهَمَّتۡ كُلُّ أُمَّةِۭ بِرَسُولِهِمۡ لِيَأۡخُذُوهُۖ وَجَٰدَلُواْ بِٱلۡبَٰطِلِ لِيُدۡحِضُواْ بِهِ ٱلۡحَقَّ فَأَخَذۡتُهُمۡۖ فَكَيۡفَ كَانَ عِقَابِ﴾[غافر:05]

"এদের পূর্বে নূহের কাওম এবং তাদের পরে অনেক দলও অস্বীকার করেছিল। প্রত্যেক উম্মতই স্ব স্ব রাসূলকে পাকড়াও করার সংকল্প করেছিল এবং সত্যকে বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে তারা অসার বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। ফলে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। সুতরাং কেমন ছিল আমার আযাব!" [সূরা গাফির, আয়াত: ০৫]

অর্থাৎ তারা ঝগড়া বিবাদ ও বিতর্ক করে যাতে হককে মিটিয়ে দেয়। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يُحَآجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُۥ حُجَّتُهُمۡ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمۡ وَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ وَلَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٌ﴾ [الشورى:16]

“আর আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার পর আল্লাহ সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে, তাদের দলীল-প্রমাণ তাদের রবের নিকট অসার। তাদের ওপর (আল্লাহর) গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি”। [**সূরা সুরা**: ১৬]

যারা আল্লাহ তা‘আলার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে, তাদের সাথে আল্লাহর ব্যাপারে যারা বিতর্ক করে ও ঝগড়া-বিবাদ করে এ আয়াত তাদের জন্য হুমকি ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করে। আল্লাহ তা‘আলা যারা মুমিনদের আল্লাহর রাস্তা হতে বিরত রাখতে চায় আল্লাহ তা‘আলা তাদের শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَا يُجَٰدِلُ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغۡرُرۡكَ تَقَلُّبُهُمۡ فِي ٱلۡبِلَٰدِ﴾[غافر:04]

“কাফিররাই কেবল আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়। সুতরাং দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।” [সূরা গাফির, আয়াত: ০৪]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمِنۡهُم مَّن يَسۡتَمِعُ إِلَيۡكَۖ وَجَعَلۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ أَكِنَّةً أَن يَفۡقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَقۡرٗاۚ وَإِن يَرَوۡاْ كُلَّ ءَايَةٖ لَّا يُؤۡمِنُواْ بِهَاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوكَ يُجَٰدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ﴾[الأنعام:25]

“আর তাদের কেউ তোমার প্রতি কান পেতে শোনে, কিন্তু আমি তাদের অন্তরের ওপর রেখে দিয়েছি আবরণ যেন তারা অনুধাবন না করে, আর তাদের কানে রেখেছি ছিপি। আর যদি তারা প্রতিটি আয়াতও দেখে, তারা তার প্রতি ঈমান আনবে না; এমনকি যখন তারা তোমার কাছে এসে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়, যারা কুফুরী করেছে তারা বলে, ‘এটা পূর্ববর্তীদের কল্পকাহিনী ছাড়া কিছুই নয়।’ [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ২৫]

অর্থাৎ তুমি পূর্বেকার লোকদের থেকে গ্রহণ করছ এবং তাদের কিতাবসমূহ ও তাদের মুখ থেকে শুনে শুনে শিখছ। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَقَالُوٓاْ ءَأَٰلِهَتُنَا خَيۡرٌ أَمۡ هُوَۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَۢاۚ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ خَصِمُونَ﴾[الزخرف:57]

“আর তারা বলে, আমাদের উপাস্যরা শ্রেষ্ঠ নাকি ঈসা? তারা কেবল কুটতর্কের খাতিরেই তাকে তোমার সামনে পেশ করে। বরং এরাই এক ঝগড়াটে সম্প্রদায়”। [সুরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৫৭]

বাতিলের ওপর তারা ঝগড়া করে এবং তারা ছিল অধিক ঝগড়াটে।

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبي فقال: تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية ﴿إِنَّكُمۡ وَمَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمۡ لَهَا وَٰرِدُونَ ۝٩٨ لَوۡ كَانَ هَٰٓؤُلَآءِ ءَالِهَةٗ مَّا وَرَدُوهَاۖ

وَكُلٌّ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ [الأنبياء :٩٨] فقال ابن الزبعرى :قد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى بن مريم، كل هؤلاء في النار مع آلهتنا؟ فنزلت ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوۡمُكَ مِنۡهُ يَصِدُّونَ ۝٥٧ وَقَالُوٓاْ ءَأَٰلِهَتُنَا خَيۡرٌ أَمۡ هُوَۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَۢاۚ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ خَصِمُونَ ۝٥٨﴾ [الزخرف :٥٧] ثم نزلت ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتۡ لَهُم مِّنَّا ٱلۡحُسۡنَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ عَنۡهَا مُبۡعَدُونَ﴾ [الأنبياء :١٠١]»

“ইবন যুবারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করে তুমি কি ধারণা কর যে, আল্লাহ তা‘আলা তোমার ওপর এ আয়াত-

﴿إِنَّكُمۡ وَمَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمۡ لَهَا وَٰرِدُونَ ۝٩٨ لَوۡ كَانَ هَٰٓؤُلَآءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَاۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾[الأنبياء : ٩٨]

“নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের পূজা কর, সেগুলো তো জাহান্নামের জ্বালানী। তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে”। [**সুরা** আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৯৮]

নাযিল করেন, ইবন যুবারী বলেন, আমরা সূর্য, চন্দ্র, ফিরিশতা উযাইর ও ঈসা ইবন মারইয়ামের ইবাদত করি। তাহলে তাদের সবাই কি আমাদের ইলাহগুলোর সাথে জাহান্নামে যাবে? তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন-

﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوۡمُكَ مِنۡهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓاْ ءَأَٰلِهَتُنَا خَيۡرٌ أَمۡ هُوَۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَۢاۚ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ خَصِمُونَ ۞﴾ [الزخرف: ٥٧]

"আর তারা বলে, আমাদের উপাস্যরা শ্রেষ্ঠ নাকি ঈসা? তারা কেবল কুটতর্কের খাতিরেই তাকে তোমার সামনে পেশ করে। বরং এরাই এক ঝগড়াটে সম্প্রদায়"। [সূরা যুখরুফ: ৫৭]

তারপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتۡ لَهُم مِّنَّا ٱلۡحُسۡنَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ عَنۡهَا مُبۡعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١]

“নিশ্চয় আমার পক্ষ থেকে যাদের জন্য পূর্বেই কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে তা থেকে দূরে রাখা হবে।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০১]

উযাইর ‘আলাইহিস সালাম ও ঈসা ইবন মারইয়াম জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত থাকবে আর অন্যান্য বাতিল ইলাহগুলো জাহান্নামে যাবে। এমনকি চন্দ্র, সূর্য ও মূর্তিগুলোকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, যাতে তাদের যারা পূজা করত তাদের কষ্ট দেওয়া হয় ও তাদের শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধি করা হয়। তাদের বলা হবে, এ সব ইলাহগুলোর তোমরা ইবাদত করতে। এখন তারা তোমাদের জাহান্নামের কারণ হলো। **তাদের কারণে** তোমরা জাহান্নামের খড়ি। সুতরাং তোমরা জাহান্নামের আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে থাক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুশরিকদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের একাধিক বিতর্ক হয়েছে। কাফিররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের সাথে

অন্যায়ভাবে ঝগড়া-বিবাদ করত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِهِمۡ لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ﴾ [الأنعام:121]

“আর তোমরা তা থেকে আহার করো না, যার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি এবং নিশ্চয় তা সীমালঙ্ঘন এবং শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্ররোচনা দেয়, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিবাদ করে। আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে নিশ্চয় তোমরা মুশরিক”। [**সূরা** আল-আন‘আম, আয়াত: ১২১]

শরী‘আতের বিধান যা হক ও সত্য তা প্রতিহত করার জন্য শয়তান কাফিরদের যুক্তি দেয়, ফলে তারা মুসলিমদের বলে, তোমরা তোমাদের নিজ হাতে যা জবেহ কর, তা তোমরা বক্ষণ কর, অথচ যে গুলোকে আল্লাহ তা‘আলা নিজে হত্যা করে তা তোমরা খাও না?! দেখুন! জাহিলদের যুক্তি কতইনা অবান্তর! আল্লাহ

তা'আলা তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করেন এবং মুসলিমদের সম্বোধন করে বলেন,

﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِهِمۡ لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ﴾[الأنعام:121]

"আর তোমরা তা থেকে আহার করো না, যার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি এবং নিশ্চয় তা সীমালঙ্ঘন এবং শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্ররোচনা দেয়, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিবাদ করে। আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে নিশ্চয় তোমরা মুশরিক"। [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১২১]

সবই আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা হয়ে থাকে। আল্লাহর ফায়সালা ছাড়া কোনো কিছুই হয়নি। যাকে মানুষ জবেহ করে তা যেমন আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ী হয়ে থাকে অনুরূপভাবে যে জন্তুটি নিজে নিজে মারা যায় তাও আল্লাহর ফায়সালায় হয়ে থাকে। তবে যে জন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে মানুষ জবেহ করে তার বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা

হালালের ফায়সালা দেন, আর যে জন্তুটি নিজে নিজে মারা যায় তাকে আল্লাহ তা‘আলা হারামের ফায়সালা দেন।

তাদের এ বিতর্ক সম্পর্কে আরো দেখুন হাদীসের মাধ্যমে।

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,

«أتى أناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا :يا رسول الله، أنأكل ما نقتل، ولا نأكل ما يقتل الله؟

“কিছু লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরাবারে এসে জিজ্ঞাসা করে বলে হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যা হত্যা করি তা আমরা খাব আল্লাহ তা‘আলা যা হত্যা করে আমরা তা খাব না? তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত ﴿فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَٰتِهِۦ مُؤۡمِنِينَ﴾ থেকে নিয়ে ﴿وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ﴾ পর্যন্ত নাযিল করেন।”[13]

---

[13] তিরমিযী, হাদীস নং ৩০৬৯।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজে গিয়ে যা দেখেন, তা নিয়ে মুশরিকরা বিতর্ক করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের বিতর্কের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

﴿مَا كَذَبَ ٱلۡفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ ۝١١ أَفَتُمَٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ﴾ [النجم : 12-11]

"সে যা দেখেছে, অন্তঃকরণ সে সম্পর্কে মিথ্যা বলে নি। সে যা দেখেছে, সে সম্পর্কে তোমরা কি তার সাথে বিতর্ক করবে?" [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ১১-১২]

অর্থাৎ হে মুশরিকগণ আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব নিদর্শন দেখিয়েছেন তা তোমরা অস্বীকার করছ! এবং সন্দেহ পোষণ করছ! আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِن جَٰدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا تَعۡمَلُونَ ۝٦٨ ٱللَّهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فِيمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ﴾ [النجم:68-69]

"আর তারা যদি তোমার সাথে বাকবিতণ্ডা করে, তাহলে বল, 'তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক

অবহিত।’ তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ, আল্লাহ সে বিষয়ে কিয়ামতের দিন ফয়সালা করে দেবেন।” [সূরা আল-হজ, আয়াত: ৬৮-৬৯] কাফিররা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে অনর্থক বিতর্ক তখন আল্লাহ তা‘আলা তার ওপর এ আয়াত নাযিল করে তাদের প্রতিহত করেন। তিনি বলেন, তোমারা যা কর আল্লাহ তা‘আলা সে সম্পর্কে জানেন। অর্থাৎ তোমরা যে কুফুরী ও হৎকারিতা করছ, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা অবগত আছেন। তাই তিনি তাদের তোমাদের থেকে বিরত থাকতে ও তোমাদের সাথে বিতর্ক করতে না করেন। কারণ হঠকারী লোকদের সাথে বিতর্ক করে কোনো ফায়দা নেই।

মুশরিকরা কুরআন বিষয়ে অনর্থক বিতর্ক করে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَا يُجَٰدِلُ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغۡرُرۡكَ تَقَلُّبُهُمۡ فِي ٱلۡبِلَٰدِ ﴾[غافر:04]

“কাফিররাই কেবল আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়। সুতরাং দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে ধোকায় না ফেলে”। [সূরা গাফির, আয়াত: ০৪]

আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا تُجَادِلُوا فِي الْقُرْآنِ؛ فَإِنّ جِدَالا فِيهِ كُفْرٌ»

“তোমরা কুরআন বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ করো না। কারণ, কুরআন বিষয়ে বিবাদ করা কুফুরী”।

দুর্বল-ঈমান সম্পন্ন লোকদের বিতর্ক:

অনুরূপভাবে দুর্বল ঈমানদারদের পক্ষ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর্কের সম্মুখীন হন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿كَمَآ أَخۡرَجَكَ رَبُّكَ مِنۢ بَيۡتِكَ بِٱلۡحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقٗا مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ لَكَٰرِهُونَ ٥ يُجَٰدِلُونَكَ فِي ٱلۡحَقِّ بَعۡدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلۡمَوۡتِ وَهُمۡ يَنظُرُونَ﴾ [الأنفال:5-6]

“(এটা এমন) যেভাবে তোমার রব তোমাকে নিজ ঘর থেকে বের করেছেন যথাযথভাবে এবং নিশ্চয় মুমিনদের একটি দল তা অপছন্দ করছিল। তারা তোমার সাথে সত্য সম্পর্কে বিতর্ক করছে তা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর। যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হচ্ছে, আর তারা তা দেখছে। [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৫-৬] অর্থাৎ তারা যখন বুঝতে পারল যুদ্ধ ও লড়াই নিশ্চিত। তখন তারা তা অপছন্দ করল এবং বলল, আপনি যুদ্ধের কথা কেন আমাদের আগে জানায় নি? যাতে আমরা যুদ্ধের জন্য তৈরি ও প্রস্তুত হতাম? আমরা তো বের হয়েছি বাণিজ্যিক কাফেলার জন্য আমরা সৈন্য দলের উদ্দেশ্যে বের হই নাই। এ ছিল তাদের বিবাদ।

কাফিররা নবীদের সাথে তাদের উপস্থিতিতেও বিবাদ ও বিতর্ক করত। যেমন, হূদ ‘আলাইহিস সালাম তার কাওমের লোকেরা তার সাথে বিতর্ক করে এবং মূর্তি বিষয়ে তার সাথে ঝগড়া করে। আল্লাহ তা‘আলা হুদ আ. এর জবানে বলেন,

﴿قَالَ قَدۡ وَقَعَ عَلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ رِجۡسٞ وَغَضَبٌۖ أَتُجَٰدِلُونَنِي فِيٓ أَسۡمَآءٖ سَمَّيۡتُمُوهَآ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلۡطَٰنٖۚ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلۡمُنتَظِرِينَ﴾[الأعراف:71]

“সে বলল, নিশ্চয় তোমাদের ওপর তোমাদের রবের পক্ষ থেকে আযাব এ ক্রোধ পতিত হয়েছে। তোমরা কি এমন নামসমূহ সম্পর্কে আমাদের সাথে বিবাদ করছ, যার নাম করণ করছ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা যার ব্যাপারে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি? সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৭১] অর্থাৎ কতক মূর্তি নিয়ে তোমরা বিতর্ক করছ, যেগুলোর নাম করন তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষরাই করছে। তারা কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না।?!

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ سُلۡطَٰنٍ أَتَىٰهُمۡۖ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۚ كَذَٰلِكَ يَطۡبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلۡبِ مُتَكَبِّرٖ جَبَّارٖ﴾[غافر:35]

“যারা নিজদের কাছে আগত কোনো দলীল-প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর নিদর্শনা-বলী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তাদের এ কাজ আল্লাহ ও মুমিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী স্বৈরাচারীর অন্তরে সীল মেরে দেন।” [সূরা গাফির, আয়াত: ৩৫] কে এ কথাটি বলছিল? আল্লাহ তা‘আলা কার কথার বর্ণনা দেন? এ কথাটি বলছিল, ফেরআউনের গোত্রের একজন ঈমানদার যখন সে মুসা ‘আলাইহিস সালামকে ছড়াতে উদ্ধত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ سُلۡطَٰنٍ أَتَىٰهُمۡ إِن فِي صُدُورِهِمۡ إِلَّا كِبۡرٞ مَّا هُم بِبَٰلِغِيهِۚ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ [غافر:56]

“নিশ্চয় যারা তাদের নিকট আসা কোনো দলীলÑ প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের অন্তরসমূহে আছে কেবল অহংকার, তারা কিছুতেই সেখানে (সাফল্যের মনজিলে) পৌঁছবে না।

কাজেই তুমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” [সূরা গাফির, আয়াত: ৫৬]

অহংকার, দম্ভ ও ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। দেখুন কীভাবে অহংকার মানুষকে অন্যায়ভাবে ঝগড়া-বিবাদের দিকে ধাবিত করে এবং সত্যকে প্রতিহত ও বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ أَنَّىٰ يُصۡرَفُونَ﴾[غافر:69]

“তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করে? তাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে? [সূরা গাফির, আয়াত: ৬৯]

নিন্দনীয় বিতর্কের প্রকার:

নিন্দনীয় বিতর্ক ও দুই প্রকার:

এক. জ্ঞানহীন ঝগড়া বিবাদ। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيۡطَٰنٖ مَّرِيدٖ﴾[الحج:3]

"মানুষের মধ্যে কতক আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে না জেনে এবং সে অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের।" [সূরা আল-হজ, আয়াত: ৩]

আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের সম্বোধন করে বলেন,

﴿هَٰٓأَنتُمۡ هَٰٓؤُلَآءِ حَٰجَجۡتُمۡ فِيمَا لَكُم بِهِۦ عِلۡمٞ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيۡسَ لَكُم بِهِۦ عِلۡمٞۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾[آل عمران:66]

"সাবধান! তোমরা তো সেসব লোক, বিতর্ক করলে এমন বিষয়ে, যার জ্ঞান তোমাদের রয়েছে। তবে কেন তোমরা বিতর্ক করছ সে বিষয়ে যার জ্ঞান তোমাদের নেই? আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না"। [**সূরা আলে** ইমরান, আয়াত: ৬৬]

আল্লাহ তা‘আয়ালার বিষয়ে বিতর্ক করা জ্ঞানহীন বিতর্কের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعۡدُ بِحَمۡدِهِۦ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ مِنۡ خِيفَتِهِۦ وَيُرۡسِلُ ٱلصَّوَٰعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمۡ يُجَٰدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلۡمِحَالِ﴾ [الرعد:13]

“আর বজ্র তার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করে এবং ফেরেশতারাও তার ভয়ে। আর তিনি গর্জনকারী বজ্র পাঠান। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা আঘাত করেন এবং তারা আল্লাহর সম্বন্ধে ঝগড়া করতে থাকে। আর তিনি শক্তিতে প্রবল, শাস্তিতে কঠোর।” [সূরা আর-রা‘আদ, আয়াত: ১৩]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيۡطَٰنٖ مَّرِيدٖ ٣ كُتِبَ عَلَيۡهِ أَنَّهُۥ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُۥ يُضِلُّهُۥ وَيَهۡدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ﴾[الحج:3-4]

“মানুষের মধ্যে কতক আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে না জেনে এবং সে অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের। তার সম্পর্কে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, যে তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে অবশ্যই তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে প্রজ্বলিত আগুনের শাস্তির দিকে পরিচালিত করবে”। [সূরা আল-হজ, আয়াত: ৩-৪] তাদের বিতর্ক; তারা আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা করে যে, আল্লাহ তা‘আলা মৃতকে জীবিত করতে পারে না। তাই একজন কাফির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পুরনো একটি হাড় নিয়ে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বলত, তুমি কি মনে কর যে, তোমার রব এ চূর্ণ -বিচূর্ণ হাড় কে জীবিত করতে পারবে? এভাবেই তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তর্ক করত এবং আখিরাতের জীবনকে অস্বীকার করত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَلَا هُدٗى وَلَا كِتَٰبٖ مُّنِيرٖ ٨ ثَانِيَ عِطۡفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۖ لَهُۥ فِي ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞۖ وَنُذِيقُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ﴾[الحج:8-9]

“আর মানুষের মধ্যে কতক আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে কোনো জ্ঞান ছাড়া, কোনো হিদায়েত ছাড়া এবং দীপ্তিমান কিতাব ছাড়া। সে বিতর্ক করে ঘাড় বাঁকিয়ে, মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে তার জন্য রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে দহন যন্ত্রণা আস্বাদন করাব।” [সূরা আল-হজ, আয়াত: ৮-৯] অর্থাৎ অহংকারী এবং চায় মানুষকে আল্লাহর রাস্তা হতে বিরত রাখতে।

এ ছাড়াও তারা কিয়ামত বিষয়ে বিতর্ক করত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَسۡتَعۡجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِهَاۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشۡفِقُونَ مِنۡهَا وَيَعۡلَمُونَ أَنَّهَا ٱلۡحَقُّۗ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَٰلِۢ بَعِيدٍ﴾ [الشورى: 18]

“যারা এতে ঈমান আনে না, তারাই তা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা একে ভয় করে এবং তারা জানে যে, এটা অবশ্যই সত্য। জেনে রেখ, নিশ্চয় যারা কিয়ামত সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করে তারা

সুদূর পথভ্রষ্টটায় নিপতিত”। [**সূরা** শূরা, আয়াত: ১৮] অথচ কিয়ামতের বিষয়টি ইলমে গাইবের অন্তর্ভুক্ত, যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

জ্ঞানহীন তর্কে অন্তর্ভুক্ত হলো, কদর সম্পর্কে বিতর্ক করা

আমর ইবন শুয়াইব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত, তিনি বলেন,

«خرج رسول الله على أصحابه وهم يختصمون في القدر،فكأنما يُفقأُ في وجهه حب الرمان من الغضب .فقال: بِهَذَا أُمِرْتُمْ؟ أَوْ لَهِذَا خُلِقْتُمْ؟ تَضرِبُونَ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ؟ ! بِهَذَاهَلَكَتِ الأُمَمُ قَبْلَكُمْ قال :فقال عبد الله بن عمروما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه»

“একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে দেখেন তার সাহাবীরা কদর সম্পর্কে বিতর্ক করছে। এ দেখে রাগে এ ক্ষোভে রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মলিন হয়ে গেল। তখন তিনি তাদের বললেন, তোমাদের এর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? অথবা তোমাদের এ জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে? তোমরা কুরআনের এক অংশ দ্বারা অপর অংশকে আঘাত করছ! এ কারণেই তোমাদের পূর্বের উম্মতরা ধ্বংস হয়েছে। তারপর আব্দুল্লাহ ইবন আমর বলেন, আমি আর কোনো মজলিশে অনুপস্থিত থাকতে এত পছন্দ করিনি সেদিন ঐ মজলিশে অনুপস্থিত থাকাকে যতটুকু পছন্দ করি।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক ক্ষুব্ধ হন, কারণ ক্বদর হলো আল্লাহ তা‘আলার গোপনীয় বিষয় সমূহের একটি। যে ব্যক্তি না জেনে তাতে মশগুল হয়, তার পরিণতি হবে গোমরাহী। হয় সে ক্বদরী হবে অথবা জবরী হবে। এ কারণে তিনি তাতে লিপ্ত হতে নিষেধ করেন।

ক্বদর সম্পর্কে বিতর্ক ঈমানের নড়বড়টা ও সন্দেহ, সংশয়ের দিকে নিয়ে যায়। ক্বদর বিষয়ে ঈমানের মধ্যে

ঘটায় ও সন্দেহ সংশয়কে উসকিয়ে দেয়, তাই এ বিষয়ে বিতর্ক করা নিন্দনীয় বিতর্ক। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذِهِ الأمةِ مُوَائِماً أَوْ مُقَارِباً مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الوِلْدَانِ وِالقَدَرِ»

“এ উম্মতের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ততদিন পর্যন্ত ঠিক বা সত্যের কাছাকাছি থাকবে যতদিন পর্যন্ত তারা কদর ও মুশরিকদের সন্তানদের নিয়ে কোনো বিতর্ক করবে না।

নিন্দনীয় বিতর্কের দ্বিতীয় প্রকার:

নিন্দনীয় বিতর্কের দ্বিতীয় প্রকার হলো, বাতিলকে বিজয়ী করা ও হক স্পষ্ট হওয়ার পরও তা অস্বীকার করার বিতর্ক। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿كَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نُوحٖ وَٱلۡأَحۡزَابُ مِنۢ بَعۡدِهِمۡۖ وَهَمَّتۡ كُلُّ أُمَّةِۢ بِرَسُولِهِمۡ لِيَأۡخُذُوهُۖ وَجَٰدَلُواْ بِٱلۡبَٰطِلِ لِيُدۡحِضُواْ بِهِ ٱلۡحَقَّ فَأَخَذۡتُهُمۡۖ فَكَيۡفَ كَانَ عِقَابِ﴾ [غافر: 5]

“এদের পূর্বে নূহের কাওম এবং তাদের পরে অনেক দলও অস্বীকার করেছিল। প্রত্যেক উম্মতই স্ব স্ব রাসূলকে পাকড়াও করার সংকল্প করেছিল এবং সত্যকে বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে তারা অসার বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। ফলে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। সুতরাং কেমন ছিল আমার আযাব!” [সূরা গাফির, আয়াত: ৫]

এ বিতর্কের পরিণতি খুবই খারাপ। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন। আমীন!

প্রশংসনীয় বিতর্ক: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এর প্রতি আহ্বান করেন, বরং এটি একটি জিহাদ।

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ»

মৌখিক জিহাদ কীভাবে করবো?

উত্তম কথা দ্বারা বিতর্ক করার মাধ্যমে। আল্লামা ইবন হাযম বলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা যেমন ওয়াজিব অনুরূপভাবে মুনাযারা করাও ওয়াজিব। আল্লামা সুনআনি বলেন, জীবন দিয়ে জিহাদ হলো, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সশরীরে অংশগ্রহণ করা। মাল দ্বারা জিহাদ হলো, জিহাদের খরচ ও অস্ত্র ক্রয়ের জন্য ব্যয় করা। আর মৌখিক জিহাদ হলো, তাদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করা ও তাদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করা।

এ ধরনের মুনাযারা কখনো ওয়াজিব হয়, আবার কখনো মোস্তাহাব হয়।

আর নিন্দনীয় বিতর্ক সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। কারণ, তা হলো, হককে প্রত্যাখ্যান করা অথবা বাতিলকে বিজয়ী করা।

কখনো কখনো বিতর্ক প্রশংসনীয় হয়, ঠিক একই স্থানে তা আবার নিন্দনীয়ও হয়ে থাকে। যেমন হজ: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾ [البقرة:197]

"হজের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ। অতএব এই মাসসমূহে যে নিজের ওপর হজ আরোপ করে নিলো, তার জন্য হজে অশি¬ল ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়। আর তোমরা ভাল কাজের যা কর, আল্লাহ তা জানেন এবং পাথেয় গ্রহণ কর। নিশ্চয় উত্তম পাথেয় তাকওয়া। আর হে বিবেক সম্পন্নগণ, তোমরা আমাকে ভয় কর।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭]

হজে যে বিতর্ক করতে নিষেধ করা হয়েছে তা কি?

যে বিতর্ক পরস্পরের মধ্যে বিরোধ, বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে, না জেনে বিতর্ক করা, যে বিতর্ক লক্ষ্য, প্রতিপক্ষের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করা, বিতর্কে কে ভালো করতে পারে থাকে, কে তার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে ও চুপ করে দিতে পারে, তা দেখা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে; আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য না থাকে।

কখনো হজের বিধান নিয়ে না জেনে বিতর্ক করে থাকে, তাও নিন্দনীয়।

কিন্তু হক্ব, সঠিক ও সুন্নাতকে জানার জন্য বিতর্ক করা, উত্তম বিতর্ক। যেমন, হজ্জে তামাত্তু উত্তম না ইফরাদ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারেন ছিলেন নাকি তামাত্তু পালন করেন এ ধরনের বিতর্ক যদ্ধারা সত্য উদঘাটন হয়, তা উত্তম। অনুরুপভাবে সাওমের বিধান বিষয়ে বিতর্ক করা তার বিধান নিয়ে আলোচনা করা।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وفي رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يُجَادِلُ»

“সাওম হলো, ডাল স্বরূপ রোজা অবস্থা কেউ যেন অশ্লিল কোনো কাজ না করে এবং অজ্ঞতার পরিচয় না দেয়। যদি কোনো লোক তোমার সাথে ঝগড়া করে বা তোমাকে গালি দেয়, তখন তাকে বলে, দিবে যে আমি রোজাদার।

এ কথা দুইবার বলবে।[14] আর সুহাইল ইবন আবি সালেহের বর্ণনায় বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে যেন অশ্লিল কোনো কাজ না করে এবং ঝগড়া না করে।”[15]

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে মুসলিমদের জন্য উচিৎ হলো, তারা হক্কের পক্ষে হলেও বর্তমানে বিতর্ক পরিহার করবে। কারণ, বিতর্ক ঝগড়া ও বিবাদ মানুষের অন্তকে কঠিন করে দুই মুসলিম ভাইয়ের মাঝে হিংসা বিদ্বেষ ও রেষারেষি বৃদ্ধি করে। বিতর্কে হককে প্রত্যাখ্যান করা ও বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقّاً»

---

[14] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৪।

[15] ওমদাতুল কারী: ২৫৮/১০; ফতহুল বারী: ১০৪/৪।

“যে ব্যক্তি বিতর্ককে পরিহার করে যদিও সে হকের পক্ষে হয়, আমি তার জন্য জান্নাতের পার্শ্বের একটি প্রাসাদের দায়িত্বশীল।”[16] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الخَصِمُ»

“আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট সে ব্যক্তি যে অধিক ঝগড়া বিবাদ করে।”[17]

এখানে যে ঝগড়া বিবাদ ও বিতর্ক পরিহার করার কথা বলা হয়েছে, তা হলো, হক পন্থীদের সাথে বিবাদ করা কিন্তু যারা আহলে বাতিল ও বিদআতি তাদের সাথে তর্ক বিতর্ক করাই হলো, জরুরি যাতে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয় অথবা তাদের বাতিলের মূলোৎপাটন হয়।

---

[16] আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৮০০।

[17] সহীহ বুখারী আমর ইবন শুয়াইব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত, তিনি বলেন, ২৪৫৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৬৮।

প্রশংসনীয় বিতর্কের উদাহরণ

বাতিল পন্থীদের সাথে নবী -রাসূল ও সালফে সালেহীনদের বিতর্কের পদ্ধতির ওপর কয়েটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো:

১. ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম নমরূদের সাথে তার বাতিলকে প্রতিহত করতে বিতর্ক করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّىَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحْىِۦ وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ﴾ [البقرة:258]

“তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখ নি, যে ইবরাহীমের সাথে তার রবের ব্যাপারে বিতর্ক করেছে যে, আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছেন? যখন ইবরাহীম বলল, ‘আমার রব তিনিই’ যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিই জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই।

ইবরাহীম বলল, নিশ্চয় আল্লাহ পূর্বদিক থেকে সূর্য আনেন। অতএব তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে আন। ফলে কাফির ব্যক্তি হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়েত দেন না"। [**সূরা** আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৮]

এ বিতর্ক ছিল তাওহীদের রুবুবিয়্যাহ বিষয়ে তাই কাফিরটি বলে (আমি জীবিত করি ও মৃত্যু দিই) অর্থাৎ এক লোক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আমি তাকে ক্ষমা করে দিই আবার অপরজন নির্দোষ আমি তাকে হত্যা করি। এ বিতর্ক ছিল অবান্তর। কারণ, তাওহীদের রুবুবিয়্যাতে হায়াত দ্বারা উদ্দেশ্য অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে আনা। যদি তুমি তোমার দাবীতে সত্য হও তবে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে নিয়ে আস! কিন্তু ইব্রাহিম আ. যখন দেখতে পেলেন, বিষয়টিতে নমরূদের বিতর্ক করার অবকাশ রয়েছে, তাই তিনি বিষয়টি এমন একদিক ঘুরিয়ে দিলেন, যেখানে নমরুদ বিতর্ক করতে পারবে না। তারপর তিনি বলেন,

﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأۡتِي بِٱلشَّمۡسِ مِنَ ٱلۡمَشۡرِقِ فَأۡتِ بِهَا مِنَ ٱلۡمَغۡرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَۗ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ পূর্বদিক থেকে সূর্য আনেন। অতএব তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে আন। ফলে কাফির ব্যক্তি হতভম্ব হয়ে গেল।

২. অনুরূপভাবে দুই বাগানের মালিক ও একজন নেককার লোকের বিতর্ক। লোকটি তাকে কিভাবে উত্তর দেন? তার নিকট যে নেয়ামত রয়েছে তা দ্বারা ধোঁকায় না পড়ে তার পরিবর্তে তার কর্তব্য বিষয়ে কিভাবে তাকে পথ দেখান। তারপর সে আল্লাহর থেকে তার প্রত্যাশা কি তা উল্লেখ করেন,

﴿فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤۡتِيَنِ خَيۡرٗا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرۡسِلَ عَلَيۡهَا حُسۡبَانٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصۡبِحَ صَعِيدٗا زَلَقًا ﴾[الكهف:40]

"তবে আশা করা যায় যে, 'আমার রব আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে উত্তম (কিছু) দান করবেন এবং তার ওপর আসমান থেকে বজ্র পাঠাবেন। ফলে তা অনুর্বর উদ্ভিদশূন্য জমিনে পরিণত হবে"। [সূরা আল-কাহাফ,

আয়াত: ৪০] এবং তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, এটি সবই ধ্বংস হবে।

৩. এ ছাড়াও অনেক আহলে ইলম আছেন, যারা নাস্তিক মুরতাদ ও কাফিরদের সাথে বিতর্ক করেন। যেমন, ইমাম আবু হানিফা রহ. দাহরীয়াদের একটি সম্প্রদায়ে সাথে মুনাজারা করেন। তারা বলেন, এ জগতের সৃষ্টি প্রাকৃতিক, জগতের আলাদা কোনো স্রষ্টা নাই, সে নিজেই তার স্রষ্টা। প্রতি ছত্রিশ হাজার বছর পর পৃথিবী আপন কক্ষ পথে ফিরে আসে। আদম আ. আবার জন্ম লাভ করে এবং প্রতি জীবন যেগুলো চলে যায় সে গুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটে। এভাবে তারা মারা যায় আবার ফিরে আসে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, আচ্ছা বলত, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি? যে বলে নদীতে মাঝি ছাড়াই নৌকা চলে, কোনো লোক ছাড়াই নৌকা নিজে নিজে তার মধ্যে মালামাল উঠায়, আবার নামায়।

তারা বলল, যে এ কথা বলে সে পাগল ছাড়া আর কি হতে পারে?

তিনি বললেন, ছোট্ট একটি নৌকা তার জন্য যদি মাঝি লাগে, পরিচালক লাগে, তাহলে এত বড় জগত তার জন্য কি পরিচালক লাগবে না? তা কীভাবে পরিচালক ছাড়া চলতে পারে?

তার কথা শোনে তারা কেঁদে ফেলল এবং হককে স্বীকার করে নিলো।

আমর ইবন উবাইদ সে একজন মুতাযেলা যারা বলে কবীরাগুণাহকারী চির জাহান্নামী। সে একদিন বলে, কিয়ামতের দিন আমাকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হলে আল্লাহ বলবে তুমি কেন বললে হত্যাকারী জাহান্নামী? আমি বলব তুমি তা বলছ!

﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا ﴾[النساء:93]

“আর যে ইচ্ছাকৃত কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর আল্লাহ তার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে লা‘নত করবেন এবং তার জন্য বিশাল আযাব প্রস্তুত করে রাখবেন”। [**সূরা** আন-নিসা, আয়াত: ৯৩]

তারপর তাকে কুরাইশ ইবন আনাস বলল, ঘরের মধ্যে তার চেয়ে ছোট আর কেউ নাই, যদি তোমাকে বলে আমি বলছি

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا﴾ [النساء:116]

“নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শরীক করাকে এবং এ ছাড়া যাকে চান ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো ঘোর পথভ্রষ্টটায় পথভ্রষ্ট হলো। [সূরা আন-নিসা আয়াত: ১১৬]

তুমি কীভাবে জানতে পারলে আমি ক্ষমা করতে চাইবো না? এ কথার পর সে আর কোনো উত্তর দিতে পারেনি।

৩ উমার ইবন আব্দুল আযীয রহ. আওন ইবন আব্দুল্লাহকে খারেজিদের সাথে মুনাযারার জন্য পাঠান। তারা ইমামদের কাফির বলত। সে তাদের বলল, তোমরা উমার ইবনুল খাত্তাবের মতে শাসক চেয়েছিলে, কিন্তু যখন উমার ইবন আব্দুল আযীয আসল তোমরাই সর্বপ্রথম তার থেকে পলায়ন করলে?!

তারা বলল, সে তার পূর্বসূরীদের বলয় থেকে বের হতে পারে নি! আমরা শর্ত দিয়েছিলাম তার পূর্বের সব ইমাম ও খলিফাদের অভিশাপ করতে হবে। কিন্তু সে তা করে নি।

সে বলল, তোমরা সর্বশেষ করে হামানকে অভিশাপ করছ?

তারা বলল, না আমরা কখনোই হামানকে অভিশাপ করি নি!

সে বলল, ফেরআউনের উজির যে তার নির্দেশে প্রাসাদ নির্মাণ করল তাকে তোমরা ছাড়তে পারলে অথচ তোমরা উমার ইবন আব্দুল আজীজকে ছাড়তে পারলে না, যে

হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং আহলে ক্বিবলার কাউকে চাই সে কোনো বিষয়ে ভুল করুক?!

উমার ইবন আব্দুল আযীয তার কথায় খুব খুশি হন এবং বলেন তাদের নিকট তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পাঠাবো না।

তারপর সে তাকে বলে, তুমি হামানের কথা বললে ফিরআউনের কথা বললে না?

সে বলে আমি আশংকা করছিলাম ফিরআউনের কথা বললে সে বলবে আমরা তাকে অভিশাপ করি।

* জাহ্হাক আস-সারী নামে একজন খারেজী আবু হানিফা রহ. এর নিকট এসে বলে তুমি তাওবা কর!

তিনি বললেন, কীসের থেকে তাওবা করব?

সে বলল, তুমি যে বলছ, দুই ব্যক্তির মাঝে বিচারক নির্ধারণ করা বৈধ তা হতে। খারেজীরা কোনো হাকীম মানে না তারা বলে, হাকিম একমাত্র আল্লাহ।

আবু হানিফা রহ. বলল, আচ্ছা তুমি কি আমাকে হত্যা করবে নাকি আমার সাথে মুনাযারা করবে?

সে বলল, আমি তোমার সাথে মুনাযারা করব!

বলল, যদি আমরা যে বিষয়ে মুনাযারা করব তাতে যদি আমরা একমত না হতে পারি তাহলে আমার আর তোমার মধ্যে কে ফায়সালা করবে?

সে বলল, যাকে তুমি চাও নির্ধারণ কর।

আবু হানিফা রহ. জাহ্হাক আশ-শারী এক সাথীকে বলল, তুমি বস আমরা যে বিষয়ে বিরোধ করি তাতে তুমি ফায়সালা দিবে।

তারপর সে জাহ্হাককে বলল, তুমি আমার ও তোমার মধ্যে বিচারক হিসেবে তাকে মান?

বলল, হ্যাঁ

আবু হানিফা রহ. বলল, তুমি তো এখন বিচারক নির্ধারণ করাবে বৈধ বললে। তারপর সে নির্বাক হলো এবং চুপ হয়ে গেল। আর কোনো উত্তর দিতে পারল না।

ইবনে আসাকের বর্ণনা করেন, একদা রুমের একজন লোককে কাজী আবু বকর আলা-বাকিল্লানীর নিকট পাঠান ইফকের ঘটনা বিষয়ে বিতর্ক করার জন্য। উদ্দেশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে হেয় করা। সে বলল, আল্লাহ তায়ালা কুরআনের মধ্যে একজন মহিলাকে যিনার অপবাদ থেকে পবিত্র করেন, তার নাম কি?

কাজী উত্তরে বললেন, তার হলো, দুইজন মহিলা। তাদের সম্পর্কে লোকেরা অপবাদ দেয় এবং যা বলার বলে। একজন হলো আমাদের নবীর স্ত্রী আর অপর জন হলো, মারয়াম বিনতে ইমরান। আমাদের নবীর স্ত্রী সন্তান প্রসব করেনি আর মারয়াম আ. একজন সন্তান কাঁধে নিয়ে মানুষের মধ্যে ফিরে আসে। আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে অপবাদ দেয়, তা থেকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও মারয়াম আ. উভয়কে পবিত্র করেন। তুমি তাদের দু’জনের কার কথা জানতে চাও? এ কথা শোনে লোকটি চুপ হয়ে গেল কোনো উত্তর দিতে পারল ন। এর পর তার আর কি বলার আছে?

মোটকথা, বাতিলকে প্রতিহত ও নিরুত্তর করার জন্য এবং বিধর্মী কাফির মুশরিক ও নাসারাদের প্রতিহত করার জন্য বিতর্ক করা মুসলিমদের ওপর ওয়াজিব। একজন মুসলিমের সামনে কুফর পেশ করা হবে, আর সে চুপ করে বসে থাকবে, তা কখনোই বৈধ হতে পারে না।

নিন্দনীয় ঝগড়া ও বিতর্কের ক্ষতি

আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের একমাত্র ঐ সব বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলেন, যার মধ্যে নগদে বা ভবিষ্যতে কোনো না কোনো ক্ষতি নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের ঝগড়া-বিবাদ থেকে নিষেধ করেছেন। কারণ, ঝগড়া-বিবাদ মানুষের অনেক ক্ষতির কারণ হয় এবং অনিষ্টটা সৃষ্টি করে। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি উল্লেখ করা হলো:

১. মহা কল্যাণ হতে বঞ্চিত হওয়া

আল্লামা আওযায়ী বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি কামনা করেন, তখন তাদের ওপর ঝগড়া-বিবাদ চাপিয়ে দেন এবং তাদের কাজের থেকে বিরত রাখেন।

মুয়াবিয়া ইবন কুরাহ বলেন, তোমরা ঝগড়া-বিবাদ থেকে বেচে থাক! কারণ, তা তোমাদের আমলসমূহকে ধ্বংস করে দেয়।

২. ইলম থেকে বঞ্চিত

তোমরা জান না যে, আল্লাহ তা'আলা ক্বদর রজনীর ইলমকে কেবল ঝগড়ার কারণে তুলে নেন।

উবাদাহ ইবন সামেত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত,

«رسول الله خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: «إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلِيلَةِ الْقَدْرِ- أي : ليعينها-، وَإِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْراً لَكُمْ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالخَمْسِ»

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদর রজনী সম্পর্কে খবর দিতে আমাদের নিকট বের হন, তারপর দুই মুসলিমকে দেখেন, তারা দুইজন ঝগড়া করছে। আমি তোমাদের নিকট বের হয়েছিলাম তোমাদের কদর রজনী সম্পর্কে সংবাদ দিতে। কিন্তু অমুক অমুক লোক ঝগড়া করতে থাকলে তার ইলম তুলে নেয়া হয়। হতে পারে এর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। তোমরা

সাতাশ, উনত্রিশ ও পঁচিশ তারিখ রজনীতে কদর রজনীকে তালাশ কর।”[18]

ওবাদাহ ইবন সামেত থেকে বর্ণিত, হাদীস দ্বার প্রমাণিত হয়, ঝগড়া বিবাদ করা একটি নিন্দনীয় কাজ; যার কারণে মানুষ শাস্তি ভোগ করতে হয় এবং কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়। দুই লোকের ঝগড়া, বাক বিতণ্ডা ও বিবাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিতিতে মসজিদে সংঘটিত হয়। ফলে কদর রাত্রির ইলম থেকে আমরা মাহরুম হই।

ইউনুস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট মাইমুন ইবন মাহরান লিখেন, সাবধান! দীনের বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ করা থেকে বিরত থাকবে। কোনো আলিম বা জাহেল কারো সাথে কখনো বিবাদ করবে না।

এক লোক বর্ণনা করে যে, এক ব্যক্তি আলিমদের সাথে বিবাদ করার কারণে ইলম হাসিল করা হতে বঞ্চিত হয়।

---

[18] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৯।

শেষ পর্যন্ত সে লজ্জিত হয় এবং বলে, আফসোস যদি আমি তাদের সাথে বিবাদ না করতাম!

৩. উম্মতের ধ্বংস

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ»

"তোমাদের পূর্বের উম্মতরা অধিক প্রশ্ন করা ও তাদের নবীদের সাথে বিরোধ করার কারণে ধ্বংস হয়েছে।"

উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যিয়াদ ইবন হাদীরকে জিজ্ঞাসা করে বলে, তুমি কি জান কোনো জিনিস ইসলামকে ধ্বংস করে? সে বলল, না। তারপর বলল, ইসলাম ধ্বংস করে আলিমদের পদস্খলন, মুনাফেকদের বিবাদ করা আল্লাহর কিতাব বিষয়ে এবং ভ্রষ্ট ইমামদের ফায়সালা দেয়।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«إنما هلك من كان قبلكم بالمراء والخصومات في الدين»

"তোমাদের পূর্বের লোকেরা দীনের ব্যাপারে বিবাদ করার কারণে ধ্বংস হয়েছে।"

৪. অন্তরকে কঠিন করে ও শত্রুতা সৃষ্টি করে

ইমাম শাফে'ঈ রহ. বলেন, ঝগড়া বিবাদ করা মানুষের অন্তরকে কঠিন করে দেয় এবং পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করে।

অনেক মানুষ আছে কেবল মজলিশে বিতর্ক করার কারণে তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। যার কারণে তারা একে অপরের সাথে কথা বলে না, একজন অপরজনকে দেখতে যায় না। এ কারণে মনীষীরা বিতর্ক করা থেকে সতর্ক করেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, তোমার যুলুমের জন্য তুমি ঝগড়াটে হওয়াই যথেষ্ট। আর তোমার গুণার জন্য তুমি বিবাদ কারী হওয়াই যথেষ্ট।

মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন হুসাইন বলেন, ঝগড়া দীনকে মিটিয়ে দেয়, মানুষের অন্তরে বিদ্বেষ জন্মায়।

আব্দুল্লাহ ইবন হাসান বলেন, বিবাদ প্রাচীন বন্ধুত্বকেও ধ্বংস করে, সুদৃঢ় বন্ধনকে খুলে দেয়, কমপক্ষে তার চড়াও হওয়ার মানসিকতা তৈরি করে যা হলো, সম্পর্কচ্ছেদের সবচেয়ে মজবুত উপায়।

ইবরাহীমে নখয়ী আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর তাফসীরে বলেন,

﴿وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغۡلُولَةٌۚ غُلَّتۡ أَيۡدِيهِمۡ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْۘ بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيۡفَ يَشَآءُۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ طُغۡيَٰنٗا وَكُفۡرٗاۚ وَأَلۡقَيۡنَا بَيۡنَهُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ كُلَّمَآ أَوۡقَدُواْ نَارٗا لِّلۡحَرۡبِ أَطۡفَأَهَا ٱللَّهُۚ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادٗاۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ﴾ [المائدة:64]

"আর ইয়াহূদীরা বলে, 'আল্লাহর হাত বাঁধা'। তাদের হাতই বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং তারা যা বলেছে, তার জন্য তারা লা'নতগ্রস্ত হয়েছে। বরং তার দু'হাত প্রসারিত। যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং তোমার ওপর তোমার রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফুরী বাড়িয়েই

দিচ্ছে। আর আমরা তাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত শত্রতা ও ঘৃণা ঢেলে দিয়েছি। যখনই তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। আর তারা জমিনে ফ্যাসাদ করে বেড়ায় এবং আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না।" [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৬৪]

অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ করা।

৫. ভালো কাজের তাওফীক থেকে বঞ্চিত

আল্লাহ তা'আলা যে মজলিশে বিতর্ক করা হয় এবং তাতে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য থাকে না, তাদের আল্লাহ তায়ালা ভালো কাজ করার তাওফিক হতে বঞ্চিত করেন।

৬. অন্তর আল্লাহর স্মরণ হতে বিরত থাকে

যে বিতর্কে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য থাকে না তা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এমনকি সালাতেও তার অন্তর আল্লাহর স্মরণ করাকে বাদ দিয়ে বিতর্কের দিকে তার অন্তর সম্পৃক্ত থাকে।

কোনও একজন মনীষী বলেন, দীনকে নষ্ট, মরুয়তকে দুর্বল এবং অন্তরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখার জন্য ঝগড়া বিবাদ থেকে এত বেশি মারাত্মক আমি আর কিছুই দেখিনি।

৭. পদস্খলনের কারণ

মুসলিম ইবন ইয়াসের বলেন, তোমরা ঝগড়া-বিবাদ পরিহার কর। কারণ, তা হলো আলেমের মূর্খতার মুহূর্ত। শয়তান এ মুহূর্তেই তার পদস্খলন কামনা করে।

৮. সম্মানহানী

কোন এক আরব বলছিল, যারা মানুষের সাথে বিবাদ করে তাদের সম্মান নষ্ট হয়। যে বেশি ঝগড়া করে সে তা অবশ্যই বুঝতে পারে।

ইমাম শাফে‘ঈ রহ. বলেন,

لَهُمْ قُلْتُ خُوصِمْتَ، وَقَدْ سَكتَّ قَالُوا

مِفْتَاحُ الشَّرِّ لِبابِ الجَوَابَ إِنِّ

شَرَفٌ أَحمَقٍ أَوْ جَاهِلٍ عَنْ وَالصَّمْتُ

إصلاحُ العِرْضِ لِصوْنِ أَيْضاً وَفيِهِ

صامِتَةٌ وَهِي تُخشى الأُسَد ترَى أَمَا

نَبَّاحُ وَهْوَ لَعَمْرِي يخْسَى وَالكلْبُ

“তুমি চুপ থাকলে অথচ তোমার সাথে বিতর্ক করা হচ্ছে! আমি তাদের বললাম উত্তর দেওয়া অন্যায়ের দরজার চাবি স্বরুপ। কোনো জাহেল বা আহমকের কথার উত্তর দেওয়ার চেয়ে চুপ থাকা মর্যদাকর। এছাড়াও তাতে রয়েছে ইজ্জত সংরক্ষনে নিশ্চয়তা। তুমি কি দেখনা বাঘ চুপ থাকে অথচ তাকে সবাই ভয় করে। আর কুকুরকে সবাই ঘৃণা করে অথচ সে সব সময় ঘেউ ঘেউ করতেই থাকে”।

৮. বিদআতের বিকাশ ও প্রবৃত্তির অনুকরণ

উমার ইবন আব্দুল আযীয রহ. বলেন, যে ব্যক্তি দীনকে বিতর্কের জন্য লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে তার নকল করার প্রবণতা বেড়ে যায়। অর্থাৎ এক বিদ‘আত থেকে আরেক বিদ‘আতের দিকে যায়।

হাকাম ইবন উতাইবা আল কূফীকে জিজ্ঞাসা করা হলো, মানুষকে বিদ‘আতে প্রবেশে কিসে বাধ্য করছে? তিনি বললেন, ঝগড়া ও বিবাদ।

সাহাল ইবন আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হলো, একজন মানুষ কীভাবে বুঝতে পারবে যে সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, যখন সে দশটি গুণ তার নিকট আছে বলে বুঝতে পারবে! সে জামা‘আত ছাড়বে না, এ উম্মতের বিরুদ্ধে তলোয়ার উত্তোলন করবে না, ভাগ্যকে অস্বীকার করবে না, ঈমান বিষয়ে সন্দেহ করবে না, দীনের বিষয়ে বিবাদ করবে না, আহলে কিবলার কোনো অপরাধী মারা গেলে তার ওপর সালাত আদায় ছাড়বে না। মোজার উপর মাসেহ করা ছাড়বে না, যালিম বা ইনসাফগার বাদশাহর পিছনে সালাত আদায় করা ছাড়বে না।

আলিমদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ

এখানে এমন কতক লোক আছে, যারা মাসলা -মাসায়েল বিষয়ে আলিমদের সাথে অনর্থক বিতর্ক করে। তাদের উদ্দেশ্য আলিম ও তালেবে ইলমদের মজলিশে নিজেদের যোগ্যতা ও ইলম জাহের করা এবং তারা কথা বলা ও বিতর্ক করার যোগ্যতা রাখে প্রকাশ করা। এ ধরনের বিতর্ক ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে অবশ্যই অপরাধ। যাবের ইবন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا تَعَلَّمُوا العِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ العُلَمَاءَ، وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ المَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارَ النَّارَ»

"তোমরা আলিমদের সাথে বড়াই করা এবং মূর্খদের সাথে বিতর্ক করার উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না এবং ইলম দ্বারা মজলিশসমূহকে বিতর্কিত করো না। যে ব্যক্তি ইহা করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম জাহান্নাম।"[19]

---

[19] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৫৪।

অপর এক হাদীসে কা‘ব ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

«مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ العُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ؛ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ»

“যে ব্যক্তি আলিমদের সাথে বিতর্ক করা এবং জাহেলদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করা অথবা মানুষকে তার প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করে আল্লাহ তা‘আলা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।”[20]

সুতরাং ঝগড়া করার বা আলিমদের সাথে বিতর্ক করার উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করা হতে বিরত থাকতে হবে।

আবার কিছু লোক আছে তাদের উদ্দেশ্যই হলো, আলিম ও তালেবে ইলমদের সাথে বিতর্ক করা। তারা বিভিন্ন মজলিশে গিয়ে বলতে থাকে, আমি অমুক কায়েদা জানি অমুক দলীল জানি ইত্যাদি। এ কারণে তাদের দেখা যায়

[20] তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৪৫।

তাদের মাশায়েখদের প্রশ্ন করলে মাশায়েখরা যখন উত্তর দেয়, তখন বলে, হে শাইখ এ মাসাআলা বিষয়ে অমুক আলিম এ কথা বলছে, অমুক এ কথা বলছে...। সে যখন সব কিছু জানে তাহলে তার প্রশ্ন করার দরকার কি? এতে স্পষ্ট হয় সে তার যোগ্যতা প্রকাশ করার জন্য প্রশ্ন করে থাকে। এ ধরনের লোকেরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে ইলম শিক্ষা করে না। তারা ইলম শিখে তাদের বড়ত্ব, যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করার জন্য। এ ছাড়াও তার নাম যাতে আলোচনায় আসে এবং মানুষ বলবে লোকটি হাফেয তার নিকট দলীলের অভাব নাই সে অনেক বড় মুনাযের ইত্যাদি প্রশংসা লাভের জন্যই সে ইলম অর্জন করে।

পরিশিষ্ট:

আমরা যখন চাইবো যে, আমরা অনর্থক বিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাদ হতে বিরত থাকবো এবং ঝগড়া-বিবাদের নিজেদের জড়াবো না, তখন আমাদের কর্তব্য হলো, আমরা এ দ্বীনকে মজবুত করে ধরবো দ্বীন থেকে বিচ্যুত হবো না। কারণ, যারা দ্বীনকে ছেড়ে দেয়, তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে জাহালত ও ঝগড়া-বিবাদ ও ফিতনা ছড়িয়ে দেয়।

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدىً كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ ثم تلا النبي هذه الآية ﴿وَقَالُوٓاْ ءَأَٰلِهَتُنَا خَيۡرٌ أَمۡ هُوَۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَۢاۚ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ خَصِمُونَ﴾»

"মানুষ সঠিক পথের ওপর থাকার পর কখনো গোমরাহ হয় নাই কিন্তু যখন তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ দেওয়া হলো, তখন তারা ধ্বংস হতে আরম্ভ করল। তার এ আয়াত-

﴿وَقَالُوٓاْ ءَأَٰلِهَتُنَا خَيۡرٌ أَمۡ هُوَۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَۢاۚ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ خَصِمُونَ﴾[الزخرف:58]

“আর তারা বলে, ‘আমাদের উপাস্যরা শ্রেষ্ঠ নাকি ঈসা’? তারা কেবল কূটতর্কের খাতিরেই তাকে তোমার সামনে পেশ করে। বরং এরাই এক ঝগড়াটে সম্প্রদায়।” [সুরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৫৮] তিলাওয়াত করেন।

আল্লাহ তা‘আলা তাদের থেকে বদলা নিয়েছেন এবং তাদের শাস্তি দিয়েছেন। যেমন, তাদের নিকট যে দীন ও ইলম পেশ করা হয়েছিল তার বিনিময়ে তাদের ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত করা হয়েছে। তাদের অনর্থক বিতর্কে লিপ্ত করে দেওয়া হলো।

আর মনে রাখতে হবে, এ হলো, চিরন্তন নিয়ম, যখন কোনো জাতি উপকারী ইলম ও কুরআন ও সুন্নাহের ইলম ছেড়ে দেবে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও ফিতনা ফাসাদ ছড়িয়ে দিয়ে তাদের থেকে বদলা নিবে।

হে আল্লাহ তুমি আমাদের হককে হক হিসেবে পরিচয় করে দাও আর তার অনুকরণ করার তাওফীক দান কর। আর বাতিলকে বাতিল হিসেবে চেনার তাওফীক দাও এবং বাতিল থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দাও।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জেদ

তোমার বুঝকে পরীক্ষা কর!

তোমার সামনে দুই প্রকার প্রশ্ন আছে; কিছু আছে তুমি এখনই উত্তর দিতে পারবে, আর কিছু আছে যে গুলোর উত্তর দিতে তোমাকে গভীর চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

প্রথম প্রকার প্রশ্ন:

১. ঝগড়া-বিবাদের সংজ্ঞা দাও।

২. ঝগড়া ও বিতর্কের মধ্যে পার্থক্য কী?

৩. ঝগড়া ও বিতর্কের অনেক কারণ আছে, উল্লেখ যোগ্য কয়েকটি উল্লেখ কর।

৪. প্রশংসনীয় বিতর্কের শর্তসমূহ কী?

৫. বিতর্ক কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকার উদাহরণ বর্ণনা কর।

৬. ঝগড়ার কারণে কী কী ক্ষতি বা ফ্যাসাদ হতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকার প্রশ্ন:

১. কুরআনে কারীম বিষয়ে বিতর্কে অর্থ কী?

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্ন লিখিত বাণীর অর্থ কী?

اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم،فإذا اختلفتم فقوموا عنه

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্ন লিখিত বাণীর অর্থ কী?

ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أُتوا الجدل

৪. আল্লাহ তা‘আলার বাণীতে অর্থ কী?

ঝগড়া-বিবাদ করা খুবই খারাব। এর কুফল এতই ক্ষতিকর যে, এটি একজন মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতকে ধ্বংস করে দেয়। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এর কুফল খুবই মারত্মক। এর কারণে মানুষের অন্তর কঠিন হয় এবং পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়। তাই এ বিষয়ে আমাদের জানা থাকা ও এর থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি।
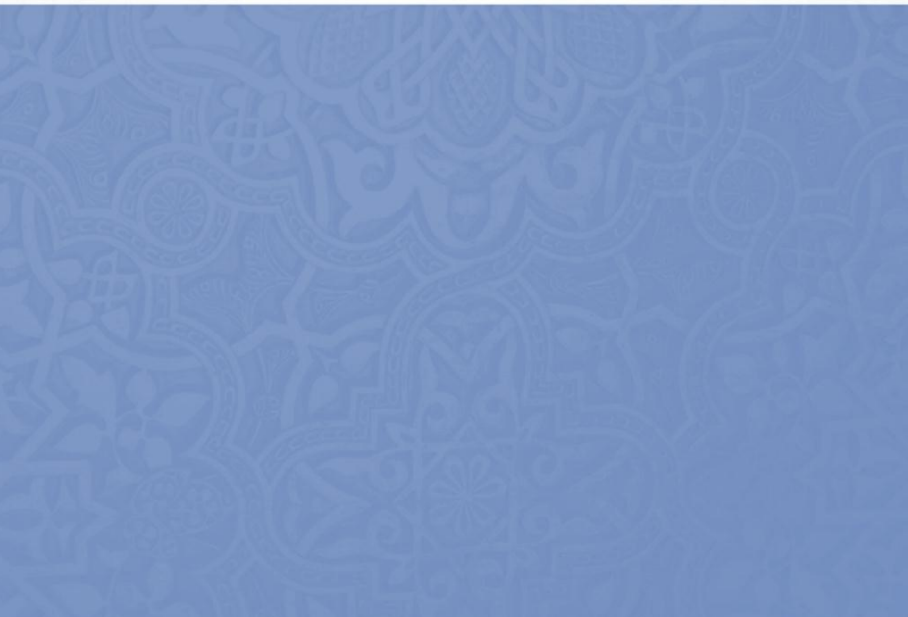
অন্তরের আমল: দ্বীনদারি

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জেদ

অনুবাদ: জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদনা: ড. মোঃ আবদুল কাদের

2012 - 1433

IslamHouse.com

﴿ أعمال القلوب: الورع ﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ محمد صالح المنجد

ترجمة: ذاكر الله أبو الخير

مراجعة: محمد عبد القادر

2012 - 1433

IslamHouse.com

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

যাবতীয় প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক। আর সালাত ও সালাম নাযিল হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর, যিনি সমস্ত নবীগণের সেরা ও সর্বশ্রেষ্ঠ। আরও সালাত ও সালাম নাযিল হোক তার পরিবার, পরিজন ও সাথী-সঙ্গীদের উপর।

অন্তরের আমলসমূহের অন্যতম আমল হল, পরহেজগারি ও দ্বীনদারি। পরহেজগারি ও দ্বীনদারি হল, দ্বীনের খুঁটিসমূহ তথা ভিত্তিসমূহের একটি অন্যতম ভিত্তি ও খুটি। তাকওয়া, পরহেজগারি ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর ভয় ছাড়া ঈমানদারি চলে না। মনে রাখতে হবে, দ্বীনদারি মানবাত্মা ও অন্তরকে যাবতীয় নাপাকী-অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে এবং বিভিন্ন ধরনের মানবিক ব্যাধি-হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রিকাতরাতা ইত্যাদি হতে মুক্ত করে। পরহেজগারি ও দ্বীনদারি হল, ঈমানী বৃক্ষের ফল এবং ঈমানের সৌন্দর্য। দ্বীনদারি ছাড়া ঈমান, ফল ছাড়া বৃক্ষের মত। ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য দ্বীনদারি আবশ্যক। তবে দ্বীনদারি কি তা আমাদের অবশ্যই জানা থাকতে হবে। আমরা অনেকেই পরহেজগারি ও দ্বীনদারি কি তা জানি না। এ জন্য পরহেজগারি ও দ্বীনদারি সম্পর্কে আলোচনা খুবই জরুরি। যাতে আমরা কোনটি দ্বীনদারি আর কোন গোড়ামি তা জানতে ও বুঝতে পারি।

আমরা এ কিতাবে দ্বীনদারি- ورع- এর সংজ্ঞা, হাকীকত, উপকারিতা ও ফলাফল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব। সাথে সাথে এখানে থাকবে কিভাবে আমরা দ্বীনদারি অর্জন করতে পারি তার আলোচনা, মুত্তাকী ও পরহেজগার হিসাবে আমরা নিজেকে কিভাবে গড়ে তুলতে পারি তার আলোচনা। আর আমার এ রিসালাটি, অন্তরের আমলসমূহের ধারাবাহিক আলোচনারই একটি অংশ বিশেষ। একটি ইলমী প্রশিক্ষণ সেন্টারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছিলেন, তখন আমি এ বিষয়টির উপর আলোচনা করি। আমার আলোচনাটিকে রিসালা-পুস্তিকা- আকারে রূপ দেয়া হয়। আমার সাথে কিছু আহলে ইলম সাথী ছিল, যারা আমাকে বিভিন্নভাবে এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন।

আমরা তাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট কামনা করি, তিনি যেন তাদের ও আমাদের সবার জন্য যাবতীয় কল্যাণ ও কামিয়াবিকে সহজ করে দেন এবং ইলম ও আমলের পথকে উন্মুক্ত করে দেন। নিশ্চয় তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন এবং কবুল করেন। আমীন।

মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জেদ

বিষয়ের গুরুত্ব

আল্লামা তাউস রহ. বলেন, ঈমানের দৃষ্টান্ত হল, বৃক্ষের মত, তার মূল, কাণ্ড ও ডাল-পালা হল, এ কথার সাক্ষ্য দেয়া, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর রাসূল। আর ঈমান বৃক্ষের ফল হল, পরহেজগারি ও দ্বীনদারি। যে বৃক্ষের ফল নাই তার মধ্যে কোন উপকারিতা নাই। আর যে লোকের মধ্যে দ্বীনদারি নাই তার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই[1]।

কাসেম ইবনে উসমান রহ. বলেন, পরহেজগারি ও দ্বীনদারি হল, দ্বীনের খুঁটি[2]। আরো মনে রাখতে হবে, আসল ইবাদতই হল, দ্বীনদারি অর্জন করা। হারেস ইবন আসাদ আল-মুহাসেবী রহ. বলেন, আসল ইবাদত হল, দ্বীনদারি। কাসেম আল-জুয়ী রহ. বলেন, দ্বীনের মূল হল, পরহেজগারি ও দ্বীনদারি অবলম্বন করা। দ্বীনদারি হল একজন বান্দার যোগ্যতার আসল প্রমাণ[3]। ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তারা উভয়ে বলেন,

« لا تنظروا إلى صلاة أحد ولا صيامه، وانظروا إلى صدق حديثه إذا حدث، وإلى أمانته إذا ائتمن، وإلى ورعه إذا أشفى»

"তোমরা কোন মানুষের সালাত ও সাওমের দিকে দেখে তার দ্বীনদারি বিচার করবে না। যখন সে কথা বলে তখন সত্য বলে কিনা তা দেখবে,

---

[1] আব্দুল্লাহ ইবন আহমদের আসসুন্নাহ: ৬৩৫।

[2] তারিখে দামেশক: ৪৯/১২২।

[3] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ১০/৭৬।

যখন তার নিকট আমানত রাখা হয়, তখন তার আমানতদারিতার প্রতি লক্ষ্য করবে এবং যখন অসুস্থ হয়, তখন তার দ্বীনদারির প্রতি লক্ষ্য করবে”[4]।

সালফে সালেহীনগণ দ্বীনদারি কিভাবে অর্জন করতে হয়, তা শিখতো। আল্লামা জাহহাক রহ. বলেন,

“আমাদের যুগে আমরা দ্বীনদারি শিখতাম। তিনি আরও বলেন, আমরা আমাদের সাথীদের দেখতাম তারা কিভাবে দ্বীনদারি অর্জন করা যায় তা শিখতো”।

দ্বীনদারির সংজ্ঞা:

আভিধানিক অর্থ: অভিধানে এর অর্থ হল, সংকোচ বোধ করা।

কিন্তু শব্দটির মূল অর্থ হল, হারাম থেকে বিরত থাকা, তারপর শব্দটিকে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হলে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মুবাহ ও হালাল বস্তু থেকে বিরত থাকা[5]।

পারিভাষিক অর্থ:

শব্দটি পারিভাষিক অর্থ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

---

[4] শুয়াবুল ঈমান: ৫২৮১, ৫২৭৮।

[5] লিসানুল আরব: ৩৮৮/৮।

আল্লামা ফুজাইল ইবনে আয়াজ রহ. বলেন,

الورع: اجتناب المحارم

“الورع তথা দ্বীনদারি হল, নিষিদ্ধ বিষয় হতে বিরত থাকা”[6]।

আল্লামা ইবরাহীম ইবনে আদহাম রহ. বলেন,

الورع: ترك كل شبهة، وترك ما لا يعنيك، وترك الفضلات

“পরহেজগারি ও দ্বীনদারি হল, সন্দেহযুক্ত বস্তু, অনর্থক কর্মকাণ্ড ও অতিরঞ্জিত কোন কাজ করা হতে বিরত থাকা”।[7]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম দ্বীনদারির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

الورع: ترك ما يُخشى ضرره في الآخرة

“দ্বীনদারি হল, যে কাজ করলে আখিরাতের ক্ষতির আশংকা রয়েছে, তা পরিহার করা”[8]।

আবু বকর মুহাম্মদ ইবন আলী আল কাতানী রহ. বলেন,

الورع: هو ملازمة الأدب، وصيانة النفس

---

[6] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ৯১/৮।

[7] মাদারেজুস সালেকীন ২১/২.

[8] আল-ফাওয়ায়েদ: ১১৮.

“দ্বীনদারি হল, শিষ্টাচারিতা অবলম্বন করা এবং আত্মার হেফাজত করা”[9]।

আল্লামা যুরকানী রহ. বলেন,

الورع: ترك ما لا بأس به حذراً من الوقوع مما به بأس

“দ্বীনদারি হল, যাতে কোন ক্ষতি নাই তা ছেড়ে দেয়া যাতে যে কাজে ক্ষতি আছে তা হতে বাঁচা যায়”[10]।

আল্লামা জুরজানী রহ. বলেন,

الورع: اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع في المحرمات

“দ্বীনদারি হল, সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহ হতে বেঁচে থাকা, যাতে হারামে লিপ্ত না হতে হয়”[11]।

কোন কোন আলেম দ্বীনদারির সংজ্ঞা দিয়ে বলেন,

الورع :كله في ترك ما يريب إلى ما لا يريب

---

[9] তারিখে দামেশক ২৫৭/৫৪.

[10] মানাহেলুল এরফান: ৪২/২.

[11] আত-তারিফাত: ৩২৫.

“যে সব বস্তু তোমাকে সন্দেহ সংশয়ের দিকে নিয়ে যায়, তা ছেড়ে যেসব বস্তু তোমাকে সন্দেহ সংশয়ের দিকে নিয়ে যায় না, তার প্রতি ঝুঁকে পড়াকে পরহেজগারি বলে”[12]।

অপর একজন বিজ্ঞ আলেম বলেন,

حقيقة الورع: توقي كل ما يحذر منه، وغايته: تدقيق النظر في طهارة الإخلاص من شائبة الشرك الخفي

“দ্বীনদারির হাকিকত হল, যে বস্তুকে মানুষ আশঙ্কাযুক্ত মনে করে, তা হতে বিরত থাকা। আর তার শেষ গন্তব্য হল, ছোট শিরকের আশঙ্কা হতে নিয়তকে পুত-পবিত্র করার প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি দেয়া”[13]।

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায়, দ্বীনদারি ও পরহেজগারির সংজ্ঞায় বিভিন্ন ধরনের মতামত পরিলক্ষিত। সবার মতামতকে একত্র করার লক্ষ্যে আমরা বলব, পরহেজগারি ও দ্বীনদারির চারটি স্তর আছে:

এক- সাধারণ লোকের দ্বীনদারি: আর তা হল, হারাম বস্তু হতে বিরত থাকা।

দুই- নেককার লোকদের দ্বীনদারি: যে সব কাজে হারামের সম্ভাবনা রয়েছে, তা হতে বিরত থাকা।

---

[12] ফায়জুল কাদির: ৫২৯/৩.

[13] ফায়জুল কাদির: ৫৭৫/৩.

তিন- মুত্তাকীদের দ্বীনদারি: যে সব কাজে কোন ক্ষতি নাই সেসব কাজকে ক্ষতি হয় এমন কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় ছেড়ে দেয়া।

চার- সত্যবাদীদের দ্বীনদারি: এমন কর্মকাণ্ড হতে বিরত থাকা, যাতে বিন্দু পরিমাণও ক্ষতি নাই। কিন্তু সে আশঙ্কা করে, না জানি কাজটি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়ে যায় অথবা না জানি কাজটি অপছন্দনীয় বা অপরাধের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ আসংঙ্কা থেকে সে এ ধরনের কাজ করা হতে বিরত থাকে।

উপরে যে চারটি স্তরের কথা আলোচনা করা হয়েছে, তার কোন না কোন একটির ভিত্তিতে ওলামাগণ দ্বীনদারির সংজ্ঞা তুলে ধরেছেন।

পরহেজগারি বা দ্বীনদারির গুরুত্ব ও ফজিলত:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করার হিকমত অসংখ্য ও অগণিত; এসব হিকমতের বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাবে না। তবে হিকমতসমূহের অন্যতম হিকমত হল, মানুষকে পরহেজগার ও মুত্তাকী বানানো। অর্থাৎ, মানুষ যাতে তাকওয়া, পরহেজগারি ও দ্বীনদারির গুণে গুণান্বিত হতে পারে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ হাসিলে সক্ষম হয়, তার জন্যই কুরআন নাযিল করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে এরশাদ করে বলেন,

﴿ وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَا يَخَافُ ظُلۡمٗا وَلَا هَضۡمٗا ١١٢ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَانًا عَرَبِيّٗا وَصَرَّفۡنَا فِيهِ مِنَ ٱلۡوَعِيدِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ أَوۡ يُحۡدِثُ لَهُمۡ ذِكۡرٗا ١١٣ ﴾

[سورة طه: ١١٣.]

"আর এ ভাবেই আমি আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি এবং তাতে বিভিন্ন সতর্কবাণী বর্ণনা করেছি, যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে অথবা তা হয় তাদের জন্য উপদেশ"। [সূরা তাহা, আয়াত: ১১৩]

আল্লামা ক্বাতাদাহ রহ. আল্লাহর বাণীতে জিকির শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, দ্বীনদারি, পরহেজগারি ও তাকওয়া[14]।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে দ্বীনদার লোকদের কামিয়াবি লাভ ও সফলতার একাধিক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যাতে তারা তাদের প্রশংসনীয় অবস্থার উপর অটল ও অবিচল থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿ أَفَلَمۡ يَهۡدِ لَهُمۡ كَمۡ أَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِّنَ ٱلۡقُرُونِ يَمۡشُونَ فِي مَسَٰكِنِهِمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّأُوْلِي ٱلنُّهَىٰ ١٢٨ ﴾ [سورة طه: ١٢٨.]

"এটি কি তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করল না যে, আমি তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠিকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে? নিশ্চয় এর মধ্যে রয়েছে বিবেক সম্পন্নদের জন্য নির্দশন"। [সূরা তাহা, আয়াত: ১২৮]

---

[14] তাফসীরে তাবারী ৪৬৪/৮.

আল্লামা ক্বাতাদাহ রহ. বলেন,

أولو النهى هم أهل الورع

“জ্ঞানী তারাই যারা দ্বীনদার ও পরহেজগার”[15]।

মানুষ যাতে পরহেজগার ও দ্বীনদার হয়, তার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার স্বীয় কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিল করেন এবং কুরাআনে বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, দ্বীনদারি অবলম্বন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি।

মনে রাখতে হবে, আমরা যে তাকওয়া বা দ্বীনদারিকে ওয়াজিব বলছি তা হল উল্লেখিত দ্বীনদারির স্তরসমূহের সর্বনিম্ন স্তর।

দ্বীনদারি অবলম্বন করার ফজিলত:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদিসে দ্বীনদারি অবলম্বন করার অনেক ফজিলত বর্ণনা করেন। এখানে কিছু ফজিলত তুলে ধরা হল। যেমন-

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« يَا هُرَيْرَةَ، كُنْ وِرِعا تَكُنْ أَعبَدَ النَاَّسِ أَبَا»

[15] তাফসীরে তাবারী ৪৭৫/৮.

“হে আবু হুরাইরা তুমি মুত্তাকী ও পরহেজগার হও, তাহলে তুমি সমগ্র মানুষের চেয়ে বড় ইবাদতকারী বলে বিবেচিত হবে”[16]। সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« خَيْرُدِينِكُمُ الْوَرَعُ»

“তোমাদের উত্তম দ্বীন হল তোমাদের দ্বীনদারি”[17]।

হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত[18]। আমর ইবন ক্বাইস আল মালায়ী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« مَلَاكُ دِينِكُم الْوَرَع »

“তোমাদের দ্বীনের রাজত্ব হল, দ্বীনদারি”[19]।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[16] ইবনে মাজাহ: ৪২১৭ আল্লামা আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

[17] হাকেম: ৩১৪ আল্লামা যাহাবী রহ. হাদীসটির সমর্থন করেন।

[18] হাকেম ৩১৭, তিবরানি মুজামুল ওসীত, ৩৯৬০, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

[19] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ: ২৬১১৫.

« ما أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيءٌ من الدنيا، ولا أعجبه منها إلا وَرِعاً »

“দুনিয়ার কোন বস্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুগ্ধ করতে পারেনি। পরহেজগারি ও দ্বীনদারি ছাড়া কোন কিছুই তাকে সে পরিমাণ আনন্দ দিতে পারেনি যে পরিমাণ আনন্দ তাকে তাকওয়া দিয়েছে”[20]।

মনে রাখতে হবে, দুনিয়ার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিন্দু পরিমাণ আগ্রহ ছিল না। তাই যখন তার নিকট দুনিয়ার কোন ধন-সম্পত্তি আসত, তখন তিনি সেগুলোকে তাড়াতাড়ি বণ্টন করে দিতেন। নিজের কাছে কিছুই রাখতেন না। তিনি ইলম, আমল ও দ্বীনদারিকে অধিক গুরুত্ব দিতেন। হারাম ও হালালের বরখেলাফ করাকে তিনি কোন ক্রমেই মেনে নিতেন না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে দ্বীনদারি অবলম্বনের গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অনুরূপভাবে আমাদের সালফে সালেহীনগণও দ্বীনদারি অবলম্বনের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন এবং তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তারা তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষকে তাকওয়া অর্জন ও দ্বীনদারি অবলম্বন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। বিভিন্নভাবে মানুষদের দ্বীনদারি অর্জনের দিকে আহ্বান করতেন। যেমন-

ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

---

20 তাবরানী মুজামুল ওসীত: ৫৩৫.

শেষ রাতে নড়াচড়া করা অর্থাৎ তাহাজ্জদ পড়া বা জিকির আজকার করার নাম কিন্তু দ্বীন নয়, দ্বীন হল, দ্বীনদারি এ পরহেজগারি অবলম্বন করা[21]।

অর্থাৎ, যারা দ্বীনদারি অবলম্বন করে তারাই হল, সত্যিকার দ্বীনদার। অনেকে আছে ভোর রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে, কিন্তু হারাম হালালের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না, মানুষের হকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, ন্যায় অন্যায়ের কোন বিচার বিশ্লেষণ করে না। এরা সত্যিকার দ্বীনদার নয়। তাদের তাহাজ্জুদ দ্বারা তারা কোন উপকৃত হতে পারবে না

হাসান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, সর্বোত্তম ইবাদত হল, চিন্তা-ফিকির করা ও দ্বীনদারি অবলম্বন করা[22]। তিনি আরও বলেন, হিকমত ও বুদ্ধিমত্তা হল, দ্বীনদারি[23]।

অর্থাৎ, যারা চিন্তা-ফিকির করে, তাদের মধ্যে সত্যিকার মানবতা জাগ্রত হয়। তখন তারা তাদের নিজেদের ব্যাপারে এবং মানুষের ব্যাপারে সতর্ক হয়। মানুষের হক তারা নষ্ট করে না এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর হকও তারা নষ্ট করে না। তাদের দ্বারা কোন প্রকার অন্যায় অনাচার সংঘটিত হয় না। তার হারাম থেকে বিরত থাকে। চিন্তা-ফিকির করার গুরুত্ব এতই বেশি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তা ফিকির করাকে ইবাদত বলে আখ্যায়িত করেন।

---

[21] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আয-যুহুদ ১২৫.

[22] ইবনে আবিদ-দুনিয়াম, আল-ওয়ারয়ু ৩৭.

[23] তাফসীরে বগবী ৩৩৪/১, তাফসীরে কুরতবী ৩১৩/৩.

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব রহ. বলেন, ইবাদত হল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা হারাম করেছেন, তা হতে বিরত থাকা এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিদর্শনসমূহের চিন্তা করা[24]।

হারাম থেকে বিরত থাকা যে ইবাদত এতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, একটি হাদিসে বর্ণিত স্ত্রীর সাথে সহবাস করাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদত বলে আখ্যায়িত করলে একজন সাহাবী তাকে জিজ্ঞাসা করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! একজন লোক তার স্ত্রীর সাথে যৌন চাহিদা নিবারণ করল তা কিভাবে ইবাদত হতে পারে? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যদি লোকটি যৌবিক চাহিদা তার স্ত্রীর সাথে না মিটিয়ে অন্য কোন মহিলার সাথে ব্যভিচার করত, তাহলে তাতে কি তার গুনাহ হত? সাহাবী বলল, অবশ্যই গুনাহ হত। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যেহেতু সে হারামে না গিয়ে হালাল উপায়ে প্রয়োজন মেটালো এবং হারাম থেকে বিরত থাকল, এটা তার জন্য অবশ্যই ইবাদত।

আল্লামা মুতাররফ ইবনে শিখির রহ. বলেন, তোমাদের সর্বোত্তম দ্বীন হল, তোমাদের পরহেজগারি ও দ্বীনদারি[25]। দ্বীনদারি ছাড়া দ্বীনদারির কোন দাম নাই। একজন ব্যক্তি তখন ঈমানদার হতে পারবে যখন তার মধ্যে দ্বীনদারি থাকবে।

তিনি আরও বলতেন, তোমরা দুইজন লোকের সাথে সাক্ষাৎ করলে দেখবে, একজন অনেক সালাত ও সাওম আদায় করে এবং বেশি বেশি

---

[24] তাফসীরে কুরতবী ৩০১/৪

[25] তাফসীরে তাবারী: ১৭/১৬.

আল্লাহর রাস্তায় দান করে। আর অপর ব্যক্তি যে বেশি সালাত বা সাওম আদায় করে না এবং বেশি বেশি সদকাও করে না। সে তার থেকে উত্তম। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল তা কিভাবে সম্ভব? তখন সে বলল, লোকটি তার অপর ভাইয়ের তুলনায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেসব বিষয়ে নিষেধ করছেন, সে বিষয়ে অধিক সতর্ক ও পরহেজগার[26]।

এখানে একটি কথা স্পষ্ট হয়, শুধু সালাত, সাওম ও দান-খয়রাত দিয়ে দ্বীনদার হওয়া যায় না। দ্বীনদার হওয়ার জন্য তোমাকে অবশ্যই হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে। হারাম থেকে বেঁচে থাকা নফল ইবাদত বন্দেগী হতে অধিক উত্তম। আল্লামা ইয়াহয়া ইবনে কাসীর রহ. বলেন, সর্বোত্তম আমল হল, পরহেজগারি ও দ্বীনদারি[27]। মানুষ যখন হারাম থেকে বেঁচে থাকবে তখনই তার মধ্যে দ্বীনদারি পাওয়া যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুত্তাকীদের অধিক ভালোবাসেন। আর মুত্তাকী তারাই যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকে এবং যা করতে বলছেন তা পালন করেন। তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হক আদায় করেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর মাখলুকের হকও আদায় করেন। প্রত্যেক হকদারকে তাদের পাওনা যথাযথভাবে আদায় করেন।

দ্বীনদারির সাথে শরীয়তের জ্ঞান একত্র হওয়ার ফজিলত:

একজন জ্ঞানী লোকের দ্বীনদারি সাধারণ মানুষের দ্বীনদারির মত নয়। যারা জ্ঞানী তাদের তাকওয়া ও দ্বীনদারি অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে।

---

[26] তাফসীরে তাবারী: ১৭/১২ এবং মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ ৩৫৪৯১.

[27] শুয়াবুল ঈমান: ৮১৪৯.

কারণ, তাদের তাকওয়া দ্বারা তারা যে উপকার লাভ করে অন্যরা তা লাভ করতে সক্ষম নয়। কোন কোন কবি বলেন,

وَإنَ فقِيهاً وَاحِداً مُتَوَّرعاً

أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابدِ

"নিশ্চয় একজন দ্বীনদার জ্ঞানী শয়তানের জন্য এক হাজার আবেদ হতে অধিক শক্তিশালী"[28]।

এ কারণেই আলেমগণ শর্তারোপ করেন, একজন বিচারক যিনি মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালা করবে, তাকে অবশ্যই শরিয়তের বিধান সম্পর্কে জ্ঞানী হতে হবে। সে যদি শরিয়তের বিষয়ে জ্ঞানী না হয়, তাহলে সে কিভাবে ন্যায় বিচার করবে। কারণ, ন্যায় বিচারের উৎসই হল একমাত্র কুরান ও সুন্নাহ। সুতরাং, যারা বিচারক হবে তাদের অবশ্যই কুরান ও সুন্নাহ সম্পর্কে ইলম থাকতে হবে। অন্যথায় তাদের দ্বারা ন্যায় বিচার সংঘটিত হবে না। তাদের থেকে ন্যায় বিচারের আশা করা আকাশ কুসুম সমতুল্য।

দুনিয়াতে মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালা করা, একটি মহৎ কাজ, এতে রয়েছে বড় ধরনের ইজ্জত ও সম্মান। এছাড়া এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য, যারা বিচারক কিংবা হাকিম হয়ে থাকে, তাদের অবশ্যই সতর্ক হতে হয় এবং জ্ঞানে পরিপূর্ণ হতে হয়। অন্যথায় তারা বিচার কাজ পরিচালনায় ভুল করতে পারে যা একজন মানুষের জীবনে

---

28 আত-তারিফ ১৯৯.

বিপর্যয় ডেকে আনবে। দুইজন মানুষের মধ্যে আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক সমস্যা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ, মারা-মারি, কাটা-কাটি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। বরং বর্তমান যুগে সমাজে ও দেশে এগুলো প্রতিনিয়তই সংঘটিত হচ্ছে। এ সব ঝগড়া-বিবাদ ও মতবিরোধের বিচার ফায়সালা বা সমাধানের স্থান হল, বিচারালয় ও আদালত। বিচারালয় ও আদালত হল, মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। এটাই মানুষের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। এখানে এসে মানুষ ন্যায় বিচার পাওয়ার আশা করে। কিন্তু এখান থেকে যদি ন্যায় বিচার না পায় তাহলে তার আর কোন উপায় থাকে না। সুতরাং এখানে যারা বিচার করবে তাদের অবশ্যই জ্ঞানী ও সৎ হতে হবে। তারা যদি জ্ঞানী না হয় এবং অসৎ হয় তাহলে মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হবে এবং মানবতা ধুলায় মিশে যাবে। এ কারণেই বলা যায় যে, যারা মানুষের মাঝে বিচার-ফায়সালা করবে তাদের অবশ্যই দ্বীনদার ও জ্ঞানী হতে হবে। তাদের দ্বীনদার ও জ্ঞানী হওয়ার কোন বিকল্প নাই।

সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলো ছেড়ে দেয়া:

একটি কথা মনে রাখতে হবে, হালাল হারামের মাঝে কিছু সন্দেহযুক্ত বস্তু আছে, যেগুলো হারাম কি হালাল তা স্পষ্ট নয়। এ ধরনের সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে বেঁচে থাকা হল, সত্যিকার দ্বীনদারি। যারা এ সব সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে বেঁচে থাকে না তারা হারামে লিপ্ত হতেও কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপ করে না।

নুমান ইবনে বাশির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

«إن الحَلَال بَيِّن وَالحرَام بين، وَبَيْنهَمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلُمهَا كَثيُر مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرأَ لِدِينهِ وَعرْضِهِ، وَمَن وقَع فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يُواقَعهُ، أَلَا وَإنّ لكِلِّ مَلكٍ حمىً، أَلَا وَإنّ حِمَى الله في أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإنَّ فِي الجَسِد مُضْغَةً إذِا صلَحتْ صَلَح الجَسَدُ كُله، وإذِا فَسَدتْ فَسَد الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْب »

“হালাল ও হারাম উভয়টি স্পষ্ট। তবে উভয়ের মাঝে কিছু সন্দেহযুক্ত বস্তু আছে, যা অধিকাংশ মানুষ জানে না। যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও ইজ্জত-সম্মানকে অটুট রাখল। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে বেঁচে থাকল না, তার জন্য সমূহ সম্ভাবনা আছে যে, সে হারামে পতিত হবে। যেমন- একজন রাখাল সে ক্ষেতের পাশে ছাগল চরায় তার মধ্যে এ আশঙ্কা থাকে, সে ক্ষেত নষ্ট করবে। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে প্রত্যেক বাদশার জন্য একটি

নির্ধারিত ময়দান রয়েছে, আর জমিনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ময়দান হল, তার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে, মানুষের দেহের মধ্যে একটি গোস্তের টুকরা রয়েছে, যখন তা সংশোধন হয়, তাহলে পুরো দেহটি ঠিক থাকে আর যখন তার মধ্যে যে টুকরা রয়েছে, তা নষ্ট হয়, তাহলে তার পুরো দেহটাই নষ্ট হয়। আর তা হল মানুষের অন্তর[29]।

ওয়াবেছাতা ইবনে মাবাদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« الإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي القَلْبِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنِ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ »

"গুনাহ হল, যা তোমার অন্তরে সংকোচ মনে হয়, এবং মনের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্ধ সৃষ্টি করে। আর যদি মানুষ ফতওয়া দেয়, তখন ....[30]

হাসান ইবনে আবি সিনান রহ. বলেন, দ্বীনদারি হল, যখন কোন কিছু তোমাকে সন্দেহে ফেলে, তাকে তুমি ছেড়ে দেবে। এটাই হল, তোমার পরহেজগারি ও দ্বীনদারি[31]।

---

[29] বুখারি ৫২ এবং মুসলিম ১৫৯৯.

[30] আহমদ ১৮০৩০, আলবানী হাসান বলেন.

[31] আল-ওয়ারয়ু ইবনে আবিদ-দুনিয়ার ৪৬

কতক মুবাহ ও হালাল বস্তু হতে বিরত থাকা:

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, দ্বীনদারি হল, যেসব কর্ম-কাণ্ড তোমার ক্ষতির কারণ হয়, তা হতে বিরত থাকা। মানবজাতিকে যেমনিভাবে হারাম হতে বিরত থাকতে হবে, অনুরূপভাবে সন্দেহযুক্ত বস্তুসমূহ হতেও বিরত থাকতে হবে। কারণ, সন্দেহযুক্ত বস্তুও অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়। যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কর্মকাণ্ড হতে বিরত থাকে, সে তার দ্বীন ও ইজ্জত-সম্ভ্রমের হেফাজত করল। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কর্ম-কাণ্ডে লিপ্ত হল, সে অবশ্যই হারামে পতিত হল। যেমন- একজন রাখাল সে ফসলের ক্ষেতের পাশে ছাগল চরাচ্ছিল, তার জন্য আশঙ্কা থাকে, তার ছাগলটি ফসলে গিয়ে পতিত হবে এবং ফসলের ক্ষতি করবে।

সুতরাং, একজন মুসলিমের কর্তব্য হল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তার কাছে যাওয়া হতে বিরত থাকা। কারণ, তার নিকট যাওয়াতে তোমাদের জন্য হারামে লিপ্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧ ﴾

[سورة البقرة: ١٨٧.]

“এটা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তার আয়াতসমূহ মানুষের জন্য স্পষ্ট করেন, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন”। [সূরা বাকারাহ, আয়াত, ১৮৭]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও বলেন,

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ ﴾ [سورة البقرة: ٢٢٩.]

“সুতরাং তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে না। তাহলে স্ত্রী যা দিয়ে নিজকে মুক্ত করে নেবে তাতে কোন সমস্যা নেই। এটা আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর যে আল্লাহর সীমারেখাসমূহ লঙ্ঘন করে, বস্তুত তারাই যালেম”। [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২২৯]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর সীমানা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হালালের শেষ প্রান্ত যার নিকট যেতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে নিষেধ করেছেন। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর সীমা-রেখার অপর অর্থ, হারামের প্রাথমিক অবস্থা। তখন অর্থ হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদের জন্য যা হালাল বা বৈধ করছেন, তা অতিক্রম করো না। আর তোমাদের জন্য যা হারাম করেছে, তার কাছেও তোমরা যেও না। সুতরাং, দ্বীনদারি হল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর বিধানের সীমা রেখার কাছে যাওয়া ও অতিক্রম করা হতে নিরাপদ থাকা। হালাল বিষয়ে সীমা অতিক্রম করা দ্বারা বড় কবিরা গুনাহ ও কঠিন হারামে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সালফে সালেহীনদের থেকে বর্ণিত, তারা অনেক সময় হারাম ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় বিভিন্ন ধরনের হালাল ও বৈধ কাজ হতেও বিরত থাকতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি আমার মাঝে এবং হারামের মাঝে হালাল দ্বারা একটি প্রাচীর তৈরি করতে চাই, যাকে আমি হারাম মনে করি না[32]।

আল্লামা সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ রহ. বলেন, একজন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের হাকীকত উপভোগ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার মাঝে এবং হারামের মাঝে হালাল দ্বারা প্রতিরোধ গড়ে না তুলে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে গুনাহ ও গুনাহের সাদৃশ্য বিষয়গুলো না ছাড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত সে পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না[33]।

মাইমুন ইবন মাহরান রহ. বলেন, একজন মানুষ যতদিন পর্যন্ত তার মাঝে ও হারামের মাঝে হালাল দ্বারা প্রতিরোধ গড়ে না তুলে, ততদিন পর্যন্ত সে ঈমানদার হতে পারবে না[34]।

কোন কোন সালফে সালেহীনগণ বলেন, একজন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত তাকওয়ার সাধ গ্রহণ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ক্ষতি নাই

---

[32] ইমাম আহমদ, আল-ওয়ারয়ু: ৫০.

[33] ইমাম আহমদ, আল-ওয়ারয়ু: ৫০.

[34] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ৮৪.

এমন বস্তুকে যে বস্তুতে ক্ষতি আছে তার থেকে বাঁচার জন্য পরিহার করবে না[35]।

কোন কোন মনীষী বলেন, আমরা হালাল বিষয়ের সত্তরটি বিষয় ছেড়ে দিতাম যাতে আমরা হারাম থেকে বাঁচতে পারি[36]।

উপরের আলোচনা থেকে একটি কথা স্পষ্ট হয়, তা হল, দ্বীনদারির একটি দিক হল, অনেক সময় কিছু কাজ আছে যেগুলোতে কোন ক্ষতি নাই তারপরও আমাদের সলফগণ তা করা হতে বিরত থাকতেন। তার কারণ হল, এ ধরনের বৈধ কাজগুলো অনেক সময় মানুষকে খারাপ কাজের দিকে নিয়ে যায় বা কোন আশঙ্কা সৃষ্টি করে। কিন্তু এ ধরনের বৈধ কাজ ছেড়ে দেয়ারও একটি নিয়মনীতি আছে, সব বৈধ কাজ ছেড়ে দেয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

কোন কোন বৈধ বিষয় আছে যেগুলো ছেড়ে দেয়া বৈধ নয়। কারণ, এ সব বৈধ কাজগুলো ছেড়ে দেয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত হতে বিরত থাকার নামান্তর। যেমন, বিবাহ করা ছেড়ে দেয়া, ঘুম যাওয়া ও খাদ্য গ্রহণ ছেড়ে দেয়া। কারণ, এ গুলো সবই হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বিবাহ করেছেন, তিনি ঘুমাতেন এবং তিনি খাদ্য গ্রহণ করতেন। সুতরাং এগুলো থেকে বিরত থাকা কোন পরহেজগারি বা দ্বীনদারি নয়।

---

[35] মাদারেজুস-সালেকীন ২২.

[36] মাদারেজুস-সালেকীন ২২.

অনুরূপভাবে কোন কোন বৈধ কাজ আছে যেগুলো নিয়ত ভালো হওয়ার কারণে ইবাদতে পরিণত হয়। যেমন- কোন ব্যক্তি খাওয়া খেল এবং নিয়ত করল, আমি খাদ্য গ্রহণ করে যে শক্তি অর্জন করব তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর ইবাদতে ব্যয় করব। এ ধরনের নিয়ত করার ফলে একজন মানুষের খাওয়া পরা ও ঘুম ইবাদতে রূপান্তরিত হবে। অথবা কোন ব্যক্তি তার স্ত্রী ও সন্তানের সাথে খেল-তামাশা করা দ্বারা নিয়ত করল, সে তার প্রবৃত্তির চাহিদা ও মানবিক চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যেই তা করছে, তাহলে তা দ্বারা সে অবশ্যই ছাওয়াব পাবে এবং তার কর্মগুলো ইবাদতে পরিণত হবে। আর যে ব্যক্তি দ্বীনদারি মনে করে বিবাহ করা ও স্ত্রী-সন্তানের সাথে খেল-তামাশা ইত্যাদি ছেড়ে দেয়, তাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এগুলো ছেড়ে দেয়া কোন ইবাদত নয়। বরং এগুলো হল, বৈরাগ্যতা। ছেলে সন্তান ছোট বাচ্চাদের আদর করা এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে সতর্ক থাকা অবশ্যই ইবাদত। আর তাদের আদর যত্ন করা হতে বিরত থাকার মধ্যে কোন বুজুর্গি নাই। অনেক লোক আছে তারা তাদের ছেলে মেয়েদের আদর করা তাদের চুমু দেয়া ইত্যাদি হতে বিরত থাকে তার মনে এটা হল, দ্বীনদারি বা বুজুর্গি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা কোন দ্বীনদারি বা বুজুর্গি নয়।

দ্বীনদারির ব্যাপকতা:

মানুষ পরহেজগারি ও দ্বীনদারির বিবেচনায় চার শ্রেণীতে বিভক্ত। ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রহ. বলেন, দ্বীনদারির বিবেচনায় মানুষ চার প্রকার। এক শ্রেণীর লোক যারা অল্প ও বেশি উভয় প্রকার বস্তু থেকে পরহেজগারি বা দ্বীনদারি অবলম্বন করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক আছে, যারা শুধু অল্প বস্তু থেকে বেঁচে থাকে। কিন্তু যখন তাদের সামনে বেশি

বা মোটা অংকের কোন বস্তু আসে, তখন তা থেকে তারা বেঁচে থাকে না। তৃতীয় শ্রেণির লোক, যারা অধিক থেকে বেঁচে থাকে, কিন্তু কম বস্তুকে তারা ছোট ও তুচ্ছ মনে করায়, তা থেকে বেঁচে থাকে না। চতুর্থ শ্রেণীর লোক, যারা কম ও বেশি কোন কিছু থেকে তারা তাদের নিজেদের বিরত রাখে না[37]।

প্রথম শ্রেণীর লোক: এরা হল, তারা যারা ছগীরা ও কবিরা উভয় প্রকার গুনাহ হতে নিজেদের বিরত রাখেন। তারা কোন ছগীরাগুণাহ করে না এবং কবিরা গুনাহও করে না।

দ্বিতীয় প্রকার লোক: সাধারণ মানুষের মত, তারা মানুষের অল্প সম্পদ ভক্ষণ করা হতেও বিরত থাকে। কিন্তু যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে মানুষের উপর ক্ষমতা বা সুযোগ দেয়, তখন সে মানুষের বড় বড় সম্পদ হনন করে। তারা বলে অল্প খেয়ে দুর্নাম কামানোর প্রয়োজন নাই।

তৃতীয় প্রকার: এ শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অধিক। তারা কোন ব্যভিচার করে না, চুরি ডাকাতি ও হত্যা রাহাজানি করে না, কবিরা গুনায় লিপ্ত হয় না এবং সুদ-ঘোষ খায় না। কিন্তু তারা ছগীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকে না। তারা ছগীরা গুনাহ করতে থাকে। যেমন- তারা তাদের দৃষ্টির হেফাজত করে না, কানের হেফাজত করে না, রাস্তা ঘাটে তারা নারীদের দিকে তাকায় এবং গান-বাজনা ইত্যাদি তারা শ্রবণ করে। সমাজের বেশির ভাগ লোক এ ধরনেরই হয়ে থাকে।

---

[37] তারিখে বাগদাদ: ১৯৯/৬.

চতুর্থ প্রকার লোক: যারা ছগীরা গুনাহ ও কবিরা গুনাহ কোন কিছু থেকেই বেঁচে থাকে না। তারা সব ধরনের গুনাহ করে এবং সব ধরনের অন্যায় তারা করতে পারে।

পরহজেগারি ও দ্বীনদারির বাস্তবতা হল, তা সমগ্র দিকগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। কোন একটি দিক যদি অপূর্ণ থাকে, তবে তাকে দীনদার ও পরহেজগার বলা যাবে না। মোটকথা, মুত্তাকী হল, সে লোক যে তার উপর অর্পিত সব দায়িত্ব ও ওয়াজিবসমূহ পালন করে। আর যেসব নিষিদ্ধ কাজ হতে তাদের বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা থেকে বিরত থাকে। এ ছাড়াও যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত বিষয় হতে তারা বিরত থাকে। সুতরাং, এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, দ্বীনদারি একটি ব্যাপক অর্থকে সামিল করে। একজন ব্যক্তি যখন ইসলামের আদেশ-নিষেধ ও হারাম-হালাল বেঁচে চলবে, তাকে মুত্তাকী বা পরহেজগার বলা হবে না। তাকে এর সাথে সাথে এমন সব বিষয় হতে বেঁচে থাকতে হবে, যেগুলোর বিষয়ে সরাসরি আদেশ নিষেধ না থাকলেও কিন্তু তার সাথে মানবিকতা ও মনুষ্যত্ব জড়িত।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, যদি কোন ব্যক্তি একশটি বস্তু হতে নিজেকে বিরত রাখল, কিন্তু একটি হতে সে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম হল না, তাহলে তাকে মুত্তাকী ও পরহেজগার বলা যাবে না[38]। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে, তোমরা পরিপূর্ণ দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ কর এবং পূর্ণ মুসলিম হও। এমন লোকদের মত হইয়ো না, যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকেও খুশি রাখে এবং শয়তানকেও খুশি রাখে।

---

[38] হুলিয়াতুল আওলিয়া ১৬৭.

সুতরাং, মনে রাখতে হবে, মুত্তাকী হতে হলে, তাকে অবশ্যই যাবতীয় সব ধরনের অপরাধ থেকে বেচে থাকতে হবে। ছোট বড় কোন অপরাধ তার দ্বারা সংঘটিত হতে পারবে না। তবেই সে মুত্তাকী বা পরহেজগার বলে বিবেচিত হবে। এ ছাড়া একজন পরহেজগার বা দ্বীনদার লোক তাকে অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর সন্তুষ্টি অর্জনে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। তার থেকে যেন কোন নফল ইবাদতও যাতে না ছুটে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। তাকে হতে হবে একজন পরিপূর্ণ সুন্নাতের অনুসারী।

অনুরূপভাবে একজন লোককে মুত্তাকী বা পরহেজগার বলে আখ্যায়িত করতে হলে, তার আবশ্যক হল, যাবতীয় সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হেফাজত করা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাতে কোন প্রকার অপরাধে জড়িত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। পরহেজগার লোক তার অন্তর, লিসান, হাত, পা, চক্ষু ও কর্ণ সবকিছুকে মুত্তাকী বানাবে; অন্যথায় তাকে পরহেজগার বলা যাবে না। সুতরাং, যদি কোন ব্যক্তি তার কোন এক অঙ্গকে হেফাজত করল, আর বাকি অঙ্গ হেফাজত করল না, তাহলে তাকে দ্বীনদার ও পরহেজগার বলা যাবে না। যেমন- কোন ব্যক্তি অন্তরকে বাঁচিয়ে রাখল, কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অন্যায় অনাচার বা অপরাধ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারল না, তাহলে তাকে দ্বীনদার বলা যাবে না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি তার লিসানকে হেফাজত করল, কিন্তু তার অন্যান্য অঙ্গকে যেমন- চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাদিকে সে হেফাজত করতে পারল না, তাহলে তাকে দ্বীনদার ও পরহেজগার বলা যাবে না। সুতরাং, একজন মুসলিমকে এমন সব ধরনের কর্মকাণ্ড হতে বিরত থাকতে হবে, যেগুলো তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় এবং তার জন্য নিশ্চিত ধ্বংস ডেকে আনে। চাই সেগুলো চোখের কর্মকাণ্ড হোক

বা হাত-পায়ের কর্মকাণ্ড। অনুরূপভাবে হাত, পা ও লজ্জা-স্থান ইত্যাদির কারণেও মানুষ নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে থাকে। সুতরাং মানুষের উপর কর্তব্য হল, তারা যাবতীয় অন্যায় ও অপকর্ম থেকে তার নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেফাজত করবে।

আর একটি কথা মনে রাখতে হবে, একজন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে বড় কঠিন ও কষ্টকর কাজ হল, জবানের হেফাজত করা এবং জবানকে বিভিন্ন ধরনের অন্যায়, অনাচার হতে বিরত রাখা। হাসান ইবন সালেহ রহ. বলেন, আমরা দ্বীনদারির অনুসন্ধান করে দেখতে পাই যে, জবান ছাড়া আর কোন কিছুতে তা এত দুর্বল নয়। জবানে দ্বীনদারির পরিমাণ একেবারেই কম[39]।

আল্লামা ফুজাইল ইবন আয়াজ রহ. বলেন, সবচেয়ে বড় কঠিন পরহেজগারি ও দ্বীনদারি হল, মানুষের জবান[40]। যে লোকের জবান ঠিক থাকবে তার অন্য সবকিছু এমনিতেই ঠিক থাকবে।

জুনাইদ রহ. বলেন, কথার মধ্যে দ্বীনদারি অবলম্বন করা অন্যান্য অঙ্গের বিষয়ে তাকওয়া বা দ্বীনদারি অর্জন করা হতে কঠিন[41]।

আল্লামা ইসহাক ইবন খলফ রহ. বলেন, কথার মধ্যে পরহেজগারি ও দ্বীনদারি অবলম্বন করা স্বর্ণ, রুপা ও ধন-দৌলত বিষয়ে পরহেজগারি ও দ্বীনদারি অর্জন হতে অনেক কঠিন[42]।

---

[39] হুলিয়াতুল আওলিয়া ১৬৭.

[40] হুলিয়াতুল আওলিয়া ১৬৭.

[41] হুলিয়াতুল আওলিয়া ১৬৭.

প্রকাশ্যে ও গোপনে পরহেজগারি ও দ্বীনদারি অবলম্বন করা:

একটি কথা মনে রাখতে হবে, সত্যিকার দ্বীনদার বা পরহেজগার তারা, যারা প্রকাশ্যে ও গোপনে উভয় অবস্থায় দ্বীনদারি অবলম্বন করে: তারা লোক দেখানোর জন্য শুধু প্রকাশ্যে দ্বীনদারি আর গোপনে নাফরমানি অবলম্বন করে না। অনেক মানুষ আছে তাদের চেহারা মানুষের সামনে এক রকম আর মানুষের অগোচরে অন্য রকম। এরা লোক দেখানোর জন্য দীনদারি অবলম্বন করে বাস্তবে তারা দ্বীনদার নয়। এরা মূলত: মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের তাদের মত হওয়া থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

মানব সমাজে এ ধরনের লোকের অভাব নাই। এদেরকে কেউ বিশ্বাস করে না এবং সমাজে তাদের কোন অবস্থান থাকে না। তারা যখন যা করার সুযোগ পায় তা করে।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার সাথী সঙ্গীদের নিয়ে একদিন মদিনার অদূরে কোন এক প্রান্তে মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণে বের হন। স্থানীয় লোকেরা তাদের জন্য খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করে এবং তাদের জন্য খাওয়ার দস্তরখান বিছিয়ে দেয়। তারা সবাই খাওয়ার দস্তরখানে বসল এমতাবস্থায় একজন ছাগলের রাখাল তাদের সালাম দিল। তখন আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাখালকে বলল, হে রাখাল! তুমি আস, আমাদের সাথে খাওয়াতে শরিক হও। সে বলল, না আমি খাব না আমি রোজাদার। তখন আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রাখালকে বলল, তুমি এ প্রচণ্ড গরমের দিনে রোজা রাখছ এবং রোজা রেখে এ

---

[42] তারিখে দামেশক ২০৫.

পাহাড়ের পাদদেশে ছাগল চরাচ্ছ! আব্দুল্লাহ ইবন ওমরের কথার উত্তরে সে বলল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর কসম করে বলছি, আমি সে দিনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি যেদিন আমাদের খালি হাতে একত্র হতে হবে। একমাত্র আমল ছাড়া আমার আর কিছুই থাকবে না। তারপর আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বললেন, তুমি আমাদের নিকট তোমার এ ছাগলগুলো হতে একটি ছাগল বিক্রি করবে? যদি বিক্রি কর আমরা তোমাকে ছাগলের মূল্য দেব এবং জবেহ করে তোমার জন্য গোস্ত দেব, যাতে তুমি গোস্ত দিয়ে ইফতার করতে পার। তখন সে বলল, এখানে যে ছাগলগুলো দেখছেন, তার একটিও আমার ছাগল না, এগুলো সব আমার মুনিবের। যখন তুমি একটি ছাগল হারাই ফেল, তখন তোমার মুনিবের আর কিছুই করার থাকবে না। তুমি বলবে একটি ছাগল বাঘে খেয়ে ফেলছে। এ কথা শোনে রাখালটি আকাশের দিকে হাত উঁচা করে এ কথা বলতে বলতে দৌড় দিল, আল্লাহ কোথায়? আল্লাহ কোথায়?[43]। তারপর ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাখালের কথাটি বলত এবং তাকে স্মরণ করত। তিনি যখন মদিনায় ফিরে আসে তখন তার মুনিবকে ডেকে পাঠালেন এবং তার থেকে তার ছাগলগুলো এবং রাখালকে কিনে নীল, তারপর রাখালকে মুক্ত করে দিল এবং তাকে ছাগলগুলো দিয়ে দিল।

একেই বলে দ্বীনদারি!। যে প্রকাশ্যে এবং গোপনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করে এবং মুনিবের পিছনের মুনিবের খিয়ানত করে না।

---

[43] শুয়াবুল ঈমান:৫২৫১.

মানুষের অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে পরহেজগারি ও দ্বীনদারির পরিবর্তন হয়:

মানুষের অবস্থার প্রেক্ষাপটে দ্বীনদারির সংজ্ঞা ও অবস্থারও পরিবর্তন হয়। একজন মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, মান-মর্যাদা ও বয়স ইত্যাদি ভেদাভেদের কারণে দ্বীনদারিরও ভেদাভেদ ও পার্থক্য হয়।

যারা বয়সে ছোট তাদের দ্বীনদারি হল, বড়দের কার্য-কলাপ নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তাদের কোন বিষয়ে তারা কোন মতামত দেবে না। আর যারা বড়, অভিজ্ঞ, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তাদের দ্বীনদারি হল, চুপ করে না থাকা। তারা তাদের মতামত ব্যক্ত করবে এবং যারা দায়িত্বশীল সরদার মাতবর তাদের সঠিক পরামর্শ দেবে। যাতে তারা কোন ভুল সিদ্ধান্ত জাতির উপর চাপিয়ে দিতে না পারে।

অনুরূপভাবে একজন জাহেল ও আলেমের দ্বীনদারি এক হতে পারে না। তাদের উভয়ের দ্বীনদারিতে অনেক তফাত আছে। একজন জাহেল লোক যা করতে পারে একজন আলেম তা করতে পারে না। একজন জাহেল ও আলেমের মধ্যে পার্থক্য হওয়াটা স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে যারা দায়িত্বশীল তাদের কাজ ও সাধারণ জনগণের কাজ এক হতে পারে না। দায়িত্বশীলরা যদি কোন ভুল করে তাহলে তাদের ভুলের খেসারত তাদের অধীনস্থ সবাইকে দিতে হবে। আর সাধারণ মানুষের ভুলের খেসারত কাউকে নিতে হয় না। সমাজে যখন কোন অন্যায় ও অপকর্ম হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন দায়িত্বশীলরা তা প্রতিহত করতে, সাধারণ মানুষকে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এ ধরনের প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল হতে পারে না। আলেমদের কাজ কোন

চুপ করে বসে থাকা নয়। তাদের কাজ হল, তারা মানুষকে দিক নির্দেশনা দেবে এবং দায়িত্বশীলদের ভুল ধরিয়ে দিবে।

আল্লামা হুবাতুল্লাহিল মুকরি রহ. বলেন, একজন আলেমের দ্বীনদারি হল, প্রয়োজনের সময় কথা বলা। আর একজন জাহেলের দ্বীনদারি হল, চুপ থাকা[44]।

যদি কোন আলেম প্রয়োজনের সময় কথা না বলে, তাহলে তাকে বোবা শয়তান বলা চলে। আর জাহেলের কথার কোন দাম নাই। সে যখন কথা বলবে তখন উল্টা-পাল্টা কথা বলবে।

আল্লামা ইবন উয়াইনাহকে দ্বীনদারি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, উত্তরে তিনি বলেন, দ্বীনদারি হল, যে ইলম দ্বারা দ্বীনদারিকে জানা যায়, সে ইলমের অনুসন্ধান করা। আর তা হল কারো কারো মতে অধিক চুপ থাকা এবং কথা কম বলা। অনুরূপভাবে তিনি আরও বলেন, একজন জ্ঞানী যে কথা বলে, সে আমার নিকট একজন জাহেল থেকে উত্তম যে কথা না বলে চুপ থাকে[45]।

ইলম ও দ্বীনদারি:

দ্বীনদারি এটি নি:সন্দেহে অন্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল ও মহান কর্ম। যারা দ্বীনদার তাদের মর্যাদা অধিক। তবে ইলম ছাড়া কখনোই দ্বীনদারি অর্জন করা যায় না। সুতরাং, এখানে একটি বিষয় জানা খুবই

---

[44] আল্লামা মুকরী রহ. এর নাছেখ ও মানছুখ ৩৮.

[45] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ২৯৯/৭.

জরুরি, আর তা হল দ্বীনদারির সাথে ইলমের সম্পর্ক। সত্যিকার নির্ভুল বাস্তবতা হল, ইলম ছাড়া কখনো মুত্তাকী হওয়া বা দ্বীনদারি অর্জন করা সম্ভব নয়।

আল্লামা আবু মাসূদ রহ. বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তা থেকে বেচে থাকাটা নির্ভর করছে হারাম হালাল সম্পর্কে জ্ঞান থাকার উপর। কোনটি হারাম আর কোনটি হালাল তা জানতে না পারলে হারাম-হালাল বেচে চলা সম্ভব নয়। আর হারাম হালাল সম্পর্কে জানার একমাত্র উৎস হল কুরআন ও সুন্নাহ। সুতরাং, হারাম হালাল সম্পর্কে জানতে হলে অবশ্যই কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ, কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান ছাড়া হারাম হালাল সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং, বলা চলে, পরহেজগারি বা দ্বীনদারির জন্য ইলমের কোন বিকল্প হতে পারে না। ইলম ছাড়া দ্বীনদারি কচু পাতার পানির মত। যে কোন সময় তা ছুটে যেতে পারে। যে কোন সময় সে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে। শয়তানের জন্য একজন আবেদকে গোমরাহ করা কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু একজন আলেমকে গোমরাহ করা তার জন্য অতি কঠিন কাজ।

মোটকথা, ইলম ছাড়া দ্বীনদারি অর্জন করা যায় না এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর সান্নিধ্য লাভ করা যায় না।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, দ্বীনদারির পূর্ণতা হল, একজন মানুষ ভালোর ভালোকে জানা এবং খারাপের খারাপকে জানা। আর এ কথা অবশ্যই জানা থাকতে হবে, ইসলামী শরীয়তের ভিত্তি হল, কল্যাণ লাভকে নিশ্চিত করা ও কল্যাণকে পূর্ণতায় পৌঁছানো এবং

যাবতীয় সব ধরনের ক্ষতিকে প্রতিহত করা এবং যথাসম্ভব তা ধমিয়ে রাখা। অন্যথায় যে লোক কোন কাজ করা ও না করার মধ্যে ভালো মন্দ তারতম্য করতে পারে না এবং কোনটির মধ্যে শরীয়তে ইসলামী কল্যাণ রেখেছে আর কোনটির মধ্যে ইসলামি শরিয়ত অকল্যাণ বা ক্ষতি রেখেছে তার বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে না, তার অবস্থা এমন হবে সে কখনো সময় যা করা ওয়াজিব তা ছেড়ে দেবে আর যা করা নিষিদ্ধ তার করে বসবে। আবার কখনো সময় কোন কাজকে সে তাকওয়া মনে করবে কিন্তু বাস্তবে তা তাকওয়া নয়, বরং ইসলামী শরিয়তের পরিপন্থী। যেমন- অনেক লোককে দেখা যায় তারা জালিম ও অত্যাচারী বাদশাহর সাথে একত্র হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছেড়ে দেয়, তারা মনে করে এটি বুজুর্গি। [কিন্তু সত্যিকার অর্থে এটি কোন বুজুর্গি বা দ্বীনদারি নয়। এটি হল গোঁড়ামি ও মূর্খতা। বর্তমানেও এ ধরনের তথাকথিত বুজুর্গ ও পরহেজগারের অভাব নাই, যারা ঘরের কোণে ও চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকাকে দ্বীনদারি বা বুজুর্গি মনে করে। দেয়ালের বাহিরে এসে ইসলাম বিরোধীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়াকে তাকওয়ার খেলাপ বা পরিপন্থী মনে করে। মূলত: এরা ইসলামের দুশমন। তাদের দ্বারা ইসলামের উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়ে থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ হতে হেফাজত করুন।]

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, যেমন- কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাবস্থায় কতক মুসলিম সৈন্য তাদের আমীরের নিকট এসে দেখতে পেল সে কোন শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত, তখন তারা তার অবস্থা দেখে বলল, আমরা এ ফাসেকের সাথে থেকে যুদ্ধ করতে রাজি না। এ বলে তারা যদি যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে তাহলে কি লাভ হবে? এ ধরনের ভ্রান্ত

তাকওয়ার কারণে দুশমনরা এসে শহরকে দখল করে নেবে এবং মুসলিমদের বিপর্যয় নেবে আসবে। যার পরিণতি কারোর জন্যই শুভকর হবে না। দ্বীনদারি অবলম্বন করার জন্য সময় সুযোগ বুঝতে হবে। আর এ সব বুঝার জন্য প্রয়োজন জ্ঞান ও দক্ষতা।

ইলম ও জ্ঞানহীন দ্বীনদারির আরেক দৃষ্টান্ত হল, একজন লোকের পিতা মারা যাওয়ার পর তার কিছু সন্দেহযুক্ত সম্পদ আছে, যেগুলো তার পিতা দুনিয়াতে রেখে গেছে। সাথে সাথে তার এমন কতক পাওনাদারও আছে, যারা তার নিকট টাকা পাবে। তারপর লোকেরা যখন তার ছেলের নিকট এসে তাদের পাওনা দাবি করে, তখন সে বলে, আমি সন্দেহযুক্ত মাল হতে আমার পিতার দেনা পরিশোধ করা হতে বিরত থাকতে চাই।

এ ধরনের দ্বীনদারি ফাসেদ ও ভ্রান্ত এবং যারা এ ধরনের দ্বীনদারি অবলম্বন করে তারা মূর্খ। কারণ, সে তার পিতার সম্পদে সন্দেহ আছে এ কথা বলে, মানুষের অধিকার বা পাওনা পরিশোধ করা ছেড়ে দিচ্ছে। অথচ মানুষের পাওনা পরিশোধ করা তার উপর ওয়াজিব।

জ্ঞান না থাকা মানুষকে অনেক ভালো কাজ ও করনীয় কাজ হতে বঞ্চিত করে। কারণ, তারা মনে করে এ ধরনের কাজ না করাই দ্বীনদারি। অথচ, দ্বীনদারি হল, এ ধরনের কাজ করার মধ্যে। কিন্তু তার ইলম না থাকার কারণে সে তা বুঝতে পারে না। এ জন্য বলা বাহুল্য যে, দ্বীনদারি বা তাকওয়ার জন্য ইলম অবশ্যই থাকতে হবে। ইলম ছাড়া তাকওয়া বা দ্বীনদারির চিন্তা করা সম্পূর্ণ অবান্তর ও ভিত্তিহীন।

তারপর ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, অনেক লোককে দেখা যায়, তারা যে সব ইমামদের মধ্যে কোন প্রকার বিদআত বা অন্যায় দেখতে পায়, তাদের পিছনে জামাতে সালাত আদায় ও জুমার সালাত আদায় করা ছেড়ে দেয়। তারা মনে করে তাদের পিছনে সালাত আদায় করার চেয়ে একা সালাত আদায় করা বুজুর্গি। কিন্তু তাদের এ ধরনের ধারণা কুরআন ও হাদিসের সম্পূর্ণ বিপরীত। অনুরূপভাবে যখন কোন আলেমের মধ্যে কোন বিদআত পরিলক্ষিত হয় বা কোন সত্যি সাক্ষ্য-দাতা তার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখা যায়, তখন তাদের থেকে ইলম হাসিল করা ও সাক্ষ্য কবুল করা হতে বিরত থাকে। তারা মনে করে তাদের থেকে হক কথা শোনে কবুল করা ছেড়ে দেয়া হল বুজুর্গি। অথচ হক কথা শোনা ও তা গ্রহণ করা হল ওয়াজিব[46]। কিন্তু তার ইলম না থাকার কারণে সে ওয়াজিব ছেড়ে দিচ্ছে। আর মনে করছে এটিই বুঝি তাকওয়া বা দ্বীনদারি।

একজন মুসলিমের আদর্শ হতে হবে, হক যেখানেই পাবে সে তার থেকে হককে কবুল করবে ও সত্যকে গ্রহণ করবে। মানুষ হিসেবে আমরা কেউ ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। আমাদের সবারই ভুল হয়ে থাকে। সুতরাং, আমরা যেন অন্যের ভুল দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে না উঠি বরং আমাদের দেখতে হবে তার গুণ কি আছে? আমরা যদি সত্যিকার মুসলিম হই তখন আমরা তার গুণ থেকে উপকৃত হব, আর তার ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব। কিন্তু দু:খের বিষয় হল, আমরা শুধু মানুষের দোষ তালাশ করে বেড়াই, নিজের দোষ দেখতে অভ্যস্ত নয়।

---

[46] মাজমুয়ে ফাতওয়া: ৫১২/১০.

সালেহীনদের দ্বীনদারির কতক দৃষ্টান্ত

আমরা আমাদের পূর্ব মনীষীদের তাকওয়া ও দ্বীনদারি বিষয়ে জানার মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করতে পারি। পূর্ব মনীষীদের ঘটনা জানা দ্বারা মানুষের অন্তর নরম হয় এবং তারা হককে কবুল করতে অভ্যস্ত হয়। এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কাফেরদের নিকট পূর্বের নবী ও রাসূলদের ঘটনা তুলে ধরেন। নবী ও রাসূলদের বিরোধিতা করার পরিণতি এবং তাদের আনুগত্য করার সুফল কি তা আলোচনা করেন, যাতে মানুষ তাদের ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। আমরা এখানে আমাদের সালফে সালেহীনদের দ্বীনদারীর কতক দৃষ্টান্ত আলোচনা করব, যাতে আমরা আমাদের নিজেদের জীবনে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরহেজগার ও দ্বীনদার হতে পারি।

আমাদের সালফে সালেহীনদের মধ্যে অনেকেই দ্বীনদারির গুণে গুণান্বিত ছিলেন। কিন্তু তা স্বত্বেও তারা কখনোই নিজেদের পরহেজগার হিসেবে দাবি করতেন না। বরং, তারা তাদের থেকে এ ধরনের কোন গুণকে প্রত্যাখ্যান করতেন। কারণ, তারা জানতেন পরহেজগার হওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ; পরহেজগার হতে হলে অনেক সাধনা করতে হয় এবং অনেক কষ্ট সাধন করতে হয়।

আল্লামা শাবী রহ. বলতেন, হে ওলামাদের দল! হে ফকীহদের দল! তোমরা মনে রাখবে- আমরা আলেম কিংবা ফকীহ কোনটাই নই, বরং আমরা হলাম এমন সম্প্রদায়ের লোক, যারা একটি হাদিস শুনেছি তারপর আমরা যা শুনলাম তা তোমাদের নিকট বর্ণনা করলাম। ফকীহতো সে ব্যক্তি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা নিষেধ করেছেন, তা

হতে বিরত থাকে। আর আলেমতো সে ব্যক্তি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করে।

চিন্তা করে দেখুন, আল্লাম শাবির মত এমন একজন মহা মণীষি সে তার নিজের ব্যাপারে কি ধরনের চিন্তা করেন এবং মানুষকে তাদের সম্পর্কে কি জানিয়ে দেন[47]।

নীচে তোমাদের জন্য আমাদের সালফে সালেহীনদের তাকওয়া ও দ্বীনদারির কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল:

পূর্বেকার উম্মতদের দ্বীনদারির দৃষ্টান্ত:

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اشْتَرَى رَجُل مِنْ رَجلٍ عَقارًا لَهُ، فَوجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيها ذَهبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ :خُذ ذهَبَكَ مِنِّي، إنّما اشْتَرَيْت مِنكَ الأرَض، وَلَم أَبْتَعْ مِنكَ الذَّهَبَ .فَقَالَ الَّذِي شَرَى الأَرْضَ :إنّمَا بعِتُكَ الأرَضَ وَمَا فِيهَا- .فكل منهما تورع عن أخذ الذهب -قَالَ :فَتَحَاكَمَا إلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ :أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ أَحَدُهمَا :لِي غُلَامٌ .وَقَالَ الآخَرُ :لِي جَارِيَةٌ .قَالَ : أَنْكحِوا الغُلَامَ الجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِكمَا مِنُه، وتَصَدقَا»

অর্থ, একলোক কোন এক ব্যক্তি থেকে একটি জমিন ক্রয় করল, তখন যে ব্যক্তি জমি ক্রয় করল, সে তার জমি একটি স্বর্ণের থলি পেল, তখন

---

[47] [47] হুলিয়াতুল আওলিয়া ৩১১.

সে জমির পূর্বের মালিককে বলল, তুমি তোমারা স্বর্ণে থলি আমার থেকে নিয়ে যাও। আমি তোমার থেকে শুধু জমি ক্রয় করছি তোমার থেকে স্বর্ণ ক্রয় করিনি। তখন যে মালিক জমি বিক্রি করল, সে বলল, আমি তোমার নিকট জমি ও জমিনে যা কিছু আছে সবই বিক্রি করছি। তারা উভয়ে স্বর্ণের থলিটি গ্রহণ করা হতে বিরত থাকে। কেউ গ্রহণ করতে রাজি হয় না। তারপর তারা উভয়ে অপর এক ব্যক্তির নিকট বিচারের জন্য গেল। তখন লোকটি তাদের উভয়কে জিজ্ঞাসা করে বলল, তোমাদের উভয়ের ছেলে মেয়ে আছে কি? তখন তাদের একজন বলল, আমার একজন ছেলে আছে আর অপরজন বলল, আমার একজন মেয়ে আছে। তখন লোকটি বলল, তোমরা তোমাদের ছেলে মেয়েদের একে অপরের নিকট বিবাহ দিয়ে দাও। আর এ স্বর্ণ হতে তোমরা তোমাদের জন্য খরচ কর এবং তাদের বিবাহের মোহরানা পরিশোধ কর[48]।

এখানে তাদের উভয়ের দ্বীনদারির দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, তারা কিভাবে দুনিয়ার লোভকে সামাল দিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যদি এ ধরনের কোন ঘটনা আমাদের সামনে পেশ করা হত তাহলে আমাদের অবস্থা কি হত? আমরা কি আমাদের লোভকে সামাল দিতে পারতাম। একেই বলে পরহেজগারি ও দ্বীনদারি।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

« أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كَخ، كَخْ ليَطْرَحها، ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ »

---

[48] বুখারি ৩৪৭২, মুসলিম ১৭৬১.

হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সদকার মালামাল থেকে একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে সাথে সাথে বলল, ওয়াক ওয়াক!! যাতে সে তার মুখে নেয়া খেজুরটি বমি করে ফেলে। তারপর তিনি হাদিস শোনালেন, তুমি কি জান না, আমরা সদকা খাই না[49]।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا»

আমি অনেক সময় আমার স্বীয় বিছানায় গিয়ে দেখতে পাই, আমার বিছানার উপর খেজুর পড়ে আছে। তারপর আমি তা খাওয়ার জন্য উঠাইতাম। কিন্তু যখন মুখের নিকটে নিতাম, তখন আর খেতাম না, না খেয়ে ফেলে দিতাম। আমি আশঙ্কা করতাম, না জানি তা কোন সদকার খেজুর![50]

---

[49] বুখারি ১৪৯১, মুসলিম ১০৬৯.

[50] বুখারি ২৪৩৩, মুসলিম ১০৭০

সাহাবীদের দ্বীনদারি:

আবু ক্বাতাদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كنا مع النبي بالقاحة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش، فوقع سوطي، فقالوا :لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة، فعقرته فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم :كلوا .وقال بعضهم :لا تأكلوا .فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا -فسألته، فقال كُلوُه، حلَالٌ»

"আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কা-হা নামক স্থানে ছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল মুহরিম আবার কিছু ছিল হালাল। এ অবস্থায় আমরা দেখতে পেলাম আমরা সাহাবীরা একটি জিনিষ দেখাদেখি করছে। তারপর আমি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখি একটি দড়ি ছুট গাধা। তারপর আমার লাঠি জমিনে পড়ে গেল, তখন তারা বলল, আমরা কোন ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করব না। কারণ, আমরা সবাই ইহরাম বাধা অবস্থায় আছি। তারপর আমি নিজেই তা উঠিয়ে নেই। তারপর আমি একটি পর্দার আড়াল দিয়ে গাধার নিকট আসি এবং গাধাটিকে শিকার করি। তারপর জবেহ করে গোশত নিয়ে আমার সাথীদের নিকট আসি। তখন তাদের কেউ কেউ বলল, তোমরা খাও। আবার কেউ কেউ বলল, তোমরা খেয়ো না। তারপর আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে আসলাম-তিনি আমাদের সামনে ছিলেন- তাকে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা কি এ

গাধা থেকে খাব নাকি খাব না? তখন তিনি বললেন, তোমরা তা হতে খাও। কারণ, তা তোমাদের জন্য হালাল”[51]।

অর্থাৎ, আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর লাঠি মাটিতে পড়ে গেলে সে তার নিজের লাঠি নিজেই মাটি থেকে উঠাইলেন। কোন সাহাবী তার লাঠিটা তার হাতে তুলে দেয়নি। কারণ, তারা আশঙ্কা করছিল যদি আমরা তার লাঠিটি তার হাতে তুলে দিই, তাহলে মুহরিম অবস্থায় তাকে শিকার করার জন্য সহযোগিতা করা হল। কারণ, সাহাবীরা তখন মুহরিম ছিল আর আবু কাতাদাহ ছিল গাইরে মুহরিম বা হালাল। তারপর সাহাবীরা আবু কাতাদাহ কর্তৃক শিকার করা গাধার গোশত খেতেও পরহেজ করেন। কারণ, তারা চিন্তা করছিল আবু কাতাদাহ শিকার করার প্রতি মনোযোগী হত না যদি তারা তার প্রতি দেখাদেখি না করত। তারা যখন দেখাদেখি করলেন তখন আবু কাতাদাহ গাধাটিকে শিকার করতে উদ্বুদ্ধ হল। এ কারণে তারা গোশত খেতে চাইছিল না। তারা ধারণা করছিল মুহরিম অবস্থায় শিকারির গোশত খাওয়া যাবে না।

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর দ্বীনদারি:

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর তাকওয়া ও দ্বীনদারির স্থান আকাশচুম্বী। তার তাকওয়া ও দ্বীনদারি একেবারে চূড়ান্ত পৌঁছেছিল। নবী ও রাসূলদের পর তার স্থান সমগ্র মানুষের শীর্ষে। তার সমকক্ষ আর কেউ হতে পারবে না।

---

[51] বুখারি ১৮২৩.

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه ، فقال له الغلام :تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: رضي الله عنه وما هو؟ قال :كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أُحسِنُ الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه»

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একজন গোলাম ছিল, সে তার ট্যাক্স আদায় করত। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার ট্যাক্স থেকে আহার করত। একদিন সে কিছু জিনিষ নিয়ে আসলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তা হতে খেলেন। খাওয়ার শেষ হলে, গোলামটি আবু বকরকে বলল, তুমি কি জান এ গুলো কি জিনিষ? তখন আবু বকর তাকে বলল, কি জিনিষ? তখন সে বলল, আমি জাহিলিয়্যাতের যুগে একজন লোককে ঝাঁড়-ফুক করি। কিন্তু আমি ভালোভাবে ঝাঁড়-ফুক কিভাবে করে জানতাম না, কিন্তু আমি তাকে ধোঁকা দিতাম। আমি তার সাথে দেখা করলে সে আমাকে এ জিনিষগুলো দেয়। আর আপনি তা হতেই এখন আহার করলেন। তার কথা শোনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সাথে সাথে তার হাতকে তার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে যা কিছু খাইলেন সবই বমি করে দিলেন[52]।

[52] বুখারি: ৩৮৪২.

ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর তাকওয়া:

আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি তার পিতা ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণনা করে বলেন,

«كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف في أربعة، وفرض لابن عمر رضي الله عنه ثلاثة آلاف وخمسمائة، فقيل له :هو من المهاجرين فلم نقصته من أربعة آلاف؟ قال :إنما هاجر به أبواه .يقول :ليس هو كمن هاجر بنفسه »

ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু প্রথম যুগের মুহাজিরদের জন্য চার হাজার করে হিস্সা নির্ধারণ করেন। আর তিনি আব্দুল্লাহ ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু জন্য নির্ধারণ করেন তিন হাজার পাঁচশ। তখন তাকে বলা হল, তিনিতো প্রথম যুগে যারা হিজরত করছে তাদের মধ্যে একজন। সে হিসেবে সে আমাদের সমান পায়। আপনি তাকে চার হাজার থেকে পাঁচশ কমালেন কেন? উত্তরে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, সে তার মাতা পিতার সাথে হিজরত করেছে। সুতরাং, সে তাদের মত হবে না, যারা নিজের থেকে হিজরত করছিল[53]।

কারণ, আব্দুল্লাহ ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ছোট ছিলেন, তাই তাকে তার মাতা-পিতা উভয়ে হিজরত করান। এ কারণে তাকে যারা ইসলামের প্রথম যুগে হিজরত করেছেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেননি।

সালাবাহ ইবনে আবি মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

---

[53] বুখারি: ৩৯১২.

إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده :يا أمير المؤمنين، أعط هذا ابنة رسول الله التي عندك .يريدون أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه - لأنها حفيدة النبي فقال عمر رضي الله عنه: أم سليط أحق .وأم سليط من نساء الأنصار، قال عمر :رضي الله عنه فإنها كانت تزفر لنا القرب، ممن بايع رسول الله يوم أحد .تزفر :تخيط.

ওমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মদিনার নারীদের মধ্যে কিছু কাপড় বিতরণ করেন। বিতরণের পর একটি ভালো কাপড় অবশিষ্ট থেকে গেলে তার নিকট উপস্থিত কেউ বলল, হে আমীরুল মুমিনিন! এ কাপড়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাতনী উম্মে কুলসুম বিনতে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কে দিয়ে দিন। কারণ, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাতনী। এ কথা শোনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, উম্মে সুলাইত তার চেয়েও অধিক হকদার। উম্মে সুলাইত হল আনসারি নারী, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আরও বলেন, উম্মে সুলাইত ওহুদের যুদ্ধে আমাদের জন্য পানির মশক সিলাই করতো[54]।

ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কাপড়টি তার স্ত্রীকে দান করতে অস্বীকার করেন। অথচ সে ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাতনী। কারণ, তার স্থান উম্মে কুলসুমের নীচে।

---

[54] বুখারি: ২৮৮১.

জয়নাব বিনতে জাহাসের দ্বীনদারি:

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা এর অপবাদের ঘটনায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জয়নব বিনতে জাহাস রাদিআল্লাহু আনহা কে তার দ্বীনদারির কারণে হেফাজত করেন। মুনাফেকরা যখন আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার ব্যাপারে বিপথগামী হলেন এবং তাদের সাথে অন্যান্য লোকেরাও তাদের কথার আলোচনা করতে আরম্ভ করেন, তখন যয়নব বিনতে জাহাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর সতিন হওয়া এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা এর উপর নিজের বড়ত্ব প্রকাশ ও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর প্রতি তার বৈরিতা থাকা স্বত্বেও আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা সম্পর্কে কোন খারাপ মন্তব্য করেননি। যখন তাকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তখন তিনি বললেন, আমি তার সম্পর্কে ভাল জানি। তার মধ্যে আমি কখনো কোন খারাপী দেখি নাই। তিনি এ ঘটনায় নিজেকে জড়ানো হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকেন।

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা নিজেই জয়নাব বিনতে জাহাস সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে বলেন,

«كان رسول الله يسأل زينب بنت جحش رضي الله عنها عن أمري، فقال يَا زَينبَ، مَا عَلِمتِ؟ مَا رَأْيتِ فقالت :يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا .قالت :وهي التي كانت تساميني، فعصمها الله بالورع»

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সম্পর্কে জয়নাব বিনতে জাহাস রাদিআল্লাহু আনহার নিকট জিজ্ঞাসা করেন, তিনি বলেন, হে

জয়নব তুমি তার সম্পর্কে কি জান এবং কি দেখছ? তখন জয়নব বিনতে জাহাস রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, হে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর রাসূল! আমি আমার চোখ ও কানকে হেফাজত করে বলছি। আমি তার সম্পর্কে একমাত্র ভালো ছাড়া খারাপ কিছু জানি না। আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, তিনিই আমার উপর বড়াই করতেন। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার দ্বীনদারি দ্বারা তাকে হেফাজত করেন[55]।

এ ধরনের ঘটনা আমাদের সমাজেও সংঘটিত হয়। যখন এ ধরনের কোন ঘটনা দেখা যায়, তখন আমাদের উচিত হল চুপ থাকা। কোন প্রকার সাক্ষী ছাড়া এ ধরনের রটনা সম্পর্কে মন্তব্য করা খুবই খারাপ।

আমাদের দেশে দেখা যায় সতীনকে বরদাশত করতে পারে না। তার কোন দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পাওয়ার সাথে তাকে কিভাবে অপমান করা যায় সে চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী ছিল দুনিয়ার সমস্ত মহিলাদের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এত বড় একটি সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের সতীনের বিষয়ে কোন খারাপ মন্তব্য করাতো দূরের কথা, বরং তিনি সাথে সাথে বললেন, না, হে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর রাসূল! আমরা তার মধ্যে কখনো কোন খারাপ অভ্যাস প্রত্যক্ষ করিনি। তার মধ্যে আমরা সব সময় ভালো গুণই দেখতে পেতাম। এ ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীদের অবস্থা; তারা তাদের নিজেদের স্বার্থের কারণে কখনো দ্বীনদারির পরিপন্থী কোন কথা বা কাজে জড়িত হত না।

---

[55] বুখারি ২৬৬১, মুসলিম ২৭৭০।

ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর তাকওয়া:

আব্দুল্লাহ ইবন ওমরের শিষ্য নাফে রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন,

« سمع ابن عمر رضي الله عنه مزماراً، قال : فوضع إصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي :يا نافع، هل تسمع شيئاً؟ قال :فقلت :لا. قال :فرفع إصبعيه من أذنيه »

অর্থ: একবার আব্দুল্লাহ ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু গানের আওয়াজ শুনল। গানের আওয়াজ শোনার পর সে তার দুই আঙ্গুল উভয় কানের মধ্যে প্রবেশ করে। তারপর সে খুব দ্রুত রাস্তা অতিক্রম করে। তারপর ইবনে ওমর আমাকে বলল, হে নাফে! তুমি কি কিছু শুনতে পেয়েছ? তিনি বলেন, আমি তাকে বললাম না, আমিতো কিছু শুনতে পাচ্ছি না। আমার কথা শোনার পর সে তার কর্ণদ্বয় থেকে আঙ্গুল বের করে আনল[56]।

তাবেয়ীনদের তাকওয়া:

আব্দুর রহমান ইবন ওসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা এহরাম অবস্থায় তালহা ইবন উবাইদুল্লা সাথে ছিলাম, তখন আমাদের জন্য একটি পাখি হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করা হল। আমাদের মধ্য হতে কেউ কেউ তা হতে আহার করল, আবার কেউ কেউ না খেয়ে থাকল এবং দ্বীনদারি অবলম্বন করল। ফলে

[56] আবু দাউদ ৪৯২৪, ইমাম আহমদ: ৪৫৩৫, আলবানি রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

অনেকেই তা থেকে একটুও খেল না। তারপর যখন তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ঘুম থেকে উঠল, তখন সে যারা খেয়েছে তাদের সাথে একমত হন এবং তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে এ ধরনের পাখির গোশত খেয়েছি।

মোটকথা, এখানে দেখা গেল, কতক তাবে‘ঈ পাখির গোশত খেল না। তারা দ্বীনদারি অবলম্বন করল। তাদের দ্বীনদারি তাদের খাওয়া হতে বিরত রাখল।

আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক রহ. এর তাকওয়া:

হাসান ইবন আরফা রহ. আব্দুল্লাহ ইবন মুবারকের সূক্ষ্ম বিষয়ে যে তাকওয়া অবলম্বন করতেন, তার বর্ণনা করে বলেন, তিনি একদিন শামের এক লোক হতে একটি কলম ধার নেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ভুলে গিয়ে তা খোরাসানে নিয়ে আসেন। তারপর যখন সে কলমটি হাতে পান, সাথে সাথে সে পুনরায় শামে চলে আসেন এবং কলমটিকে তার প্রকৃত মালিকের নিকট পৌঁছে দেন।

একটি কলমের জন্য তিনি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আবার সিরিয়ায় যান। আর বর্তমানে আমরা মানুষের হকের প্রতি কোন গুরুত্বই দিই না। আমরা শুধু আমাদের নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকি। অথচ দাবি করি আমি একজন মুত্তাকী ও পরহেজগার।

এ ধরনের অসংখ্য ও অগণিত ঘটনা আছে, যেগুলো বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। তবে যারা জ্ঞানী তাদের জন্য দু-একটি ঘটনাই

উপদেশ গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট। কারণ, প্রবাদে আছে “জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট”।

আর যারা জ্ঞানী নয়, তাদের জন্য যদি হাজারো ঘটনা উল্লেখ করা হয় তা তাদের কোন উপকারে আসবে না।

দ্বীনদারি অবলম্বন করার উপকারিতা

দ্বীনদারির উপকারিতা অনেক। একজন পরহেজগার লোক দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে কামিয়াবি লাভ করবেন। দুনিয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের মধ্যে তার কবুলিয়ত দান করবে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে মহব্বত করবে। যখন কোন বান্দাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহব্বত করে তার ফেরেশতারাও মহব্বত করে এবং জমিনে অধিবাসীরাও তাকে মহব্বত করে। এছাড়াও একজন পরহেজগার লোককে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার নূরের আলো দ্বারা আলোকিত করবে।

দ্বীনদারি অবলম্বন করা সফলতার কারণ:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴾

অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে যে আত্মশুদ্ধি করবে, [সূরা আলা, আয়াত: ১৪] আল্লামা ক্বাতাদাহ রহ. বলেন, মুত্তাকী হিসেবে আমল করল[57]।

মুসা ইবন হাম্মাদ রহ. বলেন, আমি সুফিয়ান সাওরী রহ. কে স্বপ্নে দেখি সে জান্নাতে এক গাছের ডাল থেকে অপর গাছের ডালে এবং এক গাছ থেকে আরেক গাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ অবস্থা দেখে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু আব্দুল্লাহ! তুমি এ ধরনের মান-মর্যদা ও

[57] তাফসীরে তাবারী: ৫৪৬/১২

সম্মান কিভাবে অর্জন করলে? উত্তরে সে বলল, দ্বীনদারি মাধ্যমে, দ্বীনদারি মাধ্যমে[58]। কথাটি সে দুইবার বলল।

দ্বীনদারি কিয়ামতের দিন হিসাব সহজ হওয়ার কারণ:

সুফিয়ান রহ. বলেন, তুমি দুনিয়া বিমুখ হও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাকে দুনিয়ার সব দুর্বলতা প্রদর্শন করবে। আর তুমি দ্বীনদারি অবলম্বন কর, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমার থেকে হিসাব নেয়া সহজ করে দেবে।

যারা দ্বীনদারি অবলম্বন করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের দুনিয়াতেও সুখী জীবন দান করেন এবং আখেরাতেও তাদের হিসাবকে সহজ করে দেবে[59]।

দ্বীনদারি কারণে আমলে বরকত হয় এবং ছাওয়াব বেশি পাওয়া যায়:

ইউসূফ ইবন আসবাত রহ. বলেন, অধিক আমল করা হতে সামান্য তাকওয়া অর্জন করা যথেষ্ট[60]।

এক ব্যক্তি আবি আব্দুর রহমান আল-আমরিকে বলল, তুমি আমাকে ওয়াজ কর! এ কথা শোনে জমিন থেকে একটি পাথর নীল এবং বলল, এ পাথরের টুকরা পরিমাণ তাকওয়া তোমার অন্তরে প্রবেশ করা সমগ্র

---

[58] ইবনে আবিদ-দুনিয়া, মানামাত: ২৭৫

[59] হুলিয়াতুল আওলিয়া ২০/৭ ইবনে আরবীর যুহুদ ও যাহিদিনদের বর্ণনা ৬৩

[60] হুলিয়াতুল আওলিয়া ২৪৩/৮.

জমিন বাসীর সালাত হতে উত্তম। অনেক মানুষ আছে যারা সালাত আদায় করতে করতে কপালে দাগ পালায়। কিন্তু তাদের ইবাদতে কোন এখলাছ নাই। তাদের এ ধরনের ইবাদত নিষ্ফল ও অকার্য। এ দিয়ে তারা আখিরাতের জীবনে নাজাত পেতে পারবে না। সুতরাং একটি কথা মনে রাখতে অধিক ইবাদত মানুষের জন্য কোন কল্যাণ ভয়ে আনতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুকরণ ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সন্তুষ্টি লাভের জন্য সামান্য ইবাদতই যথেষ্ট[61]।

দ্বীনদারি নিয়ত সংশোধনের কারণ:

বিলাল ইবন সায়াদ রহ. বলেন, মুমিনের তাকওয়া ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ছাড়বে না যতক্ষণ না সে কি নিয়ত করে তা দেখে নেবে। যখন কোন বান্দার নিয়ত ঠিক হবে, তখন তার পরবর্তী সব আমল ঠিক হবে। আর যদি নিয়ত ঠিক না থাকে, তখন তার আমলও ঠিক থাকবে না। এ কারণেই বলা হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের বাহ্যিক দিক দেখেন না, তিনি দেখেন মানুষের অন্তর ও নিয়ত। যখন মানুষের নিয়ত ভালো হবে তখন তার আমলও ভালো হবে। আর যখন নিয়ত ফাসেদ হবে তখন তাদের আমলও ফাসেদ হবে। এ কারণেই আমল শুদ্ধ করার পূর্বে অবশ্যই নিয়তকে শুদ্ধ করতে হবে। আর দ্বীনদারি অবলম্বন দ্বারা মানুষের নিয়ত শুদ্ধ হয়ে থাকে।

---

[61] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ২৩০/৫.

দ্বীনদারি সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে বিরত রাখার কারণ:

আল্লামা আবু আব্দুল্লাহ আল-ইনতাকী রহ. বলেন, যে ভয় করে সে ধৈর্য ধারণ করে, আর যে ধৈর্য ধারণ করে সে দ্বীনদারি অবলম্বন করে এবং যে দ্বীনদারি করে সে সুবহাত থেকে বিরত থাকে[62]। সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে তারা বেচে থাকে যারা ঈমানের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। যখন কোন বান্দার অন্তরে দ্বীনদারি থাকে তখন সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করে। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর ভয় যে অন্তরে থাকবে, সে অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর মর্জি মোতাবেক চলতে চেষ্টা করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর মর্জি মোতাবেক চলার অর্থ হল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর মর্জির খেলাপ সব ধরনের কর্মকাণ্ড হতে বিরত থাকা।

দ্বীনদারি দোয়া কবুল হওয়ার কারণ:

আবু মুহাম্মদ ইবন ওয়াসে রহ. বলেন, দ্বীনদারির সাথে সামান্য দোয়াই যথেষ্ট যেমন খাওয়ার সাথে সামান্য লবণই যথেষ্ট হয়[63]। পরহেজগার লোকদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর দরবারে অধিক দোয়া করতে হয় না। তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর দরবারে হাত তুললেই চলে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের কথায় সাড়া দেন।

---

[62] হুলিয়াতুল আওলিয়া ২৯০/৯.

[63] শুয়াবুল ঈমান: ১১৪৯.

দ্বীনদারি ইলম অর্জন বা হাসিলের কারণ:

আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক রহ. বলেন, চারটি বিষয় ছাড়া পরিপূর্ণ ইলম হাসিল করা যায় না। চারটি বিষয় হল, ইলম অর্জনের জন্য নিজেকে ফারেগ করা। দুই- টাকা-পয়সা। তিন-স্মরণ শক্তি। চার- তাকওয়া বা দ্বীনদারি[64]।

দ্বীনদারি ইলমের মধ্যে বরকতের কারণ:

আল্লামা কানুজি রহ. বলেন, একজন আলেমের জন্য জরুরি হল তাকওয়া ও দ্বীনদারি। যখন একজন আলেমের মধ্যে তাকওয়া বা দ্বীনদারি থাকবে তখন তার ইলমের ফায়েদা ও উপকারিতা বেশি হবে[65]। যখন কোন অন্তরে তাকওয়া থাকবে তখন সে অন্তরে ইলম স্থান করে নিবে। কিন্তু যে অন্তরে গুনাহ থাকবে, বিদআত থাকবে এবং জাহালত থাকবে সে অন্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর দ্বীনের ইলম বা নুর থাকতে পারে না। কারণ, ইলম হল, নুর। আর গুনাহ পাপাচার হল, অন্ধকার। আলো ও অন্ধকার একসাথে একত্র হতে পারে না। এ কারণেই যখন একজন বান্দা গুনাহ হতে বিরত থাকে তখন তার অন্তরে ইলম প্রবেশ করে। তার ইলম দ্বারা সে নিজে উপকৃত হয় এবং মানুষকে সে উপকার করতে সক্ষম হয়।

---

[64] শুয়াবুল ঈমান: ১৭৩২.

[65] আবজাদুল উলুম: ২৪৮/১.

তাকওয়া দ্বারা অপরের থেকে হক কবুল করার মানসিকতা তৈরি হয়:

সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, আমি যখনই কোন মানুষের নফসের চাহিদার বিরোধিতা করি, তখন তাকে দেখতে পাই সে আমার উপর বিরক্ত হয়। বর্তমানে আসলে আহলে ইলম ও পরহেজগার লোকের খুব অভাব দেখা দিয়েছে[66]।

সত্যিকার অর্থে যারা আহলে ইলম বা পরহেজগার হয়, তারা কখনোই তাদের মতের বিরোধিতার উপর বিরক্ত বোধ করবে না। বরং তাদের যদি কেউ উপদেশ দেয়, তারা খুশি হয় এবং উপদেশ গ্রহণ করে।

দ্বীনদারি আত্মার পরিশুদ্ধির কারণ:

আত্মার সংশোধন অত্যন্ত জরুরি বিষয়। আত্মার সংশোধন ছাড়া মানুষ কখনোই পরহেজগার হতে পারে না। আর যখন মানুষ পরহেজগার হবে না তখন তাকে পদে পদে বিপদে পড়তে হবে। তবে মানুষ যখন পরহেজগার হয়, তখন সে অন্যের সংশোধনের পূর্বে নিজের সংশোধন নিয়েই অধিক ব্যস্ত হয়। একজন মানুষের দ্বীনদারি তার নিজের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের কারণ হয়ে থাকে। মানুষ যখন পরহেজগার হয়, তার মধ্যে কোন প্রকার হিংসা, বিদ্বেষ ও অহংকার থাকে না। ইব্রাহীম ইবন দাউদ ইবন সাদ্দাদ রহ. বলেন,

وَالْمَرْءُ إِنْ كَانَ عَاقِلًا وَرِعاً

[66] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ১৯/৭.

أَخرسَهُ عَنْ عُيوبِهِمْ وَرعُهْ

كَمَا السَّقِيمُ المَرِيضُ يُشْغِلُهُ

عَنْ وَجَعِ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَجَعُهْ

“যদি কোন মানুষ জ্ঞানী ও মুত্তাকী হয়, তার তাকওয়া তাকে মানুষের দোষ-ত্রুটি নিয়ে মন্তব্য বা সমালোচনা করা হতে বোবা বানিয়ে দেয়। যেমন, একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে তার ব্যথা-বেদনা অন্যান্য লোকের ব্যথা বেদনা নিয়ে চিন্তা করা হতে বিরত রাখে[67]। পরহেজগার সব সময় তার নিজের কোন ভুল ত্রুটি হচ্ছে কিনা এ নিয়ে পেরেশান থাকে। নিজেকে সঠিক ও সৎ পথে পরিচালনার জন্য ব্যস্ত থাকে। অন্যের বিষয়ে চিন্তা করা ও মাথা গামানোর সুযোগ তার খুব কম থাকে।

দ্বীনদারির চরিত্র সুন্দর করার কারণ:

চরিত্র সুন্দর করা অতীব জরুরী বিষয়। যার চরিত্র সুন্দর তার মত সুন্দর মানুষ দুনিয়াতে আর কেউ হতে পারে না। সুন্দর চরিত্র মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। সুন্দর চরিত্রের কারণে মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। মানুষ তাকে তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। সুন্দর চরিত্র হাসিলের জন্য দ্বীনদারি অবলম্বন করতে হয়। পরহেজগার লোকের চরিত্র সুন্দর হয় এবং তারা কোন নোংরা কাজ করে না। আল্লামা আব্দুল করিম আল-জাযারি রহ. বলেন, একজন পরহেজগার

---

[67] ইবনে আবিদ-দুনিয়া, আল-ওয়ারয়ু: ২১৮.

লোক কখনোই ঝগড়া-বিবাদ করে না[68]। তারা মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করে।

কোন সমাজে একজন পরহেজগার লোক থাকলে সে মানুষের আশ্রয় কেন্দ্রে পরিণত হয়। লোকেরা তার কাছে বুদ্ধি পরামর্শের জন্য যায়। বিপদ আপদে তার থেকে পরামর্শ নেয়। তাকে সমাজের আমানতদার হিসেবে মেনে নেয়। তার কাছে তারা তাদের টাকা পয়সা আমানত রাখে। যাবতীয় গোপন বিষয় তার কাজে বলে। দু:খ, দুর্দশা ও হতাশার সময় তার সান্নিধ্যে এসে সময় কাটায়।

দ্বীনদারি অবলম্বন দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য অর্জনের কারণ:

একজন লোক তখন কামিয়াব হবে, যখন দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবি লাভে সে ধন্য হয়। দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্য লাভ করার জন্য একজন মানুষকে অবশ্যই তাকওয়া বা দ্বীনদারি অর্জন করতে হবে। ফুজাইল ইবন আয়ায রহ. বলেন, পাঁচটি জিনিষ সৌভাগ্য লাভের কারণ: অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস। দ্বীনের বিষয়ে দ্বীনদারি অবলম্বন করা, দুনিয়া হতে বিমুখ হওয়া, লজ্জা করা এবং জ্ঞান অর্জন করা[69]।

এখানে যে পাঁচটি বিষয়ের কথা আলোচনা করা হয়েছে, এগুলো খুবই জরুরি। যখন মানুষের ঈমান মজবুত হবে না, তখন তার যাবতীয় সব কর্মে হতাশা বিরাজ করবে। কোন কাজেই সে সাহস ও শক্তি পাবে না। আর যখন একজন মানুষের ঈমান মজবুত হবে, তখন তাকে কোন

---

[68] শুয়াবুল ঈমান: ৮৪৮৯.

[69] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ২১৬.

কিছুই পরাহত করতে পারবে না। যে যত বেশি বিশ্বাসী হবে, সে তত বেশি শক্তিশালী হবে।

আর দ্বীন হল, মানব প্রকৃতির সাথে সরাসরি জড়িত একটি বিধান। যারা দ্বীনকে মানবে তারা তাদের মানবতাকে সহযোগিতা করবে। আর যারা দ্বীনকে মানবে না, তারা মানবতার শত্রু ও বিরোধী। তারা কোন কাজেই সফলতা পাবে না।

দুনিয়া হল, মানুষের জন্য পরীক্ষাগার। এখানে কেউ চিরদিন থাকতে পারবে না। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী জীবন, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন একেবারেই নগণ্য। এ কথা আমাদের কারোই অজানা নয়। কিন্তু তারপরও এ দুনিয়া নিয়ে আমরা এত ব্যস্ত থাকি, তা আর বলে বোঝানোর অপেক্ষা রাখে না। যারা রাতদিন সবসময় দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তারা কখনোই পরহেজগার হতে পারে না। দুনিয়া ও আখিরাত দুটি এক সাথে কামাই করা যায়না। যারা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তারা তাদের আখিরাতের ক্ষতি করে। আর যারা আখেরাত নিয়ে ব্যস্ত থাকে তারাও দুনিয়ার কাজ কর্মে অমনোযোগি হয়।

লজ্জা মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূষণ। যাদের লজ্জা থাকে না, তারা যা ইচ্ছা তা করতে পারে। পক্ষান্তরে যাদের মধ্যে লজ্জা থাকে, তারা ইচ্ছা করলে যা ইচ্ছা তা করতে পারে না। তাদের লজ্জা তাদের বাধা দেয়। এ কারণেই হাদিসে বলা হয়েছে, লজ্জা ঈমানের একটি অন্যতম শাখা। লজ্জার সাথে ঈমানের সম্পর্ক গভীর। লজ্জাহীন লোক কখনোই ঈমানদার হতে পারে না। যারা পরহেজগার হয়, তাদের মধ্যে অবশ্যই

লজ্জা থাকে। তারা মানবতা বিরোধী কোন কাজ করে না। তাদের লজ্জা তাদের বাধা দেয় এবং বিরত রাখে।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, ইলম ছাড়া দ্বীনদারি অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ, ইলম ছাড়া কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম তা জানার কোন উপায় নাই। হারাম হালাল সম্পর্কে জানা ছাড়া কারো জন্য মুত্তাকী বা পরহেজগার হওয়া সম্ভব নয়।

আমরা কিভাবে পরহেজগার হতে পারি?

আমাদের সবারই পরহেজগার হওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত। এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনেক বড় নেয়ামত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকে এ নেয়ামত দান করেন তাকে দুনিয়া আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ দান করেন। এর গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্বীনদারি লাভ করার চেষ্টা আমাদের সবারই করা উচিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবাইকে এ নেয়ামত দান করেন না। তিনি তার বান্দাদের থেকে যাকে চান তাকেই দ্বীনদারি দান করেন। আর যাকে এ নেয়ামত দান করা হল, তার মত সৌভাগ্য দুনিয়াতে আর কারো হতেই পারে না। দ্বীনদারি লাভের কতক কারণ আছে যেগুলো একজন বান্দাকে দ্বীনদারির মর্তবা পর্যন্ত পৌছতে সহযোগিতা করে।

এক. নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দূরে থাকা:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সব কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, সেগুলো থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে দ্বীনদারি অর্জন করতে হবে। নিষিদ্ধ

বিষয়সমূহ হতে বিরত থাকা দ্বীনদারি অর্জনের পূর্ব শর্ত। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

اجتنب ما حرم عليك تكن من أورع الناس

"আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদের জন্য যা হারাম করেছে, তা হতে বিরত থাক, তাহলে তুমি বড় পরহেজগার হতে পারবে"[70]।

ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট একজন লোক এসে কোন একটি বিষয়ে সাক্ষী দিল, তার কথা শোনে তিনি তাকে বলেন, আমি তোমাকে চিনি না। আর আমার না চেনা তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তুমি একজন লোক নিয়ে আস যে তোমাকে চেনে। এ কথা শোনে উপস্থিত লোকদের একজন বলল, আমি তাকে চিনি। ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি তার সম্পর্কে কি জান? সে বলল, আমি জানি লোকটি ইনসাফগার ও দ্বীনদার। সে তোমার নিছক একজন প্রতিবেশী তুমি কি তার রাত-দিন এবং যাওয়া আসা সব বিষয়ে জান? তখন সে বলল, না। তুমি কি তার সাথে টাকা-পয়সার লেন-দেন করেছ? টাকা পয়সার লেন-দেন মানুষের দ্বীনদারির প্রমাণ। লোকটি বলল, না আমি তার সাথে টাকা পয়সার কোন লেন-দেন করি নাই। তারপর সে বলল, তুমি তার সাথে সফরের সঙ্গী হয়েছিলে? যা তার চরিত্র ভালো হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে। লোকটি বলল, না। আমি তার সাথে কখনো সফর করিনি। তখন তিনি বললেন, তুমি তার

---

[70] শুয়াবুল ঈমান: ২০১.

সম্পর্কে জান না। সুতরাং, তুমি একজন লোক নিয়ে আস যে তোমার সম্পর্কে জানে[71]।

সুফিয়ান সাওরী রহ. কে দ্বীনদারি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, উত্তরে তিনি বললেন,

إِنِّي وَجَدتُ فَلا تَظُنوُّا غَيْرَهُ

هَذَا التَّورُّع عِنْدَ هَذَا الدِّرْهَمِ

فإِذِا قِدرْتِ عَليْهِ ثُمَّ تَرْكَتهُ

فَاعْلَمْ بأَنَّ هُنَاكَ تَقْوَى المُسْلِمِ

“মনে রাখবে, আমি দিরহামের নিকট দ্বীনদারিকে পেয়েছি, এর বাহিরে কোন কিছু তোমরা চিন্তা বা ধারণা করো না। যখন তুমি দিরহাম অর্জনে সক্ষম হও, কিন্তু তা তুমি গ্রহণ না করে রেখে দিলে এবং তার লোভকে তুমি সামাল দিলে, [এটিই হল, সত্যিকার দ্বীনদারি] তবে তুমি মনে রাখ! এখানেই একজন মুসলিমের তাকওয়া বা দ্বীনদারি প্রমাণিত হয়”[72]। [তার মধ্যে কি অর্থের লোভ বেশি না আখিরাতের প্রতি আগ্রহ বেশি]

অপর এক কবি কাব্য আবৃত্তি করে বলেন,

---

[71] সুনানুল বাইহাকি আল কুবরা: ২০১৮৭ আলবানী সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

[72] মুখতাছারু শুয়াবুল ঈমান: ৮৬.

لَا يَغُرَّنْكَ مِنَ المَرْءِ قَمِيصٌ رَقَعَهْ

أَوْ إِزَارٌ فَوْقَ كَعْبِ السَّاقِ مِنهْ رَفَعَهْ

أَو جَبِيِن لَاح فِيِهِ أَثُّر قْد قَلَعَهْ

وَلَدَى الدِّرْهَمِ فَانُظرْ غَيَّهُ أَو ورَعَه

"যখন কোন মানুষকে তুমি ছিড়া জামা পরিধান করতে দেখবে, তাকে তুমি বুজুর্গ বা পরহেজগার মনে করে ধোঁকায় যেন না পড়। অনুরূপভাবে যখন তুমি কোন মানুষকে যখন দেখবে সে গোড়ালির উপর কাপড় পরিধান করে, তখন তাকে তুমি পরহেজগার ধারণা করে, অথবা তার চেহারার মধ্যে এমন কোন আঘাত রয়েছে যা তার দ্বীনদারি বুঝায়, তা দেখে তুমি যেন ধোঁকায় না পড়। তোমাকে একজন মানুষের দ্বীনদারি পরীক্ষা করতে হলে, দেখতে হবে টাকা পয়সা যখন তার সামনে রাখা হয়, তখন সে তাকে কিভাবে গ্রহণ করে। তখন তার দ্বীনদারি প্রাধান্য পায় নাকি তার গোমরাহি[73]!

দুই. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ছোট বড় যাবতীয় কর্মের উপর হিসাব নিবে এ কথা স্মরণ করা।

আবুল আব্বাস ইবন আতা রহ. বলেন,

---

[73] এহইয়ায়ু উলুমুদ্দিন: ৮২/২.

পরহেজগার লোকদের দ্বীনদারি সৃষ্টি হয়, শস্য দানা ও অনুকণাকে স্মরণ করার মাধ্যমে। তাকে জানতে হবে, আমাদের রব যিনি আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি ভালো ও মন্দ কর্ম বিষয়ে হিসাব নেবেন। তিনি আমাদেরকে হিসাবের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ছাড় দেবেন না এবং আমাদের হিসাবে কঠোরতা করবেন। তার চেয়ে আরও কঠিন ব্যাপার হল, সে তার বান্দাদের থেকে অনুকণা পরিমাণ ও শস্য দানার ওজনের সম-পরিমাণ বিষয়েও হিসাব নেবেন। সুতরাং যে বান্দার হিসাবের এ অবস্থা হবে তাকে অবশ্যই হিসাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং তাকে অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেদিন আমাদের যাবতীয় কর্মের হিসাব নিবেন সেদিনের জন্য প্রস্তুত হতে হলে আমাদের অবশ্যই দুনিয়াতে পরহেজগার হতে হবে। হালাল হারাম বেছে চলতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর আদেশ নিষেধের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে[74]। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের অনুকরণ ও অনুসরণ করতে হবে। যাবতীয় সব কর্মে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে নাজির জানতে হবে। আমাদের একদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে হিসাবের জন্য দাঁড়াতে হবে এ কথা চিন্তা করে যাবতীয় সব কর্ম সম্পাদন করতে হবে।

---

[74] শুয়াবুল ঈমান: ২৭০.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করা:

আবু আব্দুল্লাহ আল-ইনতাকী রহ. বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন হয়[75]। যার অন্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয় থাকে, সে কখনোই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা নিষেধ করেছেন তার কাছেও যেতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর ভয় হল, দ্বীনদারি মূল ভিত্তি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করার মাধ্যমে দ্বীনদারি অর্জন করা যায়। পক্ষান্তরে যার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয় থাকে না সে কখনোই পরহেজগার হতে পারবে না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সাক্ষাতে ইয়াকীন করা এবং মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করা:

ইয়াহইয়া ইবন মায়ায রহ. বলেন, তিনটি অভ্যাসের চর্চা দ্বারা দ্বীনদারি অর্জন হয়: আত্ম-মর্যাদা, বিশুদ্ধ বিশ্বাস এবং মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার অনুভূতি[76]।

আত্ম-মর্যাদাবোধ মানুষকে অনেক অপরাধমুলক কাজ হতে বিরত রাখে। যাদের মধ্যে আত্ম-মর্যাদাবোধ আছে, তারা তাদের সম্মানহানি হয়, এমন কোন কাজ করে না। সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ হতে তারা তাদের নিজেদের বিরত রাখে। তারা কোন কাজ করার পূর্বে অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করে থাকে।

---

[75] হুলিয়াতুল আওলিয়া ২৯০/৯.

[76] হুলিয়াতুল আওলিয়া ৬৮/১০.

বিশ্বাসের সাথে দ্বীনদারি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষের আমলের পরিবর্তন হয়ে থাকে। একজন মানুষ সে কাজটি করে যা সে বিশ্বাস করে। সুতরাং, মানুষের বিশ্বাসের শুদ্ধতা খুবই জরুরি। যখন বিশ্বাস শুদ্ধ হবে তখন তার আমলও শুদ্ধ হবে। আর বিশ্বাস যদি ফাসেদ হয় তখন তার আমলও ফাসেদ হবে।

মৃত্যু মানুষের জন্য অবধারিত এ কথা কারোরই অজানা নয়। তবে মানুষ যখন মৃত্যুর কথা চিন্তা করে তখন তার অন্তর নরম হয় এবং দুনিয়ার প্রতি তার মহব্বত দুর্বল হয়। যে ব্যক্তি বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করবে, সে দুনিয়া বিমুখ হবে এবং আখিরাতমুখি হবে। তখন তার মধ্যে দ্বীনদারি অর্জন হবে।

সুন্নাতের অনুকরণ করা এবং বিদ‘আত পরিহার করা:

আল্লামা আওযায়ী রহ. বলেন, আমরা আমাদের যুগে এ আলোচনা করতাম যে, যখন কোন ব্যক্তি কোন বিদআত বিষয়ে কথা বলত, তখন তার তাকওয়া ও দ্বীনদারি চিনিয়ে নেয়া হত[77]।

আবু মুজাফ্ফর আস-সামআনী রহ. আহলে কালামীদের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, কোন কালামীকে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি, তার কালাম ও তার চিন্তা-চেতনা তাকে দ্বীনের ব্যাপারে দ্বীনদারির দিকে নিয়ে গেছে অথবা তারা পারস্পরিক লেন-দেনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করছে। অথবা চলার পথে তারা বক্রতাকে বাদ দিয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করছে এবং দুনিয়ার মায়া ছেড়ে আখিরাতমুখি

[77] কালামীদের দূর্ণাম বিষয়ে হাদীসসমূহ: ১২৭.

হয়েছে, বা কোন হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে বিরত থাকছে। তারা তাদের ইবাদত বন্দেগীতে এখলাস বা একাগ্রতা অবলম্বন করার কোন দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত দেখাতে পারেনি। আর তাদের কালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি আনুগত্যটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে অথবা তার কালাম তাকে কোন নাফরমানি বা অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখছে এ রকম কোন নজির তারা প্রমাণ করতে পারেনি[78]। এ ধরনের কালামী পাওয়া যায় না বললেই চলে। মোট কথা কালামীদের কাউকেই তাদের কালাম কোন উপকার করতে পারেনি। তবে দু-একজন হয়তো ব্যতিক্রম থাকতে পারে।

ইলম অনুযায়ী আমল করা:

সাহাল ইবন আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, যখন কোন মুমিন তার ইলম অনুযায়ী আমল করবে, তখন তার ইলম তাকে তাকওয়া ও দ্বীনদারির পথ দেখাবে। আর যখন সে দ্বীনদারি অবলম্বন করবে তখন তার অন্তর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সম্পৃক্ত হবে। ইলম অনুযায়ী আমল করা দ্বীনদারি অর্জনের পূর্ব শর্ত। যারা তাদের ইলম অনুযায়ী আমল করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের জন্য হেদায়েতের পথ খুলে দেয়[79]।

---

[78] আল-ইন্তিসার লি-আসহাবিল হাদীস: ৬৫.

[79] হুলিয়াতুল আওলিয়া ২০৫/১০

দুনিয়া বিমুখ হওয়া:

মানুষকে দুনিয়াতেই বেঁচে থাকতে হয় এবং দুনিয়ার জীবন তাদের আবশ্যকীয়। দুনিয়াতে বেঁচে থেকেই আখিরাত কামাই করতে হবে। তবে দুনিয়া মানুষের জন্য একে বারেই নগণ্য বস্তু। এখানে তাকে সামান্য সময় বেঁচে থাকতে হবে। তারপর তাকে অবশ্যই তার আসল গন্তব্য আখিরাতের পথে পাড়ি দিতে হবে। দুনিয়া কারো জন্য চিরস্থায়ী নয় এবং দুনিয়াকে কেউ তাদের লক্ষ্য বানাতে পারবে না। কিন্তু দু:খের বিষয় হল, মানুষ দুনিয়ার মোহে পড়ে আখিরাত ভুলে যায়। দুনিয়া অর্জন করার জন্য রাত-দিন পরিশ্রম করে। কিন্তু আখিরাত অর্জন করার জন্য শতভাগের এক ভাগ পরিশ্রমও তারা করে না।

আল্লামা আবু জাফর আস-সাফফার রহ. বলেন, বসরার এক নারী বলল, যার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত প্রবেশ করছে, তার অন্তরে তাকওয়া প্রবেশ করা হারাম[80]। যারা দুনিয়া বিমুখ হয়, তারাই সত্যিকার অর্থে পরহেজগার হয়ে থাকে। একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, দুনিয়া ও আখিরাত একসাথে একত্র হতে পারে না। যার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত থাকে তার অন্তর থেকে আখিরাত দূর হয়ে যায়, আবার যার অন্তরে আখিরাতের মহব্বত থাকে তার অন্তরে দুনিয়া থাকতে পারে না।

আবু জাফর আল-মিখওয়ালী রহ. বলেন, যে অন্তর দুনিয়াকে তার সাথী বানিয়েছে সে অন্তরে তাকওয়া বা দ্বীনদারি বসবাস করা হারাম[81]।

---

[80] ইবনে আবিদ-দুনিয়া, আল-ওয়ারয়ু ২৯.

[81] তারিখে বাগদাদ: ৪১০/৪০.

অধিকাংশ মুত্তাকী বা পরহেজগার লোকদের দেখা যায়, তারা অভাবী, ফকীর, মিসকিন। এর কারণ হল,-আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের হেফাজত করুন-যারা তাকওয়া অর্জন বা দ্বীনদারি অবলম্বন করে না তারা সুদখোর, তারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ হরণ করে এবং হারাম হালাল বেছে চলে না। এ ধরনের লোকদের মধ্যে কাউকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তাকওয়া অর্জন করতে দেখা যায় না। তারা সাধারণত তাদের ধন-সম্পদ ও দুনিয়াদারি নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, আমি যত পরহেজগার লোককে দেখেছি, তাদের সবাইকে অভাবী দেখেছি[82]। যে ব্যক্তি দুনিয়ার থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেয়, সে দ্বীনদারি অবলম্বন করতে পারবে না।

রাগ থেকে দূরে থাকা:

রাগ মানুষের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এটি মানুষের জীবনে অনেক বিপদ ভয়ে আনে। রাগের কারণে মানুষের জীবনে অসংখ্য দুর্ঘটনা সৃষ্টি হয়। আবু আব্দুল্লাহ আস-সাজী রহ. বলেন, যখন কোন অন্তরে রাগ প্রবেশ করে, তখন তার অন্তর থেকে তাকওয়া দূর হয়ে যায়। রাগী মানুষ যখন রাগ করে তখন সে যা ইচ্ছা তা করে ফেলে। ফলে তার মধ্যে তাকওয়া অবশিষ্ট থাকে না[83]।

---

[82] তাহজিবুল কালাম: ৩৪০/২৭.

[83] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ৩১৭/৯.

কম খাওয়া এবং প্রবৃত্তিকে ধমিয়ে রাখা:

অধিক খাওয়া মানুষকে বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম করতে বাধ্য করে। কিন্তু বেশি খাওয়া মানুষের জন্য কোন কল্যাণ ভয়ে আনে না। সাথে সাথে অধিক খাওয়ারের কারণে মানুষকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আক্রান্ত হতে হয় বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধিতে। এ ছাড়া আরেকটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, পেটের দায়ে মানুষ চুরি, ডাকাতি করে এবং ভিক্ষা করে, হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে। ইমাম গাজ্জালী রহ. বলেন, বুজুর্গি, দ্বীনদারি ও তাকওয়ার চাবি হল, কম খাওয়া এবং প্রবৃত্তিকে ধমিয়ে রাখা[84]।

আশাকে খাট করা:

আশা মানুষকে কর্মের দিকে ধাবিত করে। দীর্ঘ দিন বাঁচার আশায় মানুষ সঞ্চয় করে এবং ধন-সম্পদ হাসিলের অবিরাম চেষ্টা চালায়। মানুষ এত দীর্ঘ আশা করে থাকে যা তার জীবনের তুলনায় আরও বেশি লম্বা। কিন্তু দীর্ঘ আশা মানুষের জন্য কখনোই কল্যাণ বয়ে আনে না। বরং লম্বা ও দীর্ঘ আশা মানুষকে বিপদের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং আশাকে খাট করতে হবে। আজকের দিন বেঁচে আছি আগামী দিন বেঁচে থাকবো কিনা তার কোন গ্যারান্টি নাই। অধিক আশা করে কোন লাভ নাই। ইব্রাহিম ইবন আদহাম রহ. বলেন, স্বল্প লোভ-লালসা ও খাট আশা মানুষের মধ্যে সততা ও দ্বীনদারি সৃষ্টি করে[85]।

---

[84] মায়ারেজুল কুদস : ৮১.

[85] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ৩৫/৮.

কথা কম বলা:

কথা কম বলা মানুষের একটি বিশেষ গুণ। যারা কথা কম বলে তারা অনেক ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকে এবং তাদের মানুষ মহব্বত করে। আর যে ব্যক্তি কথা বেশি বলে মানুষ তাকে বাচাল বলে। তার দোষ-ত্রুটি বেশি মানুষের সামনে প্রকাশ পায়।

আব্দুল্লাহ ইবন আবি জাকারিয়া রহ. বলেন, যার কথা বেশি হবে তার ভুল-ভ্রান্তি বেশি হবে, আর যার ভুল-ভ্রান্তি বেশি হবে তার তাকওয়া কম হবে, আর যার তাকওয়া কম হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার অন্তরকে নিষ্প্রাণ বানিয়ে দেবে[86]।

ঝগড়া-বিবাদ ছেড়ে দেয়া:

ঝগড়া-বিবাদ মানুষের জন্য বিপদ ডেকে আনে। আওযায়ী রহ. হেকাম ইবন গাইলান আল-কাইসি নিকট চিঠি লিখে তাতে বলেন, তুমি ঝগড়া-বিবাদ ছেড়ে দাও যা তোমার অন্তরকে কলুসিত করে, দুর্বলতা তৈরি করে, অন্তরকে শুকিয়ে দেয় এবং কথা ও কাজের মধ্যে তাকওয়া অবশিষ্ট থাকে না[87]।

---

86 হুলিয়াতুল আওলিয়া: ১৪৯.

87 হুলিয়াতুল আওলিয়া ১৪১.

নিজের দোষ নিয়ে মাথা ঘামানো অন্যের দোষের চর্চা হতে বিরত থাকা:

যারা নিজেদের দোষ দেখে না কিন্তু অন্যদের দোষ চর্চা করতে খুব মজা পায় তারা মুনাফেক বৈ আর কিছু নয়। এ ধরনের মানুষ আমাদের সমাজে অনেক আছে, যারা মানুষের দোষ তালাশ করে বেড়ায়। কিন্তু নিজের দোষ চোখে দেখে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ ধরনের লোকদের জন্য আখিরাতে বেদনাদায়ক শাস্তি নির্ধারণ করেছেন এবং দুনিয়ার জীবনেও রয়েছে অশান্তি ও যন্ত্রণা। আমাদের নিজেদের দোষগুলো আমাদের দু চোখের অতি নিকটে। তা স্বত্বেও আমরা তা দেখতে পাই না। কিন্তু অন্যের দোষ আমার দু-চোখ থেকে অনেক দূরে। তারপরও সেগুলো আমাদের চোখের সামনে পড়ে। এটি আমাদের জন্য মারাত্মক ব্যাধি। যার চিকিৎসা অতীব জরুরি। সুতরাং আমাকে আগে আমার নিজের দোষ দেখতে হবে। তারপর অন্যের দোষ নিয়ে মাথা গামাতে হবে। আর আমি যখন কারো মধ্যে কোন দোষ দেখব, তখন তা গোপন রাখতে চেষ্টা করব। মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হতে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। কিন্তু আমি যদি দোষী ব্যক্তির সংশোধন চাই, তাহলে আগে তাকে জানাতে হবে এবং বলতে হবে আপনার মধ্যে এ দোষ আছে আপনি সংশোধন হয়ে যান। আর গোপনে তাকে উপদেশ দিয়ে বোঝাতে হবে, যাতে সে তার দোষ থেকে ফিরে আসে। ইব্রাহিম আদহমকে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, কিসের দ্বারা তাকওয়া পরিপূর্ণ হয়? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি তোমার গুনাহের দিকে দেখার মাধ্যমে তাকওয়ার পূর্ণতা আসবে। আর মানুষের অন্যায়ের সমালোচনা করা বা প্রচার করা হতে বিরত থাকার মাধ্যমেও তোমার মধ্যে তাকওয়া পূর্ণতা পাবে। আর যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে তোমার অন্তর দুর্বল তার কথা চিন্তা করে, তুমি তোমার অন্তর থেকে খুব সুন্দর কথা

বলবে। তুমি তোমার গুনাহের বিষয়ে করনীয় সম্পর্কে চিন্তা কর এবং তোমার প্রভুর নিকট তওবা কর, তাতে তোমার অন্তরে তাকওয়া বা দ্বীনদারি প্রতিষ্ঠিত হবে[88]।

অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করা হতে বিরত থাকা:

যে সব কাজ অনর্থক একজন মানুষের সময় নষ্ট করে, তা হতে বিরত থাকা অবশ্যই জরুরি। অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করা মূর্খতা ও জাহালত। সুতরাং অর্থহীন কাজে সময় নষ্ট না করে সময়কে কাজে লাগাতে হবে। তোমার জীবন থেকে যে সময়টি চলে যাচ্ছে তা কিন্তু আর কোন দিন ফিরে আসবে না। তাই সময় নষ্ট করা হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। সময় মানুষের অমূল্য সম্পদ। যে ব্যক্তি সময়কে মূল্য দিতে পারে না, সে জীবনে কিছুই হাসিল করতে পারে না। সময় হল মানুষের জীবন। যে ব্যক্তি সময়কে নষ্ট করল, সে তার জীবনকে নষ্ট করল। সাহাল ইবন আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা আদেশ করেছেন, তা বাদ দিয়ে অন্য কিছুর সাথে সম্পৃক্ত হয়, সে দ্বীনদারি হতে বঞ্চিত হয়[89]। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি অনর্থক কাজে লিপ্ত হয়, সে তাকওয়া হতে বঞ্চিত হয়[90]।

---

[88] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ১৬/৮.

[89] শুয়াবুল ঈমান: ৫০৫৬.

[90] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ১৯৬.

লজ্জা করা:

লজ্জা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। যখন কোন মানুষের মধ্যে লজ্জা থাকে তা তাকে অনেক অনৈতিক ও অপকর্ম হতে বিরত রাখে। লজ্জাবোধ থাকার কারণে একজন মানুষ অসামাজিক ও অনৈতিক কোন কাজ করতে পারে না। যাদের লজ্জা থাকে সমাজে তারা সম্মানের অধিকারী হয়। পক্ষান্তরে যাদের লজ্জা থাকে না তারা যে কোন ধরনের অপকর্ম করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা যা ইচ্ছা তা করতে পারে। মানুষের অধিকাংশ অপকর্ম সংঘটিত হয়, তার মধ্যে লজ্জাবোধ না থাকার কারণে। সুতরাং, মনে রাখতে হবে, লজ্জা দ্বীনদারি অর্জন করার গুরুত্বপূর্ণ সোপান। লজ্জা ছাড়া দ্বীনদারি কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। তবে লজ্জা দ্বারা উদ্দেশ্য ইসলামী শরিয়ত যেসব বিষয়ে লজ্জা করতে আদেশ দিয়েছে সেসব বিষয়ে লজ্জা করা। যেমন- ব্যভিচার করা, চুরি করা, ডাকাতি করা, উলঙ্গ হওয়া, বেহায়াপনা ও মদ্য পান ইত্যাদি অসামাজিক ও অনৈতিক কাজ থেকে লজ্জা করা। অনেক লোক আছে তারা ভালো কাজ করতে লজ্জা করে এ ধরনের লজ্জাকে লজ্জা বলা হয় না। যেমন, অনেকে আছে সালাম দিতে লজ্জা করে, সালাম আদায় করতে লজ্জা করে এবং বৈধ কোন কাজ করতে লজ্জা করে এ ধরনের লজ্জাকে লজ্জা বলা যাবে।

ওমর ইবনুল খাত্তাব রহ. বলেন, যার লজ্জা কম হয়, তার তাকওয়াও কম হয় আর যার তাকওয়া কম হয়, তার অন্তর মারা যায়[91]।

---

[91] তিবরানির আল-মুজামুল আওসাত: ৩৭০/২.

যখন কোন মানুষের অন্তর মারা যায়, তখন আশঙ্কা থাকে সে দুনিয়া থেকে ঈমান হারা হয়ে কবরে যাবে। আর যারা ঈমান হারা হয়ে কবরে যায় তাদের পরিণতি যে কি হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কোনটি গ্রহণযোগ্য দ্বীনদারি আর অগ্রহণযোগ্য ‘দ্বীনদারি’?

এখানে একটি কথা জানা থাকা আবশ্যক তা হল, কোন দ্বীনদারি আছে, তা বৈধ আবার কোন কোন দ্বীনদারি আছে তা অগ্রহণযোগ্য। সুতরাং কোনটি বৈধ দ্বীনদারি আর কোন অবৈধ দ্বীনদারি তা আমাদের জানা থাকা দরকার। অন্যথায় সব ধরনের দ্বীনদারি অবলম্বন করতে গিয়ে বাড়াবাড়িতে পড়তে হবে।

বৈধ দ্বীনদারি:

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, বৈধ দ্বীনদারি হল, যেসব কাজের পরিণতি আশঙ্কাজনক তার থেকে বিরত থাকা। আর আশঙ্কাজনক কাজগুলো হল, যে কাজের হারাম হওয়া বিষয়ে জানা গেছে অথবা যে কাজের হারাম কি হালাল সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এছাড়া যেসব কাজ করার থেকে ছেড়ে দেয়াতে তেমন কোন ক্ষতি নাই, সেগুলোও আশঙ্কাজনক কাজ[92]।

পূর্বে আমরা এ ধরনের তাকওয়া বা দ্বীনদারির একাধিক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। সুতরাং, এখানে সেগুলো আলোচনা করে দীর্ঘায়িত করতে চাই না।

---

[92] মাজমুয়ে ফাতওয়া ৫১২/১০.

অগ্রহণযোগ্য দ্বীনদারি:

অগ্রহণযোগ্য দ্বীনদারি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। অনেক সময় এগুলো দীনি কাজ হিসেবে আবির্ভূত হয় আবার কখনো দুনিয়াদারি হিসেবে আবির্ভূত হয়। নিম্নে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হল।

ক- দ্বীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা:

কতক লোক আছে যারা দ্বীনদারি অবলম্বনে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে এবং তারা ইসলামী শরিয়তের মূল উদ্দেশ্য হতে বের হয়ে আসে। এটি নিতান্তই বাড়াবাড়ি ও খারাপ কাজ। কারণ, মনে রাখতে হবে, সব কিছুর একটি সীমা আছে, যখন কোন ব্যক্তি সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন সে তার আসল উদ্দেশ্য থেকে বের হয়ে যায় এবং লক্ষ্যচ্যুত হয়। সুতরাং, মনে রাখতে হবে, কোন মানুষের জন্য দ্বীনদারি অবলম্বনে বাড়াবাড়ি করা ও সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়। যে সব মাসলা-মাসায়েল বিষয়ে মানুষ বাড়াবাড়ি করে, তার মধ্য হতে একটি মাসয়ালা; যেমন- অনেকে বলে যখন হারাম মাল হালালের সাথে মিশে, তখন হুবহু হারাম মালকে হালাল থেকে আলাদা করতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি একশ রিয়ালের মালিক হয়, তার অর্ধেক হালাল আর বাকি অর্ধেক হারাম। তখন সে যদি অর্ধেক থেকে রেহাই পেল; এ ব্যক্তি সম্পর্কে কেউ কেউ বলে, নির্ধারিত হারাম- অর্ধেক- থেকে দায়মুক্তি দ্বারা সে কোন উপকৃত হতে পারবে না। এটি হল, বাড়াবাড়ি যা তাকওয়ার সীমা থেকে এক ধাপ আগ বাড়িয়ে বাড়তি তাকওয়া অবলম্বন করা হয়, যার কোন ভিত্তি শরীয়তে নাই।

যখন হালাল মাল হারামের সাথ মিশে তার বিধান কি হবে? এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কোন কোন আলেম তা থেকে গ্রহণ করাকে হারাম বলেছেন। কিন্তু যদি হারামের পরিমাণ একেবারে সামান্য হয়ে থাকে, তাতে কোন অসুবিধা নাই। আর ইমাম আহমদ রহ. বলেন, এ ধরনের মাল থেকে বিরত থাকা উচিত, কিন্তু যদি তা সামান্য বস্তু হয় বা উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু না হয়ে থাকে, তাতে কোন অসুবিধা নাই[93]।

আর কোন কোন আলেম বলেন, যদি জানা যায় যে, তার মালের মধ্যে হারাম মাল রয়েছে, কিন্তু নির্দিষ্ট করে জানে না, কোন টুকু হালাল আর কোন টুকু হারাম, তাহলে তার জন্য তা হতে খাওয়ার অনুমতি রয়েছে[94]।

ইমাম যুহরী রহ. বলেন, এ ধরনের সম্পদ হতে খাওয়াতে কোন অসুবিধা নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জানতে পারবে যে, নিদির্ষ্ট এ মালটি হারাম।

আর কোন কোন আলেম কোন প্রকার ব্যাখ্যা ছাড়াই, এ ধরনের মাল থেকে দ্বীনদারি অবলম্বন করার কথা বলেন। সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, এ ধরনের সম্পদ বক্ষণ করা আমার নিকট পছন্দনীয় নয়, আর ছেড়ে দেয়া আমার মতে অধিক প্রিয়[95]।

---

[93] জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম :৭০.

[94] জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম :৭০.

[95] জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম ৭০.

কিন্তু যখন যে পরিমাণ হারাম তার মধ্যে প্রবেশ করছে, তা বের করে দেয়া হয়, এবং অবশিষ্ট মালকে ব্যবহার বা কাজে লাগানো হয়, তখন তা হতে বক্ষণ করা হালাল[96]।

এ অবস্থার মধ্যে নির্ধারিত হারাম মালকে বের করে আনার পর তার থেকে বেচে থাকা বা সে মালকে কোন প্রকার কাজে না লাগানো উচিত নয়। কেউ যদি একে তাকওয়া মনে করে তবে সে ভুল করবে।

অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন মানুষ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ হয়, কিন্তু এ ধরনের সন্দেহের উপর ভিত্তি করে তার সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা বা তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। যেমন তুমি কোন একজন মুসলিম ভাইয়ের ঘরে প্রবেশ করলে যার অবস্থা সম্পর্কে তুমি কিছুই জান না। তারপর যখন তোমার সামনে সে খাওয়ার উপস্থিত করল, তখন তুমি বললে, তুমি যে টাকা দিয়ে বাজার করছ, সে টাকা কোথায় পেয়েছ? এ ধরনের জিজ্ঞাসা কোন ক্রমেই বৈধ নয়।

এ ধরনের প্রশ্ন কি তাকওয়া হতে পারে? এ ধরনের প্রশ্ন করা কোন ক্রমেই তাকওয়ার মানদণ্ডে পড়ে না। বরং এ ধরনের প্রশ্নের মধ্যে একজন মুসলিমকে কষ্ট দেয়া ও লজ্জা দেয়া হয়।

কারণ, এ হল তাকে অপবাদ দেয়া এবং তার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা। কোন মুসলিমকে কোন প্রকার দলীল প্রমাণ ও আলামত ছাড়া অপবাদ দেয়া এবং তাকে সন্দেহের তালিকায় রাখা সম্পূর্ণ অবৈধ।

---

[96] জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম ৭০.

আর এ হল, একজন মুসলিমের প্রতি খারাপ ধারণা করা এবং একজন মুসলিমের জন্য তার অপর মুসলিম ভাইকে কষ্ট দেয়া সম্পূর্ণ হারাম।

খ- কু-মন্ত্রণা বা ওয়াসওয়াসা:

এখানে কিছু বিষয় আছে যেগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা বা গুরুত্ব দেয়া কোন ক্রমেই উচিত নয়। এগুলোকে তাকওয়া বলা চলে না; বরং এগুলোকে কু-মন্ত্রণা বলা হয়। এর দৃষ্টান্ত হল, আল্লামা ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেন, কোন কোন লোক এমন আছে তারা শিকার করা পাখি খায় না, তারা আশঙ্কা করে, শিকারিটি কোন মানুষের ছিল, তারপর সে তার মালিক থেকে পালিয়ে গেছে, তাই সে চিন্তা করে মালিকের অনুমতি ছাড়া তা হতে খাওয়া যাবে না।

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় বস্তু কোন অপরিচিত লোক থেকে ক্রয় করে তা খায় না। তার যুক্তি হল, তা কি হালাল না হারাম তা সে জানে না। অথচ এখানে এমন কোন প্রমাণ নাই যা এ কথা প্রমাণ করে যে, বস্তুটি হারাম। কোন প্রকার দলীল প্রমাণ ছাড়া কোন কিছু খাওয়া বা গ্রহণ করা হতে বিরত থাকা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামের মূলনীতি হল, প্রতিটি বস্তুর আসল প্রকৃতি হল, হালাল হওয়া। যদি হারাম হওয়ার কোন প্রমাণ না পাওয়া যায়। আর যদি হারাম হওয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন তাকে হারাম বলা যাবে। অন্যথায় তাকে হারাম বলা হারাম।

ওয়াসওয়াসার অপর একটি দৃষ্টান্ত:

আল্লামা যারকশী রহ. বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কসম করে বলে, সে তার স্ত্রীর কাপড় পরিধান করবে না। এরপর স্ত্রী তার কাপড়টি বিক্রি করে দিল এবং বিক্রয় মূল্যটি তার স্বামীকে দান করল, তখন তার জন্য তা খাওয়াতে কোন অসুবিধা নাই। কারণ, তা ব্যবহার করা ছেড়ে দেয়া কোন দ্বীনদারি নয়, বরং তা হল, ওয়াসওয়াসা।

বিশেষ দ্বীনদারি

সাধারণ মানুষের দ্বীনদারি আর বিশেষ মানুষের দ্বীনদারি এক হতে পারে না। কিছু কিছু বিষয়ে দ্বীনদারি আছে যেগুলো শুধু বিশেষ লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সবার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। এ ধরনের দ্বীনদারিকে সূক্ষ্ম বা খাস দ্বীনদারি বলা হয়, যা সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বিশেষ কিছু লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লামা ইবন রজব রহ. বলেন, এখানে একটি বিষয় আছে, সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া একান্ত জরুরি। আর তা হল, সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বিরত থাকা তার জন্য মানায়, যার যাবতীয় সব অবস্থা স্থির এবং তার আমলসমূহ তাকওয়া ও দ্বীনদারির ক্ষেত্রে একটি অপরটির পরিপূরক। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে হারামে লিপ্ত হয়, তারপর সে সূক্ষ্ম বস্তু বা সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে দ্বীনদারি অবলম্বন করে, তার জন্য এ ধরনের তাকওয়া বা দ্বীনদারি মানায় না। তার ক্ষেত্রে এ ধরনের দ্বীনদারি কোন ক্রমেই প্রযোজ্য নয় বরং তাকে এ ধরনের দ্বীনদারি অবলম্বন থেকে বিরত রাখাই বাঞ্ছনীয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে ইরাকের এক অধিবাসী ব্যাঙের প্রস্রাবের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বলেন, তারা আমাকে ব্যাঙের পেশাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, অথচ তারা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে হত্যা করছে। আর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

« هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِن الدُّنْيَا»

দুনিয়াতে তারা উভয় আমার দুই বাহু[97]।

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহ. কে জিজ্ঞাসা করা হল, একজন লোক সবজি কেনার সময় শর্ত দিয়ে বলল, আমি তোমার থেকে সবজি এ শর্তে ক্রয় করতে পারি, তুমি আমাকে একটি দড়ি দেবে যার দ্বারা আমি আমার সবজিগুলো বেধে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি। ইমাম আহমদ রহ. তার কথা শুনে বলল, এ ধরনের কাজ কে করে? তখন তাকে জানানো হল, ইব্রাহীম ইবনে আবি নুয়াইম এ ধরনের কাজ করে থাকে। তখন তিনি বললেন, যদি ইব্রাহীম ইবন আমি নুয়াইম এ ধরনের কাজ করে থাকে তবে তা বৈধ। কারণ, দড়িটি সবজির সাথে সম্পৃক্ত[98]।

মোট কথা: কোন জিনিষ থেকে বিরত থাকবো আর কোন জিনিষ থেকে বিরত থাকবো না ব্যক্তির অবস্থার উপর নির্ভর করে। মানুষ যখন পরিস্থিতির স্বীকার হয় তখন পরিস্থিতির আলোকে সিদ্ধান্ত নেয়াই হল, তাকওয়া বা দ্বীনদারি। একজন খাদ্যের অভাবে মারা যাচ্ছে, তখন তার জন্য মৃত জন্তু খাওয়াও বৈধ। তার জান বাঁচানোর জন্য তখন হারাম বলে তা থেকে বিরত থাকা দ্বীনদারি নয়, তা খাওয়াই হল, দ্বীনদারি। যে ব্যক্তি ফরজ সালাত আদায় থেকে বিরত থাকে তার জন্য নফল সালাত কোন বুজুর্গি নয়। অনেক লোক এমন আছে যারা রমজানের রোজা রাখে না কিন্তু শাওয়ালের রোজা নিয়ে টানাটানি করে এটা কোন বুজুর্গি নয়। এগুলো নিছক ভন্ডামী ও পাগলামি বৈ কিছু নয়। কিছু কিছু বিষয় আছে এত সূক্ষ্ম যার থেকে বেচে থাকা কারো ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। বরং যারা এ সব থেকে বেচে থাকতে চায়, তারা যদি ফাসেক বা সুযোগ

---

97 বুখারি :৫৬৪৮.

98 জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম: ১১১.

সন্ধানী লোক হয়, তাদেরকে তা হতে বিরত রাখতে হবে এবং তাদের প্রতিহত করতে হবে।

পরিশিষ্ট

পরিশেষে আমরা বলব তাকওয়া অর্জন করার মধ্যে নিহিত রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। যারা আল্লাহর আদেশ নিষেধের তোয়াক্কা করে না তারা দুনিয়াতেও অশান্তিতে থাকবে এবং আখেরাতেও তারা বঞ্চিত হবে। একজন মানুষের জন্য দ্বীনদারি বা তাকওয়া ছেড়ে দেয়ার মধ্যে তার দ্বীন ও দুনিয়ার অনেক ক্ষতি নিহিত। আর এর প্রভাব খুবই মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক। আর যখন একজন মানুষের মধ্যে দ্বীনদারি থাকবে তখন তার অনেক পেরেশানি দূর হবে। কোন প্রকার হতাশা ও দুশ্চিন্তা তাকে গ্রাস করতে পারবে না। তার উপর যত মুসীবতই আসুক না কেন, তা সে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। সে তার সমস্ত বিপদ-আপদকে তার জন্য পরীক্ষামুলক হিসেবে গ্রহণ করবে। সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, যখন কোন বান্দা দ্বীনদারি অবলম্বন না করে এবং আমল করার ক্ষেত্রে সে দ্বীনদারিকে কাজে না লাগায়, তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ে। আর ধীরে ধীরে তার অন্তর শয়তানের হাতে বা কব্জায় চলে যায়। তখন তার থেকে বের হয়ে আসা তার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে[99]।

অনেক সময় দেখা যায়, একজন মানুষ তাকওয়া বা দ্বীনদারি অবলম্বন না করার কারণে তার আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যায় এবং তার আমল কোন কাজে আসে না।

---

[99] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ২০৫/১০.

ইয়াছ ইবন মুয়াবিয়া রহ. বলেন, যে দ্বীনদারি দ্বীনদারি ও তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, তা অবশ্যই অনর্থক[100]। তার কোন মূল্য নাই। আর যে দ্বীনদারি দ্বীনদারি বা তাকওয়ার ভিত্তিতে হয়, তা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, তাকওয়া ছেড়ে দেয়া উম্মতে মুসলিমাকে ধ্বংস করে দেয়। আর তাকওয়া ছেড়ে দেয়া মুসলিম উম্মতের ভাল কাজগুলোকে স্ব-মূলে উৎখাত করার কারণ হয়। সাহাল ইবন আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, দ্বীনদারি ছেড়ে দেয়ার কারণে মানুষের মধ্যে এমন কিছু বিষয় প্রকাশ পাবে যা মানুষের বিনয়কে মানুষ থেকে তুলে নেবে।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, দ্বীনদারি কোন দাবি করা বা জোর করে সাব্যস্ত করার বিষয় নয়, যে একজন ব্যক্তি জোর করে বা দাবি করে পরহেজগার হতে পারবে। বরং তা অর্জন করার জন্য আমল করতে হবে এবং সাধনা করতে হবে। যখন একজন মানুষ চেষ্টা ও সাধনা করবে তখন তার অন্তরে তাকওয়া ও দ্বীনদারি স্থাপিত হবে। যারা নিজেকে পরহেজগার বা মুত্তাকী দাবি করে তারা সত্যিকার অর্থে মুত্তাকী বা পরহেজগার নয়। তারা দুনিয়াদার ও ভন্ড।

যারা হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হতে বিরত থাকে না এবং হারাম হালাল বেছে থাকে না, তাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর মহব্বতের দাবি করা মিথ্যা বৈই আর কিছুই নয়। হাতেম রহ. বলেন,

---

[100] তাহজীবুল কামাল: ৪১৩/৩

যে ব্যক্তি হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হতে বিরত না থাকে, সে অবশ্যই মিথ্যুক[101]।

একজন মুসলিমের জন্য উচিত হল, তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য যেন হয়, দ্বীনের বিষয়ে তাকওয়া অবলম্বন করা, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয়কে কাজে লাগানো এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ ও নিষেধ বিষয়ে সব সময় আল্লাহ রাব্বুল আলমীনকে তার নিকটে বলে জানা।

وَوَاظِبْ عَلَى التَّقْوَى وَكُنْ مُتَوَرِّعاً

صُبوراً عَلَى البَلْوى وَبِالدِّينِ كُنْ شَهِمَا

"তুমি সব সময় আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং তুমি পরহেজগার হও। বিপদে তুমি ধৈর্য্যশীল থাক এবং দ্বীনের বিষয়ে তুমি বিচক্ষণ হও"[102]।

অবশেষে আমরা বলব, সু-সংবাদ সে ব্যক্তির জন্য যার অন্তরের মধ্যে দ্বীনদারি পরিলক্ষিত হবে। যারা পরহেজগার হবে দুনিয়াতে তাদের জন্য রয়েছে কামিয়াবি আর আখিরাতে থাকবে অনাবিল আনন্দ।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে মুত্তাকী বা পরহেজগার বানিয়ে দাও এবং আমাদেরকে যাবতীয় কাজে হেদায়েত দান কর। আর তাকওয়াকে

---

101 হুলিয়াতুল আওলিয়া: ৭৫/৮.

102 আত-তারিফ: ৮৫.

আমাদের পাথেয় বানাও এবং জান্নাতকে আমাদের গন্তব্য-স্থল বানাও। আর আমাদেরকে তুমি এমন শুকরিয়া আদায় করার তাওফিক দান কর, যা তোমাকে খুশি করে। আর তুমি আমাদেরকে এমন দ্বীনদারি দান কর, যা আমাদেরকে তোমার নাফরমানির মাঝে দেয়াল হিসেবে বিবেচিত হয়। আর তুমি আমাদের এমন চরিত্র দান কর, যা দ্বারা আমরা মানুষের মাঝে ভালোভাবে বাচতে পারি। আর আমাদের তুমি এমন জ্ঞান দান কর যদ্বারা আমরা উপকৃত হতে পারি।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের হেদায়েত প্রাপ্ত লোকদের পথ প্রদর্শক বানান। আপনি আমাদের পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। আর আপনি আমাদের সবার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। আর যাবতীয় প্রশংসা তার জন্য যার অপার অনুগ্রহে যাবতীয় নেক আমলসমূহ পরিপূর্ণতা লাভ করে।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

অনুশীলনী

তোমার সামনে দুই ধরনের প্রশ্ন পেশ করা হল, এক ধরনের প্রশ্ন যে গুলোর উত্তর তুমি সাথে সাথে দিতে পারবে। আর এক ধরনের প্রশ্নের উত্তর তুমি সাথে সাথে দিতে পারবে না, বরং তোমাকে একটু চিন্তাভাবনা করে উত্তর দিতে হবে।

প্রথম প্রকার প্রশ্ন:

১. যে দ্বীনদারি অবলম্বন করা ওয়াজিব তা কি?

২ দ্বীনদারির চারটি স্তর আছে, সে গুলো কি তা উল্লেখ কর! এবং প্রতিটি স্তরের সংজ্ঞা উল্লেখ কর।

৩. দ্বীনদারি অবলম্বনের ফজিলতের উপর তিনটি হাদিস উল্লেখ কর।

৪. বিচার কাজে দ্বীনদারি থাকা শর্ত। এ শর্তটি কি কারণে আরোপ করা হয়ে থাকে।

৫. সালেহীনদের তাকওয়ার তিনটি দৃষ্টান্ত আলোচনা কর।

৬. দ্বীনদারি অবলম্বনের পাঁচটি ফায়েদা আলোচনা কর।

৭. দ্বীনদারি অবলম্বনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি কি তা আলোচনা কর। এ বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত আলোচনা কর।

৮. ইমাম ইবনুল কাইয়ুম রহ. দ্বীনদারির যে সংজ্ঞা দেন, তা কি? আলোচনা কর।

৯. তাকওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের যে প্রকারভেদ আছে তা আলোচনা কর।

১০. ওয়াসওয়াসা অবলম্বনকারীদের ওয়াসওয়াসা বিষয়ে দুটি দৃষ্টান্ত আলোচনা কর।

দ্বিতীয় প্রকার প্রশ্ন:

১- দ্বীনদারির হাকীকত কি?

২- ঝগড়া-বিবাদ ছেড়ে দেয়া কিভাবে তাকওয়া অবলম্বনের কারণ হতে পারে?

৩- দ্বীনদারি অবলম্বন করা সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহ হতে বিরত রাখার কারণ হয়ে থাকে। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে আলোচনা করুন।

৪- উপরে উল্লেখিত কারণগুলো ছাড়া এমন কিছু কারণ উল্লেখ কর যেগুলো অবলম্বন দ্বারা তাকওয়া অর্জন হয়।

৫- কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ কর, যেগুলোতে দ্বীনদারি বিষয়ে আলোচনা করাকে খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

৬. একটি ঘটনা উল্লেখ কর, যা প্রমাণ করে যে দ্বীনদারি যেভাবে প্রকাশ্যে হয় এভাবে গোপনেও হয়ে থাকে।

৭. একজন মুসলিমের জন্য শুধু অন্তরের তাকওয়া যথেষ্ট কিনা? বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা কর।

সূচীপত্র

অন্তরের আমল: ইখলাস

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

মুহাম্মদ সালেহ আল মুনাজ্জেদ

অনুবাদ : জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2012 - 1433

IslamHouse.com

أعمال القلوب: الإخلاص

« باللغة البنغالية »

محمد صالح المنجد

ترجمة: ذاكر الله أبوالخير

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2012 – 1433

IslamHouse.com

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকুলের রব। আর সালাত ও সালাম নাযিল হোক সমস্ত নবী ও রাসূলদের সরদার আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর এবং তার পরিবার-পরিজন ও তার সমস্ত সাহাবীদের উপর।

আল্লাহ তা‘আলা আমাকে অন্তরের আমলসমূহ বিষয় সম্বলিত একটি ইলমী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রদানের সুযোগ দেন, যাতে মোট বারোটি ক্লাস ছিল। আর আমার সাথে ‘যাদ গ্রপের’ ইলমী বিভাগটি ছিল। তারা আলোচনাগুলোকে বর্তমানে বই আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

অন্তরের আমলসমূহের প্রথম আমল হল ইখলাস, যা ইবাদতের মগজ ও রুহ এবং আমল কবুল হওয়া বা না হওয়ার মানদণ্ড। আর ইখলাস অন্তরের আমলসমূহের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সর্বোচ্চ চূড়া ও আমলসমূহের প্রধান ভিত্তি। আর এটিই হল, সমস্ত নবী ও রাসূলদের দাওয়াতের চাবিকাঠি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ [البينة: ٥]

“আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ‘ইবাদাত করে তারই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে”। [সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত: ৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُ ۝٣﴾ [الزمر: ٣]

“জেনে রাখ, খালেস দ্বীন তো আল্লাহরই”। [সূরা আয-যুমার: ৩]

আর আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের কামনা তিনি যেন আমাদের আমলগুলো কবুল করেন, আমাদের নিয়্যতসমূহে ইখলাস তথা নিষ্ঠা প্রদান করেন এবং আমাদের অন্তরসমূহ সংশোধন করে দেন। নিশ্চয় তিনি শ্রবণকারী দো‘আ কবুলকারী।

মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জেদ

ইখলাসের অর্থ

ইখলাসের আভিধানিক অর্থ:

ইখলাস শব্দটি আরবি أَخلَص শব্দ হতে নির্গত। এ শব্দের مضارع [মুজারেয়] হল, يُخْلِص আর এর মাছদার, [إخلاصاً] অর্থাৎ, নিরেট বা খাটি বস্তু; কোনো বস্তু নির্ভেজাল ও খাটি হওয়া এবং তার সাথে কোন কিছুর সংমিশ্রণ না থাকাকে ইখলাস বলে। যেমন, বলা হয় وأخلص الرجل دينه لله অর্থাৎ, লোকটি তার দ্বীনকে কেবল আল্লাহর জন্যই খাস করল। লোকটি তার দ্বীনের বিষয়ে আল্লাহর সাথে কাউকে মিলায়-নি বা শরিক করে নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ٤٠﴾ [الحجر: ٤٠]

"তাদের মধ্য থেকে আপনার মুখলিস বা একান্ত বান্দাগণ ছাড়া"। এখানে مخلَصين শব্দটির লাম 'যবর' সহকারে রয়েছে। তবে

কোনো কোনো কেরাআতে مخلِصين অর্থাৎ লামের নীচে 'যের' সহকারেও পড়া হয়েছে।

সা'লাব রহ. বলেন, مخلِصِين (লাম এর নীচে 'যের' সহকারে) এর অর্থ যারা ইবাদতকে কেবল আল্লাহর জন্যই করে থাকেন। আর مُخۡلَصِينَ (লামের উপর 'যবর' সহকারে) এর অর্থ, যাদেরকে আল্লাহ একান্তভাবে নিজের করে নিয়েছেন।

যাজ্জাজ রহ. বলেন, আল্লাহর তা'আলার বাণী-

﴿وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مُوسَىٰٓۚ إِنَّهُۥ كَانَ مُخۡلَصٗا وَكَانَ رَسُولٗا نَّبِيّٗا ٥١﴾ [مريم: ٥١]

"আর স্মরণ করুন কিতাবে মূসাকে। অবশ্যই তিনি ছিলেন 'মুখলাস' (একান্ত করে নেওয়া) এবং তিনি ছিলেন রাসূল নবী"। [সূরা মারয়াম, আয়াত: ৫১] এখানে مخلَصاً শব্দটির লাম 'যবর' সহকারে রয়েছে। তবে কোনো কোনো কেরাআতে مخلِصاً অর্থাৎ লামের নীচে 'যের' সহকারেও পড়া হয়েছে। আর مخلَص শব্দের অর্থ: আল্লাহ যাকে খাটি করেছেন এবং ময়লা-আবর্জনা হতে মুক্ত করে, যাকে নির্বাচন করেছেন। আর মুখলিস مخلِص

শব্দের অর্থ: যে একান্তভাবে আল্লাহর এককত্ব বা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেছে। এ কারণেই قل هو الله أحد [তুমি বল, আল্লাহ এক]। এ সূরাটিকে সূরা ইখলাস নামকরণ করা হয়েছে। [কারণ, এ সূরাটিতে আল্লাহকে এককত্বের ঘোষণা রয়েছে]

আল্লামা ইবনুল আসীর রহ. বলেন, এ সূরাটিকে সূরা ইখলাস বলে নাম রাখার কারণ হল, এ সূরাটি আল্লাহ তা'আলার সীফাত বা গুণাগুণসমূহ বর্ণনার জন্য নির্দিষ্ট। অথবা এ জন্যে যে, এ সূরার তিলাওয়াতকারী আল্লাহর জন্য খালেসভাবে তাওহীদ বা তাঁর এককত্ব সাব্যস্ত করে।

আর 'কালিমাতুল ইখলাস' বলতে 'কালেমাতুত তাওহীদকেই' বুঝানো হয়ে থাকে।

খালেস বস্তু বলতে বুঝায়, সে পরিষ্কার বস্তুকে, যা থেকে যাবতীয় মিশ্রণ দূরীভূত করা হয়েছে।[1]

[1] লিসানুল আরব ২৬/৭; তাজুল আরূস, পৃ. ৪৪৩৭।

ফিরোযাবাদী রহ. বলেন, أخلص لله এ কথার অর্থ হল, “সে রিয়া তথা প্রদর্শনেচ্ছা বা লৌকিকতা ছাড়ল।”[2]

আল্লামা জুরজানী রহ. বলেন, **ইখলাসের আভিধানিক অর্থ:** “ইবাদত-আনুগত্যে রিয়া তথা প্রদর্শনেচ্ছা পরিহার করা।”[3]

ইখলাসের পারিভাষিক অর্থ:

আলেমগণ ইখলাসের একাধিক সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নে আলোচনা করা হল:-

- ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, “ইবাদতের দ্বারা একমাত্র এক আল্লাহর উদ্দেশ্য নেওয়া।”[4]

- আল্লামা জুরজানী রহ. বলেন, “মানবাত্মার পরিচ্ছন্নতায় বিঘ্ন ঘটায় এ ধরনের যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা থেকে অন্তর খালি করাকেই ইখলাস বলে। আর সেটার মূলকথা হচ্ছে, প্রতিটি বস্তুর

---

[2] আল-কামুসুল মুহীত, ৭৯৮।

[3] তা‘রীফাত: ২৮।

[4] মাদারেজুস সালেকীন ২/৯১।

ক্ষেত্রে এ কথা চিন্তা করা যায় যে, তার সাথে কোনো না কোনো বস্তুর সংমিশ্রণ থাকতে পারে, তবে যখন কোনো বস্তু অন্য কিছুর সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত হয়, তখন তাকে খালেস বা খাটি বস্তু বলা হয়। আর এ খাটি করার কাজটি সম্পাদন করার নাম হচ্ছে ইখলাস।” আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِنَّ لَكُمۡ فِي ٱلۡأَنۡعَٰمِ لَعِبۡرَةٗۖ نُّسۡقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِۦ مِنۢ بَيۡنِ فَرۡثٖ وَدَمٖ لَّبَنًا خَالِصٗا سَآئِغٗا لِّلشَّٰرِبِينَ ٦٦﴾ [النحل: ٦٦]

“আর নিশ্চয় চতুষ্পদ জন্তুতে রয়েছে, তোমাদের জন্য শিক্ষা। তার পেটের ভেতরের গোবর ও রক্তের মধ্যখান থেকে তোমারকে আমি দুধ পান করাই, যা খাটি এবং পানকারীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যকর”। [সূরা নাহাল, আয়াত: ৬৬]

এখানে দুধ খাটি হওয়ার অর্থ তার মধ্যে রক্ত ও গোবর ইত্যাদির কোনো প্রকার সংমিশ্রণ থাকার অবকাশ না থাকা।[5]

---

[5] তা‘রীফাত:২৮।

- আবার কেউ কেউ বলেন, ইখলাস হল, "আমলগুলো যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা মুক্ত ও নির্ভেজাল করা।"[6]

- হুযাইফা আল মুরআশী রহ. বলেন, "বান্দার ইবাদত প্রকাশ্য ও গোপনে উভয় অবস্থাতে একই পর্যায়ের হওয়ার নাম ইখলাস"।[7]

- আবার কেউ কেউ বলেন, ইখলাস হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে স্বীয় আমলের উপর সাক্ষ্য হিসেবে তালাশ না করা, আর বিনিময়দাতা হিসেবেও কেবল তাঁকেই গ্রহণ করা।"[8]

ইখলাসের অর্থে সালাফে সালেহীনদের থেকে বহু উক্তি বর্ণিত হয়েছে, যেমন-

- যাবতীয় আমল একমাত্র আল্লাহর জন্য করা; যাতে গাইরুল্লাহ বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য সেখানে কোনো অংশ না থাকে।

- আমলকে সৃষ্টিকুলের সবার পর্যবেক্ষণ মুক্ত করে স্বচ্ছ করা (কেবল আল্লাহর পর্যবেক্ষণে রাখা)

---

[6] তা'রীফাত:২৮।

[7] আত-তীবইয়ান ফী আ-দাবে হামালাতিল কুরআন: ১৩।

[8] মাদারেজিস সালেকীন, ২/৯২।

- আমলকে যাবতীয় (শির্ক, রিয়া ইত্যাদির) মিশ্রণ থেকে স্বচ্ছ রাখা।”[9]

মুখলিসের সংজ্ঞা: মুখলিস সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর সাথে তার আত্মা খাটি ও সংশোধিত হওয়ায়, মানুষের অন্তর থেকে তার মান-মর্যাদা পুরোপুরি বের হওয়াতে কোনো প্রকার পরওয়া করে না। তার আমলের একটি কণা বা বিন্দু পরিমাণ বিষয়েও মানুষ অবগত হোক, তা সে পছন্দ করে না।

অনেক সময় দেখা যায়, মানুষের কথায় ও শরীয়তের ভাষায়, ‘নিয়্যত’ শব্দটি ‘ইখলাস’ এর স্থানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

তবে ফিকহবিদদের মতে নিয়্যতের মূল হচ্ছে, স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড থেকে ইবাদতকে পৃথক করা এবং এক ইবাদতকে অপর ইবাদত থেকে আলাদা করা।[10]

---

[9] মাদারেজুস সালেকীন, ২/৯১-৯২।

[10] জামে‘উল উলূম ওয়াল হিকাম: ১/১১।

স্বাভাবিক কর্ম থেকে ইবাদতকে পৃথক করা, যেমন- পরিচ্ছন্নতার জন্য গোসল করা থেকে নাপাক হওয়ার কারণে গোসল করাকে আলাদা করা।

এক ইবাদত থেকে অপর ইবাদতকে পৃথক করা। যেমন- যোহরের সালাতকে আছরের সালাত থেকে পৃথক করা।

উল্লেখিত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, নিয়্যতের বিষয়টি আমাদের আলোচনার আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু যদি কেউ নিয়ত শব্দ বলে, আমল দ্বারা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা বুঝায় এবং আমলটি মহান আল্লাহ- যার কোনো শরিক নাই- তার জন্য, নাকি আল্লাহ ও গাইরুল্লাহ উভয়ের জন্য? (তা নির্ধারণ করা বুঝায়) তাহলে এ ধরনের 'নিয়ত' 'ইখলাস' এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত (আর তখন তা আমাদের আলোচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য হবে)।

ইবাদতে 'ইখলাস' ও 'সত্যবাদিতা' উভয় শব্দ অর্থের দিক বিবেচনায় প্রায় কাছাকাছি। তবে উভয়ের মাঝে সামান্য পার্থক্য আছে।

প্রথম পার্থক্য: সত্যবাদিতা হল মূল এবং তা সর্বাগ্রে। আর ইখলাস হল, তার শাখা ও অনুগামী।

দ্বিতীয় পার্থক্য: যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার আমলে প্রবেশ করে না ইখলাস ততক্ষণ পর্যন্ত অস্তিত্বে আসে না। আমলে প্রবেশ করার পরই ইখলাসের প্রশ্ন আসে। পক্ষান্তরে 'সত্যবাদিতা' তা আমলে প্রবেশ করার পূর্বেও হতে পারে।[11]

[11] তা'রীফাত ২৮।

ইখলাসের আদেশ

কুরআনে করীমে ইখলাস:

আল্লাহর তা‘আলা তার কিতাবের একাধিক জায়গায় তার বান্দাদের ইখলাস অবলম্বন করার নির্দেশ দেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥﴾ [البينة: ٥]

“আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ‘ইবাদাত করে তারই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়; আর এটিই হল সঠিক দীন”। [সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত: ৫]

আল্লাহ তা‘আলা তার নবী মুহাম্মাদ সা. কে ইবাদতে মুখলিস বলে দাবী করার নির্দেশ দেন এবং বলেন-

﴿ قُلِ ٱللَّهَ أَعۡبُدُ مُخۡلِصٗا لَّهُۥ دِينِي ١٤ ﴾ [الزمر: ١٤]

বল, ‘আমি আল্লাহর-ই ইবাদত করি, তারই জন্য আমার আনুগত্য একনিষ্ঠ করে’। [সূরা যুমার, আয়াত: ১৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٦٣ ﴾ [الانعام: ١٦٢، ١٦٣]

বল, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব। তার কোনো শরীক নেই এবং আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম’। [সূরা আনআম, আয়াত: ১৬১, ১৬২]

আল্লাহ তা‘আলা তার নিজের সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তিনি মানুষের হায়াত ও মওতকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন, তাদের মধ্যে উত্তম ও সুন্দর আমলকারী কে? আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيَوٰةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفُورُ ٢﴾ [الملك: ٢]

“যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল”। [সূরা মুলুক, আয়াত: ২]

ফুদাইল ইবনু আয়াদ্ব রহ. সুন্দর আমল সম্পর্কে বলেন, “সেটা হচ্ছে, বেশি ইখলাস অবলম্বনকারী ও সঠিক আমলকারী। লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, হে আবু আলী! বেশি ইখলাস অবলম্বনকারী ও সঠিক আমলকারী’ এ কথার অর্থ কি? উত্তরে তিনি বললেন, “আমল যদি খালেসভাবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়, কিন্তু তা সঠিক না হয়, তা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি সঠিক হয় কিন্তু খালেসভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য না হয়, তবে তাও গ্রহণযোগ্য হবে না। আমল অবশ্যই খালেস ও সঠিক হতে হবে। কেবল আল্লাহর জন্য জন্য আমল করাকে খালেস বলে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

সুন্নত অনুযায়ী আমল করাকে সঠিক বলে"। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. ফুদাইলের কথার সাথে যোগ করে বলেন, এ হল, আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ١١٠﴾ [الكهف: ١١٠]

"সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।" [সূরা কাহাফ, আয়াত: ১১০][12] এ আয়াতের বাস্তবায়ন।

আমীর আস-সানআনী রহ. বলেন,

تقَضَّتْ بكَ الأَعْمارُ في غَيْرِ طَاعَةٍ سِوَى عَمَل تَرْضَاه وَهْوَ سَرابُ

إذِا لَم يَكنْ للهِ فعِلُكَ خَالِصاً فَكلُّ بنَاءٍ قَدْ بنيَتَ خَرابُ

فَلِلْعَمَلِ الإِخْلَاصُ شَرْطٌ إذِا أَتَى وَقَدْ وَافَقَتْهُ سُنَّةٌ وَكِتَابُ

---

[12] মাজমুউল ফাতওয়া ৩৩৩/১।

অর্থ, তোমার সারা জীবন আল্লাহর নাফরমানিতে অতিবাহিত হল। কেবল এমন কিছু আমল যা তোমার সন্তুষ্টি বিধান করে, আসলে তা মরিচিকা,

যখন তোমার কর্ম খালেসভাবে আল্লাহর জন্য হবে না তখন তুমি যত ঘরই বানাও না কেন, তা বিরান ঘর।

আমলের জন্য তো ইখলাস শর্ত। যখন তুমি আমলে ইখলাস নিশ্চিত করার সাথে তা কুরআন ও সূন্নাহ অনুযায়ী কর।

আল্লাহর জন্য সর্বাঙ্গিন আত্মসমর্পন এবং ইহসান তথা আল্লাহর রাসূলের সুন্নতের অনুসরণ করাকে আল্লাহ তা'আলা 'সর্বাধিক সুন্দর দ্বীন' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ دِينٗا مِّمَّنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبۡرَٰهِيمَ خَلِيلٗا ١٢٥﴾ [النساء : ١٢٥]

"আর দীনের ব্যাপারে তার তুলনায় কে উত্তম, যে সৎকর্ম পরায়ণ অবস্থায় আল্লাহর কাছে নিজকে পূর্ণ সমর্পণ করল এবং একনিষ্ঠ ভাবে ইবরাহীমের আদর্শ অনুসরণ করল? আর আল্লাহ

ইবরাহীমকে পরম বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।” [সূরা নিসা, আয়াত: ১২৫] এখানে আল্লাহর জন্য পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পন বা আনুগত্য করার অর্থ ইখলাস, আর এহসান অর্থ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নতের অনুসরণ।

আল্লাহ তা‘আলা তার স্বীয় নবী ও তার উম্মতকে মুখলিসদের সাথে থাকার নির্দেশ দেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥۖ وَلَا تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ ٢٨﴾ [الكهف: ٢٨]

আর তুমি নিজকে ধৈর্যশীল রাখ তাদের সাথে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তার সন্তুষ্টির উদ্দেশে এবং দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে। [সূরা কাহাফ, আয়াত: ২৮]

আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেন, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “অবশ্যই তারা সফলকাম”। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَـَٔاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٣٨﴾ [الروم: ٣٨]

“অতএব আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক দিয়ে দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরকেও। এটি উত্তম তাদের জন্য, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় এবং তারাই সফলকাম।” [সূরা রুম, আয়াত: ৩৮]

আর আল্লাহ তা‘আলা মুখলিসকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দেয়া ও কিয়ামতের দিন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلۡأَتۡقَى ١٧ ٱلَّذِي يُؤۡتِي مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ ١٨ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعۡمَةٖ تُجۡزَىٰٓ ١٩ إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِ ٱلۡأَعۡلَىٰ ٢٠ وَلَسَوۡفَ يَرۡضَىٰ ٢١﴾ [الليل: ١٧، ٢١]

“তারা তা থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে। যে তার সম্পদ দান করে আত্ম-শুদ্ধির উদ্দেশ্যে, আর তার প্রতি কারো এমন কোন অনুগ্রহ নেই। যার প্রতিদান দিতে হবে। কেবল তার মহান রবের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় আর অচিরেই সে সন্তোষ লাভ করবে। [সূরা লাইল, আয়াত: ১৭-২১]

আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতিদের গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, “তারা দুনিয়াতে মুখলিস।” আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لِوَجۡهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمۡ جَزَآءٗ وَلَا شُكُورًا ٩﴾ [الانسان: ٩]

“তারা বলে, ‘আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদান চাই না এবং কোন শোকরও না।” [সূরা ইনসান, আয়াত: ৯]

আর আল্লাহ তা‘আলা মুখলিসদের কিয়ামতের দিন মহা বিনিময় দেয়ার ঘোষণা দেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ۞لَّا خَيۡرَ فِي كَثِيرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰحِۭ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا ١١٤﴾ [النساء : ١١٤]

“তাদের গোপন পরামর্শের অধিকাংশে কোনো কল্যাণ নাই। তবে [কল্যাণ আছে] যে নির্দেশ দেয়, সদকা কিংবা ভালো কাজ অথবা মানুষের মধ্যে মীমাংসার। আর যে তা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের

উদ্দেশ্যে করবে তবে অচিরেই আমি তাকে মহা পুরস্কার দান করব।" [সূরা নিসা, আয়াত: ১১৪]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرۡثَ ٱلۡأٓخِرَةِ نَزِدۡ لَهُۥ فِي حَرۡثِهِۦۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرۡثَ ٱلدُّنۡيَا نُؤۡتِهِۦ مِنۡهَا وَمَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ٢٠﴾ [الشورى: ٢٠]

"যে আখিরাতের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য তার ফসলে প্রবৃদ্ধি দান করি, আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমি তাকে তা থেকে কিছু দেই এবং আখিরাতে তার জন্য কোন অংশই থাকবে না"। [সূরা শূরা, আয়াত: ২০]

হাদিসে রাসূলে ইখলাস:

-নিয়তে সত্যবাদিতা ও ইখলাসের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক হাদিস বর্ণনা করেন এবং তিনি আমলের ভিত্তি এ দুটিকেই নির্ধারণ করেন। যেমন- ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনুহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إِنَّمَا الأَعْمالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى...»

অর্থ, সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল, প্রতিটি মানুষ যা নিয়ত করে, সে তাই পাবে।[13] হাদিসটি রাসূলের হাদিসসমূহ হতে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস। কারণ, শরয়ী বিধানের জন্য এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক হাদিস। যাবতীয় সব ইবাদত এরই অন্তর্ভুক্ত, কোন ইবাদত এ হাদিসের বাহিরে নয়। যেমন- সালাত, সাওম, জিহাদ, হজ ও সদকা ইত্যাদি সব ইবাদত বিশুদ্ধ নিয়ত ও ইখলাসের মুখাপেক্ষী।

মনে রাখনে, 'মানুষের সব আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল' এ হাদিসটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু গুরুত্বপূর্ণ কায়দাটির কথা বলেই থেমে যাননি, বরং নিয়ত ও ইখলাসের গুরুত্ব বিবেচনা করে, তিনি কতক আমলের কথা উল্লেখ করেন এবং নিয়তকে বিশুদ্ধ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। আমলসমূহ নিম্নরূপ:

তাওহীদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[13] বুখারি, হাদিস নং ১ মুসলিম, হাদিস: ১৯০৭।

« مَا قَالَ عَبْدٌ: لا إلَهَ إلا الله قَطُّ مُخلصًا إلا فُتحتْ لَهُ أَبْوَابُ الَّسَماءِ حَّتى تُفْضِي إِلَى العَرْشِ مَا اجْتَنَب الكَبَائِرَ »

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যখনই কোন বান্দা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ আরশ পর্যন্ত খুলে দেয়া হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবিরা গুনাহ না করবে।[14]

মসজিদসমূহে গমন করা: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاته فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمسَةً وَعِشرِينَ ضعْفاً، وذلكَ أنه إذا تَوضَأَ فَأحسَنَ الوضوءَ ثُمَّ خَرَجَ إلَى المَسْجِدِ لا يخرِجُهُ إلا الصَّلاَةُ لَم يخط خَطوَةً إلاَّ رُفعَتْ لَهُ بَها دَرَجةٌ، وَحُطَّ عَنه بَها خَطيئَةٌ، فَإذِا صَلَّى لَمْ تَزَلِ المَلائكَةُ تُصَلِّي عَلَيهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّه: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارحَمْهُ. وَلا يَزَالُ أَحَدُكُم فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرَالصَّلاَةَ »

জামাতে সালাত আদায় করলে, স্বীয় ঘরে বা দোকানে সালাত আদায় করা হতে, পঁচিশগুণ বেশি সাওয়াব দেয়া হবে। কারণ, যখন কোন ব্যক্তি সুন্দর করে ওজু করে, সালাত আদায় করার

[14] তিরমিযি, হাদিস: ৩৫৯০, আল্লামা আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেন।

উদ্দেশ্যে মসজিদের দিক রওয়ানা হয়, প্রতিটি কদমে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং তার থেকে গুনাহগুলো ক্ষমা করা হয়। আর যখন সালাত আদায় করে, ফেরেশতারা সর্বদা তার উপর রহমত বর্ষণ করতে থাকে। ফেরেশতারা বলতে থাকে, হে আল্লাহ তুমি তার উপর দয়া কর, তাকে তুমি রহম কর। যখন কোন ব্যক্তি সালাতের অপেক্ষায় থাকে, সে সালাতেই থাকে।[15][সালাত আদায় করার সাওয়াব পেতে থাকে]

রোজা রাখা: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« مَنْ صام رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسِاباً غُفِرَلَهُ مَا تَقَّدمَ مِنْ ذَنْبِهِ »

"যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও আশা নিয়ে রমযানের রোজা রাখে, তার অতীতের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়"।[16]

« من صامَ يوْماً فِي سَبِيلِ الله بعَّدَ الله وجْهه عَنْ النأَّرِ سَبْعِيَن خَرِيفاً »

---

[15] বুখারি: ৬২০।

[16] বুখারি: ৬২০।

“যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে একদিন রোযা রাখে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে জাহান্নামের আগুণ হতে সত্তর খারিফ পর্যন্ত দূরে সরিয়ে দেন”।[17]

কিয়ামুল-লাইল: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« مَنْ قَامَ رمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »

“যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায় রমযান মাসে রাত জেগে আল্লাহর ইবাদত করে, তার ভবিষ্যৎ জীবনের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে”।[18]

সদকা: আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনুহু হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« سَبْعَةٌ يُظلُهُمْ الله تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْم لاَ ظلّ إلا ظله: إمام عَادِلٌ، وشَابٌّ نشَأ فِي عِبادَةِ الله، وَرجل قَلبُهُ مُعلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرُجلَانِ تَحابَّا فِي الله اجْتَمَعا عليْهِ وَتَفَرَّقا عَلَيْه، وَرُجُل دَعته امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِي أَخافُ

---

[17] বুখারি: ৩৮, মুসলিম: ৭৬০।

[18] বুখারি: ২৬৮৫, মুসলিম: ৭৫৯।

الله، وَرجلٌ تَصدقَ فَأَخْفَاهَا حتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجلٌ ذَكَرَ الله خَالِياً ففَاضت عَيْنَاه»

"আল্লাহ তা'আলা সাত ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন তার ছায়া তলে ছায়া দেবেন, যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। এক- ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ। দুই- যে যুবক তার যৌবনকে আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছেন, তিন- ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত। চার- ঐ দুই ব্যক্তি যারা একে অপরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসেন, তারই ভিত্তিতে একত্র হন এবং তারই ভিত্তিতে পৃথক হন। পাঁচ- ঐ ব্যক্তি যাকে কোন সুন্দর ও বংশীয় যুবতী মহিলা অপকর্মের প্রতি আহ্বান করলে, সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি। ছয়- ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ রাহে এত গোপনে দান করে, তার বাম হাত টের পায় না, ডান হাত কি দান করল। সাত- ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর জিকির করল এবং তার চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হল।[19]

জিহাদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[19] বুখারি: ৩১৩৮, আহমদ: ২২৭৪৪, আল্লামা আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

« مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ الله وَلَمْ يَنْوِ إِلاَّ عِقَالا فَلَهُ مَا نَوَى »

“যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে একটি উটের রশি লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ করল, সে তাই পাবে যার নিয়ত সে করল”।

সালাতের জানাজার অনুসরণ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من اتَّبَعَ جنازَةَ مُسْلِمٍ إيمَاناً واحْتسَاباً، وَكَاَن مَعَهُ حَّتى يُصَلى عَليْهَا، وَيفْرغَ مِنْ دفْنها؛ فَإنه يَرْجِعُ مِن الأجر بقِيَراطَيْنِ، كُلُّ قِيَراطٍ مثْلُ أُحُدٍ، وَمَن صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رجَعَ قبلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجع بقيراِط»

“যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইয়ের জানাজায় ঈমান ও সাওয়াবের আশায় শরিক হয় এবং জানাজার সালাত আদায় ও দাফন করা পর্যন্ত মুর্দার সাথে থাকে, সে দুই কিরাত সাওয়াব নিয়ে বাড়ি ফিরবে। প্রতিটি ক্বিরাত অহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি তার উপর সালাত আদায় করে এবং দাফন করার পূর্বে ফেরত আসে, তাহলে সে এক কিরাত সাওয়াব নিয়ে বাড়ি ফিরবে”।[20]

[20] বুখারি: ৪৭।

সালফে সালেহীনদের নিকট ইখলাসের গুরুত্ব:

আল্লাহ তা'আলার বাণীসমূহের তিলাওয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিসসমূহ অধ্যয়ন করার পর সালফে সালেহীনরা ইখলাসের গুরুত্ব সম্পর্কে উম্মতদের অধিক সতর্ক করেন। তারা ইখলাসের গুরুত্ব ও ইখলাস না থাকার ক্ষতি উপলব্ধি করত: ইখলাসের মহা মর্যাদা দিয়ে থাকেন। ফলে দেখা যায়, তারা তাদের লিখনীতে প্রথমে নিয়ত বিষয়ে আলোচনা দিয়ে আরম্ভ করেন। যেমন- ইমাম বুখারি «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» "সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল"।[21] হাদিসটি দিয়ে তার কিতাব আরম্ভ করেন। আব্দুর রহমান বিন মাহদী রহ. বলেন,

"বিভিন্ন অধ্যায়ের উপর যদি আমি কোন কিতাব লিখতাম, তাহলে প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে আমি ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনুহু এর হাদিস-যাবতীয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল-কে উল্লেখ করতাম"।[22]

---

[21] বুখারি: ১, মুসলিম: ১৯০৭।

[22] জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম:৮/১।

অনুরূপভাবে তারা বলেন, নিয়ত আমল হতেও গুরুত্বপূর্ণ। ইয়াহয়া বিন আবি কাছির রহ. বলেন, তোমরা নিয়ত শেখ, কারণ, তা আমল হতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।[23] মানুষকে ইখলাস শেখানোর বিষয়ে ওলামাগণ সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। আল্লামা ইবনু আবি জামরাহ রহ. বলেন, আমি পছন্দ করি যে, যদি কতক ফকীহ এমন হত, তারা মানুষকে তাদের আমলের উদ্দেশ্য শেখানো নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এবং তাদের আমলের নিয়ত শেখানোর উদ্দেশ্যে এক জায়গায় বসে থাকবে; তারা আর কোন কাজ করবে না।[24] কারণ, অধিকাংশ মানুষকে দেখা যাচ্ছে তারা নিয়তের কারণে তাদের আমলকে নষ্ট করছে।

অপর দিকে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ তা'আলা রিয়াকারী যারা তাদের আমল দ্বারা পার্থিব স্বার্থ লাভের ইচ্ছা পোষণ করে, তাদের ভৎসনা ও তিরস্কার করছেন এবং রিয়ার পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[23] হুলিয়াতুল আওলিয়া ৭০/৩, জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম: ১৩।

[24] আল-মাদখাল, ১/১।

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ فِيهَا وَهُمۡ فِيهَا لَا يُبۡخَسُونَ ١٥ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٦ ﴾ [هود: ١٥، ١٦]

"যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার জৌলুস কামনা করে, আমি সেখানে তাদেরকে তাদের আমলের ফল পুরোপুরি দিয়ে দেই এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। এরাই তারা, আখিরাতে যাদের জন্য আগুণ ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তারা সেখানে যা করে তা বরবাদ হয়ে যাবে আর তারা যা করত, তা সম্পূর্ণ বাতিল"। [সূরা হুদ, আয়াত: ১৫, ১৬] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡعَاجِلَةَ عَجَّلۡنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلۡنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصۡلَىٰهَا مَذۡمُومٗا مَّدۡحُورٗا ١٨ ﴾ [الاسراء: ١٨]

"যে দুনিয়া চায় আমি সেখানে তাকে দ্রুত দিয়ে দেই, যা আমি চাই, যার জন্য চাই। তারপর তার জন্য নির্ধারণ করি জাহান্নাম, সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত, বিতাড়িত অবস্থায়"। [সূরা ইসরা, আয়াত: ১৮] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرۡثَ ٱلۡأٓخِرَةِ نَزِدۡ لَهُۥ فِي حَرۡثِهِۦۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرۡثَ ٱلدُّنۡيَا نُؤۡتِهِۦ مِنۡهَا وَمَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ٢٠﴾ [الشورى: ٢٠]

"যে আখিরাতের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য তার ফসলে প্রবৃদ্ধি দান করি, আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমি তাকে তা থেকে কিছু দেই এবং আখিরাতে তার জন্য কোন অংশই থাকবে না"। [সূরা শুরা, আয়াত: ২০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إنِ أَخْوَف مَا أَخَافُ عَلَيْكُم الشِّرْكُ الأَصْغَرُ قَالُوا: وَمَا الشِّرك الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ الرِّيَاءُ، يَقُولُ الله لهم يَوْم القِيَامِة إذِا جزي النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتم تُراءُونَ فِي الدُّنيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهْم جَزَاءً»

"আমি তোমাদের উপর যে জিনিষটিকে বেশি ভয় করি, তা হল, ছোট শিরক। সাহাবীরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শিরক কি? তিনি উত্তর দিলেন, রিয়া। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন যখন মানুষকে তাদের আমলের বিনিময় দেবেন, তখন

রিয়াকারীকে বলবেন, যাও দুনিয়াতে যাদেরকে তোমরা তোমাদের আমল দেখাতে, দেখ তাদের নিকট কোন সাওয়াব পাও কিনা”?[25]

হে মুসলিম ভাইয়েরা! তোমরা উল্লেখিত দুটি পথের যে কোন একটি পথ ধর। হয় ইখলাসের পথ- আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা- অথবা রিয়ার পথ-দুনিয়া হাসিলের ইচ্ছা-। আর মনে রাখবে, মানুষকে কিয়ামতের দিন তাদের নিয়ত অনুযায়ী দাড় করানো হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, إِنَّما يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نياتِهِمِ “অবশ্যই মানুষকে তাদের নিয়তের উপর ভিত্তি করে প্রেরণ করা হবে”।[26] যখন তুমি রিয়াকারী ধ্বংস প্রাপ্তদের সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন তুমি তোমার নিজেকে ছাড়া কাউকে দোষারোপ করবে না।

ইখলাসের ফলাফল

---

[25] আহমদ: ২৩৬৮১।

[26] বর্ণনায় ইবনে মাযা: ৪২২৯। আল্লামা আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

নেককার মুমিন বান্দার অন্তরে যখন ইখলাস পাওয়া যাবে, তখন সে ইখলাসের অনেকগুলো উপকারিতা ও গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল রয়েছে তা লাভ করবে।

এক. আমল কবুল হওয়া:

আবু উমামা আল-বাহেলী রাদিয়াল্লাহু আনুহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إِنَّ الله لاَ يَقْبَلُ من العَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصاً، وَابتغي بهِ وَجْهُه »

“আল্লাহ তা‘আলা শুধু সে আমল কবুল করবেন, যে আমল কেবল আল্লাহর জন্য করা হবে এবং আমল দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা উদ্দেশ্য হবে”।[27]

সাওয়াব লাভ করা: সা’আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনুহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إنكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبَتغِي بِها وَجْهَ الله إلا أُجِرتَ عَلَيْهَا »

---

[27] নাসায়ী: ৩১৪০। আল্লামা আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

“যখনই তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন খরচা করবে, তার উপর তোমাকে সাওয়াব দেয়া হবে”।[28]

যে কোন ছোট আমলকে বড় মনে করার ফলে তা বড় আমলে পরিণত হওয়া: আল্লামা ইবনুল মুবারক রহ. বলেন, অনেক ছোট আমল আছে নিয়ত তাকে বড় করে দেয়, আবার অনেক বড় আমল আছে, নিয়ত তাকে ছোট করে দেয়।[29]

গুনাহসমূহ ক্ষমা: ইখলাস গুনাহ মাপের অনেক বড় কারণ। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, এক প্রকার আমল এমন আছে, যখন কোন মানুষ আমলটি পরিপূর্ণ ইখলাস ও আল্লাহর আনুগত্যের সাথে করে থাকে, আল্লাহ তা‘আলা এ আমলের দ্বারা তার কবিরা গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন। যেমন- আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনুহু হতে হাদিস বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

---

[28] বুখারি: ৫৬, মুসলিম: ১৬২৭।

[29] জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম: ১৩/১।

« يُصاحُ برَجلٍ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَة عَلَى رُؤُوسِ الخَلَائِقِ، فَيُنْشَرُ لَهُ تسْعةٌ وتسْعونَ سِجلاً، كُلُّ سِجِلٍ مَدّ البَصَرِ، ثُمَّ يقُولُ اللهُ هَلْ تُنْكِرُ منْ هذَا شَيْئاً؟ فَيَقُولُ: لاَ يَا ربِّ. فَيقُولُ: لا ظُلمَ عَلَيْكَ. فَتخْرجُ لَهُ بِطَاقَةٌ قدْرُ الكَفِّ فيِهَا شَهادَةُ أَن لا إِلَهَ إِلاَّ الله. فَيقُولُ: أَيْنَ تَقع هذِهِ البطِاقَةُ مَع هَذِهِ السِّجلاَّتِ؟! فتوضَع هذِهِ البطِاقَةُ فِي كَفَّةٍ وَالسِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ، فَثَقُلَتِ البِطَاقَةُ، وَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ»

“কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে সমগ্র মাখলুকের সামনে উপস্থিত করা হবে, তারপর তার জন্য নিরানব্বইটি দফতর খোলা হবে, প্রতিটি দফতর চোখের দৃষ্টির সমান দূরত্ব। তারপর আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, তুমি কি এর কোন কিছুকে অস্বীকার কর, তখন সে বলবে, না, হে আমার প্রভূ। তখন আল্লাহ বলবে, তোমার উপর কোন জুলুম করা হবে না। তারপর তার জন্য হাতের তালুর সমপরিমাণ একটি কাগজের টুকরা বের করা হবে, তাতে লিপিবদ্ধ থাকবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তখন সে বলবে, এত গুলো বড় বড় দফতরের মুকাবেলায় এ কাগজের টুকরাটি কোথায় পড়ে থাকবে? তারপর এ কাগজের টুকরাটি একটি পাল্লায় রাখা হবে এবং দফতরসমূহ অপর পাল্লায়

রাখা হবে। তখন কাগজের টুকরার পাল্লাটি ভারি হয়ে যাবে এবং দফতরসমূহ হালকা হয়ে পড়বে।[30]

এ হল ঐ ব্যক্তির অবস্থা যে এ কালিমা ইখলাস ও একীনের সাথে বলবে যেমনটি উল্লেখিত লোকটি বলেছিল। অন্যথায় যারা কবিরা গুনাহ করার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদের সবাই এ কালিমা বলে থাকে। কিন্তু তাদের কথা তাদের গুনাহের উপর ভারী হয় নাই, যেমনটি ভারী হয়েছিল এ লোকটির কথা। অপর একটি হাদিসে বর্ণিত,

إنَّ امْرَأَةً بَغِيا رَأْت كَلباً فِي يَوْمٍ حَارٍّ يطِيفُ بِبِئر قَدْ أَدلَعَ لِسانَهُ مِن العَطَشِ، فنَزَعْت لَه بمُوقِهَا - أي: سقته بخفها -فَغُفِرَ لهَا

"একজন ব্যভিচারী মহিলা একটি কুকুরকে একটি কুপের নিকট দেখতে পেল সে পানির পিপাসায় কাতরাচ্ছে। মহিলাটি তার পায়ের মোজা খুলে তাকে পানি পান করালে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা

[30] তিরমিযি: ২৬৩৯, ইবনে মাযা: ৪৩০০, হাকেম হাদিসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, হাদিসটি মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী।

করে দেন"।[31] যেহেতু মহিলাটি তার অন্তরে গাথা বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ ঈমান নিয়ে কুকুরটিকে পানি পান করালেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অন্যথায় যত ব্যভিচারী মহিলা কোন কুকুরকে পানি করাবে সবাইকে ক্ষমা করে দেবেন এমন কথা এখানে বলা হয়নি।[32]

আমলের বিনিময় লাভ করা যদিও আমলটি করতে অক্ষম হয়:

ইখলাসের দ্বারা মানুষ আমলের সাওয়াব পেয়ে থাকে যদিও সে আমলটি করতে অক্ষম হয়। বরং অনেক সময় মুজাহিদ ও শহীদদের মর্তবা লাভ করবে যদিও সে বিছানায় মারা যায়। আল্লাহ তা'লা যাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদে নিয়ে যেতে পারেননি তাদের প্রশংসা করে বলেন,

﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوۡكَ لِتَحۡمِلَهُمۡ قُلۡتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحۡمِلُكُمۡ عَلَيۡهِ تَوَلَّواْ وَّأَعۡيُنُهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ٩٢ ﴾ [المائدة: ٩٢]

[31] মুসলিম: ২২৫৬।

[32] মাজমুয়ায়ে ফতোয়ায়ে ইবনে তাইমিয়্যাহ: ২২১-২১৮।

“আর তাদের উপরও কোন দোষ নেই, যারা তোমার কাছে আসে, যাতে তুমি তাদের বাহন জোগাতে পার। তুমি বললে, আমি তোমাদেরকে বহন করানোর জন্য কিছু পাচ্ছি না, তখন তারা ফিরে গেল, তাদের চোখ অশ্রুতে ভেসে যাওয়া অবস্থায়, এ দু:খে যে, তারা পাচ্ছে না এমন কিছু যা তারা ব্যয় করবে”।

আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনুহু হাদিস বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن أَقْوَاماً بِالمدينةِ خلْفَناَ مَا سَلَكْناَ شعباً وَلا وَادِياً إلا وَهُمْ معَناَ فيهِ،حَبَسُهْم العُذْرُ»

“মদিনায় আমরা কতক লোককে রেখে এসেছি, আমরা যত পাহাড়ের চুড়া ও গ্রাম মাড়াইনা কেন, তাদেরকে আমাদের সাথে সাথে পাই। তাদেরকে তাদের অপারগতা আমাদের সাথে অংশ গ্রহণ করা হতে বিরত রাখেন”।[33] যাদেরকে আমরা অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত,

إلا شَرُكُوكُمْ فِي الأَجْرِ

[33] বুখারি: ২৬৮৪।

“কিন্তু তারা তোমাদের সাথে সাওয়াবের মধ্যে শরিক”।[34]

আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনুহু হাদিস বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« مَن سَأَلَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَه الله مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ؛ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ »

“যে ব্যক্তি অন্তর থেকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট শাহাদাত কামনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদা দান করবে। যদিও লোকটি বিছানায় মারা যায়।[35]

অনুরূপভাবে ধনী লোক তার সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে যে পরিমাণ সাওয়াব লাভ করে থাকে, একজন গরীব লোক তার নিয়ত ভালো হওয়ার কারণে সে আল্লাহর রাস্তায় দান না করেও অনুরূপ সাওয়াব লাভ করবে। আবু কাবশা আল-আনমারি রাদিয়াল্লাহু আনুহু হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[34] মুসলিম: ১৯১১।

[35] মুসলিম: ১৯০৯।

« مَثَلُ هَذِهِ الأُمَّةِ كَمثَلِ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالا وَعِلْمًا، فَهُوَ يَعْمَلُ فِي مَالِهِ يُنفِقُهُ فِي حَقِّهِ، وَرَجلٌ آتَاهُ اللهُ عِلْمًا وَلَم يُؤْتِهِ مَالا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذي يَعْمَلُ قَال فَهُمَا فِي الأَجرِ سَواءٌ »

"এ উম্মতের উপমা চার শ্রেণীর লোকের অনুরূপ। এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা মাল ও জ্ঞান উভয়টি দান করেছেন। লোকটি তার মালকে যথাযথ ব্যয় করে। আর এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান দান করেছে, তাকে মাল দেয় নাই। সে মনে মনে বলে, যদি আমার নিকট লোকটির মত সম্পদ থাকত, তাহলে আমিও তার মত ব্যয় করতাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারা উভয়ে সমান সাওয়াবের অধিকারী হবেন।[36]

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন, তা হল, একজন লোক আমলে অক্ষম নয়, তবে সে কাজ করার আশা রাখে, কিন্তু করে না। আর সে ধারণা করে, তাকে তার ভালো কাজের আশার কারণে সাওয়াব দেয়া হবে। সে তার এ ধরনের

---

[36] ইবনে মাযা: ৪২২৮, আহমদ: ১৮০৩৫, আল্লামা আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

নিয়তকে নেক নিয়ত বলে বিবেচনা করে। কিন্তু বাস্তবতা হল, এ ধরনের নিয়ত ও আশা শয়তানের ওয়াস-ওসা ও আত্মার ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়।

একজন মানুষ মসজিদে সালাতের জামাতে উপস্থিত না হয়ে, ঘরে বসে থাকে বা বিছানায় শুয়ে থাকে, আর বলতে থাকে আমি সালাতে যাওয়াকে পছন্দ করি বা সালাতে উপস্থিত হতে চাই। সে ধারণা করে যে, তার এ কথা দ্বারা, মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে সালাত আদায় করার সাওয়াব সে লাভ করবে। এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা আমাদের উল্লেখিত বিষয়সমূহের সাথে কোন সম্পর্ক নাই এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিসসমূহের সাথেও এর কোন সম্পর্ক নাই।

মুবাহ ও স্বাভাবিক কর্মসমূহে ইবাদতে পরিণত করার মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদা লাভ করা:

সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনুহু হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إِنّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتغِي بها وَجْهَ الله إلا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ »

“আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যে দান কর, তার উপর অবশ্যই তুমি সাওয়াব পাবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে খাওয়ারের যে লোকমাটি তুলে দাও”।[37] [তাতেও সাওয়াব পাবে]

এটি কল্যাণের অধ্যায়সমূহ হতে একটি বিশাল অধ্যায়। যখনই একজন বান্দা তাতে প্রবেশ করবে, সে মহা কল্যাণ ও অসংখ্য প্রতিদান লাভ করবে। আর আমরা যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বৈধ কর্মগুলো ও স্বাভাবিক কাজকর্ম দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের ইরাদা করি, তাহলে আমরা বিশাল প্রতিদান ও অধিক সাওয়াবের অধিকারী হব।

যাবিদ আল-ইয়ামি রহ. বলেন, প্রতি কর্মে এমনকি খানা-পিনার ও নিয়ত করাকে আমি পছন্দ করি। বাস্তব কিছু নমুনা তোমার সামনে তুলে ধরা হল, যাতে তুমি তোমার দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাতে পার:

---

[37] বুখারি: ৫৬, মুসলিম: ১৬২৮।

অনেকেই এমন আছে, সে সুগন্ধি ব্যবহার করতে অধিক পছন্দ করেন। সে যদি মসজিদে যাওয়ার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করে আল্লাহর ঘরের ইজ্জত করার নিয়ত করে এবং মানুষ ও ফেরেশতাদের কষ্ট রোধ করার নিয়ত করে তাহলে সে অবশ্যই সাওয়াবের অধিকারী হবে। আমরা সবাই খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে বাধ্য। কিন্তু আমরা যদি আমাদের খাদ্য ও পানীয় দ্বারা আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করার উপর শক্তি লাভ করার নিয়ত করে থাকি তাহলে আমরা অবশ্যই সাওয়াব লাভ করব। অধিকাংশ মানুষ বিবাহ করতে বাধ্য। যদি একজন লোক বিবাহ দ্বারা এ নিয়ত করে, নিজের ও স্ত্রীর সতীত্বের হেফাজত করা এবং এমন নেক সন্তান রেখে যাওয়ার যারা তারপর আল্লাহর জমিনে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করবে, তাহলে তাকে অবশ্যই সাওয়াব দেয়া হবে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদের অবশ্যই তাদের উদ্দেশ্য সুন্দর হওয়া উচিত। একজন ডাক্তার ডাক্তারি শিক্ষা দ্বারা মুসলিমদের স্বাস্থ্য-সেবা দেয়ার নিয়ত করবে। অনুরূপভাবে একজন ইঞ্জিনিয়ার মুসলিমদের সেবা করার নিয়ত করবে। মোট কথা, প্রতিটি ছাত্র ইসলাম ও মুসলিমদের খেদমত

করার নিয়ত করবে। তাহলে সে তার অধ্যয়ন ও পড়া-লেখা দ্বারা সাওয়াবের অধিকারী হবে। ইত্যাদি-।

আমরা সবাই কামাই রুজি করা ও পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করতে বাধ্য। এ ধরনের যাবতীয় কর্মসমূহ হতে কোন কর্মকেই ছোট মনে করা সাওয়াবে আশা না করা বা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত না করা উচিত নয়। কারণ, হতে পারে এটিই তোমাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর আযাব হতে নাজাত দেবে।

শয়তানে কু-মন্ত্রণা হতে নফসকে হেফাজত করা:

শয়তান যখন আল্লাহ তা'আলাকে প্রতিশ্রুতি দেন, তখন সে মুখলিস বান্দাদের গোমরাহ করতে না পারার কথা বলেন। আল্লাহ বলেন, সুতরাং যাদের আল্লাহ তা'আলা ইখলাসের মাধ্যমে হেফাজত করেন আল্লাহ তাদের গোমরাহ করতে পারেন না।

মারুফ আল-কারখী রহ. তার স্বীয় আত্মাকে সম্বোধন করে বলেন, হে আত্মা! তুমি ইখলাস অবলম্বন কর, তবে তুমি রেহাই পাবে।[38]

---

[38] এহয়ায়ু উলুমুদ্দিন ৪৬৫/৩।

ওয়াস-ওয়াসা বন্দ হওয়া ও রিয়া থেকে দূর হওয়া:

আবু সুলাইমান আদ-দারমী রহ. বলেন, যখন কোন বান্দা ইখলাসকে অবলম্বন করে, তার থেকে ওয়াস-ওয়াসা ও রিয়া দূর হয়ে যায়।[39]

ফিতনা হতে নাজাত লাভ:

ইখলাসের মাধ্যমে একজন বান্দা ফিতনা হতে নাজাত লাভ করে। ইখলাস প্রভৃতির চাহিদায় পতিত হওয়া এবং ফাসেক ও ফাজেরদের অপরাধে জড়িত হওয়া হতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। আল্লাহ তা'আলা ইখলাসের কারণে ইউসুফ আ. কে আজিজে মিসরের স্ত্রীর ফিতনা হতে রক্ষা করেন। ফলে, সে অশ্লীল ও অনৈতিক কোন কাজে জড়িত হননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর হওয়া এবং রিজিক বৃদ্ধি পাওয়া:

---

[39] মাদারেজুস সালেকীন:৯২/২।

আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনুহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ كانتِ الآخرةُ هُمَّه؛ جعَلَ الله غِنَاهُ فِي قَلْبِه، وَجَمَع لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ راغمة، ومَنْ كانْت الدُّنيا هَّمُه؛ جعَلَ الله فَقْرُه بيْنَ عَينيه، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَملَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدُّنْيَا إلا مَا قُدِّرَ لَه»

“যার লক্ষ্য হবে, আখেরাত অর্জন করা, আল্লাহ তা‘আলা তার অন্তর থেকে অভাবকে দূর করে দেবেন। আর তার জন্য যাবতীয় উপকরণ সহজ করে দেবে। আর দুনিয়া তার নিকট অপদস্থ হয়ে ধরা দেবে। আর যার লক্ষ্য বস্তু হবে, দুনিয়া অর্জন করা, আল্লাহ তা‘আলা অভাবকে তার চোখের সামনে তুলে ধরবে এবং যাবতীয় উপকরণকে তার বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আর দুনিয়া তার ভাগ্যে ততটুকু মিলবে, যতটুকু তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে”।[40]

বিপদ-আপদ দূর হওয়া:

---

[40] তিরমিযি: ২৪৬৫, আল্লামা আলবানী রহ. হাদিসটি সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনুহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«خرَج ثَلَاثَةٌ يَمْشُونَ، فَأَصابَهُمُ المطَرُ، فَدخَلُوا فِي غَارٍ فِي جبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِم صَخْرَةٌ، قَالَ: فَقَالَ بعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ادْعُوا الله بأفْضِل عَمل عَمِلْتُمُوهُ.فَقالَ أَحُدُهمْ: اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانَ شَيْخَانِ كَبيرانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى، ثُمَّ أَجِي فَأَحْلب، فَأَجِيءُ بِالحِلَابِ فَآتِي أَبَوَايَ فَيَشربَانِ، ثُمَّ أَسقِي الصِّبيَةَ وَأَهلِي وَامْرَأَتِي، فَاحْتَبسُت لَيلَةً،فَجْئتُ فَإِذَا هُمَا نَائمَانِ، قَالَ: فَكَرِهْتُ أَن أُوقِظَهُمَا، وَالِّصْبيَةُ يَتَضاغَوْنَ عِنْدَ رِجلِي، فَلَمْ يزَلْ ذَلكِ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ. اللَّهُمَّ إنْ كُنت تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتَ ذَلك ابْتغَاءَ وَجْهِك فَافْرُجْ عناْ فُرْجَةً نَرَى مِنهَا السَّمَاءَ. قَالَ: فُفِرجَ عنْهُمْ وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهمَّ إن كُنتَ تَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدِّ مَا يُحبُ الرَّجُلُ النساءَ، فَقَالَتْ: لاَ تَنَالُ ذَلكِ مِنهَا حَتَّى تُعْطيَهَا مِائَةَ دِينارٍ. فَسَعيت حّتى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدتُ بَين رِجلَيْهَا قَالَتْ: اتَّقِ الله، وَلا تَفُضَّ الخَاتمَ إلِا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ وَترَكتهَا، فَإنْ كُنت تعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلكَ ابْتِغاِءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً. قَالَ: فَفرَجَ عنهُمُ الُّثُلَثيْنِ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إن كُنت تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرت أَجِيراً بفَرْقٍ مِنْ ذُرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبَى ذَلكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدتُ إلَى ذَلكَ الفَرْقِ فَزَرعْتُه حّتى اشْتَرَيْت مِنهْ بَقرًا وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله، أَعْطِنِي حَقِّي. فَقُلْتُ: انْطَلقِ إلَى تلِكَ البَقرِ وَرَاعِيهَا فَإنها لَكَ. فَقَالَ: أَتَسْتَهزِئُ بِي؟ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا

أَسَتهْزِئ بكَ، وَلَكنِهَا لَكَ. اللَّهُمَّ إن كُنت تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلكِ ابْتغِاءَ وَجْهِكَ فافْرُجْ عنَّا. فَكَشَفَ عَنْهُمْ»

“তিন ব্যক্তি ঘর থেকে বের হাটতে ছিল, এমন সময় বৃষ্টি আসলে, তারা পাহাড়ের একটি গর্তের মধ্যে প্রবেশ করল। একটি পাথর উপর থেকে পড়ে গর্তের মুখটি বন্ধ হয়ে তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তারা একে অপরকে বলল, তোমরা তোমাদের জীবনের সর্বোত্তম আমল দ্বারা আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে থাক। তখন তাদের একজন বলল, হে আমার দুই বৃদ্ধ মাতা-পিতা ছিল, আমি সকালে বের হতাম আর দিনভর ছাগল চরাতাম এবং সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দুধ দোহাতাম। আর সে দুধ নিয়ে আমি আমার দুই মাতা পিতার নিকট এসে সর্বপ্রথম তাদের দুধ পান করাতাম, তারপর আমি আমার বাচ্চা, পরিবার-পরিজন ও স্ত্রীকে পান করাতাম। এক রাত আমার দেরি হলে, আমি এসে দেখি, তারা দুইজন ঘুমাই গেছে। লোকটি বলল, আমি তাদের দুইজনকে জাগাতে অপছন্দ করলাম। অপরদিকে বাচ্চারা আমার পায়ের নিকট চটপট করছিল। আমি সারা রাত তাদের পায়ের নিকট দাড়িয়ে থাকি তারা ঘুমচ্ছিল, এভাবে সকাল হল। হে আল্লাহ! যদি তুমি জান যে,

এ কাজটি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করছি, তাহলে তুমি আমাদের থেকে পাথরটি একটু সরিয়ে দাও, যাতে আমরা আসমান দেখতে পাই। লোকটি বললেন, তারপর পাথরটি একটু সরিয়ে দেয়া হল। দ্বিতীয় জন বলল, হে আল্লাহ! তুমি জান আমি আমার একজন চাচাতো বোনকে এত বেশি ভালো বাসতাম, যেমনটি একজন পুরুষ একজন মহিলাকে ভালো বাসে। তখন সে আমাকে একটি শর্ত দিয়ে বলল, তুমি কখনোই তাকে পাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে একশটি দিনার দেবে। তারপর কথা শুনে আমি চেষ্টা চালিয়ে গেলাম এবং একশ দিনার একত্র করলাম। তারপর যখন আমি তার দু পায়ের মাঝে বসলাম, তখন সে আমাকে বলল, আল্লাহকে ভয় কর। তুমি তোমার আঁকটিকে খুলবে না, শুধু সেখানে খুলবে যেখানে তার অধিকার আছে। তার কথা শোনে আমি দাড়িয়ে গেলাম এবং তাকে ছেড়ে দিলাম। তুমি অবশ্যই জান আমি কাজটি কেবল তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই করেছি। সুতরাং, তুমি আমার থেকে পাথরটি একটু সরিয়ে দাও। লোকটি বলল, পাথরটি দুই তৃতীয়াংশ সরে গেল। অপর একলোক বলল, হে আল্লাহ! তুমি অবশ্যই জান, আমি একজন চাকরকে এক থলে খাদ্যের বিনিময়ে কাজে নিয়োগ দেই।

কাজ শেষে আমি তাকে তার মুজুরি দিতে গেলে সে তখন তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তার আমি তার খাদ্য গুলোকে নিয়ে জমিনে ছিটিয়ে দেই এবং তার থেকে যে ফসল হয় তা বিক্রি করে একটি গরু ও রাখাল ক্রয় করি। অনেক দিন পর লোকটি এসে আমাকে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমাকে আমার পাওনা পরিশোধ কর। তখন আমি তাকে বললাম, এ সব গরু ও তার রাখাল এখানে যা আছে সবই তোমার। লোকটি আমার কথা শুনে বলল, তুমি কি আমার সাতে বিদ্রূপ করছ? আমি বললাম না, আমি তোমার সাথে বিদ্রূপ করছি না। তবে এগুলো সবই তোমার। হে আল্লাহ তুমি অবশ্যই জান, আমি কাজটি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই করছি। তুমি আমাদের থেকে পাথরটি সরিয়ে দাও, তারপর তাদের থেকে পাথরটির বাকী অংশ সরিয়ে দিলেন।[41]

আল্লাহ ও মানুষের মাঝে আল্লাহই যথেষ্ট হওয়া:

[41] বুখারি: ২১০২, মুসলিম: ২৭৪৩।

ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনুহু বলেন, হকের বিষয়ে যার নিয়ত খাটি হবে, যদিও স্বীয় আত্মার উপর, আল্লাহ তা'আলা তার মাঝে ও মানুষের মাঝে যথেষ্ট হবে।[42]

মুখলিস ব্যক্তি হিকমত দ্বারা সজ্জিত:

মাকহুল রহ. বলেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত ইখলাস অবলম্বন করে, তার অন্তর থেকে হেকমতের নহরসমূহ মুখের উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে।[43]

ইখলাসের কারণে বান্দাকে সাওয়াব দেয়া হয়ে থাকে যদিও সে ভুল করে। যেমন, মুজতাহিদ, আলেম, ফকীহ-ইত্যাদি। যখন ইজতিহাদ দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সত্য উদঘাটন ও মানবতার কল্যাণ সাধন হয়, তখন সে ভুল করলেও তার উপর তাকে সাওয়াব দেয়া হবে।

যাবতীয় কল্যাণ ইখলাসের মধ্যেই নিহিত:

---

[42] বাইহাকী আল-কুবরা: ২৫০/১০।

[43] মাদারেজুস সালেকীন: ৯২/২

দাউদ আত-তায়ী রহ. বলেন,

আমি যাবতীয় কল্যাণকে একত্র করতে কেবল সুন্দর নিয়তকেই দেখেছি। ভালো নিয়তই যাবতীয় কল্যাণ লাভের জন্য যথেষ্ট।[44]

সুতরাং, যেহেতু যাবতীয় কল্যাণ ও উপকারিতা মুখলিসদের জন্যই। তাই আমাদের জন্য উচিত হল, আমরা যেন, ইখলাসের অধিকারী হই।

ইখলাস না থাকার ক্ষতি:

যেমনি ভাবে ইখলাসের অনেক উপকারিতা ও ফলাফল রয়েছে, যা একজন মুসলিম স্বীয় ইখলাস থেকে লুপে নেয়, অনুরূপভাবে ইখলাস না থাকারও অনেক ক্ষতি রয়েছে, যেগুলোতে একজন গাইরে মুখলিস ব্যক্তি আক্রান্ত হয়। এ সব ক্ষতিসমূহ হতে কতক নিম্নে আলোচনা করা হল।

জান্নাতে প্রবেশ না করা:

[44] জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম: ১৩।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনুহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« مَن تَعلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ الله لا يَتَعلَّمُه إلا ليُصيبَ بِه عرضاً مِنْ الدُّنْيَا لَم يجِدْ عَرف الجَنةَّ يوَم القيامَةِ يعْنِي رِيحَهَا »

“যে ইলম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়ে থাকে, সে ইলমকে যদি কোন ব্যক্তি দুনিয়াবি কোন উদ্দেশ্যে শেখে, কিয়ামতের দিন সে জান্নাত পাবে না, এমনকি সুঘ্রাণও পাবে না”।[45]

কিয়ামতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করা: আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনুহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

«إن أَولَ الناَّسِ يقضى يوْم القيامِة عَلَيْهِ: رَجل استُشهَد فَأُتِيَ بِهِ فعَرَّفُه نعمَه فعرَفها، قالَ: فَما عَمِلْتَ فيهَا؟ قالَ: قَاتلتُ فيكَ حتَّى استُشهْدتُ. قالَ: كَذَبْتَ، وَلَكنكَّ قَاتَلْتَ لأن يُقالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُم أُمِر بهِ فَسحبَ عَلى وَجهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرجل تَعَلَّمَ الْعلمَ وَعَلَّمه وقَرَأَ القُرْآنَ، فَأُتِي بهِ

---

[45] আবু দাউদ: ৩৬৬৪, ইবনে মাযা: ২৫২, আল্লামা আল-বানী রহ. হাদিসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

فعَرَّفُه نعَمه فعرَفهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فيِهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْت العِلْمَ وَعّلمْتُهُ وقَرَأْتُ فيِكَ القُرْآنَ. قاَلَ: كَذَبْتَ، وَلَكنكَ تَعلَّمْت العلَم ليُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ القُرْآنَ ليقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ.ثم أُمَر بِهِ فَسحبَ عَلى وَجْههِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجلٌ وَسَّع الله عَلَيْهِ وَأَعطَاهُ مِن أَصنافِ المَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعرَّفُه نعَمَه فَعرَفهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فيِهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبيِلٍ تُحبُّ أَنْ يُنفْقَ فيِهَا إلا أَنْفَقْتُ فيِها لكَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكنِكَّ فَعَلْتَ ليُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُم أُمِرَ بِهِ فَسحبَ عَلى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ»

কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে, তিনি হলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হন, তারপর তাকে ডাকা হবে এবং তার নিকট তার নিয়ামতসমূহ তুলে ধরা হলে সে তা চিনতে পারবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি এ সব নিয়ামতের মুকাবালায় কি আমল করছ? সে বলল, তোমার রাহে আমি যুদ্ধ করছি এবং শহীদ হয়েছি। সে বলল, তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি যুদ্ধ করছ, যাতে মানুষ তোমাকে বাহাদুর বলে। তা তোমাকে বলা হয়েছে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের নির্দেশ দেয়া হলে, তাকে তার চেহারার উপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। এক ব্যক্তি ইলম অর্জন করল, মানুষকে শেখাল এবং কুরআন পড়ল। তারপর তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা

হল এবং তার উপর আল্লাহর নিয়ামতসমূহ তুলে ধরা হলে, সে তা চিনতে পেল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তুমি এ বিষয়ে কি আমল করছ? বলল, আমি ইলম শিখেছি এবং শিখিয়েছি। তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন পড়েছি। সে বলল, তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি ইলম শিখেছ, যাতে তোমাকে আলেম বলা হয়। আর কুরআন তিলাওয়াত করেছ, যাতে তোমাকে এ কথা বলা হয়, লোকটি ক্বারি। আর দুনিয়াতে তোমাকে তা বলা হয়েছে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের নির্দেশ দেয়া হলে, তাকে তার চেহারার উপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়।[46]

এক ব্যক্তি তাকে আল্লাহ তা'আলা সামর্থবান করেছেন এবং তাকে বিভিন্ন ধরনের ধন-সম্পদ দিয়েছেন। তারপর তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হল এবং তার উপর আল্লাহর নিয়ামতসমূহ তুলে ধরা হলে, সে তা চিনতে পেল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তুমি এ বিষয়ে কি আমল করছ? বলল, তোমার জন্য তুমি যে পথে ব্যয় করাকে পছন্দ কর, সে ধরনের কোন পথ আমি ছাড়িনি যেখানে আমি তোমার জন্য ব্যয় করিনি। বলল, তুমি মিথ্যা বলছ,

---

[46] মুসলিম: ১৯০৫।

তবে তা করছ, যাতে লোকেরা তোমাকে এ কথা বলা হয়, লোকটি দানবীর। আর দুনিয়াতে তোমাকে তা বলা হয়েছে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের নির্দেশ দেয়া হলে, তাকে তার চেহারার উপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনুহু যখনই এ হাদিসটি বর্ণনা করার ইচ্ছা করতেন, হাদিসের ভয়াবহতার কারণে তিনি বেহুশ হয়ে পড়তেন। সুফাই আল আসবাহী রাদিয়াল্লাহু আনুহু হতে বর্ণিত, তিনি একবার মদিনায় প্রবেশ করে, দেখতে পান যে, একজন লোককে কেন্দ্র করে অনেক মানুষ একত্র হয়। তখন সে বলল, লোকটি কে? লোকেরা বললেন, লোকটি আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনুহু। আমি তার নিকটে গিয়ে তার সামনে বসলাম। তিনি মানুষকে হাদিস শোনাচ্ছেন। যখন তিনি চুপ করলেন এবং একা হলেন, আমি তাকে বললাম, আমি তোমাকে সত্যের শপথ দিয়ে বলছি। তুমি আমাকে এমন একটি হাদিস বলবে, যা তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবান থেকে শুনেছ, বুঝেছ এবং জেনেছ। তখন আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনুহু বলল, আমি তাই করব, আমি তোমাকে একটি হাদিস শোনাবো যে হাদিসটি

আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন এবং আমি হাদিসটি তার থেকে বুঝেছি এবং শিখেছি। এ কথা বলে কিছু সময় আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনুহু বেহুশ হয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পর হুশ ফিরে আসলে তিনি বলেন, আমি তোমাকে একটি হাদিস শোনাবো যে হাদিসটি আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এ ঘরের মধ্যে বর্ণনা করেছেন, যেখানে আমি ও তিনি ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। তারপর আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনুহু আবারও বেহুশ হয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পর হুশ ফিরে পেলেন। তিনি তার চেহারা মুছলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে একটি হাদিস শোনাবো যে হাদিসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বর্ণনা করেছেন, যখন আমি ও তিনি এ ঘরের মধ্যে ছিলাম। আমাদের সাথে আমি ও তিনি ছাড়া আর কেউ ছিল না। তারপর আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনুহু আবারও বেহুশ হয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পর হুশ ফিরে পেলেন। তিনি তার চেহারা মুছলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে একটি হাদিস শোনাবো যে হাদিসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বর্ণনা করেছেন,

যখন আমি ও তিনি এ ঘরের মধ্যে| আমাদের সাথে আমি ও তিনি ছাড়া আর কেউ ছিল না। না। তারপর আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনুহু আবারও কঠিন ভাবে বেহুশ হয়ে পড়লেন এবং তিনি তার চেহারার উপর ঢলে পড়লেন, আমি তাকে লম্বা করে আমার আমার উপর হেলান দেওয়ালাম, কিছুক্ষণ পর সে হুশ ফিরে পেল এবং বলল, আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস বর্ণনা করেন...তিনি উল্লেখিত হাদিসটি বর্ণনা করেন। হাদিসের শেষ অংশে বর্ণিত, “অত:পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উভয় হাঁটুর উপর আঘাত করে বলেন, হে আবু হুরাইরা! এরা তিনজনই আল্লাহ তা‘আলার প্রথম মাখলুক যাদের দ্বারা কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হবে।[47] মনে রাখবে, আগুনকে যেদিন প্রথম প্রজ্বলিত করা হবে, সেদিন হত্যাকারী, ব্যভিচারী, চোর ও মদ্যপানকারী দ্বারা প্রজ্বলিত করা হবে না, বরং কুরআন তিলাওয়াত কারী, দানকারী, মুজাহিদ

[47] তিরমিযি: ২৩৮২, হাকেম রহ. হাদিসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

প্রমুখদের দ্বারা প্রজ্বলিত করা হবে। আর এ গুলো সবই হবে রিয়ার কারণে।

কায়াব বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনুহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ طَلَبَ العِلَم لِيجَاري بِهِ العُلَمَاءَ، أَوْ لِيمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْيَصْرِفَ بِهِ وجُوَهَ النَّاسِ إِلَيْهِ؛ أَدْخَلَهُ الله النَّارَ»

"যে ব্যক্তি এলম তালাশ করে, যাতে ইলম দ্বারা আলেমদের মুকাবালা করে অথবা জাহেলদের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে অথবা মানুষের দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে"।[48]

আমল কবুল না হওয়া:

«قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعالَى: أَنَا أَغْنَى الشركَاءِ عَنْ الشِّرْكِ، مَنْ عِمَل عَمَلًا أَشرك فِيهِ مِعي غَيْري تَرَكْتُه وشَركَهُ»

---

[48] তিরমিযি: ২৬৫৪, আল্লামা আল-বানী রহ. হাদিসটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, তোমরা আমার সাথে যে সব শরীকদের শরীক সাব্যস্ত কর, আমি তা হতে পবিত্র। যে ব্যক্তি কোন আমল করে, তাতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করে, আমি তার আমল ও শিরক উভয়টিকে ছুড়ে ফেলে দেই।[49] আবু উমামা আল বাহেলী রাদিয়াল্লাহু আনুহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم«لَا شَيْءَ لَهُ » فَأَعَادَهَا ثَلَاَث مَرَّاتٍ، يُقُوُل لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم « لا شَيْءَ لَهُ » ثم « قَالَ إن الله لا يَقْبَلُ مِنْ العَمَلِ إلِا مَا كَانَ لَهُ خَالِصاً، وَاْبتُغِي بِهِ وَجْهُه »

“এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে এবং সে সুনাম অর্জন ও সাওয়াব কামনা করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে কিছুই পাবে না। লোকটি তিনবার জিজ্ঞাসা করল, প্রতিবারই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার জন্য কিছুই মিলবে না। আল্লাহ

[49] মুসলিম: ২৯৮৫

তা‘আলা কেবল ঐসব আমল কবুল করেন, যা একমাত্র আল্লাহর জন্য করা হয় এবং যে আমল দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়।[50] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনুহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لاَ أَجر لَهُ » فأعظمَ ذلك الناسُ، وقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه. فقال: يا رسول رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا. فقال: « لا أَجَر لَهُ » فقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الثالثة، فقال له « لا أَجَر لَهُ »

“এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! একজন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় পার্থিব বা দুনিয়ার কিছু সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ করতে চায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার জন্য কোন সাওয়াব মিলবে না। লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথায় আশ্চর্য হলেন এবং লোকটিকে

---

[50] নাসায়ী: ৩১৪০, আল্লামা আল-বানী রহ. হাদিসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

বললেন, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আবার যাও এবং জিজ্ঞাসা কর, হতে পারে তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কথাটি বুঝিয়ে বলতে পারনি। তারপর লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে গিয়ে আবারও বলল, হে আল্লাহর রাসূল! একজন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দুনিয়ার কিছু সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ করতে চায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার জন্য কোন সাওয়াব মিলবে না। লোকেরা বলল, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আবার যাও, লোকটি আবার গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তৃতীয় বার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার জন্য সাওয়াব ও বিনিময় কিছুই নাই।

আমলের সাওয়াব নষ্ট হওয়া:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَقَدِمۡنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَٰهُ هَبَآءٗ مَّنثُورًا ۝٢٣ ﴾ [الفرقان: ٢٣]

হাদিসে কুদসীতে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা রিয়াকারীদের বিষয়ে বলেন,

«اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُم تُراءُونَ فِي الدُّنيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً »

“দুনিয়াতে তোমরা যাদের দেখানোর জন্য আমল করতে তাদের নিকট যাও, দেখ, তাদের নিকট কোন বিনিময় পাও কিনা”?[51]

ইখলাস বিষয়ে সালফে সালেহীনদের অবস্থান:

ইখলাস আল্লাহ কুরআনের পঠিত আয়াত বা প্রকাশ যোগ্য হাদিস এ বলে সালফে সালেহীনরা ইখলাস বিষয়ে ক্ষান্ত হননি। বরং ইখলাস বিষয়ে তাদের একটি সু-স্পষ্ট অবস্থান ছিল যা অন্যদের ছিল না। ইখলাস বিষয়ে তাদের অবস্থান ছিল একটি অনুকরণীয় আদর্শ। কারণ, তারা ইখলাসের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতেন।[52]

ফুজাইল বিন আয়াজ রহ. বলেন, “আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের থেকে তোমাদের নিয়ত ও ইচ্ছাকেই চায়”।

---

[51] আহমদ: ২৩৬৮১। আল্লামা আল-বানী রহ. হাদিসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

[52] জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম: ১৩।

তারপর তারা ইখলাসের গুণে গুণান্বিত হওয়া কঠিন হওয়া সত্ত্বেও তারা মুখলিস ছিলেন এবং তারা মানুষের জন্য বিষয় বর্ণনা করে গিয়েছেন। আব্দুল্লাহ আত-তাসতরী রহ. কে জিজ্ঞাসা করা হল, প্রবৃত্তির জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ কোনটি। তিনি বলেন, ইখলাস। কারণ, তার মধ্যে নফসের কোন অংশ নাই।[53]

ইউসুফ বিন আসবাত রহ. বলেন, আমলকারীদের জন্য নিয়তকে নষ্ট করা হতে বিশুদ্ধ করা, দীর্ঘ ইজতেহাদ করা হতে কঠিন।

ইখলাস বিষয়ে সালাফদের অবস্থান সম্পর্কে তোমার নিকট কতক নমুনা তুলে ধরা হল। আশা করি তা থেকে তুমি উপদেশ গ্রহণ করবে এবং তাদের অনুসরণ করবে।

নফসকে ইখলাসের গুণে গুণান্বিত বলে দাবি করতেন না:

মানুষের জীবনে ইখলাস অর্জন করা একটি কঠিন কাজ। একজন মুসলিম ইখলাস অর্জন করতে হলে, তাকে অবশ্যই প্রকৃত জিহাদ করতে হবে। এ কথা জেনেই সালফে সালেহীনরা তাদের

---

[53] জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম: ১৩।

নিজেদের মুখলিস দাবি করা হতে বিরত থাকেন। তারা নিজেরা মুখলিস এ কথা কখনো প্রমাণ করতে চাননি।

হিশাম আত-দোস্তওয়াঈ রহ. বলেন, আমি কখনো এ কথা বলতে পারি না যে, আমি কোন দিন কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হাদিসের সন্ধান করতে বের হয়েছি।[54]

তোমরা কি জান হিশাম আত-দোস্তওয়াঈ কে, যিনি হাদিসের অনুসন্ধানে স্বীয় আত্মাকে দোষারোপ করছে?! তার সম্পর্কে শুবা ইবনুল হুজ্জাজ রহ. বলেন, একমাত্র হিশাম আত-দোস্তওয়াঈ ছাড়া আর কাউকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হাদিস তালাশ করতে আমি দেখিনি।

তার সম্পর্কে শাজ ইবনুল ফাইয়ায রহ. বলেন, হেশাম এত বেশি কাঁদত যে, তার চক্ষুদ্বয় নষ্ট হয়ে যায়।

হিশাম রহ. তার নিজের সম্পর্কে বলেন, যখন আমি বাতি-আলো হারাই ফেলতাম, তখন কবরের অন্ধকারের কথা চিন্তা করতাম।

---

[54] তারিখে ইসলাম: ১৭৫/৩, সীয়ারু আলামুন নুবালা১৫২/৭।

তিনি আরও বলেন, আমি আলেম সম্পর্কে অবাক হই, সে কীভাবে হাসে।[55]

আর সুফিয়ান রহ. বলেন, আমি আমার উপর নিয়তের চেয়ে কঠিন কিছুর সম্মুখীন হই নাই। কারণ, তা আমার উপর বার বার পরিবর্তন হয়।[56]

আর ইউসুফ ইবনুল হুসাইন রহ. বলেন, দুনিয়াতে সর্বাধিক প্রিয় বস্তু হল, ইখলাস। আমি আমার অন্তর থেকে রিয়াকে দূর করার জন্য কতনা পরিশ্রম করে থাকি। কিন্তু তা যেন ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়।[57] মুতার-রাফ বিন আব্দুল্লাহ রহ. এর দু'আ হল,

اللّٰهُمَّ إني أستغفرك مما تبتُ إليك منه ثم عدتُ فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أوفِ لك به، وأستغفرك مما زعمتُ أنني أردتُ به وجهك فخالط قلبي فيه ما قد علمتَ

---

[55] তারিখুল ইসলাম: ১৭৬/৩।

[56] আল-ইখলাস ওয়ান-নিয়্যাহ: ৬৫।

[57] মাদারেজুস সালেকীন: ২০৭/২, শুয়াবুল ইমান: ৭১৬৭,৭১৬৮।

অর্থ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যে গুনাহ হতে তোমার নিকট তাওবা করার পর, তা পুনরায় আবার করেছিলাম। আর আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তুমি আমার উপর যে দায়িত্ব দিয়েছিলে, কিন্তু আমি তা পূরণ করিনি। আর আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি ঐ সব কাজ হতে, যে সব কাজে আমি আমার ধারণা মতে তোমার সন্তুষ্টি কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমার জানা মতে আমার অন্তর অন্য কিছুকে তোমার সাথে শরিক করেছে। তারা ছিলেন, অনুকরণ যোগ্য ইমাম। তা সত্ত্বেও তারা তাদের নিজেদের প্রবৃত্তিকে দোষারোপ করার ব্যাপারে সব মানুষের তুলনায় অধিক কঠোর ছিলেন।

আমলকে গোপন করা:

হাসান বসরি রহ. সালাফদের স্বীয় আমল গোপন রাখার বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন, দেখা যেত তাদের কেউ পুরো কুরআনকে একত্র করত: অথচ তার প্রতিবেশী যারা তারা জানত না। একজন লোক অনেক বেশি ফিকাহ জানত, কিন্তু মানুষের মধ্যে তার কোন সুনাম ছিল না। আবার একজন লোক দেখা গেল, স্বীয় ঘরে দীর্ঘ সময় সালাত আদায় করত, তার ঘরে মেহমান আসত, কিন্তু তারা

জানতে পারত না। জমিনের উপর এমন কোন আমল ছিল না যা গোপনে করা যেত, তা না করে প্রকাশ্যে করা হত। মুসলিমরা বেশি বেশি দু'আ করত, কিন্তু তাদের দু'আর আওয়াজ শোনা যেত না। তাদের আওয়াজ তার মধ্যে ও তার আল্লাহর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةًۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ٥٥ ﴾ [الاعراف: ٥٥]

"তোমরা তোমাদের রবকে ডাক অনুনয় বিনয় করে ও চুপিসারে। নিশ্চয় পছন্দ করেন না সীমালঙ্ঘন কারীদেরকে"।[58]

স্ত্রী ও পরিবার-পরিজন থেকে আমলকে গোপন করা:

হাসান বিন আবু সিনানের স্ত্রী তার স্বামী সম্পর্কে বলেন, সে ঘরে এসে আমার সাথে একসাথে বিছানায় প্রবেশ করত। তারপর সে একজন মহিলা তার বাচ্চাকে ঘুম বানিয়ে যেভাবে উঠে যেত, সেভাবে উঠে গিয়ে আমাকে ধোঁকা দিত। যখন সে বুঝতে পারত, আমি ঘুমিয়ে পড়ছি তখন সে বিছানা থেকে উঠে যেত এবং

---

[58] আয-যুহুদ আল্লামা ইবনুল মুবারক রহ. এর।

সালাত আদায়ে লিপ্ত হত। তিনি বলেন, আমি তাকে বললাম, হে আবু আব্দুল্লাহ! তুমি তোমার নফসকে আর কত কষ্ট দেবে? তোমার আত্মাকে শান্তি দাও। তখন সে বলে, তুমি চুপ কর। হতে পারে আমি এমন একটি ঘুম দেব, তার থেকে আর কখনো জাগবো না।[59]

অনুরূপভাবে দাউদ বিন আবু হিন্দ রহ. চল্লিশ বছর পর্যন্ত রোজা রাখেন কিন্তু তার স্ত্রী জানত না। সকাল বেলা তার স্ত্রী তার জন্য খানা তৈরি করে দিত। কিন্তু রাস্তায় তিনি খানাটি কাউকে দান করে দিতেন এবং সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে ইফতার খেতেন।[60]

জিহাদ চলাকালীন আত্ম-গোপন করা:

জিহাদ এমন একটি যায়গা যেখানে রিয়া করা বা ইখলাস না থাকার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। মুসলিমদের সাথে যারা অস্ত্র বহন করে এবং যুদ্ধ করে, তাদের সবাই মুখলিস হবে এমন কোন কথা নাই। এ কারণে আমরা দেখতে পাই উপরে এমন কতক হাদিস

[59] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ১১৭/৩।

[60] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ১১৭/৩।

উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে জিহাদে নিয়ত খাটি করা ও ইখলাসের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষ তাকিদ দেয়া হয়েছে। আমাদের সালফে সালেহীনদের নিকট জিহাদের মধ্যে ইখলাসের চিত্র ছিল, তারা তাদের জিহাদকে এমন গোপন করতেন, তাদের চেনাই যেত না। জিহাদকে গোপন করা বিষয়ে তোমার নিকট দুটি ঘটনা তুলে ধরা হল।

প্রথম ঘটনা: আবদাহ বিন সুলাইমান রহ. বলেন, একদা আমরা আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের সাথে রুম শহরে একটি যুদ্ধে ছিলাম। আমরা দুশমনদের দেখা পাই। যখন যুদ্ধের ময়দানে দুটি কাতার মুখোমুখি হল, তখন দুশমনদের থেকে এক লোক বের হয়ে, মোকাবেলা করার আহ্বান করলে একজন মুসলিম ব্যক্তি বের হল এবং তার সাথে মোকাবিলা করল তাকে আঘাত করে হত্যা করে ফেলল। তারপর অপর এক লোক বের হল এবং সে চ্যালেঞ্জ চুড়ে দিল। তখন মুসলিমটি তার সাথে মোকাবিলা করল এবং তাকে হত্যা করল। তারপর তৃতীয় ব্যক্তি আসল এবং তাকেও হত্যা করা হল। এরপর লোকেরা মুসলিম ব্যক্তিটিকে জানার জন্য ভিড় করলে, লোকটি তার চেহারা ডেকে ফেলল। আবদা রহ. বলেন,

যারা লোকটিকে চেনার জন্য ভিড় করছিল, আমিও তাদের সাথে ছিলাম। আমি লোকটির জামার একটি হাতা ধরে টান দিলে দেখতে পাই লোকটি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক। তখন তিনি বকা দিয়ে বললেন, এ জন্যই কি চেহারা খোলা হল: হে আবু ওমর তুমি এমন লোক যে আমাদের বিরুদ্ধে বিপদ ডেকে আন!?।[61]

দ্বিতীয় ঘটনা: [পরিখা খননকারীর ঘটনা]: একবার মুসলিম সৈন্যরা দুশমনদের একটি ঘাটি ঘেরাও করে ফেললে, দুশমনরা মুসলিম উপর তীর মারতে আরম্ভ করে। এ অবস্থা দেখে একজন মুসলিম সৈন্য নিজ উদ্যোগে পরিখা খনন আরম্ভ করেন। পরিখা খনন করে সে দুশমনদের দূর্ঘের ভিতরে পৌছতে সক্ষম হয় এবং দুশমনদের বিরুদ্ধে মুসলিমরা বিজয় লাভ করে। কিন্তু লোকটি কে ছিল কেউ তা জানত না। মুসলিম সেনাপতি মাসলামাহ লোকটি পুরস্কার দেয়ার জন্য খোঁজাখুঁজি করছিল। কিন্তু না পেয়ে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, আল্লাহ যাতে লোকটির সন্ধান দেন। রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ল, তখন মাসলামার নিকট একজন আগন্তুক এসে তাকে একটি শর্ত দিয়ে বলল, যদি সে লোকটি

---

[61] তারিখে বাগদাদ: ১৬৭/১০।

সম্পর্কে তাকে সংবাদ দেয়, সে যেন তার পর থেকে আর কোন দিন তাকে তালাশ না করে। তখন মাসলামাহ তার সাথে প্রতিশ্রুতি দিলে, তাকে লোকটি সম্পর্কে জানানো হল, লোকটি কে। মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনুহু সব সময় এ কথা বলত, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পরিখা খননকারীর সাথে হাসর কর।[62]

গ্রাম্য লোক ও গনিমত:

সাদ্দাদ ইবনুল হাদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟! قال « قَسَمْتُهُ لَكَ » قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أُرمى « لَكَ إلى هاهنا -وأشار إلى حلقه- بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال « إِنْ تَصْدُقِ الله يَصْدُقْكَ » فلبثوا قليلا ثم نهضوا

[62] বুস্তানুল খতিব: ২৪।

في قتال العدو، فأُتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « أَهُوَ هوَ » قالوانعم قال صَدَقَ الله فَصَدَقهُ ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته- أي جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته « اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُك، خَرَجَ مُهَاجِراً فِي سَبِيلكِ، فَقُتِلِ شَهِيداً، أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ »

অর্থ, গ্রাম থেকে একজন লোক এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ঈমান আনে এবং তার অনুকরণ করে। তাপর লোকটি বলল, আমি আপনার সাথে হিজরত করব। তার কথা শোনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের তার বিষয়ে অচিয়ত করেন। তারপর কোন একটি যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু গণিমত লাভ করলে, তা তিনি বণ্টন করেন এবং লোকটির জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করা হয়। লোকটি সাথীদের নিকট তার অংশটি সমর্পণ করল। লোকটি তাদের পিছনে থাকত। যখন সে আসল, তাকে তার অংশটি হস্তান্তর করা হলে, সে বলল, এ কি? তারা এটি তোমার অংশ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার জন্য এ অংশ তোমার জন্য নির্ধারণ করেন। লোকটি তার অংশটি নিয়ে রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমার জন্য তোমার অংশ বণ্টন করে দিয়েছি। লোকটি বলল, আমি এ জন্য তোমার অনুকরণ করিনি। কিন্তু আমি তোমার অনুকরণ করেছি যাতে আমি আমার গলায় তীর দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হই। তারপর আমি যখন মারা যাব, তখন জান্নাতে প্রবেশ করব। এ কথা বলার পর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তুমি সত্য বল, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সত্য পরিণত করবে। তারপর সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে কিছু সময় অপেক্ষা করল এবং দুশমনদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াল। তারপর তাকে যুদ্ধের ময়দান থেকে বহন করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে নিয়ে আসা হল, তখন সে যে জায়গাটি ইশারা করে দেখিয়ে ছিল, সে জায়গায় তীরের আঘাত প্রাপ্ত হল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে বলল, সে কি সে লোক? তারা বলল, হ্যাঁ। রাসূল বললেন, লোকটি সত্য বলল, আল্লাহ তা সত্যে পরিণত করলেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার জামার মধ্যে

দাফন করলেন এবং তাকে সামনে এগিয়ে দিলেন এবং তার উপর সালাতে জানাজা আদায় করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালাত আদায়ে যে দোয়া পড়েন তা ছিল-

«اللُّهُمَّ هَذَا عَبْدُك، خَرَجَ مُهَاجِراً فِي سَبيلكَ، فَقُتلَ شَهِيداً، أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ»

হে আল্লাহ! এ তোমার বান্দা, তোমার রাস্তায় হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল অত:পর সে শহীদ হয়ে মৃত্যু বরণ করল। আমি এর উপর সাক্ষী।[63]

লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা হতে ভয়: আলী বিন বুকার আল-বাসরী আয-যাহেদ রহ. বলেন, শয়তানের সাথে সাক্ষাত করা আমার নিকট অমুকের সাথে সাক্ষাত করা হতে অধিক প্রিয়। আমি তার জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করব আর এর কারণে আল্লাহ দৃষ্টি

---

[63] নাসায়ী: ১৯৫৩, হাকেম হাদিসটিকে সহীহ বলেন। আর ইমাম যাহবী রহ. হাদিসটিকে ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী এ কথা বলেন।

হতে দূরে সরে যাব।[64] সালফে সালে-হীনগণ কৃত্রিমতা ও লৌকিকতাকে অধিক ভয় করতেন।

জ্ঞানকে প্রকাশ না করা:

আবুল হাসান আল-কাত্তান হতে ইবনে ফারেস রহ. উল্লেখ করে বলেন, আমার চোখ আক্রান্ত হল, আমার বিশ্বাস আমার আমার সফরে অধিক কথা বলার কারণে শাস্তির সম্মুখীন হই। অর্থাৎ, তার ধারণা যে, তার অসুস্থতা তার ইলমকে প্রকাশ করার শাস্তিস্বরূপ।

ইমাম যাহবী রহ. বলেন, তিনি অবশ্যই সত্য বলেছেন, কারণ, পূর্বেকার মনিষীরা তাদের নিয়ত সঠিক হওয়া ও ইচ্ছা সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও তারা -অধিকাংশ সময়- তারা কথা বলতে, তাদের ইলমকে প্রকাশ করতে ও বুজুর্গি প্রকাশ করতে ভয় করত। কিন্তু বর্তমানে, জ্ঞান কম হওয়া এবং নিয়ত খারাপ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ কথা বেশি বলে। তারপর আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদের

---

[64] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ২৭০/৮।

অপমান করেন, তাদের অজ্ঞতা ও খারাবিকে প্রকাশ করেন তারা যা জানে সে বিষয়ে তাদের ঝগড়া-বিবাদ প্রকাশ করেন।[65]

কান্নাকে গোপন করা:

হাম্মাদ বিন যায়েদ রহ. বলেন, আইউব রহ. যখন কোন হাদিস বর্ণনা করতেন, তখন সে কাঁদত এবং তার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু নির্গত হত। তখন আবরাহ এসে নাক ঝাড়ত এবং বলত, কত সর্দি!! কান্নাকে গোপন করার কারণে সর্দি বের হত।[66]

হাসান বসরী রহ. বলেন, এমন এমন লোক ছিল, যারা মজলিসে বসত, তখন তাদের চোখের পানি আসলে, তারা তা প্রতিহত করতে চেষ্টা করত। কিন্তু তারপরও যখন তারা চোখের পানি বের হওয়া আশঙ্কা করত, তখন তারা মজলিশ থেকে উঠে যেত।

[65] সিয়ারু আলামুন নবালা: ৪৬৪।

[66] সিয়ারু আলামুন নবালা: ৪৬৪।

মুহাম্মাত বিন ওয়াসে রহ. বলেন, এমন লোক ছিল, যে বিশ বছর পর্যন্ত কান্নাকাটি করত অথচ তার স্ত্রী তার সাথে থেকেও তার কান্না সম্পর্কে জানত না। [67]

তিনি আরও বলেন, আমি কতক লোক এমন পেলাম, তাদের চেহারা চোখের পানি দ্বারা ভিজে যেত, কিন্তু একই বালিশে হওয়া সত্ত্বেও তাদের কান্না-কাটি সম্পর্কে তাদের স্ত্রীরা একটুও টের পেত না। আরও কিছু লোক এমন দেখতে পেলাম, তারা একই কাতারে দাঁড়াত, আর তাদের চোখের পানি তাদের চেহারার উপর দিয়ে প্রবাহিত হত, তার পাশের লোক বুঝতে পারত না। [68]

ইমাম আল-মাওয়ারদি ও তার কিতাব লিখা:

ইমাম আল-মাওয়ারদি ও তার কিতাব লিখা বিষয়ে একটি আশ্চর্য ঘটনা বর্ণিত আছে। তিনি তাফসীর, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে একাধিক কিতাবাদি লিখেন। তার কোন কিতাবই তার জীবদ্দশায় প্রকাশ পায়নি। তিনি কিতাব লিখেছেন এবং এমন জায়গায়

---

[67] ইমাম আহমদের যুহুদ: ২৬২।

[68] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ৩৪৭/২।

গোপন করেছেন, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। আর যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হল, সে তার একজন বিশ্বস্ত লোককে ডেকে বলল, অমুক জায়গায় যে কিতাবগুলো আমি দেখছি এ গুলো সবই আমার লিখিত কিতাব। আমি এগুলোকে প্রকাশ করিনি, কারণ আমি নিজেকে খালেস নিয়ত কারী হিসেবে পাইনি। আমি যখন মৃত্যুর মুখোমুখি হই এবং মৃত্যু যন্ত্রণায় পতিত হই, তুমি তোমার হাতকে আমার হাতের উপর রাখবে, যদি আমি এ অবস্থায় মারা যাই তাহলে মনে রাখবে আমার কোন লেখাই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় নাই। তখন তুমি আমার সমস্ত লেখনী গুলো নিয়ে রাতের অন্ধকারে দিজলা নদীতে নিক্ষেপ করবে। আর যদি আমি আমার হাতকে প্রশস্ত করি এবং এ অবস্থায় মারা না যাই তাহলে, তুমি মনে করবে আমার লিখনি আল্লাহর দরবারে তা কবুল হয়েছে এবং আমি আল্লাহর নিকট থেকে যা আশা করেছিল, তাতে আমি কামিয়াব হয়েছি।

লোকটি বলল, যখন তার মৃত্যু ঘনিয়ে এলো, আমি আমার হাতকে তার হাতের উপর রাখি, তখন সে তার হাতকে প্রশস্ত করল এবং আমার হাতে তার মৃত্যু হয়নি। তাতে আমি জানতে পারলাম যে

এ ছিল কবুল হওয়ার আলামত। তারপর আমি তার কিতাবসমূহকে প্রকাশ করলাম।[69]

আলী বিন হুসাইন রহ. এর রাতে দান করা:

জয়নুল আবেদীন আলী বিন হুসাইন রহ. রাতের বেলা তার পিঠের উপর রুটির বস্তা বহন করে মিসকিনদের খুঁজে বেড়াতেন। তিনি বলতেন, রাতের অন্ধকারে সদকা করা আল্লাহর ক্ষোভকে নিবিয়ে দেয়। মদিনাতে কিছু লোক ছিল, তাদের খাবার রাতের বেলায় পৌঁছে যেত; তারা জানত না যে তাদের খাওয়ার কোথা হতে আসত। যখন আলী ইবনুল হুসাইন মারা গেল, তখন তারা তাদের রাতের বেলায় যে খাওয়ার পৌঁছানো হত তা আর পেতো না। তার মৃত্যুর পর তারা তার পিঠে রাতের বেলা আটার বস্তা বহন করার দাগ দেখতে পেল। তিনি একশটি পরিবারের নিকট খাদ্য পৌঁছাত।[70]

---

[69] তারিখে ইসলাম: ১৬৯/৭, সিয়ারু আলামুন নুবালা: ৬৬/১৮।

[70] তাহজীবুল কামাল: ৩৯২/২০, তারিখে দেমশক:৩৮৩/৪১।

এ ধরনের অবস্থা ও ঘটনাবলী যেগুলো তারা গোপন রাখতে চাইতেন, আল্লাহ তা'আলা তা প্রকাশ করে দিতেন, যাতে তারা উম্মতের অনুকরণ যোগ্য ও ইমাম হয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ইখলাসের আলামতসমূহ:

ইখলাসের কতক নিদর্শন আছে যেগুলো একজন মুখলিস বান্দার উপর প্রকাশ পায়। আলেমগণ এ গুলো উল্লেখ করেন।

তারা প্রসিদ্ধি লাভ, প্রশংসা কুড়ানো ও গুণাগুণ করাকে পছন্দ করেন না, তারা দ্বীনের জন্য আমল করতে পছন্দ করেন। তারা নেক আমলের প্রতি প্রতিযোগিতা করেন, আমলের বিনিময় আল্লাহর কাছে চান, তারা ধৈর্য ধারণ করেন, কোন প্রকার অভিযোগ করতে তারা পছন্দ করেন না। তারা তাদের আমলকে গোপন করতে পছন্দ করেন, তারা গোপনে আমল করেন এবং তাদের অধিকাংশ আমল হয়ে থাকে লোক চক্ষুর আড়ালে। তাদের গোপন আমলের সংখ্যা অধিক হয় থাকে প্রকাশ্য আমল থেকে। এগুলো সবই হল, একজন মানুষের মধ্যে ইখলাস থাকার

নিদর্শন। তবে হে মুসলিম ভাই! তোমাকে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ইখলাসের মধ্যে ইখলাসকে প্রত্যক্ষ করে, তখন তার ইখলাসের মধ্যে ইখলাস প্রয়োজন। আল্লাহর নিকট আমাদের কামনা আল্লাহ্ যেন আমাকে এবং তোমাদেরকে মুখলিসদের অন্তর্ভুক্ত করে এবং আমাদের অন্তরকে এবং আমাদের আমলসমূহকে রিয়া ও নিফাক থেকে হেফাজত করে।

ইখলাস বিষয়ে কতক মাসআলা:

আমল প্রকাশ করা কখন বৈধ?

আমরা সালফে সালেহীনদের অবস্থা আমরা উল্লেখ করছি যে, তারা কীভাবে তাদের আমলসমূহকে গোপন করার প্রতি লালায়িত ছিল। আমরা আরও উল্লেখ করেছি যে, ইখলাসের আলামত হল, আমলসমূহকে গোপন করা এবং প্রকাশ না করা। তা সত্ত্বেও কখনো কখনো সময় আমলকে প্রকাশ করা বৈধ হয়ে থাকে এবং তা গোপন করা হতে প্রকাশ করা উত্তম হয়ে থাকে।

আল্লামা ইবনু কুদামাহ রহ. বলেন, পরিচ্ছেদ ইবাদতসমূহ প্রকাশ করার ইচ্ছা করার অনুমতি বিষয়ে বর্ণনা।

তিনি বলেন, আমলকে প্রকাশ করার মধ্যে অনুকরণ করার উপকারিতা রয়েছে এবং মানুষকে কল্যাণের প্রতি উৎসাহ দেয়া। আর কতক আমল আছে, যেগুলো গোপন করার কোন উপায় থাকে না। যেমন- হজ, জিহাদ ইত্যাদি। যিনি আমলকে প্রকাশ করবেন, তাকে অবশ্যই তার অন্তরের দিক লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তার মধ্যে গোপন শিরক অর্থাৎ রিয়ার মহব্বত না থাকে বরং মানুষ তার অনুকরণ করবে, এ কথারই নিয়ত করবে।

বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার জন্য আমরা বলি, আমলকে প্রকাশ করা ও গোপন করার মধ্যে দুটি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: কতক আমল আছে যেগুলো গোপন করা সুন্নত। সেগুলোকে গোপন করবে। যেমন, কিয়ামুল লাইল, সালাতে খুশু।

দ্বিতীয় অবস্থা: কতক আমল আছে, যে গুলো প্রকাশ করা সুন্নত। সেগুলোকে প্রকাশ করবে। যেমন জুমার সালাতের হেফাজত করা, জামাতে সালাত আদায় করা, হকের আওয়াজ তুলে ধরা।

তৃতীয় অবস্থা: কতক আমল আছে যেগুলো গোপন করা ও প্রকাশ করা উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থান করে। প্রকাশ করার কারণে যে ব্যক্তি রিয়ার আশঙ্কা করে সে আমলকে গোপন করবে, আর যে মানুষকে শেখানো বা তারা যাতে তার অনুকরণ করে এ ধরনের ইচ্ছা রাখে সে প্রকাশ করবে।

যেমন, নফল সদকা: কোন মানুষ এ বিশ্বাস রাখে যে, যখন মানুষ তাকে দান করতে দেখবে, তখন তার অন্তরে কিছু হলেও রিয়া ও লৌকিকতা আসবে, তখন তার জন্য উচিত হল, সদকাকে গোপন করা। আর যদি তার উদ্দেশ্য হয়, মানুষ দেখার কারণে সে অনুকরণীয় হবে এবং লোকেরা তাকে দেখে দান করা শিখবে, এবং রিয়াকে সে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে, তাহলে তার জন্য সুন্নত হল, সদকাকে প্রকাশ করা। যেমন, একজন আলেম মসজিদে প্রবেশ করে নফল সালাত আদায় করা দ্বারা মানুষ নফল সালাত আদায় করার পদ্ধতি ও রাকাত সম্পর্কে জানতে পারবে। আমাদের সালফে সালেহীনদের কতক হতে বর্ণিত, তারা তাদের কতক আমলকে প্রকাশ করত, যাতে মানুষ তাদের অনুকরণ করে। যেমন কেউ কেউ মৃত্যু উপস্থিত হলে, তাদের পরিবারকে

বলত, তোমরা আমার উপর কান্না-কাটি করিও না, আমি যেদিন থেকে ইসলাম গ্রহণ করি সেদিন থেকে কোন খারাপ কথা বলিনি। আবু বিন আইয়াশ রহ তার ছেলেকে অসিয়ত করে বলেন, হে ছেলে! এ কামরার মধ্যে আল্লাহর নাফরমানি করা হতে বিরত থাক। কারণ, আমি এ ঘরের মধ্যে বার হাজার বার কুরআন খতম করেছি।[71]

এখানে একটি বিষয় আছে- যে বিষয়টির উপর সতর্ক থাকা খুবই জরুরি। যে ব্যক্তি সব মানুষ থেকে সব ধরনের আমল গোপন করতে বলে, সে অবশ্যই একজন খারাপ লোক- ইসলামকে শেষ করে দিতে চায়। মুনাফেকরা যখন কোন লোককে দেখত বেশি দান করতে দেখত, তখন বলত লোকটি মানুষকে দেখানোর জন্য দান করছে। আর যদি কোন লোক অল্প দান করত, তখন বলত আল্লাহ তা'আলা তোমার এ দানের প্রতি মুখাপেক্ষী নন। তাদের এ সব কথা বলা দ্বারা উদ্দেশ্য, সমাজ হতে ভালো কাজগুলো তুলে দেয়া, যাতে কোন মানুষ নেককার লোকদের অনুকরণ করতে না পারে। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, যখন কোন

[71] মিনহাজুল কাছেদীন: ২২৪।

ভালো লোক তাদের নেক আমল হতে কোন আমলকে প্রকাশ করে, তখন সে মুনাফেকদের পক্ষ থেকে নানাবিধ কষ্টের সম্মুখীন হয়। এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে, তখন মুনাফেকদের নির্যাতনের উপর ধৈর্য ধারণ করতে হবে। তাদের বিরোধিতা, অপবাদ ও নির্যাতনের প্রতি কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না। মনে রাখবে, সে অবশ্যই মহা কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

রিয়ার আশঙ্কায় আমল ছেড়ে দেয়ার বিধান:

ফুজাইল বিন আয়ায রহ. বলেন, মানুষের কারণে আমল ছেড়ে দেয়া রিয়া। আর মানুষের জন্য আমল করা, শিরক। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এ দুটি থেকে ক্ষমা করা ইখলাস।

ইমাম নববী রহ. বলেন, কোন ব্যক্তি কোন একটি ইবাদত করার প্রতিজ্ঞা করল কিন্তু মানুষ তাকে দেখবে এ আশঙ্কায় সে ইবাদত করা ছেড়ে দিল, তাহলে সে একজন রিয়াকারী।

এটি যখন কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আমল করাকে ছেড়ে দেয়। আর যদি কোন ব্যক্তি গোপনে আমল করার উদ্দেশ্যে মানুষের সামনে আমল করা ছেড়ে দেয় তাতে কোন অসুবিধা নাই।

অনেক জাহেল-মূর্খ-যারা তাদের দাড়ি কাটে বা দাড়িকে হলক করে থাকে, রিয়া না করার প্রমাণ দিয়ে। তাদের বিষয়টিও আমাদের এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, তারা বলে-দাড়ি রাখা প্রমাণ করে, দাড়িওয়ালা লোকটি ঈমানের দাবিদার এবং নেককার। [আর এটি রিয়া] এ ধরনের লোকেরা সুস্পষ্ট বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিসসমূহ হতে কোথায় সরে আছে? যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়িকে লম্বা করার নির্দেশ দেন, দাড়িকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ, দাড়িকে হলক না করার নির্দেশ দেন। আল্লাহ তা'আলার নিকট দ্বীনের বিষয়ে দূরদর্শিতা কামনা করি যাতে তিনি আমাদের সঠিক বুঝ দান করেন।

রিয়া করা ও আমলে কাউকে শরিক করার মধ্যে পার্থক্য:

শরয়ী আমল করা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত না করে গাইরুল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন কামনা করাকে রিয়া বলা হয়। আর আমল করা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করার সাথে অন্য কিছুর সন্তুষ্টির নিয়ত করাকে আমলে অংশীদার করা বলে।

উল্লেখিত দুটি বিষয়ের দিক তাকিয়ে আমরা বলি, শরয়ী আমল বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত প্রকার:

প্রথম প্রকার: আমল একমাত্র আল্লাহর জন্য করা আর কোন কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা।

আর এ প্রকার আমল হল, সবোর্চ্চ ও সর্বোত্তম আমল।

দ্বিতীয় প্রকার: আমল আল্লাহর জন্য করবে এবং অন্য কোন বৈধ বিষয়ের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করবে। যেমন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোজা রাখা এবং সাথে সাথে দৈহিক সুস্থতার প্রতিও লক্ষ্য রাখা। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ করতে বের হল এবং সাথে সাথে ব্যবসারও নিয়ত করল।

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশে পায়ে হেটে মসজিদে গমন করে আবার সাথে সাথে শরীর চর্চার নিয়তও করে।

উপরে উল্লেখিত দৃষ্টান্ত গুলোতে যে ধরনের নিয়তের কথা বলা হয়েছে, সে ধরনের নিয়তের কারণে আমল নষ্ট হয় না, তবে

সাওয়াব কম হয়। উত্তম হল আল্লাহর নৈকট্য লাভ ছাড়া আর কোন কিছুর নিয়ত না করা।

তৃতীয় প্রকার:

আমল আল্লাহর জন্যই, কিন্তু আমল দ্বারা এমন কিছু উদ্দেশ্য থাকে বা নিয়ত করে যেগুলোর উদ্দেশ্য থাকা বা নিয়ত করা বৈধ নয়। যেমন, আমল দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, মানুষের প্রশংসা কুড়ানো এবং আমলের বিনিময়ে টাকা-পয়সা উপার্জন করা। এ ধরনের আমলের কয়েকটি অবস্থা হয়ে থাকে:

- যদি আমল শুরু করার আগেই তার অন্তরে এ ধরনের উদ্দেশ্যের উদ্রেক হয় এবং আমল এ উদ্দেশ্যেই করে থাকে, তাহলে এ আমল ফাসেদ তার কোন মূল্য নাই। যেমন কোন ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নফল সালাত আদায় করে।

- আর যদি আমলের মাঝে এ ধরনের চিন্তার উদ্রেক হয়, তখন তাকে প্রতিহত করবে এবং প্রতিরোধ করবে। যেমন, কোন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমল করা শুরু করল, তারপর কাউকে দেখল, একজন লোক তার দিকে তাকাচ্ছে, এ দেখে সে

খুশি হল এবং তাদের প্রশংসা ও সুনামের আশা বা আগ্রহ করল, তারপর সে এ আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহকে প্রতিহত ও প্রতিরোধ করতে করতে সালাত শেষ করল, তাহলে তার আমল বিশুদ্ধ হবে এবং এ ধরনের সংগ্রাম করার কারণে সে বিনিময় পাবে।

- আমল করার মাঝখানে পার্থিব কোন উদ্দেশ্য বা রিয়া দেখা দিল কিন্তু তা প্রতিহত বা প্রতিরোধ কোনটাই করেনি। এ ধরনের অবস্থা আমলকে বাতিল করে দেবে।

চতুর্থ প্রকার:

আমল দ্বারা শরিয়ত ঘোষিত ছাওয়াব ও বিনিময় কোন কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে, এমন কিছু ইচ্ছা করা যার তলব করা বৈধ। যেমন, কোন ব্যক্তি আত্ম-রক্ষার জন্য রোজা রাখল অথবা গণিমতের মালামাল হাসিল করার জন্য জিহাদ করল এবং শুধু মাল বাড়ানোর উদ্দেশ্যে মালের যাকাত দিল। এ ধরনের আমল বাতিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

পঞ্চম প্রকার:

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রতি কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপ না করে, আমল দ্বারা এমন কিছুর ইচ্ছা করা যার তলব শরয়ীভাবে যায়েয নাই। যেমন, শুধু মানুষকে দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা। এ ধরনের আমলকারীর আমল বাতিল এবং সে অপরাধী।

রিয়া হতে দূরে থাকার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়া:

কোন কোন মুসলিম রিয়া হতে দূরে থাকার জন্য মিথ্যা কথা বলা বৈধ বলে দাবি করেন। এটি সম্পূর্ণ ভুল ও অন্যায় কাজ। কারণ, মিথ্যা বলা মুসলিমের চরিত্র হতে পারে না।

যেমন, এক লোক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ বানাল, তারপর যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, সে সরাসরি মিথ্যা কথা বলল; অর্থাৎ, "আমি মসজিদটি নির্মাণ করিনি, অমুক বানিয়েছে" এ ধরনের কথা বলে। এ ক্ষেত্রে সরাসরি মিথ্যা না বলে অস্পষ্ট কোন কথা বলা যেতে পারে। যেমন, বলবে- একজন মুসলিম ভাইয়ের টাকা দিয়ে মসজিদটি বানানো হয়েছে।

কিছু বিষয় আছে মানুষ রিয়া মনে করে কিন্তু বাস্তবে তা রিয়া নয়:

- তোমার ইচ্ছার বাইরে তোমার কোন ভাল কাজের উপর প্রশংসা করা। [এটি রিয়া নয়] বরং এটি মুমিনদের জন্য নগদ সু-সংবাদ।

- ইচ্ছার বাইরে, সুনাম অর্জন করা। যেমন, একজন আলেম বা তালেবে ইলম, যে মানুষকে দ্বীন শিক্ষা দেয়, তাদের দ্বীন বিষয়ে তাদের তালীম দেয়, তাদের বিভিন্ন সমস্যার শরয়ী সমাধান বা ফতওয়া দেয়, তারা কিছুটা হলেও প্রসিদ্ধি পায়। তারা যেন রিয়া থেকে দূরে থাকা দাবি করে এ ধরনের জন কল্যাণমুলক কর্ম হতে বিরত না থাকে। বরং তার উপর কর্তব্য হল, তার মধ্যে যাতে রিয়া বা অহংকার না আসে সে জন্য সংগ্রাম করবে এবং এ ধরনের কর্মগুলো চালিয়ে যাবে।

- কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে তৎপর দেখে, লোকটির মত আল্লাহর ইবাদতে তৎপর হওয়া রিয়া নয়। যদি ইবাদত দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়, তবে সে সাওয়াব পাবে।

- কাপড় সুন্দর রাখা, সুন্দর কাপড় পরিধান করা, সুন্দর জুতা পরিধান করা, সু-গন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি রিয়া নয়।

- গুনাহকে গোপন করা, গুনাহের আলোচনা না করা, রিয়া নয়। বরং আমরা আমাদের নিজেদের অপরাধ বা অন্য কোন ভাইয়ের অপরাধকে গোপন করা বিষয়ে আমরা শরিয়ত কর্তৃক নির্দেশিত। অনেকে ধারণা করে, গুনাহ করে জানিয়ে দেয়া ভাল, তাতে লোকটি মুখলিস বলে প্রমাণিত হয়। এ ধরণের ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক এবং ইবলিসের ধোঁকা বৈই আর কিছুই নয়। কারণ, গুনাহ সম্পর্কে জানানো, মুমিনদের মাঝে অন্যায়কে ছড়ানো বা প্রচার করার নামান্তর।

পরিশিষ্ট

হে মুসলিম ভাই, বর্তমান আমরা এবং উম্মতে মুসলিমাহ যে মহান সংকট ও নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করি, তার থেকে পরিত্রাণ, মুক্তি ও সংশোধনের আমরা এখালাসের খুবই মুখাপেক্ষী।

বর্তমানে আমরা দেখতে পাই অনেক বড় বড় দাওয়াতি সংস্থা, সেবামুলক সংস্থা ঘড়ে উঠেছিল, কিন্তু ইখলাস না থাকার কারণে খুব কম সময়ের মধ্যে সেগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছে। এ সব

সংস্থাসমূহের কোন কোন দায়িত্বশীলের মধ্যে কোন ইখলাস ছিল না তাদের ইচ্ছা ছিল, লোক দেখানো, সুনাম অর্জন ও পার্থিব কোন স্বার্থ হাসিল। ফলে তারা এমন সব কর্মে জড়িত হয়, যার ফলে তাদের সব অর্জন নষ্ট হয়ে যায় এবং সংস্থাগুলো ধ্বংস হয়ে যায়।

প্রতিটি ব্যক্তির জন্য তার আমলে ইখলাস থাকা জরুরি। তবে আফসোস সে ব্যক্তির জন্য যে নিয়তের হাকিকত কি, তা জানে না, সে কিভাবে নিয়তকে ঠিক করবে।

হে আল্লাহ তুমি আমাদের ইখলাস দান কর এবং ইখলাসকে আমাদের অন্তরে অটুট রাখ।

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

অনুশীলনী

আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে নিম্নে দুই ধরনের প্রশ্ন উল্লেখ করা হল। প্রথম প্রকার প্রশ্ন যেগুলোর উত্তর সাথে সাথে দেয়া যায়। এরগুলো হল, প্রথম প্রকার প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রকার প্রশ্ন যেগুলো

চিন্তা ফিকির ও গবেষণা করার দরকার হয়। আর এগুলো হল, দ্বিতীয় প্রকার প্রশ্ন।

প্রথম প্রকার প্রশ্ন:

১- নিয়ত ও ইখলাসের মধ্যে পার্থক্য কি?

২- আমলের মধ্যে ইখলাস ও আমলে সত্যবাদিতা দুটির মধ্যে পার্থক্য কি?

৩- إنما الأعمال بالنيات হাদিসটি কেন সমস্ত হাদিসের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ?

৪- অনেক লোক এমন আছে যাদের মসজিদে অনুপস্থিত কেন? এক কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, ‘আমি সালাতের জামাতে যেতে পছন্দ করি’। এ লোক সম্পর্কে তোমার মতামত কি? সে সত্যিকার অর্থে সালাতের জামাতে হাজির হতে পছন্দ করে?

৫- ইখলাসের উপকারিতা হতে তিনটি উপকারিতা এবং ইখলাস না থাকার ক্ষতিসমূহ হতে তিনটি ক্ষতি উল্লেখ কর।

দ্বিতীয় প্রকার প্রশ্ন:

১- কতক আমল উল্লেখ কর, যাতে বর্তমানে রিয়া ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং এর চিকিৎসা কি ?

২- এমন কিছু স্বাভাবিক কর্মের বর্ণনা কর, যেগুলো নিয়তের কারণে ইবাদতে পরিগণিত হয়।

৩- কতক সালফে সালে-হীনগণ বলেন,

تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد

এ কথাটির অর্থ কি?

৪- এক ব্যক্তি তার সমূহকে মানুষ থেকে গোপন রাখতে চায় এবং আমলে এখলাচ প্রমাণ করতে চায়। ফলে সে সালাতের জামাতে উপস্থিত হয় না যাতে মানুষ এ কথা বলতে না পারে যে, লোকটি জামাতে সালাত আদায় করে। এ ধরনের লোকের আমল সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি?

৫-ইখলাস বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের নাম উল্লেখ কর।

৬-যে সব বিষয়গুলো একজন বান্দাকে ইখলাস বিষয়ে সহযোগিতা করে যেগুলো কি?

৭-সূরা ইখলাসকে কেন এ নামে নাম রাখা হয়েছে?

সূচীপত্র

যে সকল হারামকে মানুষ তুচ্ছ মনে করে থাকে

محرمات استهان بها كثير من الناس يجب الحذر منها

< بنغالي >

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদক: মু. সাইফুল ইসলাম

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

محرمات استهان بها كثير من الناس يجب الحذر منها

الشيخ محمد صالح المنجد

ترجمة: محمد سيف الإسلام

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচিপত্র

১৯.	শর‘ঈ ওযর ব্যতীত স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর শয্যা গ্রহণ অস্বীকার করা	
২০.	শর‘ঈ কারণ ব্যতীত স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করা	
২১.	যিহার	
২২.	মাসিকের সময় স্ত্রী সহবাস করা	
২৩.	পশ্চাৎদ্বার দিয়ে স্ত্রীগমন	
২৪.	স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করা	
২৫.	গায়ের মাহরাম মহিলার সাথে নির্জনে অবস্থান	
২৬.	বিবাহ বৈধ এমন মহিলার সাথে করমর্দন	
২৭.	পুরুষের মাঝে সুগন্ধি মেখে নারীর গমনাগমন	
২৮.	মাহরাম আত্মীয় ছাড়া স্ত্রীলোকের সফর	
২৯.	গায়ের মাহরাম মহিলার প্রতি ইচ্ছাপূর্বক দৃষ্টিপাত করা	
৩০.	দাইয়ূছী	
৩১.	পালক সন্তান গ্রহণ ও নিজ সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করা	
৩২.	সূদ খাওয়া	
৩৩.	বিক্রিত পণ্যের দোষ গোপন করা	
৩৪.	দালালী করা	
৩৫.	জুমু‘আর সালাতের আযানের পরে কেনা-বেচা করা	
৩৬.	জুয়া	
৩৭.	চুরি করা	
৩৮.	জমি আত্মসাৎ করা	
৩৯.	ঘুষ	
৪০.	সুপারিশের বিনিময়ে উপহার গ্রহণ	
৪১.	শ্রমিক থেকে ষোলআনা শ্রম আদায় করে পুরো মজুরী না দেওয়া	
৪২.	সন্তানদের উপহার প্রদানে সমতা রক্ষা না করা	

৪৩.	ভিক্ষাবৃত্তি	
৪৪.	ঋণ পরিশোধে অনীহা প্রকাশ করা	
৪৫.	হারাম ভক্ষণ	
৪৬.	মদ্যপান	
৪৭.	সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার ও তাতে পানাহার করা	
৪৮.	মিথ্যা সাক্ষ্যদান	
৪৯.	বাদ্যযন্ত্র ও গান	
৫০.	গীবত বা পরনিন্দা	
৫১.	চোগলখুরী করা	
৫২.	অনুমতি ব্যতীত অন্যের বাড়ীতে উকি দেওয়া ও প্রবেশ করা	
৫৩.	তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দু'জনে শলাপরামর্শ করা	
৫৪.	টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা	
৫৫.	পুরুষদের স্বর্ণালংকার ব্যবহার করা	
৫৬.	মহিলাদের খাটো, পাতলা ও আঁটসাঁট পোষাক পরিধান করা	
৫৭.	পরচুলা ব্যবহার করা	
৫৮.	পোশাক-পরিচ্ছদ ও কথা-বার্তায় নারী-পুরুষ পরস্পরের বেশ ধারণ	
৫৯.	সাদা চুলে কালো খেযাব ব্যবহার করা	
৬০.	ক্যানভাস, প্রাচীর গাত্র, কাগজ ইত্যাদিতে প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা	
৬১.	মিথ্যা স্বপ্ন বলা	
৬২.	কবরের উপর বসা, কবর পদদলিত করা ও কবরস্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করা	
৬৩.	পেশাবের পর পবিত্র না হওয়া	
৬৪.	লোকদের অনীহা সত্ত্বেও গোপনে তাদের আলাপ শ্রবণ করা	
৬৫.	প্রতিবেশীর সাথে অসদাচরণ করা	

৬৬.	অসীয়ত দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করা	
৬৭.	দাবা খেলা	
৬৮.	কোনো মুসলিমকে অভিশাপ দেওয়া এবং যে অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য নয় তাকে অভিশাপ দেওয়া	
৬৯.	বিলাপ ও মাতম করা	
৭০.	মুখমণ্ডলে আঘাত করা ও দাগ দেওয়া	
৭১.	শর‘ঈ কারণ ব্যতীত তিন দিনের ঊর্ধ্বে কোনো মুসলিমের সাথে সম্পর্কেচ্ছেদ করা	

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের ওপর কিছু জিনিস ফরয করেছেন, যা পরিত্যাগ করা জায়েয নয়, কিছু সীমা বেঁধে দিয়েছেন, যা অতিক্রম করা বৈধ নয় এবং কিছু জিনিস হারাম করেছেন, যার ধারে কাছে যাওয়াও ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا» ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]

"আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল, যা হারাম করেছেন তা হারাম, আর যে বিষয়ে তিনি নীরব থেকেছেন তা ক্ষমা। সুতরাং তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমাকে গ্রহণ কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা বিস্মৃত হন না। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন, 'তোমার রব বিস্মৃত হন না"। [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৬][1]

আর এ হারামসমূহই আল্লাহ তা'আলার সীমারেখা। আল্লাহ বলেন,

﴿تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ﴾ [البقرة: ١٨٧]

"এসব আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা এগুলোর নিকটেও যেয়ো না"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘনকারী ও হারাম অবলম্বনকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভীতিপ্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেছেন,

﴿وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ ١٤﴾ [النساء: ١٤]

---

[1] হাকেম, দারাকুতনী; সিলসিলা সহীহাহ, হাদীস নং ২২৫৬।

“যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশের অবাধ্যতা করে এবং তাঁর সীমারেখাসমূহ লংঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরস্থায়ী হবে। আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪]

এ জন্যেই হারাম থেকে বিরত থাকা ফরয। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»

“আমি তোমাদেরকে যা কিছু নিষেধ করি তোমরা সেসব থেকে বিরত থাক। আর যা কিছু আদেশ করি তা যথাসাধ্য পালন কর”।[2]

লক্ষ্যণীয় যে, প্রবৃত্তিপূজারী, দুর্বলমনা ও স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী কিছু লোক যখন এক সঙ্গে কিছু হারামের কথা শুনতে পায় তখন আঁতকে ওঠে এবং বিরক্তির সুরে বলে, ‘সবই তো হারাম হয়ে গেল। তোমরা তো দেখছি আমাদের জন্য হারাম ছাড়া কিছুই বাকী রাখলে না। তোমরা আমাদের জীবনটাকে সংকীর্ণ করে ফেললে, মনটাকে বিষিয়ে দিলে! জীবনটা একেবারে মাটি হয়ে গেল। কোনো কিছুর সাধ আহ্লাদই আমরা ভোগ করতে পারলাম না। শুধু হারাম হারাম ফতওয়া দেওয়া ছাড়া তোমাদের দেখছি আর কোনো কাজ নেই। অথচ আল্লাহর দীন সহজ-সরল। তিনি নিজেও ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর শরী‘আতের গণ্ডিও ব্যাপকতর। সুতরাং হারাম এত সংখ্যক হতে পারে না।’

এদের জবাবে আমরা বলব, ‘আল্লাহ তা‘আলা যা ইচ্ছা আদেশ করতে পারেন। তাঁর আদেশকে খণ্ডন করার কেউ নেই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। সুতরাং তিনি যা ইচ্ছা হালাল করেছেন এবং যা ইচ্ছা হারাম করেছেন। তিনি পবিত্র। আল্লাহর দাস হিসেবে আমাদের নীতি হবে তাঁর আদেশের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেওয়া। কেননা তাঁর দেওয়া বিধানাবলী জ্ঞান,

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৩৭ ‘ফাযায়েল’ অধ্যায়।

প্রজ্ঞা ও ইনছাফ মোতাবেকই প্রকাশ পেয়েছে। সেগুলো নিরর্থক ও খেলনার বস্তু নয়। যেমন, তিনি বলেছেন,

﴿وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقٗا وَعَدۡلٗاۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ١١٥﴾ [الانعام: ١١٥]

"তোমার রবের বাণী সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ হলো। তাঁর বাণীসমূহকে পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১১৫]

যে নিয়মের ভিত্তিতে হালাল-হারাম নির্ণিত হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তাও আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ﴾ [الاعراف: ١٥٧]

"তিনি পবিত্র বস্তুকে তাদের জন্য হালাল এবং অপবিত্র বস্তুকে হারাম করেন।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৫৭]

সুতরাং যা পবিত্র তা হালাল এবং যা অপবিত্র তা হারাম। কোনো কিছু হালাল ও হারাম করার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই। কোনো মানুষ নিজের জন্য তা দাবী করলে কিংবা কেউ তা অন্যের জন্য সাব্যস্ত করলে সে হবে একজন বড় কাফির ও মুসলিম উম্মাহ বহির্ভূত ব্যক্তি। আল্লাহ বলেন,

﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾ [الشورى: ٢١]

"তবে কি তাদের এমন সব উপাস্য রয়েছে, যারা তাদের জন্য দীনের এমন সব বিধান দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ দেন নি?" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ২১]

কুরআন-হাদীসে পারদর্শী আলেমগণ ব্যতীত হালাল-হারাম সম্পর্কে কথা বলার অধিকার অন্য কারো নেই। যে ব্যক্তি না জেনে হালাল-হারাম সম্পর্কে কথা বলে আল-কুরআনে তার সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ﴾ [النحل: ١١٦]

“তোমাদের জিহ্বায় মিথ্যা উচ্চারিত হয় বলে তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপের মানসে যেন না বলো যে, এটা হালাল, ওটা হারাম”। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১১৬]

যেসব বস্তু অকাট্যভাবে হারাম তা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ আছে। যেমন, আল্লাহ বলেছেন:

﴿قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗاۖ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَٰقٖ﴾ [الانعام: ١٥١]

“আপনি বলুন, এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ওপর যা হারাম করেছেন তা পড়ে শুনাই। তোমরা তার সঙ্গে কাউকে শরীক করো না, মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করবে আর দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না”। [সূরা আল-আন‘আম ১৫১]

অনুরূপভাবে হাদীসেও বহু হারাম জিনিসের বিবরণ এসেছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»

“আল্লাহ তা‘আলা মদ, মৃত প্রাণী, শূকর ও মূর্তি কেনা-বেচা হারাম করেছেন”।[৩]

অপর হাদীসে এসেছে,

«إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»

“আল্লাহ যখন কোনো কিছু হারাম করেন তখন তার মূল্য তথা কেনা-বেচাও হারাম করে দেন”।[৪]

কোনো কোনো আয়াতে কখনো একটি বিশেষ শ্রেণির হারামের আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, হারাম খাদ্যদ্রব্য প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন:

---

[3] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৪৮৬, সনদ সহীহ।

[4] দারাকুতনী; ইবন হিব্বান হাদীস নং ৪৯৩৮, সনদ সহীহ।

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ﴾ [المائدة: ٣]

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের গোশত, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহকৃত প্রাণী, গলা টিপে হত্যাকৃত প্রাণী, পাথরের আঘাতে নিহত প্রাণী, উপর থেকে নিচে পড়ে গিয়ে মৃত প্রাণী, শিং এর আঘাতে মৃত প্রাণী, হিংস্র প্রাণীর ভক্ষিত প্রাণী। অবশ্য (উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলোতে যে সব হালাল প্রাণীকে) তোমরা যবেহ করতে সক্ষম হও সেগুলো হারাম হবে না। আর (তোমাদের জন্য হারাম) সেইসব প্রাণীও যেগুলো পূজার বেদীমূলে যবেহ করা হয় এবং ভাগ্য নির্ণায়ক তীরের সাহায্যে যে গোশত তোমরা বন্টন কর"। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৩]

হারাম বিবাহ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]

"তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে তামাদের মাতৃকুল, কন্যাকুল, ভগ্নিকুল, ফুফুকুল, খালাকুল, ভ্রাতুষ্পুত্রীকুল, ভগ্নিকন্যাকুল, স্তন্যদাত্রী মাতৃকুল, স্তন্যপান সম্পর্কিত ভগ্নীকুল ও শাশুড়ীদেরকে"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২৩]

উপার্জন বিষয়ক হারাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟﴾ [البقرة: ٢٧٥]

"আল্লাহ তা'আলা কেনা-বেচা হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন'। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫]

বস্তুতঃ মানুষের প্রতি পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সংখ্যা ও শ্রেণিগতভাবে এত পবিত্র জিনিস হালাল করেছেন যে, তা গননা করে শেষ

করা সম্ভব নয়। এ কারণেই তিনি হালাল জিনিসগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেন নি। কিন্তু হারামের সংখ্যা যেহেতু সীমিত এবং সেগুলো জানার পর মানুষ যেন তা থেকে বিরত থাকতে পারে সেজন্য তিনি তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِۗ﴾ [الانعام: ١١٩]

"তিনি তোমাদের ওপর যা হারাম করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ তোমাদেরকে দান করেছেন। তবে তোমরা যে হারামটা বাধ্য হয়ে বা ঠেকায় পড়ে করে ফেল তা ক্ষমার্হ"। [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১১৯]

হারামকে এভাবে বিস্তারিত পেশের কথা বললেও হালালকে কিন্তু সংক্ষেপে সাধারণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا﴾ [البقرة: ١٦٨]

"হে মানবকুল! তোমরা যমীনের বুকে যা কিছু হালাল ও উৎকৃষ্ট সেগুলো খাও।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৮]

হারামের দলীল সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত সব জিনিসের মূল হুকুম হালাল হাওয়াটা মহান আল্লাহর পরম করুণা। এটা মহান আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর বান্দাদের ওপর সহজীকরণের নিদর্শনস্বরূপ। সুতরাং তাঁর আনুগত্য প্রকাশ, প্রশংসা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করা আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য।

কিন্তু পূর্বোল্লিখিত ঐসব লোক যখন তাদের সামনে হারামগুলো বিস্তারিত দেখতে পায় তখন শরী'আতের বিধি বিধানের ব্যাপারে তাদের মন সংকীর্ণতায় ভোগে। এটা তাদের ঈমানী দুর্বলতা ও শরী'আত সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতার ফসল।

আসলে তারা কি চায় যে, হালালের শ্রেণিবিভাগগুলোও তাদের সামনে এক এক করে গণনা করা হোক; যাতে তারা দীন যে একটা সহজ বিষয় তা জেনে আত্মতৃপ্ত হতে পারে?

তারা কি চায় যে, নানা শ্রেণির পবিত্র জিনিসগুলো তাদের এক এক করে তুলে ধরা হোক, যাতে তারা নিশ্চিত হতে পারে যে, শরী'আত তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে দেয় নি? তারা কি চায় যে এভাবে বলা হোক?

- উট, গরু, ছাগল, খরগোশ, হরিণ, পাহাড়ী ছাগল, মুরগী, কবুতর, হাঁস, রাজহাঁস, উটপাখি ইত্যাকার যবেহ করার মত যবেহকৃত প্রাণীর গোশত হালাল।

- মৃত পঙ্গপাল ও মাছ হালাল।

-শাক-সবজি, ফলমূল, সকল দানাশস্য ও উপকারী ফল-ফুল হালাল। পানি, দুধ, মধু তেল ও শিরকা হালাল। লবণ, মরিচ ও মসলা হালাল।

-লোহা, বালু, খোয়া, প্লাস্টিক, কাঁচ ও রাবার ইত্যাদি ব্যবহার হালাল।

-খাট, চেয়ার, টেবিল, সোফা, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদি ব্যবহার হালাল।

-জীবজন্তু, মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী, নৌকা, জাহাজ ও বিমানে আরোহণ হালাল।

-এয়ারকন্ডিশন, রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন, পানি শুকানোর যন্ত্র, পেষণ যন্ত্র, আটা খামির করার যন্ত্র, কিমা তৈরীর যন্ত্র, নির্মাণ বিষয়ক যন্ত্রপাতি, হিসাব রক্ষণ, পর্যবেক্ষণ যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার এবং পানি, পেট্রোল, খনিজদ্রব্য উত্তোলন ও শোধন, মুদ্রণ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি হালাল।

-সূতী, কাতান, পশম, নাইলন, পলেস্টার ও বৈধ চামড়ার তৈরি বস্ত্র হালাল।

-বিবাহ, বেচা-কেনা, যিম্মাদারী, চেক, ড্রাফট, মনিঅর্ডার, ইজারা বা ভাড়া প্রদান হালাল।

-বিভিন্ন পেশা যেমন কাঠমিস্ত্রীগিরি, কর্মকারগিরি, যন্ত্রপাতি মেরামত, ছাগলপালের রাখালী ইত্যাদি হালাল।

এভাবে গুনলে আর বর্ণনা করলে পাঠকের কি মনে হয় আমরা হালালের ফিরিস্তি দিয়ে শেষ করতে পারব? তাহলে এসব লোকের কি হলো যে, তারা কোনো কথাই বুঝতে চায় না?

দীন যে সহজ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবুও একথা বলে যারা সব কিছুই হালাল প্রমাণ করতে চায়, তাদের কথা সত্য হলেও কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য

খারাপ। কেননা দীনের মধ্যে কোনো কিছু মানুষের মর্যি মাফিক সহজ হয় না। তা কেবল শরী'আতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই নির্ধারিত হবে। অপর দিকে 'দীন সহজ' এরূপ দলীল দিয়ে হারাম কাজ করা আর শরী'আতের অবকাশমূলক দিক গ্রহণ করার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। অবকাশমূলক কাজের উদাহরণ হলো সফরে দু'ওয়াক্তের সালাত একত্রে পড়া, কসর করা, সফরে সিয়াম ভঙ্গ করা, মুকীমের জন্য একদিন এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিন রাত মোজার উপর মাসেহ করা, পানি ব্যবহারের অসুবিধা থাকলে তায়াম্মুম করা, অসুস্থ হলে কিংবা বৃষ্টি নামলে দু'ওয়াক্তের সালাত একত্রে পড়া, বিবাহের প্রস্তাবদাতার জন্য গায়ের মাহরাম মহিলাকে দেখা, শপথের কাফফারায় দাস মুক্তি, আহার করানো, বস্ত্র দান, ছিয়াম পালনের যে কোনো একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৮৯], নিরূপায় হলে মৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করা ইত্যাদি।

মোটকথা, শরী'আতে যখন হারাম আছে তখন সকল মুসলিমের জন্যই তার মধ্যে যে গূঢ় রহস্য বা তত্ত্ব লুকিয়ে আছে তা জানা দরকার। যেমন,

(১) আল্লাহ তা'আলা হারাম দ্বারা তার বান্দাদের পরীক্ষা করেন। তারা এ সম্পর্কে কেমন আচরণ করে তা তিনি লক্ষ্য করেন।

(২) কে জান্নাতবাসী হবে আর কে জাহান্নামবাসী হবে হারামের মাধ্যমে তা নির্ণয় করা চলে। যারা জাহান্নামী তারা সর্বদা প্রবৃত্তির পূজায় মগ্ন থাকে, যা দিয়ে জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে। আর যারা জান্নাতী তারা দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে, যে, দুঃখ-কষ্ট দিয়ে জান্নাতকে বেষ্টন করে রাখা হয়েছে। এ পরীক্ষা না থাকলে বাধ্য থেকে অবাধ্যকে পৃথক করা যেত না।

(৩) যারা ঈমানদার তারা হারাম ত্যাগজনিত কষ্ট সহ্য করাকে সাক্ষাৎ পূণ্য এবং আল্লাহ তা'আলার যে কোনো নির্দেশ পালনকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উপায় বলে মনে করে। ফলে কষ্ট স্বীকার করা তাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা কপট ও মুনাফিক্ব তারা কষ্ট সহ্য করাকে যন্ত্রণা, বেদনা ও

বঞ্চনা বলে মনে করে। ফলে ইসলামের পথে চলা তাদের জন্য কঠিন এবং সৎ কাজ সম্পাদন ও আনুগত্য স্বীকার করা ততধিক কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

(৪) একজন সৎ লোক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে হারাম পরিহার করলে বিনিময়ে তার চেয়ে যে উত্তম কিছু পাওয়া যায় তা ভালোমত অনুধাবন করতে পারে। এভাবে সে তার মনোরাজ্যে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে।

আলোচ্য পুস্তকের মধ্যে সম্মানিত পাঠক শরী'আতে হারাম বলে গণ্য এমন কিছু সংখ্যক নিষিদ্ধ বিষয়ের বিবরণ পাবেন কুরআন-সুন্নাহ থেকে সেগুলো হারাম হওয়ার দলীলসহ। এসব হারাম এমনই যা আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বহুসংখ্যক মুসলিম নির্দ্বিধায় তা হরহামেশা করে চলেছে। আমরা কেবল মানুষের কল্যাণ কামনার্থে তাদের সামনে এগুলো তুলে ধরেছি অতি সংক্ষেপে।

১- শির্ক

আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা যে কোনো বিচারে সবচেয়ে বড় হারাম ও মহাপাপ। আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ...»

"আমি কি তোমাদেরকে বৃহত্তম কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না (তিনবার)? সাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই বলবেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শির্ক করা .....”।[৫]

শির্ক ব্যতীত প্রত্যেক পাপের ক্ষেত্রেই আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা প্রাপ্তির একটি সম্ভাবনা আছে। তাওবাই শির্কের একমাত্র প্রতিকার। আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾ [النساء: ٤٨]

---

[5] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৭৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৭।

“নিশ্চয় আল্লাহ তার সঙ্গে কৃত শির্ককে ক্ষমা করবেন না। তাছাড়া যত গুনাহ আছে তা তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮]

এমন বড় শির্ক রয়েছে যা দীন ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। এরূপ শির্ককারী ব্যক্তি যদি ঐ অবস্থায় মারা যায় তাহলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, অনেক মুসলিম দেশেই আজ শির্কের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়ছে।

২. কবরপূজা

মৃত ওলী-আউলিয়া মানুষের অভাব পূরণ করেন, বিপদাপদ দূর করেন, তাঁদের অসীলায় সাহায্য প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করা যাবে ইত্যাকার কথা বিশ্বাস করা শির্ক। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾ [الاسراء: ٢٣]

“তোমার রব চূড়ান্ত ফয়সালা দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না”। [সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৩]

অনুরূপভাবে শাফা‘আতের নিমিত্তে কিংবা বালা-মুসীবত থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মৃত-নবী-ওলী প্রমুখের নিকট দো‘আ করাও শির্ক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجۡعَلُكُمۡ خُلَفَآءَ ٱلۡأَرۡضِۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ﴾ [النمل: ٦٢]

“বল তো কে নিঃসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে আহ্বান জানায় এবং দুঃখ-কষ্ট দূর করেন আর পৃথিবীতে তোমাদেরকে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন? আল্লাহর সঙ্গে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২]

অনেকেই উঠতে, বসতে বিপদাপদে পীর মুরশিদ, ওলী-আউলিয়া, নবী-রাসূল ইত্যাকার মহাজনদের নাম নেওয়া অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে। যখনই তারা কোনো বিপদে বা কষ্টে বা সংকটে পড়ে তখনই বলে ইয়া মুহাম্মাদ, ইয়া আলী,

ইয়া হুসাইন, ইয়া বাদাভী, ইয়া জীলানী, ইয়া শাযেলী, ইয়া রিফা'ঈ। কেউ যদি ডাকে 'আইদারূসকে তো অন্যজন ডাকে মা যায়নাবকে, আরেকজন ডাকে ইবন উলওয়ানকে। অথচ আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمۡثَالُكُمۡۖ ﴾ [الاعراف: ١٩٤]

"আল্লাহ ব্যতীত আর যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তোমাদেরই মত দাস"। [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৯৪]

কিছু কবরপূজারী আছে যারা কবরকে তাওয়াফ করে, কবরগাত্র চুম্বন করে, কবরে হাত বুলায়, লাল শালুতে মাথা ঠেকিয়ে পড়ে থাকে, কবরের মাটি তাদের গা-গতরে মাখে, কবরকে সাজদাহ করে, তার সামনে মিনতিভরে দাঁড়ায়, নিজের উদ্দেশ্য ও অভাবের কথা তুলে ধরে। সুস্থতা কামনা করে, সন্তান চায় অথবা প্রয়োজনাদি পূরণ কামনা করে। অনেক সময় কবরে শায়িত ব্যক্তিকে ডেকে বলে, 'বাবা হুযুর, আমি আপনার হুযূরে অনেক দূর থেকে হাযির হয়েছি। কাজেই আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না'। অথচ আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسۡتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَهُمۡ عَن دُعَآئِهِمۡ غَٰفِلُونَ ٥﴾ [الاحقاف: ٥]

"তাদের থেকে অধিকতর দিক ভ্রান্ত আর কে আছে, যারা আল্লাহ ব্যতীত এমন সব উপাস্যকে ডাকে যারা কিয়ামত পর্যন্তও তাদের ডাকে সাড়া দেবে না। অধিকন্তু তারা ওদের ডাকাডাকি সম্বন্ধে কোনো খবর রাখে না।" [সূরা আল-আহক্বাফ, আয়াত: ৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ»

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে তার সমকক্ষ বা অংশীদার মনে করে তাকে আহ্বান করে, আর ঐ অবস্থায় (ঐ কাজ থেকে তাওবা না করে) মারা যায় তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে”।[৬]

কবর পূজারীরা অনেকেই কবরের পাশে মাথা মুণ্ডন করে। তারা অনেকে ‘মাযার যিয়ারতের নিয়মাবলী’ নামের বই সাথে রাখে। এসব মাযার বলতে তারা ওলী আউলিয়া বা সাধু-সন্তানদের কবরকে বুঝে থাকে। অনেকের আবার বিশ্বাস, ওলী আউলিয়াগণ সৃষ্টিজগতের ওপর প্রভাব খাটিয়ে থাকেন, তাঁরা ক্ষতিও করেন; উপকারও করেন। অথচ আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يُرِدۡكَ بِخَيۡرٖ فَلَا رَآدَّ لِفَضۡلِهِۦۚ﴾ [يونس: ١٠٧]

“আর যদি আপনার রব্ব আপনাকে কোনো অমঙ্গলের স্পর্শে আনেন, তবে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ সেটার বিমোচনকারী নেই। আর যদি তিনি আপনার কোনো মঙ্গল করতে চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহকে তিনি ব্যতীত রূখবারও কেউ নেই”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৭]

একইভাবে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে মান্নত করাও শির্ক। মাযার ও দরগার নামে মোমবাতি, আগরবাতি মান্নত করে অনেকেই এরূপ শির্কে জড়িয়ে পড়েন।

৩. গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে পশু যবেহ ও বলি দেওয়া শির্কে আকবর বা বড় শির্ক-এর অন্যতম। আল্লাহ বলেন,

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ۝٢﴾ [الكوثر: ٢]

“আপনার প্রভূর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং যবেহ করুন” [সূলা আল-কাওসার, আয়াত: ২]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

[6] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪৯৭।

«لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ»

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ করে তার ওপর আল্লাহর লা‘নত”।[৭]

যবেহ-এর সঙ্গে জড়িত হারাম দু’প্রকার। যথা:

১. আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে যবেহ করা। যেমন, দেবতার কৃপা লাভের জন্য।

২. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নাম নিয়ে যবেহ করা। উভয় প্রকার যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া হরাম।

জাহেলী আরবে জিনের উদ্দেশ্যে প্রাণী যবেহ-এর রেওয়াজ ছিল, যা আজও বিভিন্ন আঙ্গিকে কোনো কোনো মুসলিম দেশে চালু আছে। সে সময়ে কেউ বাড়ী ক্রয় করলে কিংবা তৈরি করলে অথবা কূপ খনন করলে তাদের ওপর জিন্নের উপদ্রব হতে পারে ভেবে পূর্বাহ্নেই তারা সেখানে বা দরজার চৌকাঠের উপরে প্রাণী যবেহ করত। এরূপ যবেহ সম্পূর্ণরূপে হারাম।

৪. হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল মনে করা

কোনো কিছু হালাল কিংবা হারাম করার একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কোনো মানুষ আল্লাহর দেওয়া হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করার অধিকার রাখে না। তবুও অনধিকার চর্চা বশে মানুষ কর্তৃক আল্লাহকৃত হালালকে হারাম ও হারামকে হালালকরণের বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। নিঃসন্দেহে এটি একটি হারাম কাজ। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হালাল হারাম করার অধিকার আছে বলে বিশ্বাস করাও শির্ক। জাহেলী তথা অনৈসলামী আইন-কানূন দ্বারা পরিচালিত বিচারালয়ের নিকট সন্তুষ্টচিত্তে, স্বেচ্ছায় ও বৈধ জ্ঞানে বিচার প্রার্থনা করা এবং এরূপ বিচার প্রার্থনার বৈধতা আছে বলে আকীদা

[7] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৭৮; মিশকাত, হাদীস নং ৪০৭০।

পোষণ করা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এ মারাত্মক শির্ক প্রসঙ্গে বলেন,

﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١]

"আল্লাহর পরিবর্তে তারা তাদের আলেম ও সাধু-দরবেশদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে"। [সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৩১]

আদী ইবন হাতেম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আল্লাহর নবীকে এ আয়াত পাঠ করতে শুনে বলেছিলেন, "ওরা তো তাদের ইবাদত করে না'। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

«أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ»

'তা বটে। কিন্তু আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারা ওদেরকে তা হালাল করে দিলে ওরা তা হালালই মনে করে। একইভাবে আল্লাহ যা হালাল করেছেন তারা ওদেরকে তা হারাম করে দিলে ওরা তা হারামই মনে করে।"[৮]

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুশরিকদের আচরণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

﴿وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ﴾ [التوبة: ٢٩]

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তারা তাকে হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দ্বীনকে তাদের দীন হিসাবে গ্রহণ করে না"। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৯]

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿قُلۡ أَرَءَيۡتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزۡقٖ فَجَعَلۡتُم مِّنۡهُ حَرَامٗا وَحَلَٰلٗا قُلۡ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمۡۖ أَمۡ عَلَى ٱللَّهِ تَفۡتَرُونَ ۝٥٩﴾ [يونس: ٥٩]

"আপনি বলুন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে রূযী দান করেছেন, তন্মধ্যে তোমরা যে সেগুলোর কতক হারাম ও কতক হালাল করে নিয়েছ, তা কি

---

[৮] তিরমিযী, হাদীস নং ৩০৯৫, সনদ হাসান।

তোমরা ভেবে দেখেছ? আপনি বলুন, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এতদ্বিষয়ে অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর নামে মনগড়া কথা বলছ?” [সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৯]

৫. জাদু ও ভাগ্যগণনা

জাদু ও ভাগ্যগণনা কুফর ও শির্কের পর্যায়ভুক্ত হারাম। জাদু তো পরিষ্কার কুফর এবং সাতটি ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহের অন্যতম। জাদু শুধু ক্ষতিই করে, কোনো উপকার করে না। জাদু শিক্ষা করা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْۚ﴾ [البقرة: ١٠٢]

“তারা এমন জিনিস (জাদু) শিক্ষা করে, যা তাদের অপকারই করে, কোনো উপকার করে না”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১০২]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَلَا يُفۡلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيۡثُ أَتَىٰ ۝٦٩﴾ [طه: ٦٩]

“জাদুকর যেভাবেই আসুক না কেন সে সফল হবে না”। [সূরা ত্বোয়াহা, আয়াত: ৬৯]

জাদু চর্চাকারী কাফের। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلۡمَلَكَيۡنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡۖ﴾ [البقرة: ١٠٢]

“সুলায়মান কুফুরী করেন নি। কিন্তু কুফুরী করেছে শয়তানেরা। তারা মানুষকে শিক্ষা দেয় জাদু এবং বাবেলে হারূত-মারূত নামের দু’জন মালাকের ওপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তা। ঐ ফিরিশতাদ্বয় কাউকে একথা না বলে কিছু শিক্ষা দেয় না যে, আমরা এক মহাপরীক্ষার জন্য। সুতরাং তুমি (জাদু শিখে) কুফুরী করো না”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১০২]

ইসলামী বিধানে জাদুকরকে হত্যা করার কথা বলা হয়েছে। জাদুকরের উপর্জন অপবিত্র ও হারাম। জ্ঞানপাপী, অত্যাচারী ও দুর্বল ঈমানের লোকেরা অন্যের সঙ্গে শত্রুতা ও জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য জাদুকরদের নিকটে যায়।

অনেকে আবার জাদুর ক্রিয়া দূর করার জন্য জাদুকরের শরণাপন্ন হয়। এজন্যে যাওয়াও হারাম। বরং তাদের উচিত ছিল আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়া এবং আল্লাহর কালাম যেমন সূরা নাস, ফালাক ইত্যাদি দিয়ে আরোগ্য লাভের চেষ্টা করা।

গণক ও ভবিষ্যদ্বক্তা উভয়েই আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকারকারী কাফিরদের দলভুক্ত। কারণ, তারা উভয়েই গায়েবের কথা জানার দাবী করে। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না।

অনেক সময় তারা সরলমনা লোকদের সম্পদ লুটে নেওয়ার জন্য তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে। এজন্য তারা বালুর উপর আঁকি-বুকি, চটা (বাটি বা থালা) চালান, হাতের তালুতে ফুঁক, চায়ের পেয়ালা, কাঁচের গুলী, আয়না ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করে থাকে। এসব লোকের কথা একটা যদি সত্য হয় তো নিরানব্বইটাই হয় মিথ্যা। কিন্তু গাফিলরা এসব ধোঁকাবাজ- মিথ্যুকদের এক সত্যকেই হাযার সত্য গণ্য করে নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য, বিয়ে-শাদী, ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভাশুভ তাদের নিকট জানতে চায়। তারা হারানো জিনিস কোথায় কীভাবে পাওয়া যাবে তা জানার জন্য তাদের নিকটে ছুটে যায়। যারা তাদের কাছে গিয়ে তাদের কথা বিশ্বাস করে, তারা কাফের এবং ইসলাম থেকে বহির্ভূত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»

“যে ব্যক্তি গণক কিংবা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, সে নিশ্চিতভাবেই মুহাম্মাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তা অস্বীকার করে।”[৯]

যে ব্যক্তি তারা গায়েব জানে না বলে বিশ্বাস করে কিন্তু অভিজ্ঞতা কিংবা অনুরূপ কিছু অর্জনের জন্য তাদের নিকটে যায় সে কাফির হবে না বটে, তবে তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»

“যে ব্যক্তি কোনো ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে যায় এবং তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবে না”।[১০] তবে তাকে সালাত অবশ্যই আদায় করতে হবে এবং বিশেষভাবে তওবা করতে হবে।

৬. রাশিফল ও মানব জীবনের ওপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কিত বিশ্বাস

যায়েদ ইবন খালিদ আল-জুহানী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, হুদায়বিয়াতে এক রাতে আকাশ থেকে বৃষ্টি নাযিল হয়। সেদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর সালাত শেষে লোকদের দিকে ফিরে বসেন এবং বলেন, ‘তোমাদের রব কী বলেছেন তা কি তোমরা জান? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, ‘আমার কিছু বান্দা আমার ওপর বিশ্বাসী হয়ে এবং কিছু বান্দা অবিশ্বাসী হয়ে ভোরে উপনীত হয়েছে। যারা বলে, আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে বৃষ্টি হয়েছে তারা আমার প্রতি বিশ্বাসী ও গ্রহ-নক্ষত্রে অবিশ্বাসী। আর যারা বলে, অমুক অমুক গ্রহের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে তারা আমার প্রতি অবিশ্বাসী ও গ্রহ-নক্ষত্রে বিশ্বাসী।”[১১]

---

[9] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৯৫৩২; সিলসিলা সহীহাহ, হাদীস নং ৩৩৮৭।

[10] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৩০; মিশকাত, হাদীস নং ৪৫৯৫।

[11] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৪৬; মিশকাত, হাদীস নং ৪৫৯৬।

গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হওয়ার কথা বিশ্বাস করা যেমন কুফুরী, তেমনি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রাশিফলের আশ্রয় নেওয়াও কুফুরী। যে ব্যক্তি রাশিফলের ওপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের কথা বিশ্বাস করবে, সে সরাসরি মুশরিক হয়ে যাবে। পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকে রাশিফলের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে সেগুলো পাঠ করা শির্ক। তবে বিশ্বাস না করে কেবল মানসিক সান্তনা অর্জনের জন্য পড়লে তাতে শির্ক হবে না বটে; কিন্তু সে গোনাহগার হবে। কেননা শির্কী কোনো কিছু পাঠ করে সান্ত্বনা লাভ করা বৈধ নয়। তাছাড়া শয়তান কর্তৃক তার মনে উক্ত বিশ্বাস জন্মিয়ে দিতে কতক্ষণ? তখন এ পড়াই তার শির্কের মাধ্যম হয়ে দাঁড়াবে।

৭. স্রষ্টা যেসব বস্তুতে যে কল্যাণ রাখেন নি তাতে সে কল্যাণ থাকার আকীদা পোষণ করা

আল্লাহ তা'আলা এ বিশ্ব ও তার মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি যে কল্যাণ যে বস্তুর মধ্যে রাখেন নি, ঐ বস্তু সেই উপকারই করতে পারে বলে অনেকে বিশ্বাস করে। এরূপ বিশ্বাস শির্কের পর্যায়ভুক্ত। যেমন, বহু লোক তাবীয-তুমার, শির্কী ঝাড়-ফুঁক, বিভিন্ন প্রকার তাগা ও খনিজ পাথর ব্যবহার করে থাকে। তাদের বিশ্বাস, এতে রোগ-বালাই কাছে ভিড়তে পারে না। আর যদি রোগ হয়েই থাকে তবে এগুলো ব্যবহারে সুস্থতা ফিরে আসে। এগুলো ব্যবহারের পিছনে গণক, জাদুকর প্রমুখ শ্রেণির পরামর্শ অথবা যুগ পরম্পরায় চলে আসা বিশ্বাস কাজ করে।

অনেকে বদ নযর এড়ানোর জন্য বাচ্চা ও বড়দের গলায় এসব ঝুলিয়ে দেয়, শরীরের অন্যত্রও বেঁধে রাখে (যেমন গলা, হাত ও কোমরে)। গাড়ী-বাড়ীতেও তাবীয ও দো'আ-কালাম লিখিত কাগজ ঝুলিয়ে রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এতে গাড়ী-বাড়ী দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে যায় বলে তাদের বিশ্বাস।

অনেকে আবার রোগের হাত থেকে উদ্ধার পেতে কিংবা রোগ যাতে হতে না পারে সে জন্য কয়েক প্রকার ধাতু নির্মিত আংটি পরে থাকে (যেমন অষ্টধাতুর

আংটি প্রভৃতি)। এর ফলে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা হ্রাস পায় এবং হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। এসব তাবীযের অনেকগুলোতেই স্পষ্ট শির্কী কথা, জিনের নিকট ফরিয়াদ, সূক্ষ্ম নকশা ও অবোধ্য কথা লেখা থাকে। অনেক জ্ঞানপাপী শির্কী মন্ত্রের সাথে কুরআনের আয়াত মিশিয়ে দেয়। কেউ কেউ নাপাক দ্রব্য, ঋতুস্রাবের রক্ত ইত্যাদি দিয়েও তাবীয লেখে। এ ধরনের তাবীয, তাগা, আংটি ঝুলানো কিংবা বাঁধা স্পষ্ট হারাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ»

“যে ব্যক্তি তাবীযের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে নিলো সে নিশ্চয় শির্ক করল”।[১২]

তাবীয ব্যবহারকারী যদি বিশ্বাস করে যে, এসব জিনিস আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই উপকার কিংবা অপকার করে, তাহলে সে বড় শির্ক করার দোষে দুষ্ট হবে। আর যদি সে বিশ্বাস করে যে, এগুলো উপকার-অপকারের একটি উপকরণ মাত্র। অথচ আল্লাহ তা‘আলা এগুলোকে রোগ বিনাশ সংক্রান্ত কোনো উপকার বা অপকারের উপকরণ করেন নি, সেক্ষেত্রে সে ছোট শির্কের গুনাহ করার দোষে দুষ্ট হবে। আর তখন এটি ‘কারণ উদ্ভূত’ শির্কের পর্যায়ভুক্ত হবে।

৮. লোক দেখানো ইবাদত

আল্লাহ তা‘আলার নিকটে আমল কবুল হওয়ার জন্য রিয়া বা লৌকিকতামুক্ত এবং কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত নিয়মে হওয়া অপরিহার্য। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করবে, সে ছোট শির্ক করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবে এবং তার আমল বরবাদ হয়ে যাবে। যেমন লোক দেখানো সালাত। আল্লাহ তা‘আলা এ সম্পর্কে বলেন,

[12] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৭৪৫৮; সিলসিলা সহীহাহ, হাদীস নং ৪৯২।

﴿إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمۡ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلٗا ١٤٢﴾ [النساء: ١٤٢]

“নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহর সঙ্গে প্রতারণা করে। আর তিনি তাদের সাথে (সেটার জবাবে) কৌশল অবলম্বনকারী। আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন আলস্যভরে দাঁড়ায়। তারা লোকদের দেখায় যে তারা সালাত আদায় করছে; কিন্তু আল্লাহকে তারা কমই স্মরণ করে”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪২]

স্বীয় কাজের কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ুক এবং লোকেরা শুনে বাহবা দিক এ নিয়তে যে কাজ করবে সে শির্কে নিপতিত হবে। এরূপ বাসনাকারী সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ»

“যে ব্যক্তি মানুষকে শুনানোর জন্য কাজ করে আল্লাহ তার বদলে তাকে (কিয়ামতের দিন) শুনিয়ে দিবেন। আর যে লোক দেখানোর জন্য কাজ করে আল্লাহ তার বদলে তাকে (কিয়ামতের দিন) দেখিয়ে দিবেন।”[13]

অর্থাৎ তিনি এসব লোককে কিয়ামতের দিন মানুষের সামনে অপমানিত করবেন এবং কঠোর শাস্তি দিবেন।

যে আল্লাহ ও মানুষ উভয়ের সন্তুষ্টিকল্পে ইবাদত করবে তার আমল বরবাদ হয়ে যাবে। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, মহান আল্লাহ বলেন,

«أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»

“আমি অংশীবাদিতা (শির্ক) থেকে সকল অংশীদারের তুলনায় বেশি মুখাপেক্ষীহীন। যে কেউ কোনো আমল করে এবং তাতে অন্যকে আমার সাথে

[13] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৯৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৮৬; মিশকাত, হাদীস নং ৫৩১৬।

শরীক করে, আমি তাকে ও তার আমল উভয়কেই বর্জন করি”।[১৪] তবে কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে কোনো আমল শুরু করার পর যদি তার মধ্যে লোক দেখানো ভাব জাগ্রত হয় এবং সে তা ঘৃণা করে ও তা থেকে সরে আসতে চেষ্টা করে, তাহলে তার ঐ আমল শুদ্ধ হবে। কিন্তু যদি সে তা না করে; বরং লোক দেখানো ভাব মনে উদয় হওয়ার জন্য প্রশান্তি ও আনন্দ অনুভব করে, তাহলে অধিকাংশ আলেমের মতে তার ঐ আমল বাতিল হয়ে যাবে।

৯. কুলক্ষণ গ্রহণ

কুলক্ষণ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَإِذَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَٰذِهِۦۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٞ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓۗ﴾

[الاعراف: ١٣١]

“যখন তাদের (ফির‘আউন ও তার প্রজাদের) কোনো কল্যাণ দেখা দিত তখন তারা বলত, এটা আমাদের জন্য হয়েছে। আর যদি কোনো অকল্যাণ হতো, তারা তখন মূসা ও তার সাথীদের অলুক্ষণে বলে গণ্য করত”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৩১]

আরবরা যাত্রা ইত্যাদি কাজের প্রাক্কালে পাখি উড়িয়ে দিয়ে তার শুভাশুভ নির্ণয় করত। পাখি ডান দিকে গেলে শুভ মনে করে সে কাজে নেমে পড়ত। আর বাম দিকে গেলে অশুভ মনে করে তা থেকে বিরত থাকত। এভাবে শুভাশুভ নির্ণয়ের বিধান প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الطِّيَرَةُ شِرْكٌ»

“কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শির্ক”।[১৫]

মাস, দিন, সংখ্যা, নাম ইত্যাদিকে দুর্ভাগ্য বা অশুভ প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করাও তাওহীদ পরিপন্থ হারাম আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত। যেমন অনেক দেশে হিজরী

---

[14] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৮৫, মিশকাত, হাদীস নং ৫৩১৫।

[15] সুনান আবু দাউদ; তিরমিযী; মিশকাত, হাদীস নং ৪৫৮৪।

সনের ছফর মাসে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকা হয় ও প্রতি মাসের শেষ বুধবারকে চিরস্থায়ী কুলক্ষণ মনে করা হয়। বিশ্বজুড়ে আজ ১৩ সংখ্যাকে 'অলুক্ষণে তের' unlucky thirteen বলা হয়। কেউ যদি তের ক্রমিকে একবার পড়ে যায় তাহলে তার আর দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না। অনেকে কানা-খোঁড়া, পাগল ইত্যাকার প্রতিবন্ধীদের কাজের শুরুতে দেখলে মাথায় হাত দিয়ে বসে। দোকান খুলতে গিয়ে পথে এমনিতর কোনো কানা-খোঁড়াকে দেখতে পেলে তার আর দোকান খোলা হয় না। অশুভ মনে করে সে ফিরে আসে। অথচ এ জাতীয় আকীদা পোষণ করা হারাম ও শির্ক। এজন্য যারা কুলক্ষণে বিশ্বাসী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেন নি। ইমরান ইবন হুছাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلَا تُطُيِّرَ لَهُ، وَلَا تَكَهَّنَ وَلَا تُكُهِّنَ لَهُ» أَظُنُّهُ قَالَ: «أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ»

"যে ব্যক্তি নিজে কুলক্ষণে বিশ্বাস করে ও যার কারণে অন্যের মাঝে কুলক্ষণের প্রতি বিশ্বাসের প্রবণতা সৃষ্টি হয় এবং যে ব্যক্তি ভাগ্য গণনা করে ও যার জন্য ভাগ্য গণনা করা হয় (বর্ণনাকারী মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কেও বলেছিলেন) এবং যে জাদু করে ও যার কারণে জাদু করা হয় সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়"।[১৬]

কেউ কোনো বিষয়ে কুলক্ষণে নিপতিত হলে তাকে এজন্য কাফ্ফারা দিতে হবে। কাফ্ফারা এখানে কোনো অর্থ কিংবা ইবাদত নয়; বরং পাপ বিমোচক একটি দোআ, যা আব্দুল্লাহ ইবন আমর বর্ণিত হাদীসে এসেছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বললেন, কুলক্ষণ যে ব্যক্তিকে কোনো কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে, নিশ্চয় সে শির্ক করে। সাহাবীগণ আরয

---

[16] ত্বাবরাণী; সিলসিলা সহীহাহ, হাদীস নং ২১৯৫।

করলেন, ইয়া রাসূলুলাল্লাহ! তার কাফফারা কী হবে? তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি বলবে:

«اللهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা লা খায়রা ইল্লা খায়রুকা, ওয়ালা ত্বায়রা ইল্লা ত্বায়রুকা, ওয়ালা ইলা-হা গায়রুকা।

“হে আল্লাহ! আপনার কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই। আপনার সৃষ্ট কুলক্ষণ ছাড়া কোনো কুলক্ষণ নেই। আর আপনি ছাড়া কোনো (হক) মা‘বুদও নেই”।[১৭] তবে সুলক্ষণ-কুলক্ষণের ধারণা মনে জন্ম নেওয়া স্বভাবগত ব্যাপার, যা সময়ে বাড়ে ও কমে। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করা। যেমন, ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন,

«وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ»

“আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, মনে কুলক্ষণ সংক্রান্ত কিছুই উঁকি দেয় না। কিন্তু তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর নির্ভরতা) দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা তা দূর করে দেন”।[১৮]

১০. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করা

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যার নামে ইচ্ছা কসম করতে পারেন। কিন্তু সৃষ্টির জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা জায়েয নেই। তা সত্ত্বেও অনেক মানুষের মুখেই নির্বিবাদে গায়রুল্লাহর নামে কসম উচ্চারিত হয়। কসম মূলতঃ এক প্রকার সম্মান, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ পাওয়ার যোগ্য নয়। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»

---

[17] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৭০৪৫; সিলসিলা সহীহাহ, হাদীস নং ১০৬৫।

[18] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৯১০; মিশকাত, হাদীস নং ৪৫৮৪।

“সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষের নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। কারো যদি শপথ করতেই হয়, তবে সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে অথবা চুপ থাকে”।[১৯]

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত আরেকটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ»

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করল, সে শির্ক করল”।[২০]

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا»

“যে আমানত (আনুগত্য, ইবাদত, সম্পদ, গচ্ছিত দ্রব্য ইত্যাদি) এর নামে কসম করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়”।[২১]

সুতরাং কা‘বা, আমানত, মর্যাদা, সাহায্য, অমুকের বরকত, অমুকের জীবন, নবীর মর্যাদা, অলীর মর্যাদা, পিতা-মাতা ও সন্তানের মাথা ইত্যাদি দিয়ে কসম খাওয়া নিষিদ্ধ।

কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করে তবে তার কাফফারা হলো ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’ পাঠ করা। যেমন, সহীহ হাদীসে এসেছে:

«مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

“যে ব্যক্তি শপথ করতে গিয়ে লাত ও উয্যার নামে শপথ করে বসে, সে যেন বলে, ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ”।[২২]

উল্লিখিত অবৈধ শপথের ধাঁচে কিছু শির্কী ও হারাম কথা কতিপয় মুসলিমের মুখে উচ্চারিত হতে শোনা যায়। যেমন, বলা হয় ‘আমি আল্লাহ ও আপনার

---

[19] সহীহ বুখার; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৩৪০৭।

[20] সুনান আবু দাউদ; তিরমিযী, মিশকাত, হাদীস নং ৩৪১৯।

[21] সুনান আবু দাউদ; মিশকাত, হাদীস নং ৩৪২০।

[22] সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৩৪০৯।

আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। 'আল্লাহ আর আপনার ওপরই ভরসা'। 'এটা আল্লাহ ও তোমার পক্ষ থেকে হয়েছে'। 'আল্লাহ ও আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই'। 'আমার জন্য উপরে আল্লাহ আর নিচে আপনি আছেন'। 'আল্লাহ ও অমুক যদি না থাকত'। ''আমি ইসলাম থেকে মুক্ত বা ইসলামের ধার ধারি না'। 'হায় কালের চক্র, আমার সব শেষ করে দিল'। 'এখন আমার দুঃসময় চলছে'। 'এ সময়টা অলক্ষণে'। 'সময় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে' ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, সময়কে গালি দিলে সময়ের স্রষ্টা আল্লাহকেই গালি দেওয়া হয় বলে হাদীসে কুদসীতে এসেছে।[২৩] সুতরাং সময়কে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ।

অনুরূপভাবে প্রকৃতি যা চেয়েছে বলাও একই পর্যায়ভুক্ত।

অনুরূপভাবে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সাথে দাসত্ব বা দাস অর্থবোধক শব্দ ব্যবহারও এ পর্যায়ে পড়ে। যেমন আব্দুল মসীহ, আবদুর রাসূল, আবদুন নবী, আবদুল হুসাইন ইত্যাদি।

আধুনিক কিছু শব্দ ও পরিভাষাও রয়েছে যা তাওহীদের পরিপন্থী। যেমন, ইসলামী সমাজতন্ত্র, ইসলামী গণতন্ত্র, জনগণের ইচ্ছাই আল্লাহর ইচ্ছা, দীন আল্লাহর আর দেশ সকল মানুষের, আরব্য জাতীয়তাবাদের নামে শপথ, বিপ্লবের নামে শপথ করে বলছি ইত্যাদি।

কোনো রাজা-বাদশাহকে 'শাহানশাহ' বা 'রাজাধিরাজ' বলাও হারাম। একইভাবে কোনো মানুষকে 'কাযীউল কুযাত' বা 'বিচারকদের উপরস্থ বিচারক' বলা যাবে না।

অনুরূপভাবে কোনো কাফির বা মুনাফিকের ক্ষেত্রে সম্মানসূচক 'সাইয়িদ' তথা 'জনাব' বা অন্য ভাষার অনুরূপ কোনো শব্দ ব্যবহার করাও সিদ্ধ নয়।

---

[23] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১৮১।

আফসোস, অনুশোচনা ও বিরাগ প্রকাশের জন্য ‘যদি’ ব্যবহার করে বলা (যেমন এটা বলা যে, ‘যদি এটা করতাম তাহলে ওটা হত না’), কারণ, এমন কথা বললে শয়তানের খপ্পরে পড়ে যেতে হয়।

অনুরূপ ‘হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করো’ এ জাতীয় কথা বলাও বৈধ নয়। [বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মু‘জামুল মানাহিল লাফযিয়্যাহ, শাইখ বকর আবদুল্লাহ আবু যায়েদ]

১১. খাতির জমানোর জন্য মুনাফিক ও ফাসিকদের সঙ্গে উঠাবসা করা

দুর্বল ঈমানের অনেক মানুষই পাপাচারী ও দুষ্কৃতিকারীদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় উঠাবসা করে। এমনকি আল্লাহর দীন ও তার অনুসারীদের প্রতি যারা অহরহ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, তাদের সঙ্গেও তারা দহরম-মহরম সম্পর্কে রেখে চলে, তাদের মোসাহেবী করে। অথচ এ কাজ যে হারাম তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ٦٨﴾ [الانعام: ٦٨]

“যখন আপনি তাদেরকে আমার কোনো আয়াত বা বিধান সম্পর্কে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন দেখতে পান তখন আপনি তাদের থেকে সরে থাকুন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়। আর যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তাহলে স্মরণে আসার পর যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপনি আর বসবেন না”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৬৮]

সুতরাং ফাসিক-মুনাফিকদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক যত গভীরই হউক কিংবা তাদের সাথে সমাজ-সামাজিকতায় যতই মজা লাগুক এবং তাদের কণ্ঠ যতই মধুর হউক তাদের সঙ্গে উঠাবসা করা বৈধ নয়।

হ্যাঁ, যে ব্যক্তি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করে, তাদের বাতিল আকীদার প্রতিবাদ করে কিংবা তাদেরকে অন্যায় থেকে নিষেধ করার জন্য তাদের নিকট গমনাগমন করে সে উক্ত নির্দেশের আওতাভুক্ত হবে না। স্বেচ্ছায়,

খুশীমনে ও কোনো কিছু না বলে নীরবে তাদের সাথে তাল মিলিয়ে রাখাতেই সব সমস্যা। অন্যত্র আল্লাহতা'আলা বলেন,

﴿فَإِن تَرۡضَوۡاْ عَنۡهُمۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرۡضَىٰ عَنِ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡفَٰسِقِينَ ٩٦﴾ [التوبة: ٩٦]

"যদি তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্টও থাক, তবে (জেনে রেখ) আল্লাহ ফাসিক বা দুষ্কৃতিকারী সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট নন"। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৯৬]

১২. সালাতে ধীরস্থিরতা পরিহার করা

সবচেয়ে বড় চুরি হচ্ছে সালাতে চুরি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ» ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: " «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا» " أَوْ قَالَ: «لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ».

"সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর সেই ব্যক্তি যে সালাতে চুরি করে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে কীভাবে সালাতে চুরি করে? তিনি বললেন, সে রুকু-সাজদাহ পরিপূর্ণভাবে করে না'।[২৪]

আজকাল অধিকাংশ মুসল্লীকে দেখা যায় যে তারা সালাতে ধীরস্থির ভাব বজায় রাখে না। ধীরে-সুস্থে রূকু-সাজদাহ করে না। রুকু থেকে যখন মাথা তোলে তখন পিঠ সোজা করে দাঁড়ায় না এবং দু'সাজদাহর মাঝে পিঠ টান করে বসে না। খুব কম মসজিদই এমন পাওয়া যাবে যেখানে এ জাতীয় দু'চারজন পাওয়া যাবে না। অথচ সালাতে ধীরস্থিরতা বজায় রাখা সালাতের অন্যতম রুকন। স্বেচ্ছায় তা পরিহার করলে কোনো মতেই সালাত শুদ্ধ হবে না। সুতরাং বিষয়টি বেশ গুরুতর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»

"কোনো ব্যক্তি যে পর্যন্ত না রুকু-সাজদায় তার পৃষ্ঠদেশ সোজা করবে, সে পর্যন্ত তার সালাত যথার্থ হবে না"।[২৫]

---

[24] মুসনাদে আহমদ ৫/৩১০; মিশকাত, হাদীস নং ৮৮৫।

কাজটি যে অবৈধ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যে মুসল্লী এরূপ করে সে ভৎর্সনার যোগ্য। আবু আব্দুল্লাহ আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সাহাবীগণের সাথে সালাত আদায়ের পর তাদের একটি দলের সাথে বসা অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে সালাতে দাঁড়ালো। সে ঠোকর মেরে রুকু-সাজদা করছিল। তা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা কি এ লোকটিকে লক্ষ্য করেছ? এভাবে চালাত আদায় করে কেউ যদি মারা যায়, তবে সে মুহাম্মাদের মিল্লাত ছাড়া অন্য মিল্লাতে মারা যাবে। কাক যেমন রক্তে ঠোকর মারে সে তেমনি করে তার সালাতে ঠোকর মারছে। যে ব্যক্তি রুকু করে আর সাজদায় গিয়ে ঠোকর মারে তার দৃষ্টান্ত সেই ক্ষুধার্ত লোকের ন্যায়, যে একটি দু'টির বেশি খেজুর খেতে পায় না। দু'টি খেজুরে তার কতটুকু ক্ষুধা মিটাতে পারে?"[২৬]

যায়েদ ইবন ওয়াহাব থেকে বর্ণিত, একবার হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু জনৈক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে, সে রুকু-সাজদাহ পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করছে না। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি সালাত আদায় কর নি। আর এ আবস্থায় যদি তুমি মারা যাও, তাহলে যে দীনসহ আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছিলেন তুমি তার বাইরে মারা যাবে"।[২৭]

যে ব্যক্তি সালাতে ধীরস্থিরতা বজায় রাখে না, সে যখন তার বিধান জানতে পারবে তখনকার ওয়াক্তের ফরয সালাত তাকে আবার পড়তে হবে। আর অতীতে যা ভুল হয়ে গেছে সেজন্য তওবা করবে, সেগুলো আর পুনরায় পড়তে হবে না। যেমন, হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন জনৈক দ্রুত সালাত আদায়কারীকে লক্ষ্য করে বললেন,

---

[25] সুনান আবু দাউদ; তিরমিযী; মিশকাত, হাদীস নং ৯৭৮।

[26] সহীহ ইবনে খুযায়মা হাদীস নং ৬৬৫; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃ: ১৩১।

[27] মুসনাদে আহমদ; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৯১; ফাতহুল বারী ২/২৭৪ পৃ:।

«ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»

"যাও, সালাত আদায় কর। কেননা তুমি তো সালাত আদায় কর নি"।[২৮] এখানে অতীত সালাত কাযা করার কথা বলা হয় নি।

১৩. সালাতে অনর্থক কাজ ও বেশি বেশি নড়াচড়া করা

সালাতে অনর্থক কাজ ও বেশি বেশি নড়াচড়া করা এমন এক আপদ, যা থেকে অনেক মুসল্লীই বাঁচতে পারে না। কারণ তারা আল্লাহর নিম্নোক্ত আদেশ প্রতিপালন করে না:

﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨﴾ [البقرة: ٢٣٨]

"তোমরা আল্লাহর জন্য অনুগত হয়ে দাঁড়াও"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৮]

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢﴾ [المؤمنون: ١، ٢]

"নিশ্চয় সেই সকল মুমিন সফলকাম, যারা নিজেদের সালাতে বিনীত থাকে"। [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ১-২]

কিন্তু উক্ত লোকেরা আল্লাহর এ বাণীর মর্মার্থ বুঝে না। তাই সালাতে আদবের পরিপন্থী অনেক কিছুই তারা করে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাজদার মধ্যে মাটি সমান করা যাবে কি-না জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, সালাত অবস্থায় তুমি কিছু মুছতে পারবে না,

«إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً»

"একান্তই যদি করতে হয় তাহলে কংকরাদি একবার সমান করতে পারবে"।[২৯] আলেমগণ বলেছেন, সালাতে নিষ্প্রয়োজনে বেশি মাত্রায় লাগাতারভাবে নড়াচড়া করলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং যারা সালাতে নিরর্থক খেলায় লিপ্ত

---

[28] সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৭৯০।

[29] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৪৬; সহীহুল জামে', হাদীস নং ৭৪৫২।

হয় তাদের অবস্থা কেমন হতে পারে? তাদের তো দেখা যায়, তারা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছে। অথচ ঘড়ির সময় নিরীক্ষণ করছে কিংবা কাপড় সোজা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অথবা আঙ্গুল দিয়ে নাক পরিষ্কার করছে। চোখ দিয়ে ডানে-বামে তাকাচ্ছে। আবার আকাশের দিকেও তাকাচ্ছে, অথচ উপরের দিকে তাকানোর কারণে তাদের চোখ যে উপড়ে ফেলা হতে পারে কিংবা শয়তান যে তাদের সালাতের কিছু অংশ ছিনিয়ে নিচ্ছে এ ব্যাপারে তাদের মনে কোনোই উদ্বেগ নেই।[৩০]

১৪. সালাতে ইচ্ছাপূর্বক ইমামের আগে মুক্তাদীর গমন

যে কোনো কাজে তাড়াহুড়া করা মানুষের জন্মগত স্বভাব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

﴿وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ عَجُولٗا ﴾ [الاسراء: ١١]

“মানুষ খুব দ্রুততা প্রিয়।” [বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ وَالعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ»

“ধীরস্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে”।[৩১]

জামা‘আতের মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ডানে-বামে অনেক মুসল্লী ইমামের রুকু-সাজদায় যাওয়ার আগেই রুকু-সাজদায় চলে যাচ্ছে। এমনকি লক্ষ্য করলে নিজের মধ্যেও এ প্রবণতা দেখা যায়। উঠা-বসার তাকবীরগুলোতে তো এটা হরহামেশাই হতে দেখা যায়। এমনকি অনেকে ইমামের আগে সালামও ফিরিয়ে ফেলে। বিষয়টি অনেকের নিকটই গুরুত্ব পায় না। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য কঠোর শাস্তির হুমকি শুনিয়েছেন। তিনি বলেন,

---

[30] মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৯৮২-৮৩, ‘সালাতে অসিদ্ধ ও সিদ্ধ সমূহ’ অনুচ্ছেদ-১৯।

[31] তিরমিযী; মিশকাত, হাদীস নং ৫০৫৫; সিলসিলা সহীহাহ, হাদীস নং ১৭৯৫।

«أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - أَوْ: لاَ يَخْشَى أَحَدُكُمْ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ»

"সাবধান! যে ব্যক্তি ইমামের আগে মাথা তোলে তার কি ভয় হয় না যে, আল্লাহ তার মাথাটা গাধার মাথায় রূপান্তরিত করতে পারেন"?[৩২]

একজন মুসল্লীকে যখন ধীরে সুস্থে সালাতে উপস্থিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং তাড়াতাড়ি বা দ্রুত পায়ে নিষেধ করা হয়েছে[৩৩], তখন স্বীয় সালাত যে ধীরে-সুস্থে আদায় করতে হবে তাতে আর সন্দেহ কি? আবার কিছু লোকের নিকট ইমামের আগে গমন ও পিছনে পড়ে থাকার বিষয়টি তালগোল পাকিয়ে যায়। তাই মুজতাহিদগণ এজন্য একটি সুন্দর নিয়ম উল্লেখ করেছেন। তা হলো, ইমাম যখন তাকবীর শেষ করবেন মুক্তাদী তখন নড়াচড়া শুরু করবে। ইমাম 'আল্লাহু আকবার' এর 'র' বর্ণ উচ্চারণ করা মাত্রই মুক্তাদী রুকু-সাজদাহয় যাওয়ার জন্য মাথা নীচু করা শুরু করবে। অনুরূপভাবে রুকু থেকে মাথা তোলার সময় ইমামের 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ'-এর 'হ' বর্ণ উচ্চারণ শেষ হলে মুক্তাদী মাথা তুলবে। এর আগেও করবে না, পরেও না। এভাবে সমস্যাটা দূর হয়ে যাবে।

সাহাবীগণ যাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগে চলে না যান সে বিষয়ে খুব সতর্ক ও সচেষ্ট থাকতেন। বারা ইবন আযিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

«يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ أَرَ أَحَدًا يَحْنِي ظَهْرَهُ، حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَخِرُّ مَنْ وَرَاءَهُ سُجَّدًا»

---

[32] সহীহ বুখারী; মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ১১৪১।

[33] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩৬; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১০৯০০৬।

“সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি রুকু থেকে মাথা তুলতেন তখন আমি এমন একজনকেও দেখি নি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কপাল মাটিতে রাখার আগে তার পিঠ বাঁকা করেছে। তিনি সাজদায় গিয়ে সারলে তারা তখন সাজদায় লুটিয়ে পড়তেন”।[৩৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন একটু বুড়িয়ে যান এবং তাঁর নড়াচড়ায় মন্থরতা দেখা দেয়, তখন তিনি তাঁর পিছনের মুক্তাদীদের এ বলে সতর্ক করে দেন যে,

«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ أَوْ بَدَّنْتُ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ...»

‘হে লোকেরা! আমার দেহ ভারী হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা রুকু-সাজদায় আমার আগে চলে যেও না”।[৩৫]

অপরদিকে ইমামকেও সালাতের তাকবীরে সুন্নাত মোতাবেক আমল করা জরুরি। এ সম্পর্কে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে,

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ" قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ: «وَلَكَ الحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الجُلُوسِ»

‘রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন শুরুতে তাকবীর বলতেন। তারপর যখন রুকুতে যেতেন তখন তাকবীর বলতেন। তারপর বলতেন, ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ’ যখন রুকু থেকে পিঠ সোজা

---

[34] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭৪।

[35] বায়হাকী; সিলসিলা সহীহাহ, হাদীস নং ১৭২৫।

করতেন। তারপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন, 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবন সালেহ তার উস্তাদ লাইস থেকে বর্ণনা করেন, 'ওয়ালাকাল হামদ'। অতঃপর যখন সাজদায় যেতেন তখন তাকবীর বলতেন। অতঃপর যখন সাজদাহ থেকে মাথা উঠাতেন তখন তাকবীর বলতেন, তারপর যখন (দ্বিতীয়) সাজদাহ-য় যেতেন তখন তাকবীর বলতেন, সাজদাহ থেকে মাথা তুলতে তাকবীর বলতেন। এভাবে সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকবীর বলতেন। আর দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক শেষে দাঁড়ানোর সময়ও তাকবীর বলতেন"।[৩৬]

সুতরাং এভাবে ইমাম যখন সালাতে উঠা-বসার সঙ্গে তার তাকবীরকে সমন্বিত করে একই সাথে আদায় করবেন এবং মুক্তাদীগণও উল্লিখিত নিয়ম মেনে চলবে তখন সবারই জামা'আতের বিধান ঠিক হয়ে যাবে।

১৫. পেঁয়াজ-রসুন কিংবা দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে গমন

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ﴾ [الاعراف: ٣١]

"হে বনু আদম! তোমরা প্রতি সালাতের সময় তোমাদের সৌন্দর্যকে ধারণ কর" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৩১] [অর্থাৎ তোমরা পোশাক পরিধান কর ও শালীন পরিবেশ বজায় রাখ। কিন্তু দুর্গন্ধ পরিবেশকে কলুষিত করে তোলে।]

জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَن أَكلَ ثوماً أو بصَلاً فليعتَزِلْنا، أو قالَ: فليَعتزلْ مسجدَنا، وليقعُدْ في بيتهِ، وفي روايةٍ: فلا يَغشانا في مساجدِنا».

[৩৬] সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৭৯৯।

"যে ব্যক্তি রসুন কিংবা পেঁয়াজ খাবে, সে যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে। অথবা তিনি বলেছেন, সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে এবং নিজ বাড়ীতে বসে থাকে"।[৩৭]

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে,

«مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ، الثُّومِ - وقَالَ مَرَّةً: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ»

"যে ব্যক্তি পেঁয়াজ, রসুন ও কুর্রাছ[৩৮] খাবে, সে যেন কখনই আমাদের মসজিদ পানে না আসে। কেননা বনী আদম যাতে কষ্ট পায় ফিরিশতারাও তাতে কষ্ট পায়"।[৩৯]

উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একদা জুমু'আর খুৎবায় বলেছিলেন, হে লোক সকল! তোমরা দু'টি গাছ খেয়ে থাক। আমি ঐ দু'টিকে কদর্য ছাড়া অন্য কিছু মনে করি না। সে দু'টি হচ্ছে পেঁয়াজ ও রসুন। কেননা আমি রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি,

«إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ، أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا»

"কারো মুখ থেকে তিনি এ দু'টির গন্ধ পেলে তাকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। ফলে তাকে বাক্বী' গোরস্থানের দিকে বের করে দেওয়া হতো। সুতরাং কাউকে তা খেতে হলে সে যেন পাকিয়ে খায়"।[৪০]

অনেকেই কাজ-কর্ম শেষে হাত-মুখ ধোয়ার আগেই মসজিদে ঢুকে পড়ে। এদিকে ঘামের জন্য তার বগল ও মোজা দিয়ে বিশ্রী রকমের গন্ধ বের হতে থাকে। এ ধরনের লোকও উক্ত বিধানের আওতায় পড়বে।

---

[37] সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৪১৭৯।

[38] কুর্রাছ এক প্রকার গন্ধযুক্ত সব্জি।

[39] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৬৪।

[40] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৬৭।

আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হল ধূমপায়ীরা। তারা হারাম ধূমপান করতে করতে মুখে চরম দুর্গন্ধ জন্মিয়ে নেয়। এ অবস্থায় মসজিদে ঢুকে তারা আল্লাহর মুসল্লী বান্দা ও ফিরিশতাদের কষ্ট দেয়।

১৬. ব্যভিচার

বংশ, ইযযত ও সম্ভ্রম রক্ষা করা ইসলামী শরী'আতের অন্যতম লক্ষ্য। এজন্য ইসলাম ব্যভিচারকে হারাম করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢﴾ [الاسراء: ٣٢]

"তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয় তা একটি অশ্লীল কাজ ও খারাপ পন্থা"। [সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৩২]

শরী'আত পর্দা ফরয করেছে, নারী-পুরুষ উভয়কে দৃষ্টি সংযত রাখতে বলেছে এবং গায়ের মাহরাম স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নির্জনে মিলিত হওয়াকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এভাবে ব্যভিচারের সকল উপায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও কেউ ব্যভিচার করে বসলে তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে না মরা পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। এভাবে সে তার কাজের উপযুক্ত পরিণাম ভোগ করবে এবং হারাম কাজে তার প্রতিটি অঙ্গ যেমন করে মজা উপভোগ করেছিল এখন তেমনি করে যন্ত্রণা উপভোগ করবে।

আর অবিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীদেরকে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে। বেত্রাঘাতের ক্ষেত্রে এটাই শরী'আতের সর্বোচ্চ শাস্তি। একদল মুমিনের সামনে অর্থাৎ জনতার সামনে খোলা ময়দানে এ শাস্তি কার্যকর করতে হবে, যাতে সে অপমানের চূড়ান্ত হয়। একই সঙ্গে তাকে এক বৎসরের জন্য অপরাধ সংঘটিত এলাকা থেকে বহিষ্কার করতে হবে। এরূপ ব্যবস্থা চালু হলে ব্যভিচারের মাত্রা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে বলে আশা করা যায়।

ব্যভিচারী নর-নারী বারাযাখ তথা কবরের জীবনেও তাকে কঠিন শাস্তি পোহাবে। তারা এমন একটি অগ্নিকুণ্ডে থাকবে যার ঊর্ধ্বাংশ হবে সংকীর্ণ; কিন্তু

নিম্নাংশ হবে প্রশস্ত। তার নিচ থেকে আগুন জ্বালানো হবে। সেই আগুনে তারা উলঙ্গ, বিবস্ত্র অবস্থায় থাকবে আর যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকবে। ঐ আগুন এতই উত্তপ্ত হবে যে, তার তোড়ে তারা উপরের দিকে উঠে আসবে। এমনকি তারা প্রায় বেরিয়ে আসার উপক্রম করবে। যখনই এমন হবে তখনই আগুন নিভিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তারা আবার অগ্নিকুণ্ডের তলদেশে ফিরে যাবে। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের জন্য এ ব্যবস্থা চলতে থাকবে।[৪১]

ব্যভিচারের বিষয়টি আরও কদর্য ও ঘৃণিত হয়ে দাঁড়ায় তখন, যখন কোনো ব্যক্তি বয়সে ভারী ও এক পা কবরে চলে যাওয়ার পরও হরদম ব্যভিচার করে যায় আর আল্লাহও তাকে ছাড় দিয়ে যান। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে মারফূ‘ সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ - قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ»

“কিয়ামত দিবসে তিন ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না; বরং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হলো বয়োবৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী রাষ্ট্রনায়ক ও অহংকারী দরিদ্র”।[৪২]

অনেকে ব্যভিচার বা পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে। অথচ পতিতাবৃত্তি থেকে অর্জিত আয় নিকৃষ্ট উপার্জনাদিরই একটি। যে পতিতা তার ইজ্জত বেচে খায় সে মধ্যরাতে যখন দো‘আ কবুলের জন্য আকাশের দরজা উন্মোচিত হয় তখন দো‘আ কবুল হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়।[৪৩] অভাব ও দারিদ্র্য আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করার জন্য কোনো শর‘ঈ ওযর হতে পারে না। বলা হয়ে থাকে

---

[41] সহীহ বুখারী; মিশকাত, হাদীস নং ৪৬২১।

[42] সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৫১০৯।

[43] সহীহুল জামে‘, হাদীস নং ২৯৭১।

স্বাধীনা নারী ক্ষুধার্ত থাকতে পারে কিন্তু সে তার স্তন বিক্রি করে খেতে পারে না, যদি স্তনের ব্যাপারে তা হয় তাহলে লজ্জাস্থানের ব্যাপার কী দাঁড়াতে পারে তা বলাই বাহুল্য।

আমাদের যুগে তো অশ্লীলতার সকল দুয়ার খুলে দেওয়া হয়েছে। শয়তান ও তার দোসরদের চক্রান্তে অশ্লীলতার পথ ও পন্থাগুলো সহজলভ্য হয়ে গেছে। পাপী ব্যভিচারীরা এখন খোলাখুলি শয়তানের অনুসরণ করছে। মেয়েরা দ্বিধাহীনচিত্তে ব্যাপকভাবে বাইরে পর্দাহীনভাবে যাতায়াত করে তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়াচ্ছে। মোড়ে মোড়ে বখাটে ছেলেদের বক্র চাহনি ও হা করে মেয়েদের পানে তাকিয়ে থাকা তো নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবাধ মেলা-মেশা, পর্ণোগ্রাফি ও ব্লু ফ্লিমে দেশ ভরে গেছে। ফ্রি সেক্সের দেশগুলোতে মানুষের ভ্রমণের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। কে কত বেশি খোলামেলা হতে পারে যেন তার প্রতিযোগিতা চলছে। ধর্ষণ ও বলাৎকারে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। জারজ সন্তানের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ক্লিনিকে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে অবৈধ গর্ভপাতের মাধ্যমে মানব সন্তানদের হত্যা করা হচ্ছে।

হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট দয়া, অনুগ্রহ ও গোপনীয়তা প্রার্থনা করছি এবং এমন সম্ভ্রম কামনা করছি যার বদৌলতে তুমি আমাদেরকে সকল অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করবে। আমরা তোমার নিকট আমাদের মনের পবিত্রতা ও ইযযতের হেফাযত প্রার্থনা করছি। দয়া করে তুমি আমাদের মাঝে ও হারামের মাঝে একটি সুদৃঢ় অন্তরাল তৈরি করে দাও। আমীন!

১৭. পুংমৈথুন বা সমকামিতা

অতীতে লূত আলাইহিস সালাম-এর জাতি পুংমৈথুনে অভ্যস্ত ছিল। তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٢٨ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ۖ﴾ [العنكبوت: ٢٨، ٢٩]

“লূতের কথা স্মরণ করুন! যখন তিনি তাঁর কওমকে বললেন, তোমরা নিশ্চয় এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে আর কেউ করে নি, তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছ, তোমরাই তো রাহাজানি করছ, তোমরাই তো ভরা মজলিসে অন্যায় কাজ করছ”। [সূরা আল-‘আনকাবুত, আয়াত: ২৮-২৯]

যেহেতু এ অপরাধ ছিল জঘন্য, অত্যন্ত মারাত্মক ও কদর্যপূর্ণ তাই আল্লাহ তা‘আলা লূত আলাইহিস সালামের জাতিকে একবারেই চার প্রকার শাস্তি দিয়েছিলেন। এ জাতীয় এতগুলো শাস্তি একবারে অন্য কোনো জাতিকে ভোগ করতে হয় নি। ঐ শাস্তিগুলো ছিল- তাদের চক্ষু উৎপাটন, উঁচু জনপদকে নিচু করে দেওয়া, অবিরাম কঙ্করপাত ও হঠাৎ নিনাদের ধ্বনি আগমন।

পুংমৈথূনের শাস্তি হিসেবে ইসলামী শরী‘আতের পণ্ডিতগণের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত হলো, স্বেচ্ছায় যদি কেউ পুংমৈথুন করে তাহলে পুংমৈথুনকারী ও মৈথুনকৃত ব্যক্তি উভয়কেই তরবারীর আঘাতে শিরচ্ছেদ করতে হবে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মারফূ সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন,

«مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ»

“তোমরা লূতের সম্প্রদায়ের ন্যায় পুংমৈথুনের কাজ কাউকে করতে দেখলে মৈথুনকারী ও মৈথুনকৃত উভয়কেই হত্যা করবে”।[৪৪]

মৈথুন বা সমকামিতার প্রাকৃতিক কুফলও কম নয়। এসব নির্লজ্জ বেহায়াপনার কারণেই আমাদের কালে এমন কিছু রোগ-ব্যাধি মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে যা পূর্বকালে ছিল না। বর্তমান পৃথিবীর মহাত্রাস ঘাতক ব্যাধি এইডস যার জ্বলন্ত উদাহরণ। এইডসই প্রমাণ করে যে, সমকামিতা রোধে ইসলামের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ যথার্থ হয়েছে।

---

[44] তিরমিযী; ইবন মাজাহ; মিশকাত, হাদীস নং ৩৫৭৫।

১৮. শর‘ঈ ওযর ব্যতীত স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর শয্যা গ্রহণ অস্বীকার করা

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»

“যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে স্বীয় শয্যা গ্রহণ বা দৈহিক মিলনের জন্য আহবান জানায়, কিন্তু স্ত্রী তা অস্বীকার করায় স্বামী তার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে রাত কাটায়, তখন ফিরিশতাগণ সকাল পর্যন্ত ঐ স্ত্রীর ওপর অভিশাপ দিতে থাকে”।[৪৫]

অনেক মহিলাকেই দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীতে একটু খুনসুটি হলেই স্বামীকে শাস্তি দেওয়ার মানসে তার সঙ্গে দৈহিক মেলামেশা বন্ধ করে বসে। এতে অনেক রকম ক্ষতি দেখা দেয়। পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। স্বামী দৈহিক তৃপ্তির জন্য অবৈধ পথও বেছে নেয়, অন্য স্ত্রী গ্রহণের চিন্তাও তাকে পেয়ে বসে। এভাবে বিষয়টি হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সুতরাং স্ত্রীর কর্তব্য হবে স্বামী ডাকামাত্রই তার ডাকে সাড়া দেওয়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إذا دعا الرجلُ امرأتَه إلى فراشِهِ فلتُجِبْ وإن كانتْ على ظهرِ قَتَبٍ»

‘যখন কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে তার সঙ্গে দৈহিক মিলনের জন্য ডাকবে, তখনই যেন সে তার ডাকে সাড়া দেয়। এমনকি সে যদি ক্বাতবের পিঠেও থাকে।’[৪৬] ‘ক্বাতব’ হচ্ছে, উটের পিঠে রাখা গদি যা সওয়ারের সময় ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

---

[45] সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৩২৪৬।

[46] যাওয়াইদুল বাযযার ২/১৮১ পৃ; সহীহুল জামে‘, হাদীস নং ৫৪৭।

স্বামীরও কর্তব্য হবে, স্ত্রী রোগাক্রান্ত, গর্ভবতী কিংবা অন্য কোনো অসুবিধায় পতিত হলে তার অবস্থা বিবেচনা করা। এতে করে তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় থাকবে এবং মনোমালিন্য সৃষ্টি হবে না।

১৯. শর‘ঈ কারণ ব্যতীত স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করা

এমন অনেক স্ত্রীলোক আছে যারা স্বামীর সঙ্গে একটু ঝগড়া-বিবাদ হলেই কিংবা তার চাওয়া-পাওয়ার একটু ব্যত্যয় ঘটলেই তার নিকট তালাক দাবী করে। অনেক সময় স্ত্রী তার কোনো নিকট আত্মীয় কিংবা অসৎ প্রতিবেশী কর্তৃক এরূপ অনিষ্টকর কাজে প্ররোচিত হয়। কখনো সে স্বামীকে লক্ষ্য করে তার জাত্যভিমান উস্কে দেওয়ার মত শব্দ উচ্চারণ করে। যেমন সে বলে, ‘যদি তুমি পুরুষ হয়ে থাক তাহলে আমাকে তালাক দাও’। কিন্তু তালাকের যে কি বিষময় ফল তা সবার জানা আছে। তালাকের কারণে একটি পরিবারে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। সন্তানরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এজন্য অনেক সময় স্ত্রীর মনে অনুশোচনা জাগতে পারে। কিন্তু তখন তো আর করার কিছুই থাকে না। এসব কারণে শরী‘আত কথায় কথায় তালাক প্রার্থনাকে হারাম করে সমাজের যে উপকার করেছে তা সহজেই অনুমেয়। সাওবান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»

“কোনো মহিলা যদি বিনা দোষে স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে, তাহলে জান্নাতের সুগন্ধি তার জন্য হারাম হয়ে যাবে”।[৪৭]

উক্বা ইবন আমের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

«الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ»

[47] মুসনাদে আহমদ; তিরমিযী; মিশকাত, হাদীস নং ৩২৭৯।

“সম্পর্কছিন্নকারিণী ও খোলাকারিণী নারীগণ মুনাফিক”’।[৪৮]

হ্যাঁ যদি কোনো শর‘ঈ ওযর থাকে যেমন-স্বামী সালাত আদায় করে না, অনবরত নেশা করে কিংবা স্ত্রীকে হারাম কাজের আদেশ দেয়, অন্যায়ভাবে মারধর করে, স্ত্রীর শর‘ঈ অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করে। কিন্তু স্বামীকে নছীহত করেও ফেরানো যাচ্ছে না এবং সংশোধনেরও কোনো উপায় নেই সেক্ষেত্রে তালাক দাবী করায় স্ত্রীর কোনো দোষ হবে না। বরং দীন ও জীবন রক্ষার্থে তখন সে তালাক প্রার্থনা করতে পারে।

২০. যিহার

জাহেলী যুগ থেকে চলে আসা যা কিছু এ উম্মতের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে ‘যিহার’ তার একটি। যেসব শব্দে যিহার হয় তার কতগুলো নিম্নরূপ:

স্বামী স্ত্রীকে বলবে, ‘তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠতুল্য’। ‘আমার বোন যেমন আমার জন্য হারাম, তুমিও তেমনি আমার জন্য হারাম’। ‘তোমার এক চতুর্থাংশ আমার জন্য আমার ধাত্রীমায়ের মতো হারাম’ ইত্যাদি। যিহারের ফলে নারীরা ভীষণভাবে অত্যাচারিত হয়। যিহার একটি অমানবিক কাজ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ ٢﴾ [المجادلة: ٢]

“তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সঙ্গে যিহার করে তারা যেন জেনে রাখে যে, তারা তাদের মা নয়। তাদের মা তো তারাই যারা তাদের প্রসব করেছে। তারা তো কেবল অসঙ্গত ও মিথ্যা কথা বলে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী”। [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ২]

ইসলাম রমযান মাসে দিনের বেলায় স্বেচ্ছায় সহবাসে সিয়াম ভঙ্গের কাফফারা, ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা যেভাবে দিতে বলেছে, যিহারের জন্যও ঠিক

[48] ত্বাবরানী ফিল কাবীর, ১৭/৩৩৯, সহীহুল জামে‘ ১৯৩৪।

একইভাবে কাফফারা দিতে বলেছে। কাফফারা পরিশোধ না করা পর্যন্ত যিহারকারী স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٣ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٤﴾ [المجادلة: ٣، ٤]

"যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারপর তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, তাদের জন্য পারস্পরিক স্পর্শের পূর্বে একজন দাস মুক্তির বিধান দেওয়া হল। এটা তোমাদের জন্য নির্দেশ। আর তোমরা যা কিছু কর তৎসম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। অতঃপর যে সেটার সামর্থ্য রাখে না তাকে পারস্পরিক স্পর্শের পূর্বে একটানা দু'মাস ছিয়াম রাখতে হবে। যে তারও সামর্থ্য রাখে না তাকে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে। এ বিধান এজন্য যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে তোমরা যেন ঈমান রাখ। এটা আল্লাহর সীমারেখা। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি"। [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ৩-৪]

২১. মাসিকের সময় স্ত্রী সহবাস

মাসিকের সময় স্ত্রী সহবাস কুরআন-হাদীস উভয়ের আলোকেই নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَۖ﴾ [البقرة: ٢٢٢]

"তারা আপনাকে মাসিক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, উহা অশুচি। সুতরাং মাসিকের সময় তোমরা স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটে যেও না"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২২]

পবিত্রতা লাভের পর তারা গোসল না করা পর্যন্ত তাদের নিকটে যাওয়া বৈধ নয়। কেননা একই সাথে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢﴾ [البقرة: ٢٢٢]

“যখন তারা ভালোমত পাক-পবিত্র হয়ে যাবে তখন তোমরা তাদের নিকটে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক গমন কর”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২২]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ»

‘সহবাস ব্যতীত তোমরা তাদের সাথে সব কিছুই কর”।[৪৯]

মাসিকের সময় সহবাস যে কঠিন পাপ তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নোক্ত বাণী থেকে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

«مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»

“যে ব্যক্তি কোনো ঋতুবতীর সাথে মিলিত হয় কিংবা কোনো মহিলার পশ্চাৎদ্বারে সঙ্গম করে অথবা কোনো গণকের নিকটে যায়, নিশ্চয় সে মুহাম্মাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফরী করে”।[৫০]

অজ্ঞতাবশতঃ যদি কোনো ব্যক্তি মাসিকের সময় স্ত্রী সহবাস করে তাহলে তাকে এজন্য কোনো কাফফারা দিতে হবে না। কিন্তু জেনেশুনে যারা এ কাজ করবে তাদেরকে নির্ধারিত এক দীনার বা অর্ধ দীনার কাফফারা দিতে হবে। এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।[৫১] এখানে এক দীনার বা অর্ধ দীনার দু’টি সুযোগের যে কোনো একটি নেওয়া যাবে বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, যদি মাসিকের শুরুতে যখন প্রথম রক্ত বেশি আকারে বের হতে থাকে তখন কেউ সহবাস করে তবে এক দীনার আর যদি মাসিকের শেষে যখন রক্ত কম বের হয়, অথবা তার

---

[49] সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৫৪৫।

[50] তিরমিযী; মিশকাত, হাদীস নং ৫৫১।

[51] তিরমিযী, হাদীস নং ১২৫; সুনান আবু দাউদ; সুনান নাসাঈ; মিশকাত, হাদীস নং ৫৫৩, সনদ সহীহ।

গোসলের আগে সহবাস করা হয় তবে অর্ধ দীনার সদকা করতে হবে। আর এক দীনার এর পরিমাণ হচ্ছে, ২৫,৪ গ্রাম স্বর্ণ। অথবা সমপরিমাণ মূল্যের কাগজের মুদ্রা।

২২. পশ্চাৎদ্বার দিয়ে স্ত্রীগমন

দুর্বল ঈমানের কিছু লোক তাদের স্ত্রীদের সাথে পশ্চাৎদ্বার (পায়খানার রাস্তা) দিয়ে মেলামেশা করতে দ্বিধা করে না। অথচ এটা কবীরা গোনাহ। যারা এ কাজ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا»

“যে পশ্চাৎদ্বার দিয়ে স্ত্রীগমন করে সে অভিশপ্ত”।[৫২]

পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো ঋতুবর্তী নারীর সাথে মিলিত হয় কিংবা পশ্চাৎদ্বারে সঙ্গম করে অথবা কোনো গণকের নিকটে যায়, নিশ্চয় সে মুহাম্মাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার সাথে কুফরীকারী।’[৫৩]

অবশ্য কিছু পবিত্রা স্ত্রী তাদের তাদের স্বামীদেরকে এ কাজে বাধা দিয়ে থাকে। কিন্তু অনেক স্বামীই তাদের কথা না মানলে তালাকের হুমকি দেয়। আবার যে সকল স্ত্রী আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করে তাদেরকে প্রতারণাচ্ছলে ধারণা দেয় যে, এ জাতীয় কাজ বৈধ। কারণ আল্লাহ বলেন,

﴿ نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ﴾ [البقرة: ٢٢٣]

“তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ। সুতরাং তোমরা তোমাদের ক্ষেতে যে পন্থায় ইচ্ছা গমন করো”। [সূরা আল-বাক্বারাহ ২২৩]

---

[52] মুসনাদে আহমদ; সুনান আবু দাউদ; মিশকাত, হাদীস নং ৩১৯৩।

[53] তিরমিযী; সহীহুল জামে‘, হাদীস নং ৫৯১৮।

অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ‘স্বামী স্ত্রীর সামনে দিয়ে, পিছন দিয়ে, যে কোনো ভাবে যেতে পারবে, যতক্ষণ তা সন্তান প্রসবের দ্বারের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে’।[৫৪]

আর এটা অবিদিত নয় যে, পশ্চাৎদ্বার (পায়খানার রাস্তা) দিয়ে সন্তান প্রসব হয় না। সুতরাং আয়াতে সঙ্গমের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কথা বলা হয় নি; বরং একই ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল বা পদ্ধতির মধ্যে যেটা ইচ্ছা সেটা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। এসব অপরাধের মূলে রয়েছে বিবাহিত শালীন জীবনের পাশাপাশি গণিকাগমনের জাহেলী প্রথা, সমকামিতা এবং যত্রতত্র প্রদর্শিত অশ্লীল নীল ছবি। নিঃসন্দেহে এ জাতীয় কাজ হারাম। উভয়পক্ষ রাযী থাকলেও তা হারাম হবে। কেননা পারস্পরিক সম্মতিতে কোনো হারাম কাজ হালাল হয়ে যায় না।

২৩. স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করা

আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে পুরুষদেরকে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বিধানের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩﴾ [النساء: ١٢٩]

“তোমরা যতই আগ্রহ পোষণ কর না কেন তোমরা কখনো স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে পারবে না। তবে তোমরা কোনো একজনের দিকে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড় না ও অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখ না। যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১২৯]

এখানে কাম্য হলো, রাত্রি যাপনে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা, পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকের নিকট এক রাত করে যাপন করা এবং প্রত্যেকের থাকা, খাওয়া ও

---

[54] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ২১৬৪, সনদ হাসান।

পরার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করা। অন্তরের ভালোবাসা সবার জন্য সমান হতে হবে এমন বিধান শরী'আত দেয় নি। কেননা তা মানুষের ইখতিয়ার বহির্ভূত। কিছু মানুষ আছে, যারা তাদের একাধিক স্ত্রীর একজনকে নিয়ে পড়ে থাকে, অন্যজনের দিকে ভ্রুক্ষেপও করে না; একজনের নিকট বেশি বেশি রাত কাটায় কিংবা বেশি খরচ করে, অন্যজনের কোনো খোঁজই নেয় না। নিঃসন্দেহে এরূপ একপেশে আচরণ হারাম। কিয়ামত দিবসে তাদের যে অবস্থা দাঁড়াবে তার একটি চিত্র আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে আমরা পাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ»

'যার দু'জন স্ত্রী আছে, কিন্তু সে তাদের একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, কিয়ামত দিবসে সে এক অংশ অবস অবস্থায় উঠবে"।[৫৫]

২৪. গায়ের মাহরাম মহিলার সাথে নির্জনে অবস্থান

মানুষের মধ্যে ফিতনা ও অশান্তি সৃষ্টি করতে শয়তান সদা তৎপর। কি করে তাদের দ্বারা হারাম কাজ করানো যায় এ চিন্তা তার অহর্নিশ। তাই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সতর্ক করতে গিয়ে বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ وَمَن يَتَّبِعۡ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۚ﴾ [النور: ٢١]

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাকে তো সে অশ্লীল ও অন্যায় কাজেরই হুকুম দেয়"। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ২১]

শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় চলাচল করে।[৫৬] কোনো গায়ের মাহরাম মহিলার সাথে একাকী অবস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অশ্লীল কাজে লিপ্ত করা

---

[55] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ২১৩৩, সনদ সহীহ।

[56] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৭৫।

শয়তানেরই একটি চক্রান্ত। এজন্যই শরী'আত উক্ত রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»

"কোনো পুরুষ একজন মহিলার সাথে নির্জনের মিলিত হলে তাদের তৃতীয় সঙ্গী হয় শয়তান"।[57]

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي هَذَا، عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ»

"আমার আজকের এ দিন থেকে কোনো পুরুষ একজন কিংবা দু'জন পুরুষকে সঙ্গে করে ব্যতীত কোনো স্বামী থেকে দূরে থাকা মহিলার সাথে নির্জনে দেখা করতে পারবে না"।[58]

সুতরাং ঘর হোক কিংবা স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়েই হোক, আর বাড়ীর কক্ষেই হোক, কিংবা মোটর গাড়ীতেই হোক, কোথাও কোনো পুরুষ লোক বিবাহ বৈধ এমন কোনো মহিলার সাথে একাকী থাকতে পারবে না। নিজের ভাবী, পরিচারিকা, রুগিনী ইত্যাকার কারও সাথেই নির্জনবাস বৈধ নয়।

অনেক মানুষ আছে যারা আত্মবিশ্বাসের বলে হোক কিংবা দ্বিতীয় পক্ষের ওপর নির্ভর করেই হোক উপরোক্ত মহিলাদের সাথে একাকী অবস্থানে খুবই উদার মনোভাব পোষণ করে। তারা এভাবে মেলামেশাকে খারাপ কিছুই মনে করে না। অথচ এরই মধ্য দিয়ে ব্যভিচারের সূত্রপাত হয়, সমাজ দেহ কলুষিত হয় এবং সমাজে অবৈধ সন্তানদের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়।

২৫. বিবাহ বৈধ এমন মহিলার সাথে করমর্দন

---

[57] তিরমিযী; মিশকাত, হাদীস নং ৩১১৮।

[58] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৭৩।

আজকের সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা অবারিতভাবে চলছে। ফলে অনেক নারী-পুরুষই নিজেকে আধুনিক হিসাবে যাহির করার জন্য শরী‘আতের সীমালংঘন করে পরস্পরে মুসাফাহা করছে। তাদের ভাষায় এটা হ্যান্ডশেক বা করমর্দন। আল্লাহর নিষেধকে থোড়াই কেয়ার করে বিকৃত রুচি ও নগ্ন সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে তারা এ কাজ করছে এবং নিজেদেরকে প্রগতিবাদী বলে যাহির করছে। আপনি তাদেরকে যতই বুঝান না কেন বা দলীল-প্রমাণ যতই দেখান না কেন তারা তা কখনই মানবে না। উল্টো আপনাকে প্রতিক্রিয়াশীল, সন্দেহবাদী, মোহাচ্ছন্ন, আত্মীয়তাছিন্নকারী ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যায়িত করবে। চাচাত বোন, ফুফাত বোন, মামাত বোন, খালাত বোন, ভাবী, চাচী, মামী প্রমুখ আত্মীয়ের সঙ্গে মুসাফাহা করা তো এসব লোকদের নিকট পানি পানের চেয়েও সহজ কাজ। শরী‘আতের দৃষ্টিতে কাজটি কত ভয়াবহ তা যদি তারা দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখত তাহলে কখনই তারা এ কাজ করত না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ»

“নিশ্চয় তোমাদের কারো মাথায় লোহার পেরেক ঠুকে দেওয়া ঐ মহিলাকে স্পর্শ করা থেকে অনেক শ্রেয়, যে তার জন্য হালাল নয়”।[৫৯]

নিঃসন্দেহে এটা হাতের যিনা। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْفَرْجُ يَزْنِي »

“দু’চোখ যিনা করে, দু’হাত যিনা করে, দু’পা যিনা করে এবং লজ্জাস্থানও যিনা করে”।[৬০]

---

[59] ত্বাবরাণী; সিলসিলা সহীহাহ, হাদীস নং ২২৬।

[60] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৩৯১২; সহীহুল জামে‘, হাদীস নং ৪১২৬।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অধিক পবিত্র মনের মানুষ আর কে আছে? অথচ তিনি বলেছেন,

«إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاء»

“আমি নারীদের সাথে মুসাফাহা করি না”।[৬১]

তিনি আরও বলেছেন,

«لا أمس أيدى النساء»

“আমি নারীদের হাত স্পর্শ করি না”।[৬২]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেছেন,

«لاَ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالكَلاَمِ»

“আল্লাহর শপথ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত কখনই কোনো বেগানা নারীর হাত স্পর্শ করে নি। তিনি মৌখিক বাক্যের মাধ্যমে তাদের বায়‘আত নিতেন”।[৬৩]

সুতরাং আধুনিক সাজতে গিয়ে যারা নিজেদের বন্ধুদের সাথে মুসাফাহা না করলে স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার হুমকি দেয় তারা যেন হুঁশিয়ার হয়। জানা আবশ্যক যে, মুসাফাহা কোনো আবরণের সাহায্যে হোক বা আবরণ ছাড়া হোক উভয় অবস্থাতেই হারাম।

২৬. পুরুষের মাঝে সুগন্ধি মেখে নারীর গমনাগমন

আজকাল আতর, সেন্ট ইত্যাদি নানা প্রকার সুগন্ধি মেখে নারীরা ঘরে-বাইরে পুরুষদের মাঝে চলাফেরা করছে। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন,

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»

---

61 মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৭৫৩; সহীহুল হাদীস, হাদীস নং ২৫০৯।

62 ত্বাবরাণী; কাবীর, ২৪/৩৪২; সহীহুল জামে‘, হাদীস নং ৭০৫৪।

63 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৬৬।

“পুরুষরা গন্ধ পাবে এমন উদ্দেশ্যে আতর মেখে কোনো মহিলা যদি পুরুষদের মাঝে গমন করে তাহলে সে একজন ব্যভিচারিণী বলে গণ্য হবে”।[৬৪]

অনেক মহিলা তো এ ব্যাপারে একেবারে উদাসীন কিংবা তারা বিষয়টিকে লঘুভাবে গ্রহণ করছে। তারা সেজেগুজে সুগন্ধি মেখে ড্রাইভারের সাথে গাড়ীতে উঠছে, দোকানে যাচ্ছে, স্কুল-কলেজে যাচ্ছে; কিন্তু শরী‘আতের নিষেধাজ্ঞার দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করছে না। নারীদের বাইরে গমনকালে শরী‘আত এমন কঠোরতা আরোপ করেছে যে, তারা সুগন্ধি মেখে থাকলে নাপাকী হেতু ফরয গোসলের ন্যায় গোসল করতে হবে। এমনকি যদি মসজিদে যায় তবুও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لا تُقبلُ صَلاةٌ لامْرَأةٍ تطيَّبت لهذا المسجدِ حتى ترجع فتغتَسِلَ غُسْلَها مِنَ الجنابةِ»

“যে মহিলা গায়ে সুগন্ধি মেখে মসজিদের দিকে বের হয় এজন্য যে, তার সুবাস পাওয়া যাবে, তাহলে তার সালাত তদবধি গৃহীত হবে না যে পর্যন্ত না সে নাপাকীর নিমিত্ত ফরয গোসলের ন্যায় গোসল করে”।[৬৫]

বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানে, হাটে-বাজারে, যানবাহনাদিতে, নানা ধরনের মানুষের সমাবেশে, এমনকি রমযানের রাতে মসজিদে আসার সময় তথা সর্বত্র মহিলারা যে সুগন্ধিযুক্ত প্রসাধনী আতর, সেন্ট, আগর, ধূনা, চন্দনকাঠ ইত্যাদি নিয়ে যাতায়াত করছে তার বিরুদ্ধে একমাত্র আল্লাহর কাছেই সকল অভিযোগ। অথচ শরী‘আত তো শুধু মহিলাদের জন্য সে আতরের অনুমোদন দিয়েছে যার রঙ হবে প্রকাশিত পক্ষান্তরে গন্ধ হবে অপ্রকাশিত। আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ না হন। অপগণ্ড নর-নারীর কাজের জন্য সৎ লোকদের পাকড়াও না করেন এবং সবাইকে সিরাতুল মুস্তাকীমে পরিচালিত করেন। আমীন!

---

[64] মুসনাদে আহমদ; সুনান নাসাঈ; মিশকাত, হাদীস নং ১০৬৫।

[65] মুসনাদে আহমদ ২/৪৪৪; সহীহুল জামে‘, হাদীস নং ২৭০৩।

২৭. মাহরাম আত্মীয় ছাড়া স্ত্রীলোকের সফর

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»

“কোনো মহিলা স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম এমন কোনো আত্মীয়কে সাথে না নিয়ে যেন ভ্রমণ না করে”।[৬৬]

[এ নির্দেশ সকল প্রকার সফরের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য; এমনকি হজের সফরের ক্ষেত্রেও।] মাহরাম কোনো পুরুষ তাদের সাথে না থাকলে দুশ্চরিত্রের লোকদের মনে তাদের প্রতি কুচিন্তা জাগ্রত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। এভাবে তারা তাদের পিছু নিতে পারে। আর নারীরা তো প্রকৃতিগত ভাবেই দুর্বল। তারা তাদের মান, ইযযত, আব্রু নিয়ে সামান্যতেই বিব্রত বোধ করে। এমতাবস্থায় দুষ্টলোকেরা তাদের পিছু নিলে বাধা দেওয়া বা আত্মরক্ষামূলক কিছু করা তাদের জন্য কষ্টকর তো বটেই।

অনেক মহিলাকে বিমান কিংবা অন্য যানবাহনে উঠার সময় বিদায় জানাতে দু’একজন মাহরাম নিকটজন হাযির থাকে, আবার তাকে স্বাগত জানাতেও এমন দু’একজন হাযির থাকে। কিন্তু পুরো সফরে তার পাশে থাকে কে? যদি বিমানে কোনো ত্রুটি দেখা দেয় এবং তা অন্য কোনো বিমানবন্দরে অবতরণে বাধ্য হয় কিংবা নির্দিষ্ট বিমানবন্দরে অবতরণে বিলম্ব ঘটে বা উড্ডয়নের সময়সূচী পরিবর্তন হয়, তাহলে তখন অবস্থা কি দাঁড়াবে? [ট্রেন, বাস, স্টীমার প্রভৃতি সফরেও এরূপ ঘটনা হর-হামেশা ঘটে। তখন কী যে অবস্থায় সৃষ্টি হয় তা ভুক্তভোগী ছাড়া বুঝিয়ে বলা কষ্টকর। সুতরাং সাথে একজন মাহরাম পুরুষ থাকা একান্ত দরকার, যে তার পাশে বসবে এবং আপদে-বিপদে ও উঠা-নামায় সাহায্য করবে।]

---

[66] সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত হাদীস নং ২৫১৫ (হজ্জ অধ্যায়)।

মাহরাম হওয়ার জন্য চারটি শর্ত রয়েছে। যথা-মুসলিম হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া ও পুরুষ হওয়া। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوِ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا»

"কোনো মহিলা যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের ওপর ঈমান রাখে তার জন্য তিন দিন বা ততোধিক সফর করা বৈধ নয়; যদি না তার সাথে থাকে তার পিতা, তার পুত্র, তার স্বামী, তার ভাই অথবা তার কোনো মাহরাম পুরুষ"।[৬৭]

২৮. গায়ের মাহরাম মহিলার প্রতি ইচ্ছাপূর্বক দৃষ্টিপাত করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝٣٠﴾ [النور: ٣٠]

"হে নবী! আপনি মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নিচু করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে। এ ব্যবস্থা তাদের জন্য পবিত্রতম। নিশ্চয় তারা যা করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত আছেন"। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩০]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ»

"চোখের যিনা দৃষ্টিপাত"।[৬৮]

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে সব স্ত্রীলোককে দেখা হারাম করে দিয়েছেন তাদেরকে দেখা হল চোখের যিনা। তবে শর'ঈ অনুমোদন রয়েছে এমন সব প্রয়োজনে তাদের প্রতি তাকানো যাবে এবং যতটুকু দেখা দরকার তা দেখা

[67] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪০।

[68] সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৮৬।

যাবে। যেমন, বিবাহের জন্য কনে দেখা ও ডাক্তার কর্তৃক রুগিনীকে দেখা নিষিদ্ধ নয়।

পুরুষদের ন্যায় মহিলারাও বেগানা পুরুষের পানে কুমতলবে তাকাতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ [النور: ٣١]

"হে নবী! আপনি বিশ্বাসী নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নীচু রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হিফাযত করে"। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১]

অনুরূপভাবে দাঁড়ি-গোফ বিহীন সুন্দর ও সুশ্রী বালকদের দিকে কুমতলবে তাকানোও হারাম।

তদ্রূপ পুরুষের সতর পুরুষের দেখা এবং নারীর সতর নারী কর্তৃক দেখাও হারাম। আর যে সতর দেখা জায়েয নেই তা স্পর্শ করাও জায়েয নেই। এমনকি কোনো আবরণ যোগে হলেও জায়েয নেই।

কিছু লোক শয়তানী ফেরেবে পড়ে পত্র-পত্রিকা ও সিনেমার ছবি দেখে থাকে। তাদের দাবী, 'এসব ছবির কোনো বাস্তবতা নেই। সুতরাং এগুলো দেখলে দোষ হবে না'। অথচ এগুলোর ক্ষতিকর এবং যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী প্রভাব খুবই স্পষ্ট।

২৯. দাইয়ূছী

যে নারী বা পুরুষ পর্দা মানে না তাকে দাইয়ূছী বলা হয়। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُّ، وَالدَّيُّوثُ "، الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ»

"তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন। লাগাতার শরাব পানকারী, মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান এবং দাইয়ূছী, যে নিজ পরিবারের মধ্যে বেহায়াপনাকে জিইয়ে রাখে'। [৬৯]

আমাদের যুগে পর্দাহীনতার নিত্যনতুন সংস্করণ বের হচ্ছে। বাড়ীতে কন্যা কিংবা স্ত্রীকে একজন বেগানা পুরুষের পাশে বসে আলাপ করতে দেখেও বাড়ীর কর্তা পুরুষটি কিছুই বলেন না। বরং তিনি যেন এরূপ একাকী আলাপে খুশীই হন। মহিলাদের কোনো বেগানা পুরুষের সাথে একাকী বাইরে যাওয়াও দাইয়ূছী। ড্রাইভারের সাথে অনেক স্ত্রীলোককে এভাবে একাকী বাইরে যেতে দেখা যায়। বিনা পর্দায় তাদেরকে বাইরে যেতে দেওয়াটাই দাইয়ূছী। এভাবে বাইরে বের হলে পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি তাদের প্রতি পড়ে।

আবার ফিল্ম কিংবা যে সকল পত্রিকা পরিবেশকে কলুষিত করে ও অশ্লীলতার বিস্তার ঘটায় সেগুলো আমদানী করা এবং বাড়ীতে স্থান দেওয়াও দাইয়ূছী। সুতরাং এসব হারাম থেকে আমাদের অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

৩০. পালক সন্তান গ্রহণ ও নিজ সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করা

কোনো মুসলিমের জন্য স্বীয় পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দেওয়া শরী'আতে বৈধ নয়। অনুরূপভাবে এক গোত্রের লোক হয়ে নিজেকে অন্য গোত্রের লোক বলে দাবী করাও জায়েয নয়। বস্তুগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অনেকে এভাবে অপরকে নিজের পিতা হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকে। সরকারী তালিকায় তাদের মিথ্যা বংশ পরিচয় তুলে ধরে। শৈশবে যে পিতা তাকে ত্যাগ করেছে তার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ অনেকে লালন-পালনকারীকে পিতা বলে ডাকে। কিন্তু এসবই হারাম। এর ফলে নানাক্ষেত্রে বিশৃংখলা দেখা দেয়। যেমন মাহরাম পুরুষ, মীরাছ, বিয়ে, শাদী ইত্যাদির বিধানে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়।

---

[69] মুসনাদে আহমদ; সুনান নাসাঈ; মিশকাত, হাদীস নং ৩৬৫৫।

সা‘দ ও আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

«مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»

“জেনে শুনে যে নিজ পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দেয়, তার ওপর জান্নাত হারাম”।[৭০]

যে সকল নিয়ম ও কাজ বংশ নিয়ে অসারতা তৈরী করে তোলে কিংবা মিথ্যা সাব্যস্ত করে শরী‘আতে এগুলো সবই হারাম। কেউ আছে, স্ত্রীর সাথে ঝগড়া বাঁধলে একেবারে দিশাহীন হয়ে তার বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ আনয়ন করে এবং কোনো প্রমাণ ছাড়াই নিজ সন্তানের পরিচয় অস্বীকার করে; অথচ সে ভালোমতই জানে যে, সন্তানটি তারই ঔরসে জন্ম নিয়েছে। আবার অনেক মহিলা আছে, যারা স্বামীর আমানতের খেয়ানত করে অন্যের দ্বারা গর্ভবর্তী হয় এবং সেই জারজকে স্বামীর বৈধ সন্তান হিসাবে তার বংশভুক্ত করে দেয়। এসবই হারাম। এ বিষয়ে কঠোর তিরস্কার উচ্চারিত হয়েছে। লি‘আনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ»

“যে মহিলা কোনো সন্তানকে এমন কোনো গোত্রভুক্ত করে দেয় যে আসলে ঐ গোত্রভুক্ত নয়, আল্লাহর নিকট তার কোনোই মূল্য নেই এবং আল্লাহ তাকে কখনই তার জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে পুরুষ নিজ সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করবে এমতাবস্থায় যে সে তার দিকে তাকিয় আছে আল্লাহ তার

[70] সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৩৩১৪।

থেকে পর্দা করে নিবেন এবং পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল লোকের সামনে তাকে অপদস্থ করবেন"।[৭১]

৩১. সুদ খাওয়া

আল্লাহ তা'আলা সূদখোর ব্যতীত আর কারো বিরুদ্ধে স্বয়ং যুদ্ধের ঘোষণা দেননি। তিনি বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ۝٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ۝٢٧٩﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩]

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর তাকাওয়া অবলম্বন কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর যদি তোমরা তা না কর, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শোন" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৮-২৭৯]

আল্লাহর নিকট সূদ খাওয়া যে কত মারাত্মক অপরাধ তা অনুধাবনের জন্য উক্ত আয়াতদ্বয়ই যথেষ্ট। সূদবৃত্তি দারিদ্র্য, মন্দা ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা, অর্থনৈতিক স্থবিরতা, বেকারত্ব বৃদ্ধি, বহু কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াত্ব ইত্যাদির ন্যায় কত যে জঘন্য ক্ষতি ও ধ্বংসের দিকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ঠেলে দিচ্ছে তা পর্যবেক্ষক মাত্রই অনুধাবন করতে সক্ষম। প্রতিদিনের ঘাম ঝরানো শ্রমের বিনিময়ে যা অর্জিত হয়, সূদের অতলগহ্বর পূরণেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। সূদের ফলে সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণির উদ্ভব হয়। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে ব্যাপক সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ে। সম্ভবতঃ এসব কারণেই আল্লাহ তা'আলা সূদীকারবারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

---

[71] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ২২৬৩; মিশকাত, হাদীস নং ৩৩১৬, সনদ দুর্বল।

সূদী কারবারে মূল দু’পক্ষ, মধ্যস্থতাকারী, সহযোগিতাকারী ইত্যাকার যারাই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তারা সবাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানীতে অভিশপ্ত। জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ، وقال: هم سواء»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূদ গ্রহীতা, সূদ দাতা, সূদের লেখক এবং তার সাক্ষীদ্বয়কে অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন, তারা সবাই সমান অপরাধী”।[৭২]

এ কারণেই সূদ লিপিবদ্ধ করা, এর আদান-প্রদানে সহায়তা করা, সূদী দ্রব্য গচ্ছিত রাখা ও এর পাহারাদারীর কাজে নিযুক্ত হওয়া জায়েয নেই। মোটকথা, সূদের সূদের কাজে অংশগ্রহণ ও যে কোনোভাবে এর সাহায্য-সহযোগিতা করা হারাম।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মহাঅপরাধের কদর্যতা ফুটিয়ে তুলতে বড়ই আগ্রহী ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ»

“সূদের ৭৩টি দ্বার বা স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সহজতর স্তর হলো, নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচারের সমতুল্য। আর সবচেয়ে কঠিনতম স্তর হলো, মুসলিম ব্যক্তির মানহানি”।[৭৩]

আব্দুল্লাহ ইবন হানযালা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية»

---

[72] সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ২৮০৭।

[73] মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস নং ২২৫৯; সহীহুল জামে‘, হাদীস নং ৩৫৩৯।

“জেনেশুনে কোনো লোকের সূদের এক টাকা ভক্ষণ করা ৩৬ বার ব্যভিচার করা থেকেও কঠিন”।[৭৪]

সূদ ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবার জন্য সর্বদা হারাম। সবাইকে তা পরিহার করতে হবে। কত ধনিক-বণিক যে এ সূদের কারণে দেউলিয়া হয়ে গেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। সূদের সর্বনিম্ন ক্ষতি হলো, মালের বরকত উঠে যাবে, পরিমাণে তা যতই স্ফীত হউক না কেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قَلّ»

“সূদের দ্বারা সম্পদ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন তার শেষ পরিণতি হলো নিঃস্বতা”।[৭৫]

সূদের হার কমই হোক আর চড়াই হোক সবই হারাম। যেমন করে শয়তান দুনিয়াতে তার স্পর্শে কাউকে পাগল করে দেয়, তেমনি সূদখোর পাগল হয়ে হাশরের ময়দানে উত্থিত হবে [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫] যদিও সূদের লেনদেন গুরুতর অন্যায় তবুও মহান রাব্বুল আলামীন দয়াপরবশ হয়ে বান্দাকে তা থেকে তওবার উপায় বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩﴾ [البقرة: ٢٧٩]

“যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা তোমাদের মূলধন ফিরে পাবে। তোমরা না অত্যাচার করবে, আর না অত্যাচারিত হবে”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৯]

মুমিনের অন্তরে সূদের প্রতি ঘৃণা এবং তার খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে তীব্র অনুভূতি থাকা একান্ত আবশ্যক। এমনকি যারা টাকা-পয়সা ও মূল্যবান সম্পদ চুরি হয়ে যাওয়া কিংবা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয়ে সূদী ব্যাংকে জমা রাখে,

---

74 মুসনাদে আহমদ ৫/২২৫; সহীহ আল-জামে‘ ৩৩৭৫।

75 মুস্তাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ২২৬২।

তাদের মধ্যেও নিতান্ত দায়েপড়া ব্যক্তির ন্যায় অনুভূতি থাকতে হবে, যেন তারা মৃত জীব ভক্ষণ কিংবা তার থেকেও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। তাই তারা সব সময় আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং সূদী ব্যাংকের বিকল্প সূদহীন ভালো কোনো উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করবে। তাদের আমানতের বিপরীতে সূদী ব্যাংকের নিকট সূদ দাবী করা জায়েয নেই। বরং যে কোনো উপায়ে তার থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করবে, তা (ছওয়াবের নিয়তে] দান করবে না। কেননা আল্লাহ পবিত্র। পবিত্র বস্তু ছাড়া তিনি দানের স্বীকৃতি দেন না। নিজের কোনো কাজে সূদের অর্থ ব্যয় করা যাবে না। না পানাহারে, না পরিধেয়ে, না সওয়ারীতে, না বাড়ী-ঘর তৈরীতে, না পুত্র-পরিজন, স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতার ভরণ-পোষণে, না যাকাত আদায়ে, না ট্যাক্স পরিশোধে, না নিজের ওপর অন্যায়ভাবে আরোপিত অর্থ পরিশোধে। সূদের অর্থ কেবল আল্লাহর শাস্তির ভয়ে দায় মুক্তির জন্য এমনিতেই কাউকে দিয়ে দিতে হবে।

৩২. বিক্রিত পণ্যের দোষ গোপন করা

একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারের মধ্যে এক খাদ্যস্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে আঙ্গুলে আর্দ্রতা ধরা পড়ল। তিনি বিক্রেতাকে বললেন, ‘হে খাদ্য বিক্রেতা! ব্যাপার কি? সে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এতে বৃষ্টির পানি লেগেছে’। তিনি বললেন,

«أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»

“তুমি এগুলো স্তূপের উপরিভাগে রাখলে না কেন? তাহলে লোকে দেখতে পেত। মনে রেখো যে প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়”।[৭৬]

আজকাল আল্লাহর প্রতি ভয়ভীতি শূণ্য অনেক বিক্রেতাই ভালো পণ্যের সঙ্গে ত্রুটিযুক্ত কিংবা নিম্নমানের পণ্য মিশিয়ে বিক্রয় করে থাকে। কেউ কেউ

---

[76] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০২; মিশকাত, হাদীস নং ২৮৬০।

ত্রুটিযুক্ত পণ্যগুলোতে আঠা লাগিয়ে ঢেকে দেয়, কেউ কেউ গাইট কিংবা কন্টেইনারের নিচে রাখে। অনেকে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে নিম্নমানের দ্রব্যকে বাহ্যদৃষ্টিতে উন্নতমানের ও আকর্ষণীয় করে তোলে। কেউ কেউ গাড়ীর ইঞ্জীনের শব্দ গোপন করে বিক্রি করে পরে যখন সেটা নিয়ে যায় তখন তা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ পণ্য ব্যবহারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তা পরিবর্তন করে নতুন মেয়াদকালের ছাপ মেরে দেয়। কোনো কোনো বিক্রেতা ক্রেতাকে পণ্য নিরীক্ষণ ও যাচাই-বাছাই করতে দেয় না। মোটরগাড়ী, মেশিনারী যন্ত্রপাতি বিক্রেতাদেরও অনেকে রয়েছে, যারা ক্রেতাদের সামনে সেগুলোর ত্রুটি ও অসুবিধা তুলে ধরে না।

উল্লিখিত পদ্ধতির সকল কেনা-বেচাই হারাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ»

“এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। একজন মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের নিকট কোনো ত্রুটিপূর্ণ পণ্য বিক্রয়ের সময় পণ্যের ত্রুটি বর্ণনা না করা পর্যন্ত তা বিক্রয় করা বৈধ নয়”।[৭৭]

অনেকে প্রকাশ্য নিলামে দ্রব্য বিক্রয়কালে ‘এটা অমুক জিনিস’ এটা অমুক জিনিস’ এতটুকু বলেই অব্যাহতি পেতে চায়! দৃষ্টান্তস্বরূপ লোহার রড বিক্রেতা বলে ‘এটা লোহার গাদা’....‘এটা লোহার গাদা’ ইত্যাদি। কিন্তু গাদার মধ্যে যে ত্রুটি আছে তা বলে না। তার এ বিক্রয় বরকতশূণ্য হয়ে পড়বে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتفَرَّقَا، - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»

[77] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২২৪৬, সনদ সহীহ।

“দৈহিকভাবে পৃথক হওয়া কিংবা বিক্রয় প্রস্তাবও গ্রহণে মতান্তর না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই বিক্রয় কর্যকর করার কিংবা বাতিল করার অধিকার থাকে। যদি তারা সত্য বলে ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে, তবে তাদের কেনা-বেচায় বরকত হয়। আর যদি দু’জনে মিথ্যা বলে ও পণ্য বা মুদ্রার দোষ গোপন করে, তবে তাদের কেনা-বেচার বরকত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়”।[৭৮]

৩৩. দালালী করা

এমন অনেক লোক আছে যাদের পণ্য কেনার মোটেও ইচ্ছা নেই। কিন্তু অন্য লোকে যাতে ঐ পণ্য বেশি দামে কিনতে উদ্বুদ্ধ হয় সেজন্য পণ্যের পাশে ঘুরাঘুরি করে ও বাড়িয়ে বাড়িয়ে দাম বলতে থাকে। এটাই প্রতারণামূলক দালালী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ تَنَاجَشُوا»

“ক্রেতার ভান করে তোমরা পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিও না”।[৭৯]

এটা নিঃসন্দেহে এক শ্রেণির প্রতারণা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ»

‘চালবাজী ও ধোঁকাবাজী জাহান্নামে নিয়ে যায়”।[৮০]

পশু বিক্রয়, নিলামে বিক্রয় ও গাড়ী প্রদর্শনীতে অনেক দালালকে দেখতে পাওয়া যায় যাদের আয়-রোযগার সবই হারাম। কেননা এ উপার্জনের সাথে নানা রকম অবৈধ উপায় জড়িয়ে আছে। যেমন, প্রতারণামূলক দাম বৃদ্ধি বা মিথ্যা দালালী, ক্রেতার সাথে প্রতারণা, বিক্রেতাকে ধোঁকায় ফেলে পথিমধ্যেই তার পণ্য অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে খরিদ করা ইত্যাদি।

---

[78] সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ২৮০২।

[79] সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৫০২৮।

[80] সিলসিলা সহীহাহ, হাদীস নং ১০৫৭; সহীহুল জামে‘, হাদীস নং ৬৭২৫।

আর যদি পণ্যটি তার বা তাদের কারও হয়, তখন ঠিক উল্টোটি তারা করে থাকে, বিক্রেতারা একে অপরের জন্য দালাল সাজে কিংবা দালাল নিয়োগ করে। তার ক্রেতার বেশে খরিদ্দারদের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং পণ্যের দাম ক্রমাগত বাড়িয়ে দেয়। এভাবে তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে ধোঁকা দেয় ও তাদেরকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করে।

৩৪. জুমু'আর সালাতের আযানের পরে কেনা-বেচা করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝٩﴾ [الجمعة: ٩]

"হে ঈমানদারগণ! জুমু'আ দিবসে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং বেচা-কেনা ছেড়ে দাও। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জ্ঞান রাখ"। [সূরা আল-জুমু'আ, আয়াত ৯]

অত্র আয়াতদৃষ্টে আলিমগণ আযান থেকে শুরু করে ফরয সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেনা বেচা ও অন্যান্য সকল কাজকর্ম হারাম বলে উল্লেখ করেছেন। অনেক দোকানদারকে দেখা যায় তারা আযানের সময়ও নিজেদের দোকানে কিংবা মসজিদের সামনে কেনা বেচা চালিয়ে যেতে থাকে। যারা এ সময় কেনা-কাটায় অংশ নেয়, তারাও তাদের সাথে পাপে শরীক হয়। এমনকি তুচ্ছ একটি মিসওয়াক কেনা-বেচা করলেও ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই তাতে গোনাহগার হবে। আলেমগণের জোরালো মতানুসারে এ সময়ের কেনা-বেচা বাতিল বলে গণ্য হবে। অনেক হোটেল, বেকারী, ফ্যাক্টরী, কলকারখানা ইত্যাদির লোকেরা জুমু'আর সালাতের সময় তাদের শ্রমিকদের কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য করে। তাতে বাহ্যত: তাদের কিছু লাভ দেখা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে শ্রমিকদের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নোক্ত উক্তি মোতাবেক আমল করা কর্তব্য-

«لاَ طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ»

“আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো মানুষের আনুগত্য করা যাবে না”।[৮১]

৩৫. জুয়া

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠﴾ [المائدة: ٩٠]

“নিশ্চয় মদ, জুয়া, বেদী, ভাগ্য নির্ণয়ক তীর অপবিত্র শয়তানী কাজ। সুতরাং তোমরা তা থেকে বিরত থাক। তাতে তোমরা সফলকাম হবে”। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৯০]

জাহেলী যুগের লোকেরা জুয়া খেলায় ভীষণ অভ্যস্ত ছিল। জুয়ার যে পদ্ধতি তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল তা হল, তারা দশ জনে সমান অংক দিয়ে একটা উট ক্রয় করত, সেই উটের গোশত ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্য জুয়ার তীর ব্যবহার করা হতো। এটা এক প্রকার লটারী। ১০টি তীরের ৭টিতে কম-বেশী করে বিভিন্ন অংশ লেখা থাকত এবং অন্য সাত জন তাদের প্রচলিত নিয়মে কম-বেশি অংশ পেত। এভাবে তারা দশ জনের টাকায় কেনা উট সাত জনে ভাগ করে নিত। বর্তমানে জুয়ার নানা পদ্ধতি বের হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ:

লটারী: লটারী খুবই প্রসিদ্ধ জুয়া। লটারী নানা রকম আছে। তন্মধ্যে ব্যাপকতর হচ্ছে, নির্দিষ্ট অংকের টাকা কিংবা দ্রব্য পুরস্করের নামে প্রদানের বিনিময়ে নির্দিষ্ট নম্বরের কুপন ক্রয়-বিক্রয়। নির্দিষ্ট তারিখে বিক্রিত কুপনগুলোর ড্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম যে নম্বরের কুপনটি ওঠে সে প্রথম পুরস্কার পায়। এভাবে ক্রমানুযায়ী উদ্দিষ্ট সংখ্যক পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কারের অংকগুলোতে প্রায়শ তারতম্য থাকে। এ লটারী হারাম, যদিও আয়োজকরা একে ‘কল্যাণকর’ মনে করে।

---

[81] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১০৬৫।

পণ্যের মধ্যে অজ্ঞাত সংকেত: কোনো কোনো পণ্যের মধ্যে অজ্ঞাত নম্বর কিংবা সংকেত দেওয়া থাকে। ক্রেতারা ঐসব পণ্য খরিদের পর সেই বস্তু বা নম্বরের লটারী করে থাকে। অনেক সময় কোনো কোনো উৎপাদক কোম্পানী তাদের উৎপাদিত পণ্যের বহুল প্রসারের জন্য হাজার হাজার পণ্যের কোনো একটিতে পুরস্কারের সংকেত রেখে দেয়। সেই সংকেতটি পাওয়ার আশায় বহু মানুষ তা কেনায় মেতে উঠে। পরে দেখা যায় দু'একজনের বেশি কেউ পায় না। এরূপ বিক্রয়ে ক্রেতারা প্রতারিত হয় এবং সেই সাথে প্রতিযোগী কোম্পানীসমূহের ব্যবসায়ে ক্ষতি করা হয়।

বীমা: বর্তমানে বাজারে নানারকম বীমা বা ইনস্যুরেন্স চালু আছে। যেমন, জীবন বীমা, যানবাহন বীমা, পণ্য বীমা, অগ্নি বীমা ইত্যাদি। এমনকি অনেক গায়ক তাদের কণ্ঠস্বর পর্যন্ত বীমা করে থাকে। নানান ঝুঁকি হতে নিরাপত্তা জন্য এ ব্যবসা এখন জমজমাটভাবে চলছে।

উল্লিখিত জুয়া ছাড়াও যত প্রকার জুয়া আছে সবই কুরআনে বর্ণিত 'মাইসির'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। বর্তমানে জুয়ার মত বড় গুনাহের জন্য বিশেষভাবে অনেক আসর বসে, যা কোথাও 'হাউজি' কোথাও 'সবুজ টেবিল' নামে পরিচিত। অনুরূপভাবে ঘোড়-দৌড়, ফুটবল ও অন্যান্য খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় যে বাজী ধরা হয় তাও জুয়ার অন্তর্গত। আবার খেলাধূলার এমন অনেক দোকান ও বিনোদন কেন্দ্র আছে যেখানে জুয়ার চিন্তাধারায় গড়ে উঠে নানারকম খেলনা সামগ্রী রয়েছে। যেমন, ফ্লাস, পাশা ইত্যাদি।

আর মানুষ যেসব প্রতিযোগিতা করে থাকে তাতেও কিছু জুয়া রয়েছে। যেমন সেসব প্রতিযোগিতা যেখানে পুরষ্কার প্রতিযোগীদের কোনো এক বা একাধিক পক্ষ থেকে প্রদান করতে হয়। আলেমগণ সেটা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।[৮২]

---

[82] [কারণ প্রতিযোগিতা তিন প্রকার। এক. শর'ঈ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যপ্রসূত প্রতিযোগিতা। যেমন উট ও ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা, তীরন্দযী ও নিশানার প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। শর 'ঈ বিদ্যা যেমন কুরআন হিফয প্রতিযোগিতাও আলিমদের অগ্রাধিকারযোগ্য মতানুসারে এ শ্রেণির

৩৬. চুরি করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨﴾ [المائدة: ٣٨]

“পুরুষ ও নারী চোর চুরি করলে তোমরা তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত আদর্শদণ্ড। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৩৮]

চুরির মধ্যে মহাচুরি হলো, হজ ও ওমরার উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরীফে আগমনকারীদের দ্রব্যাদি চুরি করা। পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থানে চুরি করা আল্লাহর বিধানের প্রতি চরমভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শণ। এতে আল্লাহর বিধানকে থোড়াই কেয়ার করা হয়। এজন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণের সালাতের ঘটনায় বলেছিলেন,

«لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ، مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ»

অন্তর্ভুক্ত। এ জাতীয় প্রতিযোগিতা পুরস্কার সহ কিংবা পুরস্কারবিহীন যেভাবেই হোক মুবাহ বা বৈধ হবে। দুই. মূলে মুবাহ এমন সব প্রতিযোগিতা। যেমন, ফুটবল প্রতিযোগিতা, দৌড় প্রতিযোগিতা। তবে এগুলো হারাম শূণ্য হতে হবে। যেমন, এসব খেলা করতে কিংবা দেখতে গিয়ে সালাত বিনষ্ট করা কিংবা সতর খোলা হারাম। পুরস্কার ছাড়া এসব প্রতিযোগিতা জায়েয। তিন. মূলে হারাম কিংবা মাধ্যম হারাম এমন সব প্রতিযোগিতা। যেমন, বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে নষ্ট প্রতিযোগিতা, রেসলিং বা মুষ্টিযুদ্ধের প্রতিযোগিতা। মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় মুখমণ্ডলে আঘাত করা হয় অথচ মুখমণ্ডলে আঘাত করা হারাম। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৫৯; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৩৪২৫)। সুতরাং মুষ্টিযুদ্ধ হারামের মাধ্যম একটি প্রতিযোগিতা। অনুরূপভাবে মেষের লড়াই, মোরগের লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই ইত্যাদিও এ শ্রেণিভুক্ত।

"আমার সামনে জাহান্নামকে হাযির করা হয়। এটা সেই সময়ে হয়েছিল যখন তোমরা আমাকে পিছু হটতে দেখছিলে, আমি সেটার লেলিহান শিখায় আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে পিছিয়ে আসছিলাম। এমনি সময় আমি সেটার মধ্যে একজন বাঁকা মাথা বিশিষ্ট লাঠিওয়ালাকে দেখতে পেলাম, যে আগুনের মধ্যে তার পেট ধরে টানছে। সে বাঁকা মাথাবিশিষ্ট লাঠি দিয়ে হাজীদের জিনিসপত্র চুরি করত। ধরা পড়লে বলত, আমার লাঠির সাথে চলে এসেছিল বলে এমন হয়েছে। আর না ধরা পড়লে তা নিয়ে কেটে পড়ত"।[৮৩]

সরকারী সম্পদ চুরি করাও বড় আকারের চুরির অন্তর্ভুক্ত। কিছু লোক এ জাতীয় চুরিতে অভ্যস্ত। তারা বলে থাকে, অন্যরা চুরি করে তাই আমরাও করি। অথচ তারা জানে না, এতে সকল মুসলিম বা জনগণের সম্পদ চুরি করা হচ্ছে। আর যারা আল্লাহকে ভয় করে না তাদের কাজ কোনো দলীল হতে পারে না; তাদের অনুকরণও করা যাবে না।

কেউ কেউ কাফিরদের সম্পদ এ যুক্তিতে চুরি করে যে, লোকটা কাফির, তার সম্পদ মুসলিমের জন্য মুবাহ, অথচ তাদের ধারণা ভ্রান্তিপূর্ণ। কেননা যে সকল কাফির মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত কেবল তাদের সম্পদ মুসলিমদের জন্য বৈধ। কাফিরদের সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

অন্য লোকের পকেট থেকে কিছু তুলে নেওয়া বা পকেটমারাও চুরি। অনেকেই কারো সঙ্গে দেখা করতে তার বাড়ীতে যায় এবং চুরি করে আসে। অনেকে মেহমানদের ব্যাগ হাতড়িয়ে টাকা-পয়সা নিয়ে নেয়। আবার অনেক চোর বিপণীবিতানগুলোতে প্রবেশ করে পকেট কিংবা থলিতে দু'একটা দ্রব্য তুলে নেয়। অনেক মহিলা আছে, যারা তাদের পরিধেয়ের মধ্যে অনেক কিছুই লুকিয়ে নিয়ে যায়। কেউ কেউ সামান্য কিংবা সস্তা কোনো কিছু চুরি করাকে অপরাধ মনে করেন না। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[83] সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ২৯৪২।

«لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ»

"সে চোরের ওপর আল্লাহর লা'নত, যে একটি ডিম চুরি করার ফলে তার হাত কাটা হয় এবং যে এক গাছি রশি চুরি করার ফলে তার হাত কাটা যায়"।[৮৪]

যে যাই চুরি করুক না কেন আল্লাহর নিকটে তওবা করার সাথে সাথে তাকে ঐ চুরির দ্রব্য মালিকের নিকটে ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। চাই প্রকাশ্যে হউক কিংবা গোপনে হউক, সরাসরি হউক কিংবা কারো মাধ্যমে হউক। কিন্তু অনেক চেষ্টার পরও যদি মালিক কিংবা তার ওয়ারিসদের খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে চুরির মাল মালিকের নামে দান করে দিতে হবে।

৩৭. ঘুষ আদান-প্রদান

কারো হক বিনষ্ট করা কিংবা কোনো অন্যায়কে কার্যকর করার জন্য বিচারক কিংবা শাসককে ঘুষ দেওয়া মারাত্মক অপরাধ। কেননা ঘুষের ফলে বিচারক প্রভাবিত হয়, হকদারের প্রতি অবিচার করা হয়, বিচার ও প্রশাসন ব্যবস্থায় ধস নেমে আসে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٨﴾ [البقرة: ١٨٨]

"তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং জেনে-বুঝে মানুষের সম্পদ থেকে ভক্ষণের জন্য বিচারকদের দরবারে উহার আরযী পেশ করো না"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৮]

অনুরূপভাবে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

«لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ»

---

84 সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৩৫৯২।

“বিচার-ফায়সালায় ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়ের উপরে আল্লাহ তা‘আলা লা‘নত করেছেন”।[৮৫]

তবে যদি ঘুষ প্রদান ব্যতীত নিজের পাওনা বা অধিকার আদায় সম্ভব না হয় কিংবা ঘুষ না দিলে যুলুম-অত্যাচারের শিকার হতে হয় তবে ঐ অধিকার আদায় ও যুলুম নিরোধ কল্পে ঘুষ দিলে ঘুষদাতা উক্ত শাস্তির আওতায় পড়বে না।

বর্তমানে ঘুষের বিস্তার রীতিমত উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এমনকি অনেক চাকুরের নিকট মূল বেতনের চেয়ে তা রীতিমত আয়ের এক বড় উৎস। অনেক অফিস ও কোম্পানী নানা নামে-উপনামের ছদ্মাবরণে ঘুষকে আয়ের বাহানা বানিয়ে নিয়েছে। অনেক কাজই এখন ঘুষ ছাড়া শুরু ও শেষ হয় না। এতে গরীব ও অসহায়রা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ঘুষের কারণে ভঙ্গ হয়ে যায়। ঘুষ না দিলে ভালো সার্ভিসের আশা করা বাতুলতা মাত্র। যে ঘুষ দিতে পারে না তার জন্য নিকৃষ্ট মানের সার্ভিস অপেক্ষা করে। হয়ত তাকে বারবার ঘুরানো হয়, নয়ত তার দরখাস্ত বা ফাইল একেবারে গায়েব করে দেওয়া হয়। আর যে ঘুষ দিতে পারে সে পরে এসেও ঘুষ দিতে অক্ষম ব্যক্তির নাকের ডগার উপর দিয়ে বহু আগেই কাজ সমাধা করে চলে যায়। অথচ ঘুষের কারণে যে অর্থ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পাওয়ার কথা ছিল তা তাদের হাতে না পৌঁছে বরং ঘুষখোর কর্মকর্তা-কর্মচারীর পকেটস্থ হয়।

এসব নানাবিধ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সবার বিরুদ্ধে বদ দো‘আ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

«لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي»

---

[85] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৯০১১; সহীহুল জামে‘, হাদীস নং ৫০৯৩।

"ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের ওপর আল্লাহর লা'নত"।[৮৬]

৩৮. জমি আত্মসাৎ করা

যখন মানুষের মন থেকে আল্লাহভীতি উঠে যায় তখন তার শক্তি, বুদ্ধি সবই তার জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। সে এগুলোকে নির্বিচারে যুলুম-নিপীড়নে ব্যবহার করে। যেমন শক্তির বলে অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত করা। ভূমি জবরদখল এরই একটি অংশ। এর পরিণাম খুবই মারাত্মক। আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ»

'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো জমির কিয়দংশ জবরদখল করবে, কিয়ামত দিবসে এজন্য তাকে সপ্ত যমীন পর্যন্ত পুঁতে দেওয়া হবে"।[৮৭]

ইয়া'লা ইবন মুররাহ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ، كَلَّفَهُ اللَّهُ أَنْ يَحْفِرَهُ (وفي الطبراني: يحضره) حَتَّى يَبْلُغَ سَبْعَ أَرَضِينَ، ثُمَّ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَفْصِلَ بَيْنَ الناس»

'যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি জবরদখল করবে আল্লাহ তাকে যমীনের সপ্ত স্তর পর্যন্ত তা খনন করতে বাধ্য করবেন। (ত্বাবরানীর বর্ণনায়, 'তা উপস্থিত করতে বাধ্য করবেন' বলা হয়েছে) অতঃপর কিয়ামত দিবসে তা তার গলায় বেড়ী করে রাখা হবে, যে পর্যন্ত না মানুষের মাঝে বিচারকার্য শেষ হয়"।[৮৮]

জমির সীমানা বা আইল পরিবর্তন করাও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[86] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৩১৩; সহীহুল জামে', হাদীস নং ৫১১৪।

[87] সহীহ বুখারী; মিশকাত, হাদীস নং ২৯৫৮।

[88] মুসনাদে আহমদ; মিশকাত, হাদীস নং ২৯৬০, সনদ সহীহ।

«لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ»

‘যে ব্যক্তি জমির নিশানা বা আইল পরিবর্তন করে আল্লাহ তার ওপর অভিসম্পাত করেন”।[৮৯]

৩৯. সুপারিশের বিনিময়ে উপহার গ্রহণ

মানুষের মান-মর্যাদা ও পদাধিকার বান্দার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহরাজির অন্যতম। এ অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য। মুসলিমদের উপকারে তাদের পদ ও মর্যাদাকে কাজে লাগানো উক্ত শুকরিয়ারই অংশ বিশেষ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ»

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের উপকার করতে সক্ষম, সে যেন তা করে”।[৯০]

যে ব্যক্তি তার পদের মাধ্যমে কোনো মুসলিম ভাইকে যুলুম থেকে রক্ষা করে কিংবা তার কোনো কল্যাণ সাধন করে এবং তা করতে গিয়ে কোনো হারাম উপায় অবলম্বন করে না বা কারো অধিকার ক্ষুন্ন করে না, সে ব্যক্তির নিয়ত বিশুদ্ধ হলে আল্লাহর নিকট সে পারিতোষিক পাওয়ার যোগ্য। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا»

“তোমরা সুপারিশ কর, বিনিময়ে তোমরা সাওয়াব পাবে”।[৯১]

এ সুপারিশ ও মধ্যস্থতার জন্য কোনো বিনিময়ে গ্রহণ করা জায়েয নয়। আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[89] সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৪০৭০।

[90] সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৪৫২৯।

[91] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৩২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১৩২।

«مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا»

“সুপারিশ করার দরুন যে ব্যক্তি সুপারিশকারীকে উপহার দেয় এবং (তার থেকে) সে ঐ উপহার গ্রহণ করে তাহলে সে ব্যক্তি সূদের দ্বারদেশগুলোর মধ্য থেকে একটি বৃহৎ দ্বারে উপনীত হয়”।[৯২]

এক শ্রেণির মানুষ আর্থিক স্বার্থের বিনিময়ে তাদের পদমর্যাদাকে কাজে লাগাতে চায় বা মধ্যস্থতা করতে সম্মত হয়। যেমন, কোনো একজন লোককে চাকরি দেওয়া অথবা কাউকে কোনো প্রতিষ্ঠান বা এলাকা থেকে অন্য প্রতিষ্ঠান বা এলাকায় বদলি করে দেওয়া কিংবা কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে চিকিৎসা করে দেওয়া ইত্যাদির জন্য অর্থলাভের শর্ত আরোপ করে। কিন্তু এরূপ স্বার্থের জন্য শর্তারোপ ও তার সুযোগ গ্রহণ করা হারাম। উপরোক্ত হাদীছই তার জ্বলন্ত প্রমাণ; বরং যে কোনো কিছু গ্রহণ করাই এ হাদীসের বাহ্যিক দিকের আওতায় পড়ে, চাই পূর্বে কোনো কিছুর শর্ত আরোপ না করা হোক। [শাইখ আব্দুল আযীয ইবন বায রহ. এর জবানী থেকে] আসলে ভালো কাজের কর্মীর জন্য আল্লাহর পারিতোষিকই যথেষ্ট, যা সে কিয়ামত দিবসে পাবে।

জনৈক ব্যক্তি কোনো এক প্রয়োজনে হাসান ইবন সাহলের নিকট এসে তাঁর সুপারিশ প্রার্থনা করে। তিনি তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। ফলে লোকটি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগল। তখন হাসান ইবন সাহল তাকে বললেন, ‘কি জন্য তুমি আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছ? আমরা তো মনে করি পদেরও যাকাত আছে, যেমন অর্থ-সম্পদের যাকাত আছে”।[৯৩]

এখানে এ পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করা যথার্থ হবে যে, কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য ব্যক্তি বিশেষকে পারিশ্রমিক দিয়ে নিযুক্ত করা এবং শর্ত সাপেক্ষে বৈধ

---

92 সুনান আবু দাউদ; মিশকাত, হাদীস নং ৩৭৫৭।

93 . ইবন মুফলিহ, আল-আদাবুশ শার’ঈয়্যাহ ২/১৭৬ পৃ:।

মজুরী প্রদান জায়েয শ্রেণিভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে আর্থিক সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে নিজ পদমর্যাদা ও মধ্যস্থতাকে কাজে লাগিয়ে সুপারিশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এটা নিষিদ্ধ। উভয় প্রক্রিয়া এক নয়।

৪০. শ্রমিক থেকে ষোলআনা শ্রম আদায় করে পুরো মজুরী না দেওয়া

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রমিকের পাওনা দ্রুত পরিশোধে জোর তাকীদ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

«أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ»

"তোমরা শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তার পাওনা পরিশোধ কর"।[৯৪]

শ্রমিক, কর্মচারী, দিনমজুর যেই হোক না কেন তার থেকে শ্রম আদায়ের পর যথারীতি তার পাওনা পরিশোধ না করা মহা যুলম। এ যুলুম এখন হর-হামেশাই হচ্ছে। শ্রমিকদের প্রতি যুলুমের বিচিত্র রূপ রয়েছে। যেমন,

১. শ্রমিক স্বীয় কাজের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ পেশ করতে না পারায় তার পাওনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা। এক্ষেত্রে দুনিয়াতে তার হক নষ্ট হলেও কিয়ামতে তা বৃথা যাবে না। কিয়ামতের দিন যালিমের পূণ্য থেকে মাযলূমের পাওনা পরিমাণ পূন্য প্রদান করা হবে। যদি তার পূণ্য নিঃশেষ হয়ে যায় তাহলে মাযলুমের পাপ যালিমের ঘাড়ে চাপানো হবে, তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৯৫]

২. যে পরিমাণ অংক মজুরী দেওয়ার জন্য চুক্তি হয়েছে তার থেকে কম দেওয়া। এ বিষয়ের সমূহ ক্ষতি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন,

﴿وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١﴾ [المطففين: ١]

---

[94] .ইবন মাজাহ; মিশকাত, হাদীস নং ২৯৮৭।

[95] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৮১; মিশকাত, হাদীস নং ৫১২৭।

“যারা ওযনে কম দেয় তাদের জন্য দুর্ভোগ রয়েছে”। [সূরা আল-মুতাফফিফীন, আয়াত: ১]

অনেক নিয়োগকর্তা দেশ-বিদেশ থেকে নির্দিষ্ট বেতন বা মজুরীর চুক্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করে থাকে। তারপর তারা যখন কাজে যোগদান করে তখন সে একতরফাভাবে চুক্তিপত্র পরিবর্তন করে বেতন বা মজুরীর পরিমাণ অনেক কমিয়ে দেয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐসব শ্রমিক তখন কাজ করতে বাধ্য হয়। অনেক সময় শ্রমিকরা তাদের অধিকারের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে পারে না। তখন কেবল আল্লাহর নিকট অভিযোগ দায়ের করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় থাকে না। এক্ষেত্রে যদি নিয়োগকর্তা মুসলিম ও নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি কাফির হয় তবে বেতন মজুরী হ্রাসে ঐ শ্রমিকের ইসলাম গ্রহণে বাধা সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে কিয়ামত দিবসে ঐ কাফিরের পাপ তাকে বহন করতে হবে।

৩. বেতন বা মজুরী বৃদ্ধি না করে কেবল কাজের পরিমাণ কিংবা সময় বৃদ্ধি করা। এতে শ্রমিককে তার অতিরিক্ত কাজের পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করা হয়।

৪. বেতন বা মজুরী পরিশোধে গড়িমসি করা। অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা, তদবীর তাগাদা, অভিযোগ-অনুযোগ ও মামলা-মোকদ্দমার পর তবেই প্রাপ্য অর্থ আদায় সম্ভব হয়। অনেক সময় নিয়োগকারী শ্রমিককে ত্যক্ত-বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে টাল-বাহানা করে, যেন সে পাওনা ছেড়ে দেয় এবং কোনো দাবী না তুলে চলে যায়। আবার কখনো তাদের টাকা খাটিয়ে মালিকের তহবিল স্ফীত করার কুমতলব থাকে। অনেকে তা সূদী কারবারেও খাটায়। অথচ সেই শ্রমিক না নিজে খেতে পাচ্ছে না নিজের পুত্র-পরিজনদের জন্য কিছু পাঠাতে পারছে। যদিও তাদের মুখে দু’মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্যই সে এ দূর দেশে পড়ে আছে। এজন্যই এ সকল যালিমের জন্য এক কঠিন দিনের শাস্তি অপেক্ষা করছে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

«ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ»

“কিয়ামত দিবসে আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব। ১. যে ব্যক্তি আমার নামে শপথ করে কিছু দেওয়ার কথা বলে তারপর তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। ২. যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন বা মুক্ত লোককে ধরে বিক্রয় করে তার মূল্য ভোগ করে। ৩. যে ব্যক্তি কোনো মজুরকে নিয়োগের পর তার থেকে পুরো কাজ আদায় করেও তার পাওনা পরিশোধ করে না”।[৯৬]

৪১. সন্তানদের উপহার প্রদানে সমতা রক্ষা না করা

আমাদের সমাজে এমন অনেক মাতা-পিতা আছেন, যারা এক সন্তানকে ‘হেবা’ বা উপহার দিলে অন্যান্য সন্তানকে দেন না। নিয়ম হলো, সন্তানদের সবাইকে বিশেষ কোনো উপহার সমান হারে দিতে হবে; আর না হলে কাউকে দেওয়া যাবে না। নিয়ম লঙ্ঘন করে সন্তানবিশেষকে দেওয়া ও অন্যদের বঞ্চিত করা ঠিক নয়। শর‘ঈ কারণ ব্যতীত এরূপ দান করলে তা হারাম বলে গণ্য হবে। শর‘ঈ কারণ বলতে সন্তানদের একজনের এমন প্রয়োজন দেখা দিয়েছেন, যা অন্যদের নেই। যেমন, সে অসুস্থ কিংবা বেকার অথবা ছাত্র কিংবা সংসারে তার সদস্য সংখ্যা অনেক তথা সে পোষ্য ভারাক্রান্ত অথবা সে কুরআন মুখস্থ করেছে তাই উৎসাহ ধরে রাখতে কিছু দেওয়া ইত্যাদি। পিতা এরূপ শর‘ঈ কারণবশতঃ কোনো সন্তানকে কিছু দেওয়ার সময় নিয়ত করবে যে, অন্য কোনো সন্তানের যদি এরূপ প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তাকেও তিনি তার প্রয়োজন মত দিবেন। এ কথার সাধারণ দলীল আল্লাহর বাণী:

﴿ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ﴾ [المائدة: ٨]

---

[96] সহীহ বুখারী; মিশকাত, হাদীস নং ২৯৮৪।

"তোমরা সুবিচার কর। ইহা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর"। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৮]

আর বিশেষ দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস। একদা নু'মান ইবন বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পিতা তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আমি আমার এ পুত্রকে একটা দাস দান করেছি'। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বললেন, 'তোমার সকল সন্তানকে কি তার মত করে দান করেছ? পিতা বললেন, 'না'। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাহলে উক্ত দান ফেরত নাও'। অন্য বর্ণনায় আছে, 'তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সুবিচার কর'। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বাড়ী ফিরে এসে ঐ দাস ফেরত নেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ»

"তাহলে তুমি আমাকে সাক্ষী করো না। কেননা যুলুমের সাক্ষী আমি হতে পারি না"।[৯৭]

কোনো কোনো পিতাদের দেখা যায় যে, তারা সন্তান বিশেষকে অহেতুক অগ্রাধিকার দানে আল্লাহকে ভয় করেন না। এর ফলে সন্তানদের মধ্যে মন কষাকষির সৃষ্টি হয়। তারা একে অপরের প্রতি শত্রু ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। কখনো কোনো সন্তানকে পিতৃকুলের আকৃতি পাওয়ার জন্য দেওয়া হয়, অন্য সন্তানকে মাতৃকুলের আকৃতি পাওয়ার জন্য বঞ্চিত করা হয়। এক স্ত্রীর সন্তানকে দেওয়া হয়, অন্য স্ত্রীর সন্তানদের দেওয়া হয় না। আবার অনেক সময় তাদের একজনের সন্তানদেরকে বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়, কিন্তু অন্যজনের সন্তানদের ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এর কুফল

---

97 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬২৩; মিশকাত, হাদীস নং ৩০৯০।

অচিরেই ঐসব মাতা-পিতাকে ভোগ করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই ঐসব বঞ্চিত সন্তান ভবিষ্যতে তাদের পিতার সঙ্গে সদাচরণ করে না।

সন্তানদের মধ্যে দান-দক্ষিনায় কাউকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فَلَا أَشْهَدُ عَلَى شَيْءٍ، أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟»

"তোমার সন্তানেরা তোমার সাথে সমান সদাচরণ করুক তা কি তোমাকে আনন্দিত করবে না"?[৯৮]

সুতরাং সন্তানদের প্রতি দান-দক্ষিণায় সমতা রক্ষা করা অপরিহার্য।

৪২. ভিক্ষা বৃত্তি

সাহল ইবন হানযালিয়াহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ» وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ ...أو وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ قَالَ: «قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ» ... «أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ»

"যার নিকট অভাব মোচনের মত সামগ্রী আছে অথচ সে ভিক্ষা করে, সে জাহান্নামের অঙ্গারকেই কেবল বর্ধিত করে। সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কতটুকু সম্পদ থাকলে ভিক্ষা করা উচিৎ নয়? উত্তরে তিনি বললেন, সকাল-সন্ধ্যায় খাওয়া চলে এমন পরিমাণ সম্পদ"। অপর বর্ণনায়, তার একদিন একরাত্রির পেটপুরে খাবার পরিমাণ"।[৯৯]

ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ»

---

[98] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৩৭৫; আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৫৪২।

[99] সুনান আবু দাউদ; মিশকাত, হাদীস নং ১৮৪৮।

"অভাবমুক্ত হয়েও যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে, কিয়ামত দিবসে সেটা মুখে গোশতশূণ্য হয়ে উঠবে"।[১০০]

অনেক ভিক্ষুক মসজিদে আল্লাহর বান্দাদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের অভাব-অভিযোগের ফিরিস্তি আওড়াতে থাকে। এতে মুসল্লীদের তাসবীহ-তাহলীলে ছেদ পড়ে। অনেকে মিথ্যা বলে এবং ভূয়া কার্ড ও কাগজপত্র দেখায়। অনেকে আবার মনগড়া কাহিনী বলে ভিক্ষা করে। কোনো কোনো ভিক্ষুক স্বীয় পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন মসজিদ ও জনসমাগম স্থলে ভাগ করে দেয়। দিন শেষে তারা একস্থানে একত্রিত হয়ে নিজেদের আয় গুণে দেখে। এভাবে তারা যে কত ধনী হয়েছে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। যখন তারা মারা যায়, তখন জানা যায় কী পরিমাণ সম্পদ তারা রেখে গেছে।

পক্ষান্তরে একদল প্রকৃতই অভাবী রয়েছে। যাদের সংযম দেখে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে ধনী বলেই মনে করে। তারা কাকুতি-মিনতি করে লোকদের নিকটে চায় না। ফলে তাদের অবস্থা যেমন জানার বাইরে থেকে যায়, তেমনি তাদের কিছু দেওয়াও হয় না।

৪৩. ঋণ পরিশোধে অনীহা প্রকাশ করা

মহান রাব্বুল আলামীনের নিকটে বান্দার হক অতীব গুরুত্ববহ। আল্লাহর হক নষ্ট করলে তাওবার মাধ্যমে ক্ষমা পাওয়া যায়। কিন্তু বান্দার হক নষ্ট করলে সংশ্লিষ্ট বান্দার নিকট থেকে ক্ষমা না পেলে ক্ষমা লাভের কোনো উপায় নেই। যেকোনো মূল্যে তার হক আদায় করতে হবে ঐদিন আসার পূর্বে যেদিন টাকা-পয়সার কোনো কারবার হবে না। সেদিন হকদারের পাপ হক আত্মসাৎকারীকে দেওয়া হবে এবং হক আত্মসাৎকারীর নেকী হকদারকে দেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]

---

[100] সুনান আবু দাউদ; মিশকাত, হাদীস নং ১৮৪৭।

“নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতকে তার প্রাপকের নিকটে অর্পন করবে”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯]

বর্তমান সমাজে ঋণ গ্রহণ একটি মামুলী ও গুরুত্বহীন বিষয় বলে বিবেচিত। অনেকে অভাবের জন্য নয়; বরং প্রাচুর্য সৃষ্টি ও অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে নতুন নতুন বাড়ী, গাড়ী, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ঋণ নিয়ে থাকে। অনেক সময় এরা কিস্তিতে বেচা-কেনা করে থাকে, যার অনেকাংশই সন্দেহপূর্ণ বা হারাম।

ঋণ পরিশোধকে লঘু বা সাধারণভাবে নিলে প্রায়শই সেখানে টালবাহানা ও গড়িমসি সৃষ্টি হয়। ক্ষেত্রবিশেষ তাতে অপরের সম্পদ বিনষ্ট করা হয়। এর শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ»

“যে ব্যক্তি পরিশোধের নিয়তে মানুষের সম্পদ গ্রহণ করে, আল্লাহ তা‘আলা তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করে দেন। আর যে তা বিনষ্ট করার নিয়তে গ্রহণ করে থাকে, আল্লাহ তাকে বিনষ্ট করে দেন”।[১০১]

মানুষ ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে বড় উদাসীন। তারা এটাকে খুবই তুচ্ছ মনে করে। অথচ আল্লাহর নিকট তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ ব্যক্তি এতসব মর্যাদা ও অগণিত ছওয়াবের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধের দায় থেকে সে অব্যাহতি পায় নি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«سُبْحَانَ اللَّهِ، مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ» فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، سَأَلْتُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ؟ فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ»

---

101 সহীহ বুখারী; মিশকাত, হাদীস নং ২৯১০।

'সুবহানাল্লাহ! ঋণ প্রসঙ্গে কী কঠোর বাণীই না আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন। ফলে আমরা চুপ হয়ে গেলাম এবং ভীত হলাম, অতঃপর যখন পরের দিন আসলো, আমরা তাঁকে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, কী কঠোর বাণী নাযিল হয়েছে? তখন তিনি বললেন, যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, ঋণগ্রস্ত অবস্থায় কেউ যদি আল্লাহর পথে শহীদ হয় তারপর জীবিত হয়, তারপর শহীদ হয়, তারপর জীবিত হয়, তারপর আবার শহীদ হয় তবুও ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না"।[১০২]

এরপরও কি ঋণ পরিশোধে টালবাহানাকারী মতলববাজদের হুঁশ ফিরবে না?

৪৪. হারাম ভক্ষণ

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না সে কোথা থেকে অর্থ উপার্জন করল এবং কোথায় ব্যয় করল তার কোনো পরোয়া করে না। তার একটাই ইচ্ছা সম্পদ বৃদ্ধি করা। চাই তা হারাম, অবৈধ যে পথেই হোক। এজন্য সে ঘুষ, চুরি ডাকাতি, ছিনতাই, আত্মসাৎ, হারাম দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়, সুদ, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ, জ্যোতিষগিরী, বেশ্যাবৃত্তি, গান-বাজনা ইত্যাদি হারাম কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন, এমনকি মুসলিমদের সরকারী কোষাগার কিংবা জনগণের সম্পদ কুক্ষিগত করা, মানুষকে সংকটে ফেলে তার সম্পদ বাগিয়ে নেওয়া, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি যে কোনো উপায়ে অর্থ উপার্জন করে। অতঃপর সে ঐ অর্থ থেকে খায়, পরিধান করে, গাড়িতে চড়ে, বাড়ী-ঘর তৈরি করে কিংবা বাড়ী ভাড়া নিয়ে দামী আসবাবপত্র দিয়ে সাজায়। এভাবে হারাম দিয়ে তার উদর পূর্তি করে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ»

---

102 সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ৪৬৮৪; সহীহুল জামে', হাদীস নং ৩৬০০।

“শরীরের যতটুকু গোশত হারাম থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তা জাহান্নামের জন্যই সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত”।[১০৩]

আর কিয়ামতের দিনেও তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোথা থেকে সে ধন-উপার্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে।[১০৪] সুতরাং এ শ্রেণির লোকদের জন্য শুধু ধ্বংসই অপেক্ষা করছে। অতএব যার কাছে হারাম সম্পদ রয়ে গেছে তার উচিত তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে; যদি মানুষের হক হয় তবে যেন তার কাছে তা ফেরত দেওয়ার সাথে সাথে তার কাছ থেকে ক্ষমাও চেয়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যেদিন মানুষ কোনো টাকা-পয়সা নিয়ে আসবে না, আসবে শুধু নেক আমল ও বদ আমল নিয়ে।

৪৫. মদ্যপান

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝٩٠﴾ [المائدة: ٩٠]

“নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য নির্ণয়কারী তীর বা লটারী অপবিত্র শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাক। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৯০]

মদ্যপান থেকে বিরত থাকার আদেশ প্রদান তা হারাম হওয়ার অন্যতম শক্তিশালী দলীল। আল্লাহ তা‘আলা অত্র আয়াতে মদের সঙ্গে মূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন। মূর্তি কাফেরদের উপাস্য ও দেব-দেবীর সাধারণ নাম। মূর্তিপূজা হারাম হেতু মদ্যপানও হারাম। তাই উক্ত আয়াতে আল্লাহ উল্লিখিত জিনিসগুলো হারাম করেন নি; বরং বিরত থাকতে বলেছেন বলে এথেকে গা বাঁচানোর কোনো উপায় নেই।

---

[103] মুসনাদে আহমদ; তিরমিযী, হাদীস নং ২৭৭২।

[104] তিরমিযী; মিশকাত, হাদীস নং ৫১৯৭।

মদ্যপান সম্পর্কে হাদীসেও কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ» أَوْ «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ»

"যে ব্যক্তি মদ্যপান করে তার জন্য আল্লাহর অঙ্গীকার হলো, তিনি তাকে 'ত্বীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ত্বীনাতুল খাবাল' কী? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের ঘাম অথবা পুঁজ-রক্ত"।[১০৫]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ لَقِيَ اللَّهَ مُدْمِنَ خَمْرٍ لَقِيَهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ»

"শরাবপানে অভ্যস্তরূপে যে মারা যাবে, (কিয়ামতে) সে একজন মূর্তিপূজকের ন্যায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে"।[১০৬]

আমাদের যুগে হরেক রকম মদ ও নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি বেরিয়েছে। তাদের নামও আরবী, আজমী বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন-বিয়ার, হুইস্কি, চুয়ানি, তাড়ি ভদকা, শ্যাম্পেন, কোডিন, মরফিন, প্যাথেড্রিন, হেরোইন, ড্রাগ ইত্যাদি। অনুরূপভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন,

«لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا»

'নিশ্চয় আমার উম্মতের কিছু লোক মদ পান করবে, তারা সেটার ভিন্ন নামকরণ করে নেবে"।[১০৭] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উক্ত নাম পাল্টিয়ে মদ পানকারী মুসলিমও বর্তমান যামানায় প্রকাশ পেয়েছে। তারা উহার নাম দিয়েছে 'রূহানী টনিক' বা 'জীবনী সুধা'।

---

105 সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৩৬৩৯।

106 মুসনাদে আহমদ; মিশকাত, হাদীস নং ৩৬৫৬, সনদ হাসান।

107 সুনান আবু দাউদ; ইবন মাজাহ; মিশকাত, হাদীস নং ৪২৯২।

অথচ এটা নিছক মিথ্যার ওপর প্রলেপ প্রদান ও প্রতারণা মাত্র। এ সমস্ত প্রতারকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ۝٩ ﴾ [البقرة: ٩]

"তারা আল্লাহ ও ঈমানদারদের সাথে প্রতারণা করে অথচ তারা যে নিজেদের সাথেই প্রতারণা করছে তা তারা অনুধাবন করতে পারছে না"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৯]

মদ কী এবং তার বিধান কী হবে শরী'আতে তার পরিপূর্ণ নীতিমালা তুলে ধরা হয়েছে, যাতে ফিৎনা ও দ্বন্দ্বের মূলোৎপাটন করা যায়। এ নীতিমালা হলো-

«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

"প্রত্যেক নেশার দ্রব্যই 'খামর' বা মদ এবং প্রত্যেক নেশার দ্রব্যই হারাম"।[১০৮] সুতরাং যা কিছু মস্তিষ্কের সঙ্গে মিশে জ্ঞান-বুদ্ধিকে নেশাগ্রস্ত করে তোলে তাই হারাম। চাই তা কম হোক বা বেশি হোক[১০৯]; তরল পদার্থ হোক কিংবা কঠিন পদার্থ হোক। এসব নেশার দ্রব্যের নাম যাই হোক মূলতঃ এগুলো সবই এক এবং এসবের বিধানও এক।

পরিশেষে মদ্যপায়িদের উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি নসীহত তুলে ধরা হলো। তিনি বলেছেন,

«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ، فَشَرِبَ، فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ، فَشَرِبَ، فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ، أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخَبَالِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رَدَغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ»

---

108 সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৩৬৩৮।

109 সুনান আবু দাউদ; মিশকাত, হাদীস নং ৩৬৪৫।

“যে ব্যক্তি মদ পান করে ও নেশাগ্রস্ত হয় তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবে না। যদি সে ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে জাহান্নামে যাবে। আর যদি তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। পুনরায় যদি সে মদ পান করে ও নেশাগ্রস্থ হয় তবে তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবে না। যদি সে ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। পুনরায় সে যদি মদ পান করে ও নেশাগ্রস্ত হয় তবে তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবে না। যদি সে ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। পুনরায় যদি সে মদ পান করে তবে তাকে কিয়ামত দিবসে রাদগাতুল খাবাল’ পান করানো আল্লাহর জন্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! রাদগাতুল খাবল কী? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের দেহ নিঃসৃত পূঁজ-রক্ত”।[১১০]

৪৬. সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার ও তাতে পানাহার করা

আধুনিক কালে গার্হস্থ্য জিনিসপত্রের এমন কোনো দোকান পাওয়া যাবে না, যেখানে সোনা-রূপার পাত্র অথবা সোনা-রূপার প্রলেপযুক্ত পাত্রাদি নেই। ধনীদের গৃহে এমনকি অনেক হোটেলেও এসব পাত্র পরিবেশন করা হয়। এ জাতীয় পাত্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত মূল্যবান উপঢৌকনে পরিণত হয়েছে। অনেকে নিজ বাড়িতে সোনা-রূপার পাত্র রাখে না বটে কিন্তু অন্যের বাড়ীতে ‘ওয়ালীমা’ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে পরিবেশিত সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহারে কুণ্ঠাবোধ করে না। অথচ নিজ বাড়ীতে হোক কিংবা অন্যের বাড়ীতে হোক, শরী‘আতে এসব পাত্র ব্যবহার হারাম ঘোষিত হয়েছে। এ জাতীয় পাত্র ব্যবহার কঠোর শাস্তির কথা হাদীসে এসেছে। উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»

---

110 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৩৭৭; সহীহুল জামে‘, হাদীস নং ৬৩১৩।

“যে ব্যক্তি রূপা ও সোনার পাত্রে খাবে কিংবা পান করবে সে যেন তার পেটে জাহান্নামের আগুন ঢক ঢক করে ঢুকিয়ে দিচ্ছে”।[১১১]

এ বিধান খাবারের পাত্র সহ যেকোনো ধরনের সোনা-রূপার পাত্রের জন্য প্রযোজ্য। যেমন-প্লেট, ডিস, কাঁটা চামচ, চামচ, ছুরি, মেহমানদারীর জন্য প্রস্তুত খাদ্য প্রদানের পাত্র, বিবাহ ইত্যাদিতে মিষ্টি প্রভৃতি পরিবেশনের ডালা বা বারকোশ ইত্যাদি।

কিছু লোক শোকেসের মধ্যে সোনা-রূপার পাত্র রেখে বলে, এগুলো আমরা ব্যবহার করি না, কেবল সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রেখে দিয়েছি। হারামের পথ রুদ্ধ করার জন্য তাদের উক্ত কাজও অনুমোদনযোগ্য নয়। [শাইখ আব্দুল আযীয ইবন বাযের জবানী থেকে সরাসরি প্রাপ্ত]

৪৭. মিথ্যা সাক্ষ্যদান

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلۡأَوۡثَٰنِ وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّورِ ٣٠ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيۡرَ مُشۡرِكِينَ بِهِۦۚ﴾ [الحج: ٣٠، ٣١]

“সুতরাং তোমরা পূতিগন্ধ অর্থাৎ মূর্তি, প্রতিমা থেকে দূরে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে ধূরে থাক, আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে ও তাঁর সঙ্গে শির্ক না করে”। [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৩০-৩১]

হাদীসে এসেছে,

«أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» ثَلاَثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ - وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ - أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ»، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ»

“আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে ছিলাম। এমন সময় তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে

[111] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৬৫।

বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বৃহত্তম কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না? কথাটি তিনি তিনবার বললেন। সাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই বলবেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! (উত্তরে তিনি বললেন) আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় কথাগুলো বলছিলেন। অতঃপর সোজা হয়ে বসে বললেন, শুনে রাখ! আর মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। এ কথাটি তিনি এতবার বলতে থাকলেন যে আমরা শেষ পর্যন্ত বলে ফেললাম, যদি তিনি এবার ক্ষান্ত হতেন"।[১১২]

আলোচ্য হাদীসে মিথ্যা সাক্ষ্যের ভয়াবহতা বুঝাতে পুনঃপুনঃ কথাটি বলা হয়েছে। কেননা মানুষ এ বিষয়টিকে হালকাভাবে নিয়ে থাকে। মিথ্যা সাক্ষ্য নিষিদ্ধ হওয়ার পেছনে অনেক কারণও রয়েছে। যেমন শত্রুতা, হিংসা ইত্যাদি। মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলে ক্ষয়-ক্ষতিও হয় প্রচুর। মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলে কত হক্ব যে বিনষ্ট হয়ে গেছে, কত নির্দোষ লোক যুলুম-নিপীড়নের শিকার হচ্ছে, কত লোক যে জিনিসের উপর তাদের কোনো অধিকার নেই তাতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করছে, কতজন যে বংশের মানুষ নয় সে বংশের সন্তান গণ্য হচ্ছে-তার কোনো ইয়াত্তা নেই।

কিছু লোক বিচার-ফায়সালার জন্য অন্য লোককে এ বলে সপক্ষে টেনে আনে যে, তুমি আমার পক্ষে অমুক বিষয়ে আদালতে সাক্ষ্য দিবে, তোমার প্রয়োজনে আমিও তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিব। সাক্ষ্য দিতে হলে যেখানে ঘটনা প্রত্যক্ষ করা অপরিহার্য সেখানে হয়ত এ লোকটির সঙ্গে তার কোর্টের বারান্দায় কিংবা দহলিজে মাত্র দেখা হয়েছে। মূল ঘটনার সময় হয়ত সে আদৌ উপস্থিত ছিল না। তা সত্ত্বেও সে তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে। তার এ মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলে কোনো ভুমি কিংবা বাড়ীর মালিকানা প্রকৃত মালিকের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। কিংবা কোনো দোষী ব্যক্তি বেকসুর খালাস পেয়ে যেতে পারে, এসব

---

[112] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৫৪, ৫৯৭৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৭।

সাক্ষ্য ডাহা মিথ্যা। সুতরাং না দেখে না জেনে কোনো প্রকারেই সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمَا شَهِدۡنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمۡنَا﴾ [يوسف: ٨١]

"আমরা যা জানি তার বাইরে সাক্ষ্য দিতে পারি না"। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮১]

৪৮. বাদ্যযন্ত্র ও গান

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [لقمان: ٦]

"মানুষের মাঝে কেউ কেউ এমন আছে যে আল্লাহর রাস্তা (ইসলাম) থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার কথা খরিদ করে" [সূরা লুক্বমান, আয়াত: ৬]

ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আল্লাহর কসম করে বলেছেন, উক্ত আয়াতে 'অসার কথা' বলতে গানকে বুঝানো হয়েছে।[১১৩]

আবু আমির ও আবু মালিক আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ»

"অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে এমন অনেক গোষ্ঠী হবে, যারা ব্যভিচার, রেশম ব্যবহার, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল গণ্য করবে"।[১১৪]

আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فِي هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَتِ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الخُمُورُ»

113 তাফসীরে ইবন কাছীর ৬/৩৩৩ পৃ:।

114 সহীহ বুখারী; মিশকাত, হাদীস নং ৫৩৪৩।

"অবশ্যই এ উম্মতের মধ্যে ভূমিধ্বস, আসমান থেকে নিক্ষিপ্ত গযব ও দৈহিক রূপান্তরের শাস্তির প্রাদুর্ভাব দেখা দিবে। এসব তখনই ঘটবে যখন তারা মদ্যপান শুরু করবে, গায়িকা রাখবে ও বাদ্যযন্ত্র বাজাবে"।[১১৫]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঢোল-তবলা বাজাতে নিষেধ করেছেন[১১৬] এবং বাঁশিকে দুষ্ট লোক ও বোকার কণ্ঠস্বর নামে আখ্যায়িত করেছেন।[১১৭]

পূর্বসূরি আলেমগণ যেমন ইমাম আহমাদ রহ. প্রমুখ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, অসার ক্রীড়া-কৌতুক, গান-বাজনা এবং তাতে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি হারাম। যেমন সারেঙ্গী, তানপুরা, রাবাব, মন্দিরা, বাঁশি, ফ্লুট বাঁশি, তবলা ইত্যাদি।

আধুনিক বাদ্যযন্ত্রসমূহ নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধ বাণীর আওতায় পড়ে। যেমন, বেহালা, একতারা, দোতারা, তার্প, পিয়ানো, গিটার, ম্যান্ডেলিন ইত্যাদি। এ যন্ত্রগুলো বরং হাদীসে নিষিদ্ধ তৎকালীন অনেক যন্ত্র থেকে অনেক বেশি মোহ ও তন্ময়তা সৃষ্টি করে। এমনকি বাদ্যযন্ত্রের নেশা মদের নেশা থেকেও অনেক বড় হয়ে দাঁড়ায়। যেমনটি ইবনুল কাইয়্যেম ও অন্যান্যরা বলেছেন।

আর যদি বাদ্যযন্ত্রের সাথে গান ও সুর সংযোজিত হয় তাহলে পাপের পরিধি বেড়ে যাবে, হারামও কঠিন হবে। সেই সাথে গানের কথাগুলো যদি প্রেম-ভালোবাসা, রূপচর্চা, যৌন উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী ইত্যাদি বিষয়ে হয় তাহলে তো মুসীবতের কোনো শেষ নেই।

এ কারণেই আলেমগণ বলেছেন, গান ব্যভিচারের বার্তাবাহক এবং অন্তরে কপটতা সৃষ্টিকারী। মোটকথা, বর্তমান কালে গানের কথা, সুর ও বাদ্য এক বিরাট ফিতনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিউজিকের এ সর্বগ্রাসী থাবা এখন শুধু গানেই

---

[115] তিরমিযী, হাদীস নং ২১৮৫; সিলসিলা সহীহাহ, হাদীস নং ২২০৩।

[116] বায়হাক্বী; মিশকাত, হাদীস নং ৪৫০৩; সহীহুল জামে', হাদীস নং ১৭৪৭-৪৮।

[117] তিরমিযী, হাদীস নং ১০০৫; সহীহুল জামে', হাদীস নং ৫১৯৪।

সীমাবদ্ধ নেই; বরং তা ঘড়ি, ঘন্টা, ভেঁপু, শিশুখেলনা, কম্পিউটার ও টেলিফোন ও মোবাইলের মাঝেও বিস্তৃত হয়েছে। মনের দৃঢ় সংকল্প না থাকলে এসব থেকে বাঁচা বড়ই দুষ্কর। ‘আল্লাহই সাহায্যস্থল’।

৪৯. গীবত বা পরনিন্দা

মুসলিমদের গীবত ও তাদের মান-ইজ্জতে অহেতুক নাক গলানো এখন একটি জনপ্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অথচ গীবত করতে আল্লাহ তা‘আলা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। মানুষ যাতে গীবতকে ঘৃণা করে এবং তাতে নিরুৎসাহ হয় সেজন্য আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যাদেশ করেছেন। সর্বোপরি তিনি গীবতকে এমন ঘৃণ্যভাবে চিত্রিত করেছেন, যে কোনো মনই তার প্রতি বিতৃষ্ণ হবে। তিনি বলেছেন,

﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُۚ﴾ [الحجرات: ١٢]

“তোমরা একে অপরের যেন গীবত না কর। তোমাদের কেউ কি স্বীয় মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ পছন্দ করে? অনন্তর তোমরা তা অপছন্দ কর”। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১২]

‘গীবত’-এর পরিচয় প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

«أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ»

“তোমরা কি জান ‘গীবত’ কী? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, তোমার ভাই যে কথা অপছন্দ করে তার সম্পর্কে সে কথা বলার নাম গীবত। জিজ্ঞেস করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি

যা বলছ তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবেই তুমি তার 'গীবত' করলে। আর যদি না থাকে তাহলে তুমি তাকে অপবাদ দিলে"।[১১৮]

সুতরাং মানুষের মধ্যে যে দোষ আছে এবং যার চর্চা সে অপছন্দ করে তা আলোচনা করাই গীবত। চাই সে দোষ তার শরীর সংক্রান্ত হোক কিংবা দীন ও চরিত্র বিষয়ক হোক কিংবা আকার-আকৃতি বিষয়ক হোক। গীবত করার আঙ্গিক বা ধরণও নানা রকম রয়েছে। যেমন, ব্যক্তির দোষ আলোচনা করা, বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে তার কর্মকাণ্ড তুলে ধরা ইত্যাদি।

আল্লাহ পাকের নিকটে গীবত বড়ই কদর্য ও খারাপ কাজ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ গীবতের ব্যাপারে খুবই উদাসীনতা দেখিয়ে থাকে। এজন্য গীবতের ভয়াবহতা প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ»

"সূদের (পাপের) ৭৩টি দরজা বা স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নতম স্তর হচ্ছে স্বীয় মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া তুল্য পাপ এবং ঊর্ধ্বতম স্তর হলো কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তার এক ভাইয়ের মান-সম্ভ্রমের হানি ঘটানোতুল্য পাপ"।[১১৯]

যে মজলিসে কারও গীবত করা হয় সেখানে যে ব্যক্তিই উপস্থিত থাকুক তাকে তা নিষেধ করা ওয়াজিব। যে ভাইয়ের গীবত করা হয় তার পক্ষ নিয়ে সাধ্যমত তাকে সহযোগিতা করাও আবশ্যক। সম্ভব হলে ঐ মজলিসেই গীবতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

---

118 সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৪৮২৮।

119 ত্বাবরাণী; সিলসিলা সহীহুল হাদীস নং ১৮৭১।

“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মান-সম্ভ্রমের বিরুদ্ধে কৃত হামলাকে প্রতিহত করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তার থেকে জাহান্নামের আগুনকে প্রতিহত করবেন”।[১২০]

৫০. চোগলখুরী করা

মানুষের মাঝে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি ও সম্পর্কের অবনতি ঘটানোর মানসে একজনের কথা অন্য জনের নিকটে লাগানোকে চোগলখুরী বলে। চোগলখুরীর ফলে মানুষের সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং তাদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার বহ্নিশিখা জ্বলে ওঠে। চোগলখুরীর নিন্দায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ ۝١٠ هَمَّازٖ مَّشَّآءِۭ بِنَمِيمٖ ۝١١﴾ [القلم: ١٠، ١١]

“যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, যে পশ্চাতে নিন্দা করে, একের কথা অন্যের নিকটে লাগায় আপনি তার আনুগত্য করবেন না”। [সূরা আল-ক্বালাম, আয়াত: ১০-১১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ»

“চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না”।[১২১]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা মদীনার একটি খেজুর বাগান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তথায় তিনি দু’জন লোকের আহাজারী শুনতে পেলেন। তখন তাদেরকে কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»

---

[120] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৭৫৮৩; তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৩১।

[121] সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৪৮২৩।

“এ দু’জনকে ‘আযাব দেওয়া হচ্ছে। তবে বড় কোনো কারণে নয়। অবশ্য এগুলো কবীরা গুনাহ। তাদের একজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না। অন্যজন চোগলখুরী করে বেড়াত”।[১২২]

চোগলখুরীর একটি নিকৃষ্ট প্রক্রিয়া হলো, স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে এবং স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামীকে ক্ষেপিয়ে তুলে তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরানো। অনুরূপভাবে অনেক কর্মজীবি অফিসের বস কিংবা দায়িত্বশীলের নিকট অন্য কোনো কর্মজীবির কথা তুলে ধরে। এতে তার উদ্দেশ্য উক্ত কর্মজীবির ক্ষতি সাধন করা এবং নিজেকে উক্ত দায়িত্বশীলের শুভার্থী বা খয়েরখাঁ হিসাবে তুলে ধরা। এসব কাজ চোগলখুরী হিসাবে গণ্য এবং তা হারাম।

৫১. অনুমতি ব্যতীত অন্যের বাড়ীতে উঁকি দেওয়া ও প্রবেশ করা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ﴾ [النور: ٢٧]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজ গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে তার মালিকের অনুমতি ও সালাম প্রদান ব্যতীত প্রবেশ করো না”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ২৭]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব স্পষ্ট করে বলেছেন,

«إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ»

“দৃষ্টিপাতের কারণেই কেবল অনুমতির ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে”।[১২৩]

আধুনিক কালের বাড়ীগুলো পাশাপাশি গড়ে উঠেছে। তাদের বিল্ডিং বা ঘরগুলো একটা অপরটার সাথে লাগিয়ে, দরজা-জানালাও সামনা-সামনি তৈরি। এমতাবস্থায় এক প্রতিবেশীর সামনে অন্য প্রতিবেশীর সতর প্রকাশিত হয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কুরআনে মুমিন নর-নারীর চক্ষু সংযত করে

---

[122] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৫৫; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৬০৭৫।

[123] সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৩৫১৫।

রাখার নির্দেশ থাকলেও অনেকে তা মেনে চলে না। অনেকে উপর তলার জানালা কিংবা ছাদ থেকে নীচের অধিবাসীদের সতর ইচ্ছে করে দেখে। নিঃসন্দেহে এটা খিয়ানত, প্রতিবেশীর সম্মানে আঘাত এবং হারাম পথের মাধ্যম। এর ফলে অনেক রকম বিপদাপদ ও ফিৎনা দেখা দেয়। এরূপ গোয়েন্দাগিরী যে কত ভয়াবহ তার প্রমাণ হলো, শরী'আত ঐ ব্যক্তির চোখ ফূঁড়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ»

"যে ব্যক্তি কারো বাড়ীতে তাদের অনুমতি ব্যতীত উঁকি দেয় তাদের জন্য তার চোখ ফুঁড়ে দেওয়া বৈধ হয়ে যাবে"।[১২৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

«مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ، فَلَا دِيَةَ لَهُ، وَلَا قِصَاصَ»

"যে ব্যক্তি কারো বাড়ীতে তাদের অনুমতি ব্যতীত উঁকি দেয়, আর যদি তারা তার চোখ ফুঁড়ে দেয় তাহলে সেজন্য কোনো দিয়াত বা রক্তমূল্য ও কিসাস দিতে হবে না"।[১২৫]

৫২. তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দু'জনে শলা-পরামর্শ করা

আমাদের সভা-সমিতিগুলোর জন্য একটা বড় বিপদ হলো ব্যক্তি বিশেষকে বাদ দিয়ে অন্য দু'একজন নিয়ে শলাপরামর্শ করা। এতে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করা হয়। কেননা এ জাতীয় কাজের ফলে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং একের প্রতি অন্যের মন বিষিয়ে ওঠে। এরূপ শলাপরামর্শের অবৈধতার বিধান ও কারণ দর্শাতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ»

---

124 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৫৮।

125 সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ৪৮৬০, সনদ সহীহ।

“যখন তোমরা তিনজন হবে তখন যেন দু’জন লোক অন্য একজনকে বাদ রেখে গোপনে কথা না বলে। তবে তোমরা অনেক মানুষের সাথে একাকার হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। কারণ তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে কৃত গোপন পরামর্শ ঐ ব্যক্তিকে ব্যথিত করবে”।[১২৬]

এভাবে চারজনের মধ্যে একজনকে বাদ রেখে তিন জনে পরামর্শ করাও নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে তৃতীয় জন বোঝে না এমন ভাষায় দু’জনের শলা-পরামর্শ করাও বৈধ নয়। কারণ এক্ষেত্রে তৃতীয় জনকে বাদ দেওয়ায় তার প্রতি এক প্রকার তাচ্ছিল্য ভাব দেখানো হয়। কিংবা তারা দু’জনে যে তার প্রসঙ্গে কোনো খারাপ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এরূপ ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হতে পারে। ইত্যাদি

৫৩. টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা

মানুষ যেসব কাজকে লঘু মনে করে অথচ আল্লাহর নিকটে সেগুলো খুবই গুরুতর, তন্মধ্যে টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা একটি। অনেকের কাপড় এত লম্বা যে, তা মাটি স্পর্শ করে। কেউবা আবার পরিধেয় বস্ত্র পিছন থেকে মাটিতে টেনে বেড়ায়। টাখনুর নিচে এভাবে কাপড় ঝুলিয়ে পরা হারাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارًا، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ»

“তিন প্রকার লোকের সাথে আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। তারা হলো-টাখনুর নিচে কাপড় (অন্য বর্ণনায় লুঙ্গী)

---

126 সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৪৯৬৫।

পরিধানকারী, খোঁটাদানকারী (অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে খোঁটা না দিয়ে কোনো কিছু দান করে না) ও মিথ্যা কসমের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়কারী”।[১২৭]

যে বলে, ‘আমার টাখনুর নিচে কাপড় পরা অহংকারের প্রেক্ষিতে নয়’ তার এ সাফাই গাওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা অহংকার বশেই হোক আর এমনিতেই হোক, শাস্তির ধমকি তাতে রয়েছেই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ»

“টাখনুর নিচে কাপড়ের যেটুকু থাকবে তা জাহান্নামে যাবে”।[১২৮]

এ হাদীসে অহংকার ও নিরহংকারের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় নি। আর জাহান্নামে গেলে শরীরের কোনো অংশবিশেষ যাবে না; বরং সমগ্র দেহই যাবে। অবশ্য অহংকার বশে যে টাখনুর নিচে কাপড় পরবে তার শাস্তি তুলনামূলকভাবে কঠোর ও বেশি হবে। এ কথাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে এসেছে,

«مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»

“যে ব্যক্তি অহংকার বশে তার লুঙ্গি মাটির সাথে টেনে নিয়ে বেড়াবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি দৃষ্টি দিবেন না”।[১২৯] বেশি শাস্তি এ জন্য হবে যে, সে এক সঙ্গে দু’টি হারাম কাজ করছে। [**এক.** টাখনুর নিচে কাপড় পরা। **দুই.** অহংকার প্রদর্শন।]

বস্তুত পরিমিত পরিমাণ থেকে নিচে ঝুলিয়ে যেকোনো বস্ত্র পরিধান করাই ‘ইসবালের আওতাভুক্ত এবং তা হারাম। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

127 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৬; মিশকাত, হাদীস নং ২৭৯৫।

128 সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ৫৩৩০; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২০১৮০।

129 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৬৬৫; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৪৩১১।

«الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ، وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

'লুঙ্গি, জামা ও পাগড়ীতে ইসবাল (ঝুলিয়ে পরা) রয়েছে। এগুলো থেকে যেকোনো একটিকে কোনো ব্যক্তি অহংকার বশে টেনে-ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়ালে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার প্রতি সদয় দৃষ্টি দিবেন না"।[১৩০]

স্ত্রীলোকদের জন্য পায়ের সতরের সুবিধার্থে এক বিঘত কিংবা এক হাত পরিমাণ ঝুলিয়ে দেবার অবকাশ আছে; কেননা বাতাস বা অন্য কোনো কারণে সতর খোলার ভয় থাকলে অতিরিক্ত কাপড়ে তা বহুলাংশে রোধ হবে। তবে সীমালংঘন করা তাদের জন্যও বৈধ হবে না। যেমন বিয়ে-শাদীতে পরিহিত বস্ত্রের ক্ষেত্রে মেয়েদের সীমালংঘন করতে দেখা যায়। সেগুলো পরিমিত পরিমাণ থেকে কয়েক বিঘত এমনকি কয়েক মিটার লম্বা হয়। অনেক সময় পেছন থেকে তা বয়ে নিয়ে যেতেও দেখা যায়।

৫৪. পুরুষদের স্বর্ণালংকার ব্যবহার করা

আবু মুসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন,

«أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا»

"আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের নারীদের জন্য রেশম ও স্বর্ণ হালাল করেছেন এবং পুরুষদের জন্য হারাম করেছেন"।[১৩১]

আজকাল বাজারে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের তৈরি নানা ডিজাইনের ঘড়ি, চশমা, বোতাম, কলম, চেইন, মেডেল ইত্যাদি পাওয়া যায়। এগুলোর কতক সম্পূর্ণ স্বর্ণের তৈরি আবার কতক স্বর্ণের প্রলেপযুক্ত। অনেক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হিসেবে পুরুষদের স্বর্ণের বিভিন্ন বস্তু দেওয়া হয়। বস্তুত তা ঘোরতর অন্যায়।

---

130 সুনান আবু দাউদ; সুনান নাসাঈ; মিশকাত, হাদীস নং ৪৩৩২।

131 সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ৫২৬৫, সনদ সহীহ।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখতে পেয়ে তা খুলে নেন এবং ছুঁড়ে ফেলে দেন। অতঃপর বলেন,

«يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ»، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لَا وَاللهِ، لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

"তোমাদের কেউ কি ইচ্ছে করে আগুনের অঙ্গার তুলে নিয়ে স্বহস্তে রাখতে পারে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর জনৈক ব্যক্তি লোকটিকে বলল, তোমার আংটিটা তুলে নাও এবং তা (অন্য) কাজে লাগাও। লোকটি বলল, 'আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন আমি তা কখনই গ্রহণ করব না"।[১৩২]

৫৫. মহিলাদের খাটো, পাতলা ও আঁটসাঁট পোষাক পরিধান করা

বর্তমানে যেসব জিনিস দ্বারা আমাদের শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে তন্মধ্যে একটি হলো, তাদের উদ্ভাবিত নানা ডিজাইনের পোশাক-পরিচ্ছদের সাহায্যে তারা মুসলিমদের চরিত্র ধ্বংসের কঠিন অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। পোশাকগুলোর কতক খুবই খাট মাপের, কতক আঁটসাঁট করে তৈরি, আবার কতক এত পাতলা যে তা দিয়ে শরীরের সব অঙ্গ দেখা যায়। ফলে পোশাক পরার আসল লক্ষ্য সতর ঢাকা হয় না। এসব পোশাকের অনেক ডিজাইন পরিধান করা মোটেও বৈধ নয়। এমনকি মহিলাদের মাঝে এবং মাহরাম পুরুষদের মাঝেও নয়।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[132] সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৪৩৮৫।

«صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»

“দু’শ্রেণির জাহান্নামীকে আমি দেখি নি। প্রথম শ্রেণি যাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের ন্যায় ছড়ি, তা দ্বারা তারা লোকদেরকে প্রহার করবে। দ্বিতীয় শ্রেণি ঐ সকল নারী, যারা বস্ত্র পরিহিতা অথচ উলঙ্গ, পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্টকারিণী এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট। তাদের মাথা হবে লম্বা গ্রীবা বিশিষ্ট উটের চুঁটির ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি এত এত দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে”।[১৩৩] হাদীসে উল্লেখিত ‘বুখত’ বলতে বুঝায় লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট উটকে।

যে সকল মহিলা নিচের দিকে বা অন্যান্য দিকে দীর্ঘ ফাঁড়া পোশাক পরিধান করে তারাও উক্ত হাদীসের বিধানভুক্ত হবে। এগুলো পরে বসলে তাদের সতরের অংশবিশেষ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এতে সতর প্রকাশের পাশাপাশি কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য, তাদের কৃষ্টি-কালচারের অন্ধ অনুকরণ ও তাদের উদ্ভাবিত অশালীন পোশাকের অনুসরণ করা হয়।

কোনো কোনো পোশাকে আবার অশালীন ছবিও অঙ্কিত থাকে। যেমন, গায়কদের ছবি, বাদক দলের ছবি, মদপাত্রের ছবি, প্রাণীর ছবি, ক্রুশের ছবি, অবৈধ সংস্থা ও ক্লাবের ছবি ইত্যাদি। অনেক পোশাকে মান-ইজ্জত বিনষ্টকারী কথাও লিখা থাকে। বিদেশী ভাষাতেও এসব লিখা থাকে। এ জাতীয় পোশাক পরিহার করা আবশ্যক।

৫৬. পরচুলা ব্যবহার করা

আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন,

---

133 সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৩৫২৪।

«جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ»

“জনৈকা মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি সদ্য বিবাহিতা কন্যা আছে। হাম হওয়ার কারণে তার মাথার চুল পড়ে গেছে। আমি কি তাকে পরচুলা লাগিয়ে দেব? তিনি বললেন, ‘যে পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যে লাগাতে চায় আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন”।[১৩৪]

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের মাথার চুলে কোনো কিছু সংযোজন করার ব্যাপারে ধমক দিয়েছেন”।[১৩৫]

৫৭. পোশাক-পরিচ্ছদ ও কথা-বার্তায় নারী-পুরুষ পরস্পরের বেশ ধারণ

পুরুষকে আল্লাহ তা‘আলা যে পুরুষালী স্বভাবে সৃষ্টি করছেন তাকে তা বজায় রাখা এবং নারীকে যে নারীত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাকে তা ধরে রাখাই আল্লাহর বিধান। এটা এমনি এক ব্যবস্থা, যা না হলে মানব জীবন ঠিকঠাক চলবে না। পুরুষের নারীর বেশ ধারণ এবং নারীর পুরুষের বেশ ধারণ স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। এর ফলে অশান্তির দুয়ার খুলে যায় এবং সমাজে উচ্ছৃংখলতা ও বেলেল্লাপনা ছড়িয়ে পড়ে। শরী‘আতে এ জাতীয় কাজকে হারাম গণ্য করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তিকে যে আমল করার দরুন শর‘ঈ দলীলে অভিশাপ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে সেই দলীলেই প্রমাণ করে যে উক্ত কাজ হারাম ও কবীরা গুনাহ। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত,

---

[134] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১২২।

[135] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১২৬।

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের মধ্যে নারীর বেশ ধারণকারীদের এবং নারীদের মধ্যে পুরুষের বেশ ধারণকারিণীদের অভিশাপ দিয়েছেন"।[১৩৬]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে আরও বর্ণিত আছে,

«لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ»

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীবেশী পুরুষদেরকে এবং পুরুষবেশী নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন"।[১৩৭]

এ অনুকরণ উঠাবসা, চলাফেরা, কথাবার্তা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন, দৈহিকভাবে মেয়েলী বেশ ধারণ করা, কথাবার্তা ও চলাফেরায় মেয়েলীপনা অবলম্বন করা কিংবা পুরুষের বেশ ধারণ করা ইত্যাদি।

পোশাক ও অলংকার পরিধানেও অনুকরণ রয়েছে। সুতরাং পুরুষের জন্য গলার হার, হাতের চুড়ি, পায়ের মল, কানের দুল পরা চলবে না। অনুরূপভাবে মহিলারাও পুরুষদের জামা, পাজামা, প্যান্ট, শার্ট, পাঞ্জাবী পরতে পারবে না। নারীদের পোশাকের ডিজাইন পুরুষদের থেকে ভিন্নতর হবে। হাদীসে এসেছে,

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ»

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন সেই পুরুষের ওপর যে মেয়েলী পোশাক পরিধান করে এবং সেই নারীর ওপর, যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে"।[১৩৮]

সুতরাং উভয়ের কারো জন্যই স্ব স্ব বেশভূষা বদল করা জায়েয হবে না।

---

[136] সহীহ বুখারী; মিশকাত, হাদীস নং ৪৪২৯।

[137] সহীহ বুখারী; মিশকাত, হাদীস নং ৪৪২৮।

[138] সুনান আবু দাউদ; মিশকাত, হাদীস নং ৪৪৬৯।

৫৮.সাদা চুলে কালো খেযাব ব্যবহার করা

সাদা চুলকে কালো রঙ্গে রঞ্জিত করা হারাম। হাদীসে কালো খেযাব সম্পর্কে যে হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে তাতে একথাই প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ، كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»

“শেষ যমানায় একদল লোক কবুতরের বুকের ন্যায় কাল খেযাব ব্যবহার করবে। তারা জান্নাতের কোনো সুগন্ধি পাবে না”।[১৩৯]

অনেক চুল পাকা ব্যক্তিকে এ কাজ করতে দেখা যায়। তারা কাল রং দ্বারা সাদা চুল রাঙ্গিয়ে নিজেদেরকে যুবক কিংবা অপেক্ষাকৃত কম বয়সী বলে প্রকাশ করে। এতে প্রতারণা, আল্লাহর সৃষ্টিকে গোপন করা ও মিথ্যা আত্মতৃপ্তি ব্যতীত আর কিছু হয় না। এর ফলে ব্যক্তিগত চালচলনের ওপর নিঃসন্দেহে এক প্রকার কুপ্রভাব পড়ে। অন্য মানুষ তাতে প্রতারিত হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাকা চুল খেযাব করেছেন মেহেদি বা অনুরূপ কোনো জিনিস দ্বারা। যাতে হলুদ, লাল ইত্যাদি মৌলিক রং ফুটে ওঠে। তবে কালো রং দিয়ে কখনোই নয়।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা আবু কুহাফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কা বিজয়ের দিন যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে হাযির করা হয় তখন তার চুল-দাড়ি এত সাদা হয়ে গিয়েছিল যে, তা ‘ছাগামা” (কাশ) ফুলের ন্যায় ধবধবে দেখাচ্ছিল। তিনি তাকে দেখে বললেন,

«غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ»

“তোমরা কোনো কিছু দ্বারা এটা পরিবর্তন করে দাও। তবে কালো রং থেকে দূরে থাকো”।[১৪০]

---

[139] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২১২; সহীহুল জামে‘, হাদীস নং ৮১৫৩।

[140] সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৪৪২৪।

নারীদের বিধান পুরুষদের অনুরূপ। তারাও পাকা চুল কালো রঙ্গে রাঙাতে পারবে না।

৫৯. ক্যানভাস, প্রাচীর গাত্র, কাগজ ইত্যাদিতে প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা

আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ»

“কিয়াতের বিচারে কঠোর শাস্তি প্রাপ্তরা হবে ছবি নির্মাতাগণ”।[১৪১]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

«وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً»

“যারা আমার সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি করতে তৎপর হয় তাদের থেকে বড় যালিম আর কে আছে? এতই যদি পারে তো তারা একটা শস্য দানা সৃষ্টি করুক কিংবা অণু সৃষ্টি করুক”।[১৪২]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ، بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا، نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ» وقَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ»

“প্রত্যেক ছবি নির্মাতা জাহান্নামে যাবে। সে যত ছবি অঙ্কন করেছে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে তার জন্য একটি করে প্রাণী তৈরি করা হবে। সে জাহান্নামে (তাকে) শাস্তি দেবে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, “তোমাদেরকে যদি ছবি আঁকতেই হয় তাহলে বৃক্ষ ও যার রূহ নেই তার ছবি আঁক”।[১৪৩]

---

[141] সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৪৪২৯।

[142] সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত হাদীস নং ৪৪৯৬।

[143] সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৪৪৯৮।

এ সকল হাদীস থেকে প্রমাণ মেলে যে, মানুষ, পশু ইত্যাকার যে কোনো প্রাণীর ছবি আঁকা হারাম। চাই তার ছায়া থাকুক বা না থাকুক, তা ছাপা হোক, কিংবা খোদাইকৃত হোক, কিংবা অঙ্কিত হোক বা ভাষ্কর্য হোক কিংবা ছাঁচে ঢালাই করা হোক। কেননা ছবি হারাম সংক্রান্ত হাদীসের আওতায় এ সবই পড়ে।

আর যে ব্যক্তি মুসলিম সে তো শরী'আতের কথা অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিবে। সে এ বিতর্ক করতে যাবে না যে, আমি তো এটার পূজা করি না বা এটাকে সাজদাহ করি না। একজন জ্ঞানী লোক যদি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আমাদের যুগে ব্যাপক বিস্তার লাভকারী ছবির মধ্যে নিহিত একটি ক্ষতির কথাও চিন্তা করেন তাহলে শরী'আতে ছবি হারামের তাৎপর্য তিনি অনুধাবন করতে পারবেন। বর্তমানে এমন অনেক ছবি আছে যার কারণে কুপ্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, কামনার জোয়ার সৃষ্টি হয়। এমনকি ছবির জন্য যিনায় লিপ্ত হওয়াও বিচিত্র নয়। এছাড়া মুসলিমরা নিজেদের ঘরে প্রাণীর ছবি রাখবে না। কেননা প্রাণীর ছবি থাকলে গৃহে ফিরিশতা প্রবেশ করে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيرُ»

“যে বাড়ীতে কুকুর ও ছবি থাকে সেই বাড়ীতে ফিরিশতা প্রবেশ করে না”।[১৪৪]

কোনো কোনো বাড়ীতে কাফিরদের দেব-দেবীর ছবি দেখতে পাওয়া যায়। বলা হয় যে, এগুলো আমরা হাদীয়া হিসেবে বা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রেখেছি। অন্যান্য ছবির তুলনায় এগুলো আরও কঠোর হারাম। অনুরূপভাবে প্রাচীর গাত্রে টাঙ্গানো ছবিও বেশি ক্ষতিকারক। এসব ছবি কত যে সম্মান পায়, কত যে দুঃখ জাগরুক করে, কত যে গর্ব বয়ে আনে তার কোনো ইয়াত্তা নেই।

ছবিকে কখনো স্মৃতি বলা যায় না। কেননা, মুসলিম আত্মীয় ও প্রিয়জনের স্মৃতি তো অন্তরে বিরাজ করে। একজন মুসলিম তাদের জন্য রাব্বুল আলামীনের

---

[144] সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৪৪৮৯।

নিকটে রহমত ও মাগফেরাত কামনা করবে। তাতেই তাদের স্মৃতি জাগরুক থাকবে।

সুতরাং সর্বপ্রকার প্রাণীর ছবি বাড়ী থেকে সরিয়ে দেওয়া ও নিশ্চিহ্ন করে ফেলা আবশ্যক। হ্যাঁ, যেগুলো নিশ্চিহ্ন করা দুষ্কর ও আয়াসসাধ্য সেগুলো ব্যতিক্রম বলে গণ্য হবে। যেমন, সাধারণ্যে প্রচলিত কৌটাবদ্ধ খাদ্যদ্রব্য বা টিনজাত খাদ্য সমগ্রী ও অন্যান্য নানা ধরনের বস্তুতে অঙ্কিত ছবি, অভিধান, রেফারেন্স বুক ও অন্যান্য পাঠ্য বাইয়ের ছবি ইত্যাদি। তবে যথাসম্ভব সেগুলো অপসারিত করা গেলে করবে। বিশেষ করে মন্দ ছবি রাখবে না। পরিচয়পত্রে ব্যবহৃত ছবি হারামের আওতাভুক্ত হবে না। কেননা সফরে সেটার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এছাড়া কোনো কোনো বিদ্বানের মতে, যে সব ছবির কদর নেই; বরং তা পদদলিত করার ন্যায় গণ্য, সে সব ছবির ব্যাপারে তারা ছাড় দিয়েছেন। আর আল্লাহ বলেছেন,

﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: ١٦]

“তোমরা সাধ্যমত আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর”। [সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৬]

৬০.মিথ্যা স্বপ্ন বলা

মানুষের মাঝে মর্যাদার আসন লাভ, আলোচনার পাত্র হওয়া, আর্থিক সুবিধা লাভ কিংবা শত্রুকে ভীতচকিত করার মানসে মিথ্যা স্বপ্ন বলার অভ্যাস কিছু মানুষের আছে। জনসাধারণের অনেকেই স্বপ্নে বিশ্বাসী। স্বপ্নের সাথে তাদের সম্পর্কে খুবই নিবিড়। তারা একে বাস্তাব মনে করে ও এ মিথ্যা স্বপ্ন দ্বারা প্রতারিত হয়। ফলে এসব মিথ্যা স্বপ্ন যে বলে বেড়ায় তার জন্য কঠোর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ، أَوْ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ»

“সবচেয়ে বড় মনগড়া বা মিথ্যার মধ্যে রয়েছে ঐ ব্যক্তি, যে নিজেকে স্বীয় পিতা ব্যতীত অন্যের সন্তান হিসেবে আখ্যায়িত করে, যে স্বপ্ন সে দেখেনি তা দেখার দাবী করে এবং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেন নি তাঁর নামে তা বলে’।[145]

তিনি আরো বলেছেন,

«مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ»

“যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে নি অথচ তা দেখার ভান বা দাবী করে তাকে দু’টি চুলে গিরা দিতে বাধ্য করা হবে; কিন্তু সে তা কখনই করতে পারবে না’।[146]

দু’টি চুলে গিরা দেওয়া একটি অসাধ্য কাজ। সুতরাং কাজ যেমন হবে তার ফলও তেমন হবে।

৬১. কবরের ওপর বসা, কবর পদদলিত করা ও কবরস্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করা

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ»

“যদি তোমাদের কারো অঙ্গারের উপর বসার দরুন তার কাপড় পুড়ে দেহের চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবুও তা তার জন্য কবরের উপর বসা থেকে উত্তম”। [147]

কবর পা দিয়ে মাড়ানোর কাজ অনেকেই করে থাকে। তারা যখন নিজেদের কাউকে কবরস্থানে দাফন করতে নিয়ে আসে, তখন দেখা যায় পার্শ্ববর্তী কবরগুলো মাড়াচ্ছে, কখনও আবার জুতা পায়ে মাড়াচ্ছে, কোনো পরোয়াই

---

145 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৫০৯।

146 সহীহ বুখারী; মিশকাত, হাদীস নং ৪৪৯৯।

147 সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ১৬৯৯।

করছে না। অন্যান্য মৃতদের প্রতি যেন তাদের সম্মানবোধই নেই। অথচ এ সকল মৃত ব্যক্তির সম্মানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
«لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ، أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ»
"আগুনের অঙ্গার কিংবা তরবারির উপর দিয়ে আমার হেঁটে যাওয়া কিংবা আমার পায়ের চামড়া দ্বারা আমার চটি তৈরি করা একজন মুসলিমের কবরের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া থেকে আমার নিকট অধিক প্রিয়"।[১৪৮]
সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো কবরস্থানের মালিক হয়ে সেখানে ব্যবসা কেন্দ্র কিংবা বাড়ী ঘর গড়ে তোলে তার অবস্থা কী দাঁড়াবে? কিছু লোকের কবরস্থানে পেশাব-পায়খানা করার অভ্যাস আছে। তাদের যখন পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন তারা কবর স্থানের প্রাচীর টপকিয়ে কিংবা খোলাস্থান দিয়ে ঢুকে পড়ে এবং মল-মূত্রের নাপাকী ও গন্ধ দ্বারা মৃতদের কষ্ট দেয়। কবরের উপর পেশাব-পায়খানা করা প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
«وَمَا أُبَالِي أَوَسْطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسْطَ السُّوقِ»
'কবরস্থানের মাঝে মল-মূত্র ত্যাগ করতে পারলে বাজারের মধ্যস্থলে মল-মূত্র ত্যাগের কোনো পরোয়া করি না"।[১৪৯]
অর্থাৎ কবরস্থানে মল-মূত্র ত্যাগের কদর্যতা আর বাজারের মধ্যে জনগণের সামনে সতর খোলা ও মল-মূত্র ত্যাগের কদর্যতা একই সমান। সুতরাং কবরস্থানে মল-মূত্র ত্যাগ গুনাহ তো বটেই এমনকি তা লোকালয়ে মল-মূত্র ত্যাগের ন্যায় লজ্জাকরও বটে।

---

148 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৫৭৬, সনদ সহীহ।

149 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৫৬৭; সহীহুল জামে', হাদীস নং ৫০৩৮।

আর যারা ইচ্ছে করে কবরস্থানে ময়লা-আবর্জনা ইত্যাকার জিনিস ফেলে তারাও এ ভৎর্সনায় শামিল হবে।

এছাড়া কবর যিয়ারতকালে কবরসমূহের মাঝ দিয়ে যাতায়াতের সময় জুতা খুলে রাখাই আদবের পরিচয়।

৬২. পেশাবের পর পবিত্র না হওয়া

মানব প্রকৃতিকে পরিশুদ্ধ করার যত উপায়-উপকরণ আছে ইসলামী শরী'আত তার সবই উপস্থাপন করেছে। এটি ইসলামের একটি বড় সৌন্দর্য। নাপাকী দূর করা এসব উপায়ের একটি। এ কারণেই 'ইসতিনজা' বা শৌচকার্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে এবং কীভাবে পাক-পবিত্রতা অর্জিত হবে তার নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে।

অনেকে নাপাকী দূরীকরণে অলসতা করে থাকে। যার ফলে তাদের কাপড় ও দেহ অপবিত্র হয়ে যায় এবং ফলশ্রুতিতে তাদের সালাত হয় না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাকে কবর 'আযাবের অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার একটি খেজুর বাগানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে তিনি দু'জন (মৃত) ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনতে পান। কবরে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। তা শুনে তিনি বললেন, এ দু'টো লোককে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বড় কোনো কারণে নয়। অবশ্য গুনাহ হিসেবে এগুলো কবীরা। তাদের একজন পেশাব শেষে পবিত্র হত না। আর অন্যজন চোগলখুরী করে বেড়াত"।[১৫০]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরং এতদূর বলেছেন যে,

«أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ»

---

[150] সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৬০৭৫।

“বেশিরভাগ কবরের ‘আযাব পেশাবের কারণে হয়”।[১৫১]

পেশাবের ফোঁটা বন্ধ না হতেই যে দ্রুত পেশাব থেকে উঠে পড়ে কিংবা এমন কায়দায় বা স্থানে পেশাব করে যেখান থেকে পেশাবের ছিঁটা এসে গায়ে বা কাপড়ে লাগে সেও এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

কাফেরদের দেখাদেখি আমাদের মধ্যে অনেকস্থানেই দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে টয়লেট তৈরি করা হয়। এগুলো খোলামেলাও হয়। মানুষ কোনো লজ্জা-শরম না করেই চলাচলকারী মানুষের সামনে সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে শুরু করে। তারপর পেশাবের নাপাকী সমেতই কাপড় পরে নেয়। এতে দু’টি বিশ্রী হারাম একত্রিত হয়।

এক. সে তার লজ্জাস্থানকে মানুষের দৃষ্টি থেকে হিফাযত করে না।

দুই. সে পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করে না।

৬৩. লোকদের অনীহা সত্ত্বেও গোপনে তাদের আলাপ শ্রবণ করা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تَجَسَّسُواْ﴾ [الحجرات: ١٢]

“তোমরা গোয়েন্দাগিরি করো না”। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১২]

অনুরূপ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ، صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَةِ»

“যে ব্যক্তি লোকদের অনীহা বা তার কাছ থেকে পালানো সত্ত্বেও তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে ক্বিয়ামতের দিন তার দু’কানে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে”।[১৫২]

---

151 মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৮৩১৩; সহীহ তারগীব, হাদীস নং ১৫৮।

152 সহীহ বুখারী; মিশকাত, হাদীস নং ৪৪৯৯।

আর যদি ক্ষতি করার মানসে তাদের থেকে শোনা কথা তাদের অগোচরে মানুষের নিকট বলে বড়োয়, তাহলে গোয়েন্দাগিরি পাপের সাথে কুটনামির পাপও জড়িত হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ»

"ক্বাত্তাত বা চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না"।[153]

৬৪. প্রতিবেশীর সাথে অসদাচরণ করা

প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতি জোর তাকীদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا ٣٦﴾ [النساء: ٣٦]

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তার সঙ্গে কাউকে শরীক করো না এবং মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণ কর। আর সদাচরণ কর নিকটাত্মীয়, অনাথ, নিঃস্ব, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, পার্শ্বস্থিত সঙ্গী, পথিক ও তোমাদের অধিকারভূক্ত দাস-দাসীদের সঙ্গে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের ভালোবাসেন না যারা গর্বে স্ফীত অহংকারী"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৬]

প্রতিবেশীর হক অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধায় তাকে কষ্ট দেওয়া হারাম। আবু শুরাইহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«واللهِ لا يُؤْمِنُ، واللهِ لا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لا يُؤْمِنُ".قيلَ: وَمَنْ يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: "الَّذِي لا يأْمَنُ جارُهُ بَوائِقَهُ».

---

[153] সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৪৮২৩।

“আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হল, কে সে জন ইয়া রাসুলুল্লাহ? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার থেকে নিরাপদে থাকতে পারে না”।[১৫৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএক প্রতিবেশী কর্তৃক অন্য প্রতিবেশীর প্রশংসা ও নিন্দা করাকে ভালো ও মন্দ আচরণের মাপকাঠি গণ্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবন মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ভালো আচরণ করলাম না মন্দ আচরণ করলাম -তা কী করে বুঝব? তিনি বললেন,

«إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ: أَنْ قَدْ أَحْسَنْتَ، فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَأْتَ، فَقَدْ أَسَأْتَ»

“যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীদেরকে বলতে শুনবে যে, তারা তোমার সম্পর্কে বলাবলি করছে, ‘তুমি ভালো আচরণ করে থাক’ তখন বুঝবে, তুমি নিশ্চয় ভালো আচরণ করছ। আর যখন তাদেরকে বলাবলি করতে শুনবে যে, ‘তুমি মন্দ আচরণ করে থাক’, তখন বুঝবে, তুমি নিশ্চয় মন্দ আচরণ করছ”।[১৫৫]

প্রতিবেশীর সঙ্গে মন্দ আচরণ নানাভাবে হতে পারে। যেমন, প্রতিবেশীর সাথে যৌথভাবে নির্মিত বাড়ীর প্রাচীরের উপর কাঠ কিংবা বাঁশ পুঁততে বাধা দেওয়া, প্রতিবেশীর অনুমতি না নিয়ে তার বাড়ী থেকে নিজ বাড়ীকে উঁচু বা বহুতল করে তার বাড়ীতে লোকদের সতর দেখতে চেষ্টা করা, বিরক্তিকর শব্দ দ্বারা তাকে কষ্ট দেওয়া, বিশেষ করে ঘুম ও আরামের সময়ে চেঁচামেচি ও খটখট আওয়াজ করা, প্রতিবেশীর সন্তানদের মারধোর করা কিংবা তার বাড়ীর দরজায় ময়লা-আবর্জনা ফেলা ইত্যাদি।

---

154 সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৪৯৬২।

155 ইবন মাজাহ; মিশকাত, হাদীস নং ৪৯৮৮।

তাছাড়া প্রতিবেশীর হকের ওপর চড়াও হলে পাপের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ "، ... لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ»

“কোনো ব্যক্তির পক্ষে অন্য দশজন মহিলার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া স্বীয় প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারের তুলনায় অনেক সহজ। অনুরূপভাবে অন্য দশ বাড়ীতে চুরি করা কোনো ব্যক্তির স্বীয় প্রতিবেশীর বাড়ীতে চুরি করা অপেক্ষা অনেক সহজ”।[১৫৬]

অনেক অসাধু ব্যক্তি আছে, যারা প্রতিবেশীর অনুপস্থিতির সুযোগে রাতে তাদের গৃহে প্রবেশ করে এবং অপকর্মে লিপ্ত হয়। এসব লোকের জন্য এক বিভীষিকাময় দিনের শাস্তি অপেক্ষা করছে।

৬৫. অসীয়ত দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করা

শরী‘আতের একটি অন্যতম নীতি হচ্ছে, «لا ضرر ولا ضرار» ‘নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হব না’ অন্যের ক্ষতি করব না’।[১৫৭] এ জাতীয় ক্ষতি করার একটি উপমা হলো, শরী‘আত স্বীকৃত ওয়ারিসগণের সবাইকে অথবা বিশেষ কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। কেউ এমন করলে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত কঠিন সাবধান বাণীর আওতায় পড়বে। তিনি বলেছেন,

«مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ»

“যে কারো ক্ষতি করবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন। আর যে শত্রুতা ও কষ্টে ফেলবে আল্লাহ তাকে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করবেন”।[১৫৮]

---

156 মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৩৯০৫; সিলসিলা সহীহাহ, হাদীস নং ৬৫।

157 সুনান আবু দাউদ, ইবন মাজাহ; মিশকাত, হাদীস নং ৫০৪২।

158 সুনান আবু দাউদ, ইবন মাজাহ; মিশকাত, হাদীস নং ৫০৪২।

অসিয়তের মাধ্যমে নানাভাবে ক্ষতি হতে পারে। যেমন, কোনো ওয়ারিসকে তার ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত করা অথবা একজন ওয়ারিসকে শরী‘আত যেটুকু দিয়েছে তার বিপরীতে তার জন্য অসিয়ত করা কিংবা এক তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করা ইত্যাদি।

যে সব দেশে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা চালু নেই সেখানে একজন পাওনাদার অনেক ক্ষেত্রেই মানব রচিত বিধানের কারণে তার শরী‘আত প্রদত্ত অধিকার লাভে সমর্থ হয় না। মানব রচিত বিচার ব্যবস্থা তাকে উকিলের মাধমে লিখিত অন্যায় অসীয়ত কার্যকর করতে আদেশ দেয় এবং সে তা কার্যকর করতে বাধ্য হয়। সুতরাং বড়ই পরিতাপ তাদের স্বহস্তে রচিত আইনের জন্য এবং বড়ই পরিতাপ তারা যে পাপ কামাই করছে তার জন্য!

৬৬. দাবা খেলা

লোকসমাজে প্রচলিত অনেক খেলাধুলার সাথেই হারাম জড়িত আছে। দাবা এমনই একটি খেলা। দাবা থেকে আরো অনেক রকম খেলার প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি হয়। যেমন, পাশা খেলা প্রভৃতি। জুয়া ও বাজির দ্বার উন্মোচনকারী এ দাবা সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন,

«مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ»

“যে ব্যক্তি দাবা খেলে সে যেন শুকরের রক্ত-মাংসে স্বীয় হাত রঞ্জিত করে”।[১৫৯]

আবু মূসা আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

“যে ব্যক্তি দাবা খেলে, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধানকে অমান্য করে”।[১৬০]

---

[159] সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৪৫০০।

[160] মুসনাদে আহমদ; সুনান আবু দাউদ; মিশকাত, হাদীস নং ৪৫০৫।

সুতরাং দাবা ও তার আনুসঙ্গিক খেলা যেমন তাস, পাশা, ফ্লাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে অবশ্যই শরী'আতের আদেশ মানতে হবে।

৬৭. কোনো মুসলিমকে অভিশাপ দেওয়া এবং যে অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য নয় তাকে অভিশাপ দেওয়া

অনেকেই রাগের সময় জিহবাকে সংযত রাখতে পারে না। ফলে বেদিশা হয়ে লা'নত করে বসে। তাদের লা'নতের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। মানুষ, পশু, জড় পদার্থ, দিন-ক্ষণ এমনকি নিজের সন্তান-সন্ততিদেরও তারা লা'নত করে বসে। দেখা যায়, স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে লা'নত করে, আবার স্ত্রীও স্বামীকে লা'নত করে। এটি একটি মারাত্মক অন্যায়। আবু যায়েদ সাবিত ইবন দাহহাক আনসারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ»

"যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে লা'নত করল বা কাফের বলে গালি দিল, সে যেন তাকে হত্যা করল'।[১৬১]

মহিলাদেরকে বেশি বেশি লা'নত করতে দেখা যায়। এজন্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের জাহান্নামী হওয়ার নানা কারণের মধ্যে এটি একটি বলে উল্লেখ করেছেন।[১৬২]

এমনিভাবে লা'নতকারীরা কিয়ামত দিবসে সুপারিশকারীও হতে পারবে না। সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার এ যে, অন্যায়ভাবে লা'নত করলে তা লা'নতকারীর ওপর বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে। তাতে লা'নতকারী মূলতঃ নিজকেই আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করার জন্য প্রার্থনাকারী হয়ে দাঁড়ায়।

৬৮. বিলাপ ও মাতম করা

---

[161] সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৩৪১০।

[162] সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ১৯।

অনেক মহিলা আছে যারা চেঁচিয়ে কাঁদে, মৃতের গুণাবলী উল্লেখ করে মাতম করে, গালে-মুখে থাপ্পড় মারে -এগুলো বড় অন্যায়। অনুরূপভাবে কাপড় ও পকেট ছিঁড়ে, চুল উপড়িয়ে, বেনী বেঁধে বা জড়িয়ে ধরে বিলাপ করাও মহা অন্যায়। এতে আল্লাহর ফায়ছালার প্রতি অসন্তোষ ও বিপদে অধৈর্যের পরিচয় মেলে। যে এমন করবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি লা'নত করেছেন। এ সম্পর্কে আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ»

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখমণ্ডল ক্ষত-বিক্ষতকারিণী, পকেট বিদীর্ণকারী এবং দুর্ভোগ ও ধ্বংস প্রার্থনাকারিণীর ওপর লা'নত করেছেন"।[১৬৩]

ইবন মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন,

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ»

"যে গালে থাপ্পড় মারে, পকেট ছিঁড়ে ফেলে ও জাহেলিয়াতের রীতি-নীতির প্রতি আহ্বান জানায় সে আমাদের দলভুক্ত নয়"।[১৬৪]

তিনি আরো বলেছেন,

«النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ»

"মাতমকারিণী মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করলে কিয়ামত দিবসে তাকে আলকাতরার পাজামা ও খোস-পেঁচড়াযুক্ত বর্ম পরিহিতা অবস্থায় তোলা হবে"।[১৬৫]

সুতরাং কারো মৃত্যু বা বিপদে বিলাপ-মাতম ও আহাজারী করা বড়ই অন্যায়।

৬৯. মুখমণ্ডলে আঘাত করা ও দাগ দেওয়া

---

163 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৫৮৫। সনদ সহীহ।

164 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৯৪।

165 সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ১৭২৭।

জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখমণ্ডলে আঘাত করতে এবং মুখমণ্ডলে দাগ দিতে নিষেধ করেছেন”।[১৬৬]

মুখমণ্ডলে আঘাতের বিষয়টি কিছু মাতা-পিতা ও শিক্ষকদের থেকে বেশি প্রত্যক্ষ করা যায়। তারা সন্তানদের বা ছাত্রদের শাসন করার জন্য হাত কিংবা অন্য কিছু দ্বারা মুখমণ্ডলে মেরে থাকে। অনেকে বাড়ীর চাকরদের সাথে এরূপ করে থাকে। এতে আল্লাহ তা’’আলা যে চেহারার বদৌলতে মানুষকে সম্মানিত করেছেন তাকে অমর্যাদা করার সাথে সাথে অনেক সময় মুখমণ্ডলের কোনো একটি ইন্দ্রিয় অকেজো হয়ে পড়তে পারে। ফলে অনুশোচনা ছাড়াও ক্ষেত্রবিশেষে কিসাস দেওয়া লাগতে পারে।

পশুর মুখমণ্ডলে দাগ দেওয়া কাজটি পশু মালিকদের সাথে জড়িত। তারা স্ব স্ব পশু চেনা ও হারিয়ে গেলে ফিরে পাওয়ার জন্য পশুগুলোর মুখে দাগ দিয়ে থাকে। এটা হারাম। এতে পশুর চেহারা ক্ষত করা ছাড়াও তাকে কষ্ট দেওয়া হয়। কেউ যদি দাবী করে যে, এরূপ দাগ দেওয়া তাদের গোত্রের একটি রীতি এবং গোত্রের বিশেষ চিহ্ন, তাহলে এটুকু করার অবকাশ থাকতে পারে যে শরীরের অন্য কোথাও দাগ বা কোনো চিহ্ন দিবে; মুখমণ্ডলে নয়।

৭০. শর‘ঈ কারণ ব্যতীত তিন দিনের ঊর্ধ্বে কোনো মুসলিমের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা

মুসলিমে মুসলিমে সম্পর্কে বিনষ্ট করা শয়তানের অন্যতম চক্রান্ত। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসারী অনেকেই শর‘ঈ কোনো কারণ ছাড়াই মুসলিম ভাইদের সাথে সম্পর্কে ছিন্ন করে। নিহায়েত বস্তুগত কারণে কিংবা দুর্বল কোনো বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ছিন্ন সম্পর্ক যুগ যুগ ধরে চলতে থাকে। তারা কেউ একে

---

[166] সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৪০৭৭।

অপরের সঙ্গে কথা না বলার শপথ করে, তার বাড়ীতে প্রবেশ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। রাস্তায় দেখা হলে পাশ কেটে চলে যায়। মজলিসে হাযির হলে তার আগে-পিছের লোকদের সঙ্গে করমর্দন করে কিন্তু তাকে এড়িয়ে যায়। ইসলামী সমাজে দুর্বলতা অনুপ্রবেশের এটি অন্যতম কারণ। এর শর‘ঈ হুকুম চূড়ান্ত ও পরকালীন শাস্তি কঠোর। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ»

“কোনো মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের ঊর্ধ্বে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা বৈধ নয়। যে মুসলিম তিন দিনের ঊর্ধ্বে সম্পর্ক ছেদ করে থাকা অবস্থায় মারা যায় সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে”।[১৬৭]

অন্যত্র তিনি বলেন,

«مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ»

“যে ব্যক্তি তার ভাইকে এক বৎসর অবধি পরিত্যাগ করে থাকে সে তার রক্তপাতকারী সমতুল্য’।[১৬৮]

মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম এত মারাত্মক যে, এর ফলে আল্লাহর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন,

«تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ، يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: اتْرُكُوا، أَوِ ارْكُوا، هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا»

“প্রতি সপ্তাহে বান্দার আমল আল্লাহর সমীপে দু’বার করে পেশ করা হয়। সোমবারে একবার ও বৃহস্পতিবারে একবার। তখন সকল ঈমানদার বান্দাকেই

---

[167] মুসনাদে আহমদ; সুনান আবু দাউদ; মিশকাত, হাদীস নং ৫০৩৫।

[168] সুনান আবু দাউদ; মিশকাত, হাদীস নং ৫০৩৬; সনদ সহীহ।

ক্ষমা করা হয়; কেবল সেই লোককে ক্ষমা করা হয় না, যার সাথে তার ভাইয়ের শত্রুতা আছে। তাদের দু'জন সম্পর্কে বলা হয়, 'এ দু'জনকে বাদ রাখ কিংবা অবকাশ দাও, যে পর্যন্ত না তারা দু'জন ফিরে আসে"।[১৬৯]
(অর্থাৎ শত্রুতা পরিহার না করা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা করা নিষিদ্ধ।)
বিবাদকারীদ্বয়ের মধ্যে যে তওবা করবে, তাকে তার সঙ্গীর নিকটে গিয়ে সাক্ষাত করা ও সালাম প্রদান করা জরুরি। যদি সে তা করে কিন্তু তার সঙ্গী সাক্ষাত না দেয় কিংবা সালামের জবাব না দেয় তবে সে দোষমুক্ত হয়ে যাবে এবং দণ্ড যা কিছু তা অস্বীকারকারীর উপরে পতিত হবে।
আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,
«لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ: فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ»
"কোনো ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছেদ করে থাকা বৈধ নয়। (সম্পর্কছেদের চিহ্নস্বরূপ) তাদের দু'জনের সাক্ষাত হলে দু'জনই মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের দু'জনের মধ্যে সে-ই উত্তম হবে, যে প্রথমে তার সঙ্গীকে সালাম দিবে"।[১৭০]
হাঁ, যদি সম্পর্কছেদ করার শর'ঈ কোনো কারণ পাওয়া যায়। যেমন, সে সালাত আদায় করে না কিংবা বেপরোয়াভাবে অন্যায়-অশ্লীল কাজ করে করে চলে তাহলে লক্ষ্য করতে হবে, তখন প্রশ্ন হবে, এমতাবস্থায় সম্পর্কচ্ছেদই তার জন্য মঙ্গলজনক না সম্পর্ক রক্ষাই মঙ্গলজনক? এর উত্তরে বলা হবে যে, যদি সম্পর্কচ্ছেদে তার মঙ্গল হয় এবং সে সৎ পথে ফিরে আসে তাহলে সম্পর্কছেদ করা ফরয হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি মঙ্গলজনক না হয়ে বরং আরো বিগড়ে

---

[169] সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৫০৩০।

[170] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৭৭।

যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তার মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি ও পাপ প্রবণতা বেড়ে যায় তাহলে সম্পর্ক ছিন্ন করা ঠিক হবে না। কেননা তাতে সংশোধন না হয়ে বরং বিশৃঙ্খলা আরো বেড়ে যাবে। সুতরাং তার সঙ্গে সংস্রব বজায় রেখে যথাসাধ্য নসীহত করে যেতে হবে।

سبحانك اللّٰهُمَّ وبحمدك أشهد أن لا إلٰه إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

اللّٰهُمَّ اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.